Vincent

জীবন কাটায়ে দেয় যে মানুষ সূক্ষ্মতর শিল্পচিন্তা নিয়ে,
ফলকের পর ক্ষুদ্র নিয়ন্তা রেখার টানে ফেলেছে যে সীমানা হারিয়ে

জীবনানন্দ দাশ

ভিনসেন্ট

এক অবিস্মরণীয় জীবন

সংকলন ও সম্পাদনা

অনির্বাণ রায়



একাডেমী থিয়েটার

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ১৯৯৮

প্রচ্ছদ
যামিনী রায় অঙ্কিত ভিনসেন্ট-প্রতিকৃতি অবলম্বনে
অর্ণব সেনগুপ্ত

প্রকাশক
একাডেমী থিয়েটার
১৭৭ নেতাজী সুভাষ রোড
হাওড়া ৭১১ ১০১

মুদ্রক
অরিজিৎ কুমার
লেজার ইম্প্রেশনস
২ গণেন্দ্র মিত্র লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৪

উ ৎ স র্গ

শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়

নিবেদন

নিজের জীবন সৃষ্টিতে যাঁরা গুণী তাঁদের আমরা অমর বলি।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভিনসেন্ট ভ্যান গঘ-এর নাম উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে পড়ে যায় তিনি এঁকেছেন সূর্যমুখী ফুলের ছবি। একবার তিনি কেটে ফেলেছিলেন নিজের কান। আর মাত্র সাঁইত্রিশ বছর বয়সে পৃথিবী থেকে স্বেচ্ছাবিদায় নিয়েছিলেন পেটে গুলি ঢুকিয়ে। দশ বছর আগে এই সংকলনের কাজ শুরু করার সময় জানা ছিল না ভিনসেন্ট ভ্যান গঘ প্রথম জীবনে যীশুখ্রীস্টের সেবক হতে চেয়েছিলেন, 'আমার সাধ : যদি যাজক হতে পারি আর স্থান পূরণ করতে পারি যাতে আমার কাজকে মনে হয় পিতার কাজ, তবে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেব।' বাইবেল-এর রসে আপাদমস্তক নিমজ্জিত ভিনসেন্ট যাজক হননি। মত বদল করেছিলেন। তাঁর আত্মবিশ্বাস ছিল প্রবল নইলে ভাই তেও-কে কখনো লিখতেন না, 'অপেক্ষা কর, হয়তো কোনোদিন দেখবি আমিও একজন শিল্পী; জানি না কী করতে পারি, তবে আশা করি কিছু ড্রয়িং করতে পারব যাতে কিছু মানবত্ব থাকবে।' তাঁর মনের জোর ছিল নজিরবিহীন। নইলে যীশুখ্রীস্টের জন্মদিনে যাজক পিতার সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়ে ছবি আঁকাকেই ধ্যানজ্ঞান করে নিতেন না। ভিনসেন্ট বিশ্বাস করতেন ফিগার ড্রয়িং করতে গেলে কেবল ড্রয়িং-এর কৌশল জানা থাকলেই চলবে না, এর জন্য প্রয়োজন প্রভূতপরিমাণে সাহিত্যপাঠ, শারীরবিদ্যা চর্চা। বাবা পছন্দ করতেন না কিন্তু ভিনসেন্ট প্রচুর বই পড়তেন, শারীরবিদ্যা বিষয়ক বই সংগ্রহ করে খাতার পাতায় মকসো করতেন ছবি আঁকা। ড্রয়িং করতে তিনি ভালোবাসতেন। এমনও হয়েছে ঘণ্টাখানেক ধরে এঁকে চলেছেন পুরনো কোনো গাছের গুঁড়ি। দেখে কোনো কৃষক তাঁকে ঠাউরেছে উন্মাদ। ভিনসেন্ট গায়ে মাখেননি সেই কৃষকের উপহাস। কারণ তিনি শিল্পী হতে চেয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন কাজ করতে গেলে, শিল্পী হতে গেলে প্রয়োজন ভালোবাসা। ভালো তিনি বেসেছিলেন। বেসে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তাই বলে দমে যাননি। শিল্পের কঠিন পথ পরিত্যাগ করেননি। লড়াই করেছেন সারাটা জীবন। বাজি ধরেছেন নিজেকে। ভাই তেও-কে এই প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছেন, 'কোনো কিছুর জন্য যদি চেষ্টা করার সাহস না থাকে, তবে কিসের জীবন?' শিল্পী মিইয়ের একটা কথা, 'শিল্প হল সংগ্রাম', তাঁর খুব প্রিয় ছিল। মিইয়ের জীবনী চেয়ে এনে রাত জেগে পড়তেন ভিনসেন্ট। কারণ তিনি শিল্পী হতে চেয়েছিলেন। একদিন তিনি ভাইকে লিখেছিলেন, 'ছবি আঁকাতেই আমার প্রকৃত জীবন শুরু হবে।' একটা বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে কী করে পথ চলতে হয় ভিনসেন্টের স্বসৃষ্ট সংক্ষিপ্ত জীবন তার উজ্জ্বল উদাহরণ। ফুল-পাখি-গাছ-পোকামাকড়-শ্রমজীবী সাধারণ মানুষ-ঘরবাড়ি-নিজের মুখ-হাত-বই-প্রকৃতির দৃশ্য-মড়ার খুলি-বুট জুতো -কে বিষয় করে ছবি এঁকেছেন। আধুনিক শিল্পীদের ভেতরে ভিনসেন্টই সবচেয়ে বেশি সাড়া ফেলেছেন সাধারণ মানুষের মনে। অথচ তাঁর ছবির প্রদর্শনী দেখার জন্য স্বদেশে-বিদেশে লক্ষ লক্ষ মানুষ যে ভিড়

জমায়, প্রদর্শনী শুরু হওয়ার দু মাস আগে সব টিকিট কিনে নেয়, তারা জানে না ভিনসেন্টের ছবিতে তারা ঠিক কী দেখতে চায়। এইজন্যই কি ভিনসেন্টের ছবির নকল করিয়ে একদল সুযোগসন্ধানী (অ)মানুষ বিশ্বজোড়া ব্যাবসার জাল বিছিয়েছে! এইসব ঠগদের হাত থেকে শিল্পপ্রেমী মানুষদের বাঁচাবার জন্য লেখা হয়েছে কিছু বই যাদের বিষয়বস্তু কী করে চিনতে হবে ভিনসেন্টের ছবি। পারির 'কনেশাঁস ডেজার্ট' পত্রিকায় (অকটোবর ১৯৫৭) প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে এম ভ্যান দাঁতজিগ ভিনসেন্টের ছবির এই তেরটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন :

১ বাস্তব জগৎ এবং প্রকৃতি থেকে তিনি ছবির যে বিষয়বস্তু নির্বাচন করেছেন, তা কখনোই অসম্ভব বিষয়ের সমন্বয় নয়।
২ ছোটোখাটো অনুপুঙ্খ নিয়ে তাঁর মাথা ব্যথা নেই।
৩ তাঁর ছবি আদতে যা দেখায় তার চেয়ে বড়ো।
৪ ছবির কেন্দ্রে বড়োসড়ো বস্তু রাখা হয়।
৫ সাধারণভাবে তিনি একটি বৃহৎ শূন্যস্থান নির্দেশ করেন, জোর দেন তৃতীয় মাত্রার উপর।
৬ ছবির নিম্নভাগে রৈখিক পরিপ্রেক্ষিত লক্ষ করা যায়।
৭ ক্যানভাসের তিন-চতুর্থাংশ উপরে দিগন্ত রেখার অবস্থান।
৮ ছবিতে দেখা যায় চূড়ান্ত হালকা এবং ভারী টোন।
৯ সাধারণভাবে ঠাণ্ডা টোনেরই প্রাধান্য।
১০ তাঁর রীতি ছিল সীমারেখা ঘেঁষে রং দিয়ে ছবি শেষ করা।
১১ সাধারণভাবে ছবির মাঝখানটাই সবচেয়ে বেশি মনোযোগ আকর্ষণ করে।
১২ ছবির কেন্দ্রস্থলে সবচেয়ে বেশি কাজ করা হয়।
১৩ তল-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাশ-টানার দিকও পরিবর্তিত হয়।

'তাঁর ছবি হল মূর্তিমান তারল্য, আর সেই কারণে এমন স্বাভাবিকভাবে ছবি ধুয়ে দেয় চোখ, আর এমন স্বতঃস্ফূর্তভাবে দর্শকের বিশ্বাস জয় করে নেয়।' লিখেছেন একজন ভিনসেন্ট-রসিক। তাঁর সমসাময়িক হুগো ফন হফমানস্থল, বিশ বছর যিনি মিউজিয়াম/ছবির প্রদর্শনীতে যাননি, ভিনসেন্টের ছবির প্রদর্শনী দেখে এসে চিঠিতে জানাচ্ছেন যে তিনি আবিষ্কার করেছেন প্রদর্শিত ছবিগুলো কোন অন্তর্লীন আত্মীয়তায় আবদ্ধ। তাঁর মনে হয়েছে ভিনসেন্টের ছবিরা একে অপরের জন্য। ভিনসেন্ট সম্পর্কে গুস্তাভ কান লিখেছিলেন (এপ্রিল ১৮৮৮), 'মি. ভ্যান গঘ জোরালো ভূদৃশ্য আঁকেন খুব গভীর যত্ন ছাড়া কারণ টোনের মূল্য বা অবিকৃতি। বহুবর্ণ বইয়ের ভিড় একটা চিকের জন্ম দেয়; এ ধরনের মোটিফ স্টাডির উপযুক্ত, তবে পেন্টিং-এর মুখপাত হতে পারে না।' সেদিন জানা ছিল না এই লেখন-বটবীজ থেকে ভবিষ্যতে দেখা দেবে ভিনসেন্ট-সাহিত্য নামে বিশাল মহীরুহ। চার্লস মাটটুন ব্রুকসকে সংকলন করতে হবে *ভিনসেন্ট ভ্যান গঘ : আ বিবলিওগ্রাফি*। ১৯৪২-এ ব্রুকসের বই প্রকাশপর্যন্ত ভিনসেন্ট-সংক্রান্ত মুদ্রিত আলোচনার সংখ্যা সাতশো সাতাত্তর। তাঁর ছবিকে ভিত্তি করে রচিত হয়েছে একাধিক গবেষণাপত্র। আর তাঁর অবিস্মরণীয় জীবন অবলম্বনে লেখা হয়েছে অসংখ্য উপন্যাস যার আদিতমটির প্রকাশকাল ১৯১৩। সতেরজন প্রকাশক-প্রত্যাখ্যাত আর্ভিং স্টোন-এর বেস্টসেলার উপন্যাস *লাস্ট ফর লাইফ* (১৯৩৪) চলচ্চিত্রায়িত হলে (১৯৫৬) ভিনসেন্টের চরিত্রে অভিনয়

করেন কার্ক ডগলাস। ভিনসেন্টের জীবন তাঁকে কীভাবে নাড়া দিয়েছিল তা ধরা পড়েছে তাঁর এই কথায়, 'লোকেরা প্রশ্ন করে, "ভ্যান গঘের জীবন অভিনয় করা সাংঘাতিক শক্ত, না?" নিঃসঙ্গতা কী তা যে জানে—কে না জানে?—সে-ই এই নিগৃহীত আত্মাকে উপলব্ধি করতে পারবে। তাঁর জীবন রূপ দেওয়া নয় তো শেষ হয়ে যাওয়া তবে আমার কর্মজীবনের সবচেয়ে মূল্যবান অভিজ্ঞতা।' সদ্যপ্রয়াত জাপানী পরিচালক আকিরা কুরোশোওয়া, 'ড্রিমস' নামের আট-পর্বের ছবিতে যিনি ভিনসেন্টকে উত্তরকালের জন্য ধরে রেখে গেছেন, আত্মকথায় লিখেছেন, 'সেজানের কোনো মনোগ্রাফ দেখে বাইরে বেরতে দেখি বাড়িঘর, পথ, গাছপালা সমস্ত কিছুই সেজানের ছবির মতো লাগছে। একই ঘটনা ঘটত ভ্যান গঘ বা উত্রিলোর ছবির বই দেখে...।' পড়ে আমরা অবাক হই না। এমনটাই তো হবার কথা। কারণ ভিনসেন্ট শিল্পী হতে চেয়েছিলেন। হয়েছিলেন। শিল্পী যামিনী রায় তাঁর একটি আত্মপ্রতিকৃতি কপি করেছিলেন। কেন? আমরা জানি না। আমরা কেবল জানতে চাই সেই শিল্পীকে, ভিনসেন্ট ভ্যান গঘ যাঁর নাম, যিনি বলেছিলেন, 'অনুভব করি জনগণের হৃদয়ে রয়েছে আমার কাজ, আমাকে থাকতে হবে মাটির কাছাকাছি, জীবনকে ধরতে হবে তার অনেকান্ত গভীরতাসহ।'

এই সংকলন সেই অনেকান্ত শিল্পী ভিনসেন্টকে বুঝতে-ছুঁতে চাওয়ার বিনম্র প্রয়াস।

অনির্বাণ রায়

কৃতজ্ঞতাস্বীকার

এই সংকলনের প্রথম পরিকল্পনার দিন থেকে সকল অর্থে সক্রিয় উৎসাহ দিয়েছেন অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত এবং রণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভিন্ন রচনা অনুবাদে সাহায্য করেছেন সুকুমারী ভট্টাচার্য, কৃষ্ণগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজয় দেব। শিল্পী শুভাপ্রসন্ন ও অশোক মল্লিক সানন্দে প্রবন্ধ রচনা করে দিয়েছেন। প্রার্থনামাত্র চিত্রপরিচালক পল কক্‌স্‌ নিঃশর্তে তাঁর প্রবন্ধটি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

অ্যামস্টার্ডামের ভ্যান গঘ মিউজিয়ামের পরিচালক জন লিটন-এর আনুকূল্যে ভিনসেন্টের বারোটি ছবি ও পত্রের প্রতিলিপি মুদ্রণ সম্ভব হল। এই মিউজিয়ামের অনিতা ভ্রিযেণ্ড, ফিয়েক ও সোফি পেস্ট এবং জোসেট ভ্যান গেমের্ট -এর কাছ থেকে পেয়েছি অকৃপণ সাহায্য। নতুন দিল্লীর ফরাসি দূতাবাস, টোকিওর দ্য টোকিও শিমবুন পত্রিকা, নিউ ইয়র্কের দ্য মিউজিয়াম অব মডার্ন আর্ট -এর সহায়তা স্মরণযোগ্য। মুদ্রণকর্মে ও আনুষঙ্গিক নানা পর্বে সাহায্য করেছেন অর্ণব সেনগুপ্ত, সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় এবং আরও অনেকে।

স্বল্প সময়ে এই সংকলন পাঠকদের হাতে তুলে দেওয়ার গুরুদায়িত্ব হাসিমুখে কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন অরিজিৎ কুমার ও সঞ্জয় সাউ। দীর্ঘ দশবছর বন্ধু শুভানুধ্যায়ীরা নানাভাবে উৎসাহ দিয়েছেন। বহু প্রয়োজনীয় গ্রন্থ সংগ্রহ করে দিয়েছেন তপন চট্টোপাধ্যায়, অর্ণব ভট্টাচার্য এবং প্রেম প্রকাশ, সেইসঙ্গে কলকাতার ফুটপাথের পুরনো গ্রন্থবিক্রেতা বন্ধুবর্গ।

পরিশেষে, একাডেমী থিয়েটার এবং তার প্রাণপুরুষ বন্ধু দেবজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর জীবনের দুর্লভ অভিজ্ঞতার মূল্যবান ভাণ্ডার নিয়ে শর্তহীন পাশে এসে না দাঁড়ালে এই গ্রন্থপ্রকাশ সম্ভব হত না। অপরিশোধ্য তাঁর ঋণের কাছে আনতহৃদয় হয়ে রই।

সূচী

ر

ভিনসেন্ট

রণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

নেদারল্যান্ডসের ভ্যান গঘ পরিবারে ভিনসেন্ট নামটি সেই সতের শতক থেকেই চোখে পড়ে। ঠাকুরদার নামেই নামকরণ হয়েছিল উনিশ শতকের বিখ্যাত শিল্পী ভ্যান গঘেরও। কয়লাখনি অঞ্চল বোরিনাজে থাকার সময় থেকেই ভাই তেওকে ফরাসী ভাষায় চিঠি লিখতেন এই শিল্পী। পরে আর্লে শহরে থাকার সময় পারির সালোঁ দ্যেজ্যাঁদেপ্যাঁদাঁতে (Salons des Indépendants) তাঁর কয়েকটি ছবি প্রদর্শিত হয়। এই সময় সুস্পষ্টভাবে তিনি জানিয়ে দেন, "ছবির ক্যানভাসে আমি যে নামসই করি সেই 'ভিনসেন্ট' নামই যেন ভবিষ্যতে ক্যাটালগে লেখা হয় ভ্যান গঘ নয়, তার সোজা কারণ এই যে শেষের নামটি কি করে উচ্চারণ করতে হয়, তা এখানকার লোক জানে না।"

ঠাকুরদা জন্মেছিলেন ফরাসী বিপ্লবের বছরে। প্যাস্টরের কাজ করতেন ব্রেডায় (Breda)। বাবা থেওডোরাস-ও সাধারণ যাজকের পদেই কাজ করতেন। ছয় ভাইয়ের মধ্যে একমাত্র তিনিই এই বৃত্তি নিয়েছিলেন। অন্য ভাদের মধ্যে সেন্টের প্রিন্ট ও আধুনিক চিত্রের দোকান ছিল দি হেগের ১৪নং প্লাৎস ঠিকানায়। হেনড্রিক ও কর্নেলিয়াস-ও ছিলেন চিত্রব্যবসায়ী।

১৮৪৯এর ১লা এপ্রিল থেওডোরাস উত্তর ব্রাবান্টের বেলজিয়াম সীমান্তের কাছাকাছি গ্রোট-ৎসুন্ডার্ট গ্রামের প্যাস্টর পদে নিযুক্ত হন। মাত্র শ'খানেক অধিবাসীর প্যারিশ। ১৮৫১তে রাজসভার বুকবাইন্ডারের মেয়ে আন্না কর্নেলিয়া কারবেনটাসের (ডাক নাম 'মু') সঙ্গে রেভারেন্ড ভ্যান গঘের বিবাহ হয়। মৃতজাত প্রথম সন্তানটির কথা বাদ দিলে ভিনসেন্টই সন্তানদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ। জন্ম ৩০শে মার্চ ১৮৫৩। অন্যান্যরা হলেন আন্না কর্নেলিয়া (মায়ের নামেই নাম), জন্ম ১৮৫৫; বাবার নামেই নাম থেওডোরাস, জন্ম ১মে ১৮৫৭ (তেও নামেই ইনি সুপরিচিত); এলিজাবেথ হুবার্টা (১৮৫৯); ভিলহেলমিনা ইয়াকোবা (১৮৬২) আর কর্নেলিস ভিনসেন্ট (১৮৬৭)।

শান্ত নিঃসঙ্গ বালক ভিনসেন্ট গ্রামের মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসে। প্যারিশের স্কুলেই লেখাপড়ার শুরু। একটু বড়ো হতে বাবা তাকে ৎসেফেনবের্গেন-এ জীন প্রফিলির (Jean Provily) বোর্ডিং স্কুলে ভর্তি করে দিলেন ১লা অক্টোবর ১৮৬৪। এখানে ফরাসী, ইংরেজি ও জার্মান শেখার সূত্রপাত। তবে ছাত্র হিসাবে মেধাবী নয়। ছবি আঁকার শুরু খুব ছোটো বয়সেই। ১৮৬৩ সাল থেকে আঁকা ছবিও রক্ষিত। ড. জে. জি ভান গেলডেন (Dr. J. G. Van Gelden) ভিনসেন্টের বাল্যকালে আঁকা ছবি থেকে পরবর্তী জীবনের বিকাশ সম্বন্ধে তাৎপর্যপূর্ণ গবেষণা করেছেন। পরে টিলবুর্গের হান্নিক ইনস্টিট্যুটে তাঁকে ভর্তি করা হয়; কিন্তু ১৮৬৮ সালের মার্চের মাঝামাঝি রেভারেন্ডের আর্থিক সংস্থানের অবনতি ঘটায় পনের বছর বয়সে পড়াশুনার পাট চুকিয়ে আবার গ্রোট-ৎসুন্ডার্টে ফিরে আসতে হল ভিনসেন্টকে।

বিখ্যাত চিত্রব্যবসায়ী গুপিল অ্যান্ড কোম্পানির (Goupil and Co) হেডকোয়ার্টার ছিল পারির রূ শাপতালে। বুলোভার মঁমার্ত্র এবং প্লাস দ্য ল'পেরাতে দুটি গ্যালারিও ছিল তাঁদের। সেন্টকাকার দোকানটা হয়েছিল তাদের ডাচ শাখা। সেন্টকাকা সেই সময় অসুস্থ হয়ে পড়ায় ব্যাবসাপত্র বিক্রি করে দিয়ে ব্রেডার কাছে প্রিন্সেনহাজে (Princenhage) বসবাস করছিলেন। তাঁর সুপারিশে ডাচ শাখার ম্যানেজার মিস্টার টেরস্টেগ (Mr. Teersteg) ভিনসেন্টকে প্রিন্ট ও খোদাইকাজ বিক্রেতার পদে নিযুক্ত করলেন।

দি হেগ ছিল এক সমৃদ্ধিশালী উদ্যমশীল রাজ্যের রাজধানী। ১৮৫৯ থেকে তৃতীয় উইলিয়াম এখানে রাজত্ব করেন। সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি তাঁর আনুগত্য এই রাজবংশকে রাষ্ট্রিক ইতিহাসে মর্যাদাপূর্ণ স্থান দিয়েছে। উনিশ শতকের জাগ্রত দেবতার নাম প্রগতি। ইউরোপের অন্যান্য অংশের মতো এখানেও সামাজিক শান্তি অর্জিত হয়েছিল এই দেবতাটি যাদের কথা ভুলে গিয়েছিলেন সেই দারিদ্র্য ও দুর্দশাপীড়িত মানুষদের পিঠে দাঁড়িয়ে। ভিনসেন্টের যখন আঠারো বছর বয়স এই রাজধানী শহরের রাজদরবার-গৃহের (The Lange Vijverberg) পেন্সিল ও কলমে একটি ছবি তিনি আঁকেন।

উৎসাহী সময়নিষ্ঠ দক্ষ কর্মচারী ভিনসেন্ট। সকলেই তাঁর প্রশংসা করে। জীবনযাত্রায় নিয়মনিষ্ঠ সরল অধ্যয়নশীল। বইপড়া ছাড়াও মিউজিয়ামে যাওয়া অভ্যাস। ১৮৭২এর গ্রীষ্মকালে বাড়ি এলেন। ইতোমধ্যে ১৮৭১এর জানুয়ারিতে বাবা বদলি হয়ে গেছেন হেলভয়ের্ট (Helvoirt) শহরে প্যাস্টর হয়ে। কাছেই অয়স্টারভাইকে ছোটোভাই তেও পড়ে। সেও এসে হাজির। কিন্তু বাবার আর্থিক অবস্থার কিছুতেই সুরাহা হচ্ছে না। তেও-র লেখাপড়া চালানো তাই অসম্ভব হয়ে উঠেছে। দুই ভাই দি হেগে ফিরে এলেন। ভিনসেন্ট তখন রোজ (Roos) পরিবারের সঙ্গে থাকেন। কয়েক দিন পরে তেও তার স্কুলে ফিরে গেল। এই সূত্রপাত হল দুই ভাইয়ের মধ্যে চিঠি লেখা।

১৮৭৩ এর গোড়ায় তেও যোগ দিলেন গুপিল অ্যান্ড কোম্পানির ব্রুসেলস গ্যালারিতে। সে-ও সেন্ট কাকারই সুপারিশে। একই কোম্পানিতে একই পেশায়। এখন থেকে আগামী সতেরো বছর দুই ভাইয়ের মধ্যে নিয়মিত চিঠিপত্র লেখা চলতে থাকে। কেবল মাঝখানে বার তিনেক তাতে ছেদ পড়েছিল। প্রথমবার ১৮৭৪এর অগাস্ট থেকে ১৮৭৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত, ভিনসেন্ট তখন অনিশ্চয়তা উদ্‌বেগ আর পালাবদলের পর্যায়। দ্বিতীয়বার ১৮৭৯র অক্টোবর থেকে ১৮৮০র জুলাই পর্যন্ত। ভাই নিজের মুখে বলে দিয়েছেন ভিনসেন্টের চলার পথ তিনি সমর্থন করেন না, অতএব তাঁকে চিঠি লেখা নিষ্প্রয়োজন। তৃতীয়বার ১৮৮৬র মার্চ থেকে ১৮৮৮র ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত; তখন ভিনসেন্ট পারিতে তেওর কাছেই থাকেন। অর্থাৎ, একুনে চুয়াল্লিশ মাস।

১৮৭৩ এর জানুয়ারি মাসে মাইনে বাড়ল। দু'মাস পরে লন্ডন গ্যালারিতে তাঁকে পাঠানো হল। একমাত্র চিত্রব্যবসায়ীদের কাছেই ছবি বিক্রি করা হত এখানে। জুন মাসে লন্ডনে গেলেন। তবে তার আগে কয়েকটা দিন পারিতে কাটিয়ে এলেন। এই সময় সালোঁ, লুভ্র্ আর ম্যূজে দ্য লুক্সেমবুর্গ ঘুরে ঘুরে দেখলেন। লন্ডনে থাকায় কোনো অসুবিধা নেই। বরং দি হেগের থেকে এখানে সময় বেশি পাওয়া গেল। কেবল শহরতলীর যে অঞ্চলে বাসা নিয়েছিলেন তাঁর পক্ষে বড়ো বেশি খরচা সেখানে— সপ্তাহে আঠারো শিলিং, তাও ধোবা খরচ আলাদা। যেসব জার্মান সেই বাড়ির বাসিন্দা একসঙ্গে বেড়াতে বেরুলে তারা দরাজ হাতে খরচা করে। ভিনসেন্ট তাল

রাখতে পারেন না তাদের সঙ্গে। তাই কয়েকদিনের মধ্যেই কম খরচার বাসার জন্যে খোঁজ করতে হল।

লন্ডনে এসে আবিষ্কার করলেন ইংরেজি চিত্রকলার জগৎ। কীটস্ পড়েন, পার্কে বেড়ান, টেমস নদীতে নৌকা চালান আর ছবি দেখেন। ত্রিশ বছর আগের চিত্রশিল্পী জন কনস্টেবল (John Constable) সম্বন্ধে ধারণা 'চমৎকার শিল্পী'; তাঁর কাজ দেখে মনে পড়ে যায় নার্সিস দিয়ার (Narcisse Dia) ও শার্ল-ফ্রাঁসোয়া দোবিনির (Charles-Francois Daubigny) কথা—সেই সঙ্গে জোসুয়া রেনোল্ডস, টমাস গেন্সবরো আর জে. এম. ডব্লু. টার্নারের কথা (Joshua Reynolds, Thomas Gainsborough and J.M.W. Turner)। চাকরি হল অ্যাঁগ্রএর (Jean-Auguste-Dominique Ingres) ভিনাস আনাদিয়েমেনের (Venus Anadyomene) মতো খোদাই বা ছবির রঙীন ফটো আর স্ক্র্যাপবুক বিক্রি। ভাইকে ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে উন্নতি করার জন্য পরামর্শ দিয়ে লিখছেন: 'যত পার পায়ে হেঁটে বেড়াও, আর প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা বজায় রাখার চেষ্টা কর, কারণ শিল্পকলাকে আরও বেশি বেশি করে বুঝতে শেখার এটাই যথার্থ পথ।' নিজে কিন্তু এখনও ছবি আঁকার কথা ভাবছেন না। কুড়ি বছর বয়সে যেমন মনে হওয়া স্বাভাবিক সেইরকমই 'কিছুই নেই তবু সব কিছুরই মালিক'। পুরুষ হয়ে উঠছেন অনুভব করতে থাকেন।

প্রেমে পড়লেন ভিনসেন্ট। ১৮৭৩ এর অগাস্ট মাস থেকে মাদাম লোইয়ারের (Loyer) বাড়িতে থাকেন। দক্ষিণ ফ্রান্সের এক প্যাস্টরের বিধবা পত্নী, লন্ডনে ছোটো একটি স্কুল চালান। উনিশ বছরের মেয়ে উরসুলাকে মানুষ করছেন। হল্যান্ডে যাবার কিছুদিন আগে ভিনসেন্ট উরসুলার পাণিপ্রার্থনা করলেন। কিন্তু মেয়েটি রাজী নয়, গোপনে সে অন্যের বাগদত্তা। হেলভয়ের্টে বাপমার নজরে পড়ল এক হতাশ্বাস, উদ্‌ভ্রান্ত বেদনাপীড়িত ছেলে। ভাইকে ঘুণাক্ষরেও কিছু জানালেন না। কেবল ইতিহাসবেত্তা জুল মিশ্‌লের (Jules Michelat) *লা'মুর* (L'Amour) বইটি পড়ে দেখতে অনুরোধ করে চিঠিতে লিখলেন:

> আর স্বামী ও স্ত্রী যে এক হতে পারে, অর্থাৎ দুটি অর্ধ খণ্ড নয়, একটি অখণ্ড সামগ্রী হতে পারে সেকথা আমি বিশ্বাস করি।

১৮৭৪-৭৫এ, দ্বিতীয়বার লন্ডনবাসের সময় দীর্ঘদিন বিষণ্ণ মনে কাটে। কেনসিংটন নিউ রোডে 'আইভি কটেজে' থাকেন। এ-যাত্রায় সঙ্গে এসেছে ছোটো বোন আন্না, বয়স তার উনিশ, শিক্ষিকা, গবর্নেস বা কোনো সম্ভ্রান্ত মহিলার সহচরীর কাজ খুঁজতে। একমাত্র সঙ্গী এই বোনটি। আঁকাও বন্ধ। দোকানের কাজে মন নেই। মাস দুয়েক পরে তেওকে লেখা এক চিঠিতে পুনশ্চ হিসাবে যোগ করেছেন ফরাসী পণ্ডিত জোসেফ আর্নেস্ট রেনাঁর (Joseph Ernest Renan) কয়েকটি পঙক্তি:

> এই জগতে ভালো কিছু করতে হলে যাবতীয় ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা বলি দিতে হবে। এই পৃথিবীতে মানুষ শুধুমাত্র সুখী হতে, এমন কি নিছক সৎ হবার জন্যেও আসেনি। মানুষ এখানে এসেছে মানবজাতির জন্যে বড়ো বড়ো জিনিস বাস্তবায়িত করতে, মহত্ত্ব অর্জন করতে আর প্রায় প্রতিটি স্বতন্ত্র ব্যক্তির কদর্যতাকে অতিক্রম করতে।

কথাগুলো ভিনসেন্টের জীবনকাহিনীর শিরোনাম হতে পারত, যদিও কেউই, এমন কি তিনি নিজেও তখন পর্যন্ত এই বিষয়ে অবহিত ছিলেন না।

১৮৭৫ মে মাসের মাঝামাঝি ভিনসেন্ট পারিতে চলে এলেন গুপিল অ্যান্ড কোম্পানির হেড অফিসে বদলি হয়ে। মঁমার্ত্রে একটা ঘর ভাড়া করে থাকেন। কয়েক সপ্তাহ আগে কোরোর মৃত্যু হয়েছে। সেই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীতে লুভ্রে বা লুক্সেমবুর্গে যান, তবু মনের মধ্যে যে অতীন্দ্রিয়বাদী চিন্তা চেপে বসতে শুরু করেছে তার হাত থেকে নিস্তার পান না। প্রতিটি চিঠিতেই প্রায় বাইবেলের উদ্ধৃতি। স্তোত্র আর বিভিন্ন অধ্যায়ের পঙ্‌ক্তি তুলে। রবিবার দিন এক গির্জায় যান যেখানে রেভারেন্ড বার্সিয়ে (Bersier) উপদেশ দেন, সেখান থেকে লুভ্‌র লুক্সেমবুর্গ। কয়েকমাস এই ভাবেই চলল। তারপর ডিসেম্বরের শেষ দিকে একদিন কোম্পানির কাউকে কিছু না জানিয়ে সোজা এট্টেনে (Etten)। ব্রেডার কাছে এই গ্রামে বাবা অক্টোবর মাসে বদলি হয়ে এসেছেন। খ্রীস্টমাসের ছুটির শেষে অফিসে ফিরে এসে বুঝলেন তাঁকে আর রাখা হবে না। পয়লা এপ্রিল থেকে ইস্তফা দিতে বাধ্য হলেন। ১৮৭৬ অব্দের জন্মদিনের পরদিনের সকালেই এট্টেন রওনা হবেন। এমন সময় ইংলণ্ডের র‍্যামসগেটের মিঃ স্টোকসের (Mr. Stokes) স্কুল থেকে চাকরির চিঠি পেলেন। এট্টেনে দুসপ্তাহ মা-বাবার কাছে কাটিয়ে ১৬ এপ্রিল স্কুলের কাজে যোগ দিলেন। ২৪টি ছাত্র। পড়াতে হয় ফরাসী ভাষার প্রথম পাঠ, পাটিগণিত আর বানান। ছেলেদের স্নান ও জামাকাপড় পরাও তাঁকে তদারক করতে বলা হল। এক মাস নবীশী অধ্যায় বিনা বেতনে। তবে কাজের বিনিময়ে খাওয়া-থাকা মিলবে। অবশ্য কয়েক ঘণ্টা প্রাইভেট ট্যুশনি পেলে করতে পারেন। কাজের সন্ধানে বিভিন্ন পাদ্রীদের কাছে চিঠি লেখেন। এর মধ্যে স্কুলটা আবার চলে গেল শ্রমিক অধ্যুষিত শহরতলী আইলওয়ার্থে (Isleworth) জুলাই মাসের গোড়ার দিকে।

এটা কিন্তু মহারানী ভিক্টোরিয়ার বিভিন্ন উৎসবমুখরিত লন্ডন নয় যেখানে মিতব্যয়িতা চরিত্র কর্তব্য হল জীবনের মূলভিত্তিপ্রস্তর। এ হল বস্তি এলাকা। গাদাগাদি করে মানুষ যেখানে থাকে, হৈ-হট্টগোল, নির্বিচারী কদাচারী জীবনযাত্রা। এদের মাঝখানে ভিনসেন্ট কথামৃত বিতরণ করতে চান। স্টোকসও পয়সা দিতে রাজী নয়। নিয়মিত লন্ডনে গিয়ে পুরোহিত পাদ্রীদের দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়ান সবেতন কাজের সন্ধানে, বাকি সময় যান মিউজিয়ামে। হ্যাম্পটন কোর্টে রেমব্রান্ট, হান্স হলবাইনদের, বেলিনিদের আঁকা ছবি দেখেন। অল্প দিনেই মধ্যেই স্টোকসের স্কুল ছেড়ে দিয়ে একই এলাকায় হিউম কোর্টে (Holme Court) রেভারেন্ড জোন্সের স্কুলে যোগ দিলেন। শিক্ষাবর্ষ শুরু হবার ঠিক আগে সদাহরিত গুল্ম দিয়ে পাঠকক্ষ সাজিয়ে লিখলেন 'সুস্বাগত স্বীয় গৃহে'। ক্রমাগত বাইবেল পড়েন, ধর্ম প্রচারকদের কার্যকলাপের কথা, সেন্ট পলের পত্রাবলী।

অক্টোবরের গোড়ার দিকে মিস্টার জোন্স পড়ানোর কাজ খানিকটা নিজের হাতে নিয়ে কথামৃত বিতরণের কাজ কিছুটা দিলেন কর্মচারীকে; বললেন প্যারিশের লোকদের দেখাশোনা করতে। অবশেষে এল চৌঠা নভেম্বর ১৮৭৬। সেদিন মিস্টার জোন্সের গির্জায় ভিনসেন্ট তাঁর জীবনের প্রথম উপদেশ ভাষণ দিলেন, ইংরেজি ভাষায়। ভাষণ দেবার জন্যে মঞ্চে উঠে তাঁর মনে হচ্ছিল

> পাতালের কোন অন্ধকার গুহা থেকে বেরিয়ে উপরের জগতে ফিরে এসেছেন যেখানে মিতা দিনের আলো।

ভাষণ শেষ করলেন ভারি সুন্দর এক ছবির বর্ণনা দিয়ে:

> সন্ধ্যার ভূদৃশ্য। দূরে ডান দিকে এক সারি পাহাড় সন্ধ্যার হিমেল আলোয় নীল। পাহাড়গুলোর মাথায় সূর্যাস্তের সমারোহ; ধূসর মেঘের টুকরোগুলোয় রূপালি সোনালি নীলাভরক্তিম পাড় বসানো। নীচে ঘাস আর হলুদ পাতায় ছাওয়া পতিত গুল্মভূমি, কারণ হেমন্ত এসে গেছে।

ছবি আঁকার কথা এখনও কিন্তু মনে দেখা দেয় নি।

সারা সপ্তাহ কাজ। সকাল থেকে বেলা একটা অবধি ছেলেদের পড়ান, তারপর মি. জোন্সকে সাহায্য করেন বা তার জায়গায় কাজ করেন। পরে প্রাইভেট পড়ান। সন্ধ্যা আর রাতটা ফাঁকা রাখেন ভাষণ তৈরি আর লেখার জন্যে। রবিবার টার্নহ্যাম গ্রীনে (Turnham Green) ক্লাস নেন। খ্রীস্টমাসে এট্টেনে যখন ফিরলেন, পরিশ্রান্ত, ঝড়ো পাখির মতো চেহারা, কিন্তু মনে ভারি দীপ্তি। মা-বাবা চাইলেন না ছেলে আবার লন্ডনে ফিরে যাক। সেন্টকাকার উদ্যোগে মি. ব্রাট (Mr. Braat) তাঁর বইয়ের দোকানে কেরানির চাকরি দিলেন। ডরড্রেকের এই কোম্পানির নাম ভান ব্লুসে অ্যাণ্ড ভান ব্রাম (Van Blusse and van Braam)। জানুয়ারির শেষে সেখানে গিয়ে উঠলেন শস্য আর ময়দার ব্যবসায়ী মি. রাইকেনের (Mr. Rijken) বাড়ি। ঘরে টাঙালেন ধর্মীয় ছবির প্রিন্ট। পাতার পর পাতা বাইবেল থেকে কপি করেন, জার্মান ফরাসী ও ইংরেজিতে তার অনুবাদ করেন। ভাইয়ের জন্য তেওর দুর্ভাবনা বাড়ে। খেতে আসতে ভুলে যান, সারারাত জেগে থাকেন। দোকানে বসে সারাক্ষণ বাইবেল পড়েন। মি. ব্রাট কিছু বলেন না ভিনসেন্টের প্রতি শ্রদ্ধায় আর রেভারেন্ডের টানাটানির কথা ভেবে।

একদিন আমস্টার্ডামে গেলেন কর (Cor) আর স্ট্রিকার (Stricker) মামার সঙ্গে দেখা করতে। কথামৃত বিতরণের কাজ করতে তাঁকে দৃঢ়সংকল্প দেখে তাঁরা মত দিলেন। এট্টেনে ফিরে এসে চব্বিশতম জন্মদিনের দিন একা রওনা হলেন এক আশ্চর্য তীর্থযাত্রায়। ডরড্রেক্ট থেকে ওডেনবশগামী শেষ ট্রেন ধরলেন। সেখান থেকে পায়ে হেঁটে গ্রোট-ৎসুনডার্ট। সেখানকার গির্জায় সূর্যোদয় দেখবেন বলে প্রতীক্ষা করতে থাকেন।

কথামৃত ও ড্রয়িং

বিশ্বাসেরই জয় হল শেষ অবধি। ঠিক হল বাপদাদাদের মতো ভিনসেন্টও হবেন ধর্মযাজক। তবে আমস্টার্ডামের ফ্যাকাল্টি অব থিওলজির প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে হবে তাঁকে। ভারী সিলেবাস, পাঠ্য বিষয় প্রচুর, সময় লাগবে দীর্ঘকাল পাঠাভ্যাসের জন্যে। ছেলের ওপর মনে মনে শ্রদ্ধা জন্মালেও বাবার বৃত্তি সামান্য যাজকের খরচ জোগানোর সামর্থ্য নেই। বংশাবলীর ধারা বজায় রাখতে চান ভিনসেন্ট। কাকারা তাই এগিয়ে এলেন। জ্যাককাকা (Johannes) আমস্টার্ডামের নৌবাহিনীর জাহাজ মেরামতি বিভাগের অধ্যক্ষ। বিপত্নীক মানুষ। বাড়ির একটা ঘর ভিনসেন্টকে ছেড়ে দিলেন। স্ট্রিকার মামা নিজেও যাজক, তিনি পড়াশুনা তদারক করেন, উৎসাহ জোগান। করকাকা লাইডেনস্ট্রাট (Leidenstraat) শহরে আর্টগ্যালারি চালান। ভিনসেন্ট নিয়মিত তাঁর সঙ্গে

যোগাযোগ রাখেন। কিছুদিন পরে ১৮৭৭এর মে মাসের গোড়ার দিকে করকাকার কাছ থেকে কয়েক রীম পুরানো কাগজ পাওয়া গেল; তাতেই গ্রীক ও লাতিন অনুশীলনের কাজ চলল। কামিয়ে কোরোর (Camille Corot) একটি উদ্ধৃতি চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে:

মাত্র চল্লিশ বছরের কঠোর পরিশ্রম চিন্তা আর মনোযোগ লেগেছিল।

আমস্টার্ডমের কোনো কোনো পাড়ায় ঘুরতে ঘুরতে রেমব্রান্টের কথা মনে পড়ে যায়। রেমব্রান্টের এচিং। প্রকৃতপক্ষে মানুষের মুখই হোক বা প্রাকৃতিক দৃশ্যই হোক, যে কোনো বর্ণনার প্রসঙ্গেই সর্বদা চিত্রকরদেরই উল্লেখ চিঠিতে দেখা যায়: জ্যাকব ভান রুইজডেল, ভিলেম মারিস, বের্টেল থরফান্ডসেন, জুল গুপিল, শার্ল দ্য গ্রুখ, দোবিনি ইত্যাদি। রেমব্রান্টের একটি এচিং-এর মার্জিনে লাতিন ভাষায় লেখা 'ইন মেদিও নক্তিস ভিম সুয়াম লুক্স, এক্সেরিত' অর্থাৎ 'যামিনীর মধ্যযামে বিকীর্ণ আলোকের শক্তি'। কাকার নিষেধ সত্ত্বেও ছোটো একটি গ্যাসবাতির আলোয় সারারাত কাজ। প্রচণ্ড পরিশ্রম করলেও এক এক সময় সন্দেহ জাগে কি জানি পারবেন তো এত সব কঠিন ও বিস্তারিত বিষয় মাথায় ধরে রাখতে। স্ট্রিকারমামা পরিচয় করিয়ে দিলেন মেন্দেস দা কোস্টার (Mendes da Costa) সঙ্গে, গ্রীক ও লাতিন পাড়ায় তিনি সাহায্য করবেন। ইহুদি মহল্লার মাঝখানে তারটা তেতে আগুন হয়ে থাকে গ্রীষ্মকালে। সেখানেই পড়াশুনা চলে। অগাস্টের মাঝামাঝি দেখা গেল বেশ উন্নতি হয়েছে। কিন্তু হেমন্তকাল আসতে মামা দেখলেন ভাগনের পড়ার উন্নতি ঠিক মতো হচ্ছে না অথচ মেন্দেসকে অন্ধের মতো মেনে চলেন। যথোপযুক্ত কাজ করতে না পারলে নিজেকে যে কঠোর শাস্তি দেন, নিজের পিঠে নিজেই লাঠিপেটা করেন, এমনকি কনকনে শীতেও বাড়ির বাইরে শুয়ে থাকেন এসব কথা অবশ্য কখনও উচ্চারণ করেন না। বীজগণিত আর জ্যামিতি মাথায় ঢোকে না। মেন্দেসের এক ভাগনে তেইখেইরা মার্তোস (Teixeira de Martos) গরীবদের ও ইহুদিদের স্কুলের শিক্ষক। তাঁর কাছে এগুলো ছাড়াও পড়েন গ্রীস, এসিয়া মাইনর ও ইতালির ইতিহাস ও ভূগোল। এইসব পড়তেই সময় কেটে যায়, মূল কাজ ঈশ্বরতত্ত্ব পাঠ আর বাগ্মিতা অভ্যাসে ঘাটতি পড়ে। কিন্তু যত কাজই করুন ব্যাপারটা ক্রমেই আরও শক্ত হয়ে ওঠে। থিওলজিক্যাল ফ্যাকাল্টিতে প্রবেশ করার ইচ্ছা কি তবে সত্যিই তাঁর ছিল? এই ক'মাস ধরে সমানে গেছেন ট্রিপ্পেনহুইসে (Trippenhuis) রেমব্রান্টের 'সিণ্ডিকস অব দ্য ড্রেপারস গিল্ড' ছবিটি দেখতে, ভাইকেও পীড়াপীড়ি করছেন চিত্রকর জ্ঞাতিভাই আন্টন মাউভের (Anton Mauve) সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে। হাইনকাকা মারা গেলেন ডিসেম্বরের কদিন আগেই। তাঁর সম্বন্ধে একবার মাত্র চিঠিতে উল্লেখ করেছেন, তাও এক ছত্রে। কিন্তু এই সময়েই কয়েক সপ্তাহের আড়াআড়ি মারা গেলেন চিত্রকর গুস্তাভ ব্রিয়ঁ (Gustave Brion) আর দোবিনি। এঁদের জন্যে শোক কিন্তু হল বেশি। দোবিনির খোলা আকাশের নীচে ছবি আঁকার টেকনিক সেকালের তরুণ ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পীদের খুব প্রভাবিত করে। নিজের 'বোত্যাঁ' নামের নৌকায় চেপে ঘুরে ঘুরে তিনি ছবি এঁকে বেড়াতেন সেন নদীর পাড় বরাবর। কুর্বের প্রভাব পড়ার আগে দীর্ঘকাল কোরোর সঙ্গে কাজ করেছিলেন। পটের উপর 'মুহূর্তের ক্ষণস্থায়িত্বকে' ধরে রাখার প্রয়াসী প্রথম শিল্পীদের অন্যতম ছিলেন এই দোবিনি।

এদিকে আপাতত কারও কাছেই ভিনসেন্ট ভালো কিছুর দৃষ্টান্ত রাখতে পারছেন না। যে

পরীক্ষার জন্যে পনেরো মাস ধরে তৈরি হচ্ছিলেন তাতে অকৃতকার্য হলেন। ১৮৭৮ এর অক্টোবরে আমস্টার্ডামের থিওলজিক্যাল ফ্যাকালটি তাঁকে ছাড়পত্র দিতে অস্বীকার করল।

অকৃতকার্যতার হতাশা বা প্রত্যাখ্যাত হওয়ার লাঞ্ছনায় কিছুতেই কিন্তু যাজকবৃত্তি গ্রহণের সংকল্প তাঁর শিথিল হল না। মুখ বুঁজে চললেন এট্টেনে আইলওয়ার্থে থাকতে। মেথডিস্ট চার্চের যে যাজকের কাছে কিছুদিন কাজ করেছিলেন এবং যিনি তাঁকে প্রথম উপদেশভাষণ দেওয়ার সুযোগ দিয়েদিলেন সেই মি. জোন্স এই সময় হল্যান্ড পরিভ্রমণ করছিলেন। ব্রুসেলসের ফ্লেমিশ ইভানজেলিক্যাল স্কুলের ডিরেক্টর রেভারেন্ড বকমাকে (Bokma) তিনি চিনতেন। হল্যান্ডের থেকে এখানকার স্কুলে খরচ কম। পড়াও ছ' বছরের জায়গায় তিন বছরের মেয়াদে। মি. জোন্স রাজী হলেন ভিনসেন্ট ও তাঁর বাবার সঙ্গে ব্রুসেলসে যেতে। বলা হল পড়ার মেয়াদ শেষ হবার আগেই হয়তো ধর্মপ্রচারের কাজে তাঁকে বাজারে যেতে হতে পারে। কিন্তু শিক্ষাক্রম শুরু হবার আগে এই তিন মাস ব্রুসেলসে কাটাবার মতো অত টাকাপয়সা যে তাঁর নেই। তাই স্থির হল এট্টেনেই থাকবেন এবং মেশলিনের (Mechlin) রেভারেন্ড পিয়েটারসেন (Pietersen) আর ব্রুসেলসের রেভারেন্ড দ্য ইয়ঙের (de Younge) সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন ভিনসেন্ট।

এট্টেনে ফিরে এসেই কয়েকটা প্রবন্ধ লিখতে বসলেন, তার একটা হল লুভর-এ রক্ষিত রেমব্রান্টের ছবি 'দা হাউস অব দা কার্পেন্টার'। ছবি আঁকা নয় ঈশ্বরতত্ত্বের কথাই ভাবছেন ভিনসেন্ট। এই দুইয়ের মধ্যে কি সত্যিই তেমন বিরাট কোনো পার্থক্য আছে ? প্রকৃত জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য বলে যেসব জিনিসকে ধরা হয় তার মধ্যে মহৎ শিল্পকে অন্যতম বলে মনে করেন তিনি। রেভারেন্ড দ্য ইয়ঙ বললেন অগাস্ট মাস শেষ হবার কিছুদিন আগেই যেন ভিনসেন্ট ব্রুসেলসে ফিরে আসেন।

ব্রুসেলসের কাছে লাকেনের (Lacken) স্কুলে পূর্ণ উদ্যমে শিক্ষানবিশী করতে থাকলেন তিন মাস, কিন্তু প্রত্যাশিত জিনিস তাঁর কাছ থেকে পাওয়া গেল না। সহপাঠীদের একজন লিখেছেন নতিস্বীকার কথাটার অর্থ তিনি জানতেন না।

তাঁর স্বাধীনচেতা স্বভাব, প্রত্যাশা পূরণ করার অক্ষমতা, আর সেই সঙ্গে হঠাৎ হঠাৎ রাগে ফেটে পড়ার ঝোঁকই হল ধর্ম প্রচারকের কাজে তাঁকে মনোনীত না করার কারণ, যদিও ১৫ নভেম্বর তারিখে বিদায় দেবার সময় এগুলোর উল্লেখ দ্য ইয়ং এবং বোকমা কেউই করলেন না তাঁর কাছে। ফ্লেমিশ ছাত্রদের জন্যে শর্ত তাঁর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় তাই মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই তাঁকে বিচার করা হল। যেতে হবেই, তবে এট্টেনে আর নয়।

ভূগোলের বইয়ে পড়া জ্ঞানটুকু সম্বল করে মঁ (Mons) এবং ফরাসী সীমান্তের মধ্যবর্তী হেইনো (Hainaut) অঞ্চলের উদ্দেশ্যে ভিনসেন্ট রওনা দিলেন যদি কারও দরকার থাকে তাহলে তার কাছে ঈশ্বরের বাণী প্রচার করার উদ্দেশ্য নিয়ে। বোরিনাজ অঞ্চলে শীত তখন পড়ি পড়ি করছে। এখানকার গরীব খনিশ্রমিকদের মাঝখানে বসবাস করাই স্থির করলেন ভিনসেন্ট। মেষ-চরানো অঞ্চলে ৩৯ রু দ্য লে'গলিজে ভান দ্য হায়েগেন (Van du Haegen) নামে বাড়ি বাড়ি সওদা ফিরি করে বেড়ানো এক মানুষের বাড়িতে থাকেন। সন্ধ্যায় তার ছেলেমেয়েদের পড়ানোর বিনিময়ে আহার। সারাদিন আতুরদের সেবা আর কুলিধাওড়ায় মজুরদের কাছে ঈশ্বরের নাম প্রচার। ভিনসেন্টকে কাজ করার অনুমতি দেবার বদলে ব্রুসেল কর্তৃপক্ষ তাঁকে কাছাকাছি ভাসমেস

(Wasmes) অঞ্চলে পরবর্তী ছ' মাসের জন্য 'ঠিকা পুরোহিতে'র (lay evaangelist) পদে নিযুক্ত করল। লন্ডনের ইস্ট এন্ডেও ভিনসেন্ট দারিদ্র্যের মধ্যে নারীপুরুষের একই ছবি দেখেছেন। তবে খনিমজুরদের সঙ্গে থাকতে হলে চরিত্র ও মেজাজ তাদেরই মতো হতে হবে, কোনো গর্ব বা প্রভুত্বের ভাব থাকলে তাদের সঙ্গে বাস করা বা তাদের আস্থা অর্জন করা যাবে না। স্থানীয় ব্যাঙ্কার জাঁ ব্যাপতিস্ত দেনিসের আরামদায়ক বাস ছেড়ে ঝুপড়িতে গিয়ে বাস করতে থাকলেন, বিচালি পেতে ঘুমান। পাঁচ-সাতশ মিটার খনির গহ্বরে নামেন, সেখান থেকে ওপর দিকে তাকালে দিনের আলোকে আকাশের তারার মতো দেখায়। ছবি আঁকা এখানে স্মৃতিতে পর্যবসিত, যদিও ছবির ব্যাপারটা এখনও বোঝেন প্রায় আগেকারই মতো। 'এখানে বোরিনাজে ছবি বলতে কিছু নেই; সাধারণভাবে বলতে গেলে ছবি কাকে বলে লোকে তা জানেই না।' বিষাক্ত বাতাস, গ্যাস বিস্ফোরণ, মাটির নীচে চুঁয়ানো জল, পুরানো খনির ছাদ ভেঙে পড়া। তারই মাঝখানে কষ্টে ক্লিষ্ট মানুষ জ্বরে ভুগে ধুঁকতে ধুঁকতে কোনোমতে জীবন কাটায়, অল্পবয়সে বুড়িয়ে যায়।

মার্চ মাসে বাবা এসে দেখে গেলেন ভিনসেন্টকে খনিমজুরের মতো দেখতে হয়ে গেছে। তাদেরই সেবা করেন, তাদের সঙ্গেই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন, কিন্তু দেখেন সবকিছু শিল্পীর চোখ দিয়েই। ভাসমেসের কাছে পাহাড় থেকে উপত্যকা পেরিয়ে দিগন্তের দিকে তাকালে দেখেন :

> সাধারণত একধরনের ধোঁয়াটে ভাব চারদিক ছেয়ে আছে, না হয়তো মেঘের ছায়ায় এক উদ্ভট আঁকিজুঁকি কাটা ভাব যা দেখে রেমব্রান্ট বা মিশেল বা রুইজডায়েলের ছবির কথা মনে পড়ে যায়।

এক ফোরম্যানকে দেখে লিখছেন, 'প্রথমবার তাকে দেখে [জাঁ লুই-আর্নেস্ট] মেইসোনিয়েরের [Isan- Louis-Ernest Meissonier] আঁকা আমাদের সেই পরিচিত 'পাঠক' (দি রিডার) নামের এচিংটর কথা মনে হচ্ছিল।'

ব্রুসেলসের কর্তাদের তিরস্কার এই ছবি-দেখা চোখটার জন্যে নয়, তাঁদের আপত্তি তাঁর আত্মকৃচ্ছ্রসাধন আর মাথাগরম স্বভাবের বিরুদ্ধে। ধর্মোন্মাদীসুলভ উৎসাহের বশেই প্রথাকে তিনি অস্বীকার করেন, স্কুল কমিটির কাছে তাই তিনি অপ্রিয়, অগ্রহণীয়। ১৮৭৯র জুলাই পার হয়ে গেল, চুক্তির নবীকরণ কিন্তু হল না। চটে গিয়ে পায়ে হেঁটে ব্রুসেলস রওনা হলেন, তাদের কাছ থেকে কোনো ব্যাখ্যা বা সিদ্ধান্ত বদলানোর জন্যে অপেক্ষা না করেই।

বিক্ষুব্ধ ভিনসেন্টের দরকার সুপরামর্শের। রেভারেন্ড পিয়েটারসেনের সঙ্গে কথা হল, কিন্তু তার বেশিরভাগটাই ছবি নিয়ে। রেভারেন্ড আঁকেন [লোডভিক] শেলফহোট বা [জোহান্নেস] হপ্পেনব্রোভের্সের (Ludewick Schelfhout or Johannes Hoppenbrouwers) রীতিতে। তেওকে জানান, 'ব্রুসেলসে এক ইহুদি বইওয়ালার কাছ থেকে পুরানো ডাচ কাগজের একটা বড়ো স্কেচবই কিনেছি।'

১৮৭৯র অগাস্টে গির্জার দরজা মুখের ওপর বন্ধ হয়ে যেতে মঁর কাছে কুয়েজমেসের (Cuesmes) বাসিন্দা যাজক মিঃ ফ্রাঙ্কের (Mr. Frank) বাড়ি বাসা নিলেন প্রচার কাজ চালিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে। এবার কিন্তু গির্জার অনুমোদন ছাড়াই।

নিঃসঙ্গ দণ্ডিত অবহেলিত। জেদী ও একরোখা স্বভাবের জন্যে কেউ তাঁকে সহ্য করতে

পারে না, তিনিও কারও কথা শুনবেন না। অক্টোবরে ভ্যান গঘ পরিবারের প্রতিনিধি হয়ে তেও এলেন কুয়েজমেসে। দু মাস কোনো খবরাখবর পাঠান নি। কোনো প্রশ্নের উত্তর দিলেন না বা কিছু বললেন না তেওর প্রশ্ন বা যুক্তির জবাবে। অনুনয় উপরোধ আদেশ—হেলদোল নেই কিছুতেই, নিজের গোঁ ধরেই বসে রইলেন। ইহুদি পুরাণ আর নববিধানই তাঁর ডিপ্লোমা, ঈশ্বরবিশ্বাসই তাঁর বীজমন্ত্র। টাকা? লোকের কাছে হাত পাতবেন। লেখাপড়ায় ফিরে আসা? 'এক জার্মান চাষীর কাছে একবার একটা পাঠ পেয়েছি, গ্রীক ভাষার কোনো পাঠের থেকে তার মূল্য আমার কাছে অনেক বেশি'— ভিনসেন্টের সাফ জবাব।

তাহলে কোনো একটা বৃত্তিমূলক কাজ শেখ, তেও বোঝানোর বৃথা চেষ্টা করেন—কার্ড ছাপানোর কাজ, হিসাব রাখা, রুটি তৈরি। ছুতার, নাপিত, গ্রন্থাগারিক যে কোনো একটা পেশার কাজ। কিন্তু পরাশ্রয়ী বলে অভিহিত হওয়ার ঝুঁকি নিয়েও প্রচারকের কাজ চালিয়ে যেতেই তিনি প্রস্তুত। 'তুমি কি মনে কর কোনো ছবির যদি হান্স মামলিঙের (Hans Mamling) সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ আদৌ না থাকে অথচ তারই রচনা বলে ক্যাটালগে সেটার উল্লেখ করা থাকে—একমাত্র গথিক যুগের বিষয়বস্তু ছাড়া অন্য কোনো শিল্পগত মূল্য তার না তাকে—তাহলে সেটার সামনে উদাসীন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা কি ভুল?' এতেও কিন্তু তেওকে বোঝানো গেল না। তবে ভাইয়ের সঙ্গে একটুও কড়া কথা বলতে ভিনসেন্ট চান না। তেও তিরস্কার করেন, ভিনসেন্ট ন'মাস চুপ করে থাকেন।

অনাহার। সবাই পরিত্যাগ করেছে। শুধু বাবা যে ক'টা ফ্রাঁ পাঠান তাই একমাত্র সম্বল। আসলে ভাইকে না জানিয়ে তেওই সেটা পাঠাতেন। ১৮৮০র জুলাই মাসে এট্টেনে দেখা করতে এসে জানলেন তেও সম্প্রতি মনি অর্ডার করে তাঁকে পঞ্চাশ ফ্রাঁ পাঠিয়েছেন। বোরিনাজে ফিরে আবার চিঠি লিখলেন। অবশ্য এখানকার খনিমজুরদের সঙ্গে ফরাসী ভাষায় কথা বলতে বলতে অভ্যাস হয়ে যাওয়ার ফলে এবং তেও-ও এখন পারিতে কাজ করার কারণে ফরাসী ভাষাতেই এক দীর্ঘ চিঠি লেখেন। তাতে একটি পঙ্‌ক্তির নীচে দাগটানা ছিল:

> কারণ আজও, সে-দেশ থেকে অনেক দূরে বসবাস করলেও, সেই ছবির দেশের জন্যে প্রায়ই আমার মন কেমন করে।

ছবির প্রতি প্রেমও প্রচারকের ভূমিকারই অঙ্গ। ছবির খাতিরে ধর্মপ্রচারকের কাজ কিন্তু ছাড়ছেন না।

> আমি কিভাবে উপকারে লাগতে পারি, কোন কাজে লাগতে পারি? আমার ভিতরে কি যেন একটা আছে, সেটা কী হতে পারে?

তেওকে লিখেছেন: 'একটা উদাহরণ দিই তোমায়: রেমব্রান্টকে একজন ভালোবাসে, তবে গুরুত্বের সঙ্গে—সে লোক জানবেই যে ঈশ্বর একজন আছেন, এবং অবশ্যই সে তাতে বিশ্বাস করবে।' চিঠিটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ; এটি তাঁর অপদার্থতার স্বীকারোক্তি আবার সাহায্যের জন্যে প্রার্থনাও। ধর্মপ্রচারকের সুর ছাপিয়ে তেওর কানে তা পৌঁছল। তিনি সাহায্য করতে চাইলেন। প্রতিদানে, ১৮৮০র অগাস্টের শেষ দিকে ভিনসেন্ট তেওকে কেবল তাঁর ড্রয়িং-এর কথা

লিখছেন। তেও প্রিন্ট পাঠিয়ে দেন, ভিনসেন্ট কপি করেন। মনুষ্যমূর্তি আঁকা শিখছেন বড়ো বড়ো শিল্পীদের ছবি নিরীক্ষণ করে, যেমন মিইয়ে, জুল ব্রেতঁ, গুস্তাভ ব্রিয়ঁ বা এ. বি. ব্রটন (Millet, Jules Breton, Gustave Brion, A.B. Broughton)। টেরস্টেগ এখনও হেগের গুপিল কোম্পানির ডিরেক্টর। শার্ল বার্গের (Charles Bargue) ড্রয়িং-এর হ্যাণ্ডবুক আর অ্যানাটমি ও পার্সপেক্টিভের বই তিনি পাঠিয়ে দিলেন। যেমন ভাবে বাইবেল পড়তেন সেই উৎসাহ নিয়েই এগুলো খুঁটিয়ে পড়তেন। মডেল হল স্থানীয় খনিমজুর আর তাঁতিরা, তাদের মধ্যেই এই দু'বছর ধরে বাস করছেন। এরা সব টাইপ, চিত্রকলায় আজও এরা ঠাঁই পায় নি। জোলাও (Emile Zola) এদের ছবিই এঁকেছেন তাঁর *জার্মিনাল* উপন্যাসে। ভিনসেন্টের বোরিনাজ বাসের কয়েক বছর পরে সেই উপন্যাস রচনার শুরু। ড্রয়িং অভ্যাস করেন প্রতিদিন, আর তার সাহায্যেই যে 'দ'য়ে' ডুবিয়ে ফেলেছিলেন নিজেকে তা থেকে নিজেকে উদ্ধার করতে শুরু করলেন। মানসিক ভারসাম্য আর শক্তি ফিরে পেলেন, আর তা বজায় রাখার জন্যেই দরকার কুয়েজমেস ও বোরিনাজ ত্যাগ করা। ইতোমধ্যে ব্রেতঁর প্রভাবে কাজ করার, বিশেষ করে গ্রামীণ জীবনের কাজকর্মের ছবি আঁকার দিকে মন পড়েছে। ২০ অগাস্টের চিঠিতে তেওকে লিখছেন:

> একটা ড্রয়িং স্কেচ করেছি, খনিমজুরদের, মেয়ে পুরুষ সকালে বরফ পড়ার মধ্যেই চলেছে খনির দিকে কাঁটা ঝোপের বেড়ার পাশের পথ বেয়ে: গোধূলির আবছায়াতে যেন ছায়ার মতো যায়। পিছনে আকাশের পটভূমিতে বড়ো বড়ো খনিবাড়িগুলো অস্পষ্টভাবে দাঁড়িয়ে।

রীতিমত শিক্ষা

অক্টোবর ১৮৮০। বয়স সাতাশ। গুপিল অ্যান্ড কোম্পানির ব্রুসেলস অফিসের ডিরেক্টর মি. স্মিটের (Mr. Schmidt) সঙ্গে দেখা করলেন ভিনসেন্ট, অনুরোধ করলেন কয়েকজন শিল্পীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিতে। কিন্তু এত বেশি বয়সে ছবি আঁকিয়ে হিসাবে কেউ কি জীবন শুরু করতে পারে ? পার্সপেক্টিভ, অ্যানাটমি, ড্রয়িং, আলোছায়া, তারপর রঙ দেওয়া— ভিনসেন্ট এখন সব কিছুই শিখতে চান। তবে কোনো শিল্পীর সঙ্গে থেকে নিজে কাজ করে তা শিখতে চান। স্মিট বললেন ব্রুসেলসের আকাদেমি দ্যে বোজার্তে (Académie des Beaux-Arts) ভর্তি হতে। চিরাচরিত আকাদেমির শিক্ষকদের ওপর ভিনসেন্টের আস্থা নেই। ধর্মীয় স্কুলের শিক্ষকদের মতো তারাও সব ভণ্ড কাপালিক বলেই তাঁর আশঙ্কা।

কয়েক মাস আগে পারিতে আন্টন ভান রাপার্ড (Anthon van Rappard) নামে তাঁর থেকে পাঁচ বছরের ছোটো এক তরুণ চিত্রকরের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। ব্রুসেলসে শিক্ষার্থী। রু ত্রাভের্সিয়েরে (Rue Traversière) তার স্টুডিওতে গিয়ে ভিনসেন্ট তার সঙ্গে এখন দেখা করলেন! দুজনের মধ্যে অনেক বিষয়ে মিল থাকলেও রাপার্ড ধনী আর ভিনসেন্ট কপর্দকহীন। তেও তাঁকে মাসে মাসে ষাট ফ্রাঁ করে পাঠাতে থাকলেন। ৭২ বুলভার দ্যু মিদিতে ঘর ভাড়া আর তিনবেলা তিন কাপ কালো কফি আর রুটি বাবদ দিতে হয় পঞ্চাশ ফ্রাঁ। রাপার্ড তাঁকে অ্যানাটমির প্লেট ধার দেন, পার্সপেক্টিভ শেখান। মে মাসের গোড়ায় রাপার্ড জানালেন তিনি শিগগীরই ব্রুসেলস ছাড়ছেন। টেরস্টেগও ভাবেন লোকটা অন্যের অন্ন ধ্বংস করে, বাপকাকারাও ভাবে তাই। তেও

এট্টেনে এসে কয়েকদিন কাটিয়ে যান, ভাইকে সাহায্যও করেন, তাঁর সপক্ষে কথা বলেন। আত্মীয়দের সন্দেহ ঘোচে না। যাই হোক, বাউণ্ডুলে ছেলের মতো সবাই তাঁকে দেখে। স্থানীয় গ্রীক চার্চে কিছুদিন স্বাধীনভাবে কাজ করার অনুমতি পান। রাপার্ড এসে কয়েকদিন একসঙ্গে কাটিয়ে গেলেন। জলার ধারে একটা পোড়ো জায়গায় গিয়ে রোজ দুজনে বসে ছবি আঁকেন। এতদিন পর্যন্ত পেন্সিলে ড্রয়িং করেছেন, এখন শেড দেওয়া শুরু করলেন আর খাগের কলম দিয়ে মোটা দাগ টেনে ফিনিশ দেওয়া। ব্রুসেলস থেকে আনা মিইয়ের খানকুড়ি কাঠ খোদাই আর হলবাইনের ড্রয়িং-এরও কপি করতে থাকেন বার্গের হ্যান্ডবুক দেখে দেখে।

অগাস্ট মাসে দুদিন দি হেগে কাটিয়ে এলেন। টেরস্টেগ আর মাউভ দুজনেই ছবি দেখে বুঝলেন কিছুটা উন্নতি হয়েছে। মাউভ জানালেন আঁকার কাজ ভিনসেন্ট শুরু করতে পারেন। তেওফিল দ্য বক (Théophile de Bock) চিত্রকরের মেজাজ আছে স্বীকার করেও বললেন আরও কিছুদিন মনুষ্যমূর্তি আঁকতে। এট্টেন থেকে ফেরার পথে ডরড্রেক্টের ওপর দিয়ে এলেন কেবল একসারি বায়ুকল আঁকবেন বলে। ফিরে আসে আবার মনুষ্যমূর্তি আঁকা। মাটিকাটা, বীজবোনা, বাগিচার কাজে নিযুক্ত নারী ও পুরুষ শ্রমিকদের মূর্তি।

চিত্রকর আপন শক্তিবৃদ্ধি অনুভব করছেন। নিজেকেও উপলব্ধি করতে এখন শুরু করেছেন। অগাস্টমাসে স্ট্রিকার তাঁর সদ্য বিধবা মেয়ে কেটকে পিসির বাড়ি কয়েকদিন বেড়িয়ে আসার জন্যে পাঠালেন। ভিনসেন্টের ওপর প্রচণ্ড প্রভাব পড়ল মেয়েটির। ভিনসেন্ট প্রেম নিবেদন করলে কেট তা প্রত্যাখ্যান করলেন। এতদিন তিনি ভাবতেন 'নারী শুধু পুরুষের বিষাদ'। কিন্তু এখন মিশ্‌লের একটি উক্তি কেবল আবৃত্তি করেন: 'পুরুষ হতে হলে নারীর নিঃশ্বাস তোমাকে পেতেই হবে'। কেট ফিরে যান আমস্টার্ডামে। ভিনসেন্ট নাছোড়বান্দা; সমানে চিঠি দেন। একদিন সশরীরে সেখানে গিয়ে হাজির। মামা মামী জানিয়ে দিলেন কেউ দেখা করবেন না। বাতির শিখার ওপর নিজের হাতটা ধরে থাকেন, পুড়ে যায় চামড়া। তবু ব্যর্থ। কেটের দেখা মিলল না, শুধু পাওয়া গেল পোড়ার যন্ত্রণা।

প্রেমের ক্ষেত্রে দ্বিতীয়বার ব্যর্থ হয়ে ডিসেম্বরের শুরুতে আমাস্টার্ডাম ছেড়ে জ্ঞাতিভাই মাউভের কাছে গেলেন কয়েক সপ্তাহ তাঁর কাছে থাকার অনুমতি চেয়ে। নিজের আঁকা ছবি দেখিয়ে মাউভের মন জয় করলেন। পরের দিনই তাঁর স্টুডিওতে বসে এই প্রথম কোনো চিত্রকরের স্টুডিওতে তারই পাশে বসে প্যালেট হাতে কয়েকটা জিনিসের স্টিল-লাইফ আঁকার অনুমতি পেলেন। মাউভ সে-ছবি দেখে বললেন: 'আমি বরাবর ভাবতাম তোমার মাথায় কিছু নেই, এখন দেখছি তা ঠিক নয়।' পাসার দান পড়ল; ভিনসেন্ট চিত্রকর হবেন।

মাউভের বাড়ি থেকে দশ মিনিটের পথ। শহরের বাইরে ১৩৮ শেঙ্কভেগে (Schenkweg) মাসিক ত্রিশ ফ্লোরিনে একটা ঘর ভাড়া করলেন। এট্টেনে বাড়ি গিয়ে জিনিসপত্র আনবেন। কিন্তু খ্রীস্টমাসের দিন গির্জায় যেতে অস্বীকার করায় বাবার সঙ্গে প্রচণ্ড ঝগড়া হল। বাবাকে বলে দিলেন ধর্ম একটা সাংঘাতিক ভয়ঙ্কর জিনিস এই তাঁর ধারণা। বাবা বললেন, তাহলে বাড়িতে থাকা চলবে না। দি হেগে মাউভের কাছেই শুধু ফিরে এলেন না, থাকতে লাগলেন এমন এক স্ত্রীলোকের সঙ্গে তাদের তিনি মনে করতেন 'একই পরিস্থিতি ও অভিজ্ঞতার মধ্যে লালিত সেবিকা'। এই পতিতা মেয়েটির নাম ক্লাসিনা মারিয়া হরনিক, ডাক নাম সিয়েন (Sien) কিন্তু ভিনসেন্ট একে

'ক্রিস্তিন' বলেই ডাকতেন। বত্রিশ বছরের গর্ভবতী রমণী, পানাসক্ত, সিফিলিস রোগী। কিন্তু কোথায় যেন জাঁ বাপ্তিস্ত শার্দ্যাঁ বা এদুয়ার ফ্রের বা সম্ভবত ইয়ান স্টেনের আঁকা (Jean Baptiste Chadrin, Eduard Frère, Jan Steen) কোনো মানুষের সঙ্গে তার মিল ছিল। সেই ছবিটিকেই জীবন্ত করে তুলতে লাগলেন ভিনসেন্ট।

মাউভ জলরঙের কাজ শেখান। মডেল সিয়েন। পোশাক পরিচ্ছদের যত্ন নিতে বললেন মাউভ, না হলে পাঁচটা লোকের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায় না। মাঝে মাঝে অবশ্য দুই চিত্রকরের মধ্যে মতান্তর হয় তবু অনেক শিল্পীর সঙ্গে পরিচয় হল। দ্য বক, ভিলেম মারিস, গেয়র্গ-হেনড্রিক ব্রাইটনার, যোহান্নেস ভাইসেনব্রুখ (de Bock, Willem Maris, Georg-HendriK Breitner, Johannes Weissenbruch)। এঁদের মধ্যে একমাত্র ভাইসেনব্রুখই ভিনসেন্টের কাজের তারিফ করতেন। টেরস্টেগকে একথা জানাতে দশ ফ্লোরিন দিয়ে একটা ছোট ড্রয়িং তিনি কিনলেন। কারও কোনো রকম সমালোচনা কিন্তু সহ্য করতে পারেন না; ফলে তর্ক, বিবাদ, কোর্ট-কাছারি। ছবি সম্বন্ধে নিজস্ব মতামত গড়ে উঠছে তাঁর, কিছুতেই সে-সব ছাড়া যায় না।

মার্চমাসে করকাকা একডজন দি হেগের কালি কলমে আঁকা ড্রয়িং-এর ফরমাস দিলেন। রোজগার হল তিরিশ ফ্লোরিন। কিন্তু ল্যান্ডস্কেপ আঁকাতে ভালো লাগে না। মডেলের অভাব হয় না এখন। অ্যাকাডেমিক নয়, খনক আর দর্জির পোজ দিতে বলেন মডেলদের। পার্সপেক্টিভ বোঝার জন্যে আর গতির বাস্তবতা ধরার জন্যে কাজ করে যেত থাকেন। সিয়েন মডেল হয়। 'দি গ্রেট লেডি' বিবেকতাড়িত মহিলা। 'সরো' হতাশার প্রতিমূর্তি। দুটি বিখ্যাত ছবিরই মডেল, সিয়েন। ১৮৮২র এপ্রিলে বুঝলেন দি হেগে থাকতে প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন জিনিস তিনি আয়ত্ত করতে পেরেছেন।

শরীর ভেঙে গেছে। টেরস্টেগের সঙ্গে কয়েক সপ্তাহ দেখা হয় নি। মাউভ আজ দু মাস হল তাঁর মুখ দেখতে রাজী নন। প্লাস্টার কাট করা নিয়ে ঝগড়া। ছবি আঁকার সব থেকে কঠোর সংজ্ঞা দিলেন তিনি:

> এ হল এক দীক্ষাপদ্ধতি। এ হল এমন একটা জিনিসকে দৃষ্টিগোচর করে তোলা যা এঁকে ছাড়া বোঝানো যায় না।

এপ্রিলের শেষে ঝড়ে স্টুডিওর একটা জানালা উড়ে গেল, ছবি ইজেল লণ্ডভণ্ড। পাশের দোতলা বাড়িটায় জায়গা প্রচুর, ভাড়াও মাত্র সাড়ে বারো ফ্লোরিন। তেওকে লিখলেন সিয়েনকে বিয়ে করতে চান তার আভাস, তবে 'গোপনে, কোনো হৈ চৈ না করে'। সে গেছে লাইডেনে খালাস হতে। ফিরে এলেই বিয়ে। সে না গলগ্রহ, না গলার পাথর, বরং সঙ্গী। এদিকে টাকার জন্যে তেওকে চটাতেও চান না। চটালেই সর্বনাশ, যাকে বলে 'ফাঁসির হুকুম'। এদিকে তেওর পাঠানো টাকা মে মাস শেষ হতে না হতেই সব খরচ হয়ে গেছে। পোস্টকার্ড কেনার পয়সাটুকুও নেই যে তেওকে লিখবেন। পয়লা জুন ভাড়া না চুকাতে পারলে উচ্ছেদ। টাকা অবশ্য ঠিক সময়েই এল। উচ্ছেদের হাত থেকে রেহাই পেলেও পরিবারের লোকজন জেনে গেল ভিনসেন্ট এক গণিকার সঙ্গে থাকে। অভিভাবকগোষ্ঠী গড়ে তোলার কথা চলতে থাকল যাতে ভিনসেন্টকে ঠিক মতো বাগে রাখা যায়।

ভর্ৎসনা, অবসাদ আর ক্লান্তি। সব মিলিয়ে ১৮৮২র ৭ জুন আশ্রয় নিতে হল সিটি হাসপাতালে। তেইশ দিন সেখানে কাটিয়ে ছাড়া পেয়ে সোজা লাইডেনে গিয়ে হাজির সিয়েনের কাছে। তার ছেলে হয়েছে। দি হেগে ফিরে এসে স্টুডিও খাড়া করে কাজ শুরু করলেন, লোকে তবু তাঁর কাজ ঠিক পথে চলছে বলে মনে করছে না। তেও এসে জানালেন সিয়েনকে বিয়ে করা চলবে না, তবে ছবি আঁকতে চাইলে আঁকতে পারেন। আঁকার খরচা তিনি জোগাবেন। ছবি আঁকার ব্যাপার ছাড়া অন্য কোনো কথা শুনতে তেও রাজি নয়।

নভেম্বরে তাঁর ছবির প্রথম লিথোগ্রাফ করিয়ে তেওর কাছে তার প্রুফ পাঠালেন। ছাপার কাজ করে এই প্রথম আশা জাগে হয়তো তাঁর ছবিও একদিন সকলের কাছে পরিচিত হবে। 'সরো'র লিথোগ্রাফ দেখে এক ব্যাবসায়ী এক সেট প্রিন্টের অর্ডার দেয়। যথার্থ আনন্দ পান ভিনসেন্ট, কিন্তু তবু তাঁর এই বিশ্বাস কিছুতেই ম্লান হল না যে চিত্রকর কখনও যথার্থ সুখী হতে পারে না। 'চিত্রকরকে অবিরাম সংগ্রাম করতে হবে নিজের সঙ্গে, পূর্ণাঙ্গতর করে তুলতে হবে নিজেকে, আপন শক্তিকে করতে হবে নতুনতর, আর সেই সঙ্গে বস্তুগত অসুবিধাকেও জয় করতে হবে।'

সিয়েনকে মডেল করে 'সরো' বা 'দুঃখ' নামের নগ্নিকার চিত্রটিতে ভিনসেন্ট শুধু যে সমাজ-বাস্তবতারই পুঙ্খানুপুঙ্খ ছবি একেঁছিলেন তা নয়, সেটা একটা প্রতীক, একটা আদিম পৌরাণিক কাহিনী। স্রষ্টার কল্পনা জগতের একটা প্রকাশ এই ছবিটিতে রূপ পেয়েছে আলব্রেখট ড্যুরেরের 'মেলাঙ্কোলিয়া' ছবির সঙ্গে যার তুলনা করা যায়। ইতোমধ্যে তরুণ চিত্রকর বন্ধু যোহান্নেস ভানডার ভেলের (Johannes van der Weele) মাধ্যমে আবার সন্ধান পেলেন সেই অনুসন্ধানের সখ্যতা মাউভের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর থেকে যে অভিজ্ঞতা আজ অবধি আর হয় নি।

এত সুদৃঢ় উৎসাহ সত্ত্বেও আর্থিক অনটনজনিত বিমর্ষতা তাঁর আর ঘুচল না। অনলস কাজের ফলে বিমর্ষতা বাড়তেই থাকে। ১৮৮৩র ফেব্রুয়াবি মাসে খুবই দুর্বল হয়ে পড়লেন। এইভাবে কয়েকটা মাস কেটে গেল। আবার আঁকছেন মানুষের মূর্তি। ১৮৭০ সাল থেকে প্রকাশিত 'গ্রাফিক' (Graphic) পত্রিকার সমস্ত সংখ্যা সংগ্রহ করলেন। তাতে ছাপা ছবিগুলো হয়ে উঠল তাঁর কাছে ইষ্টমন্ত্র। কাজ আর কাজ। দুঃখ একটাই। মডেলকে দেবার মতো পয়সা জোগাড় করতে পারেন না। নিয়মিত যান শেভেনিঙ্গেনে (Scheveningen)। সমুদ্র সৈকতের দৃশ্য আর জেলেদের ছবি আঁকেন। রাপার্ড চিঠিতে উৎসাহ দিয়ে বলেন এবার বড়ো ছবি শুরু করার জন্য। কিন্তু কম্পোজিশনের ব্যাপারটা তাতে এসে যাবে। সেটা তো আগে কখনও সামলাবার সাহস করেন নি।

সিয়েন বিশ্বাসভঙ্গ করছে। তেও আবার বললেন তাকে ত্যাগ করতে। কিন্তু তার মানে হল আবার তার পতিতাবৃত্তিতে ফিরে যাওয়া। ভিনসেন্ট তাতে রাজী নন। ড্রেন্থের কথা উঠল। প্রথমে ভেবেছিলেন সিয়েনকে নিয়েই যাবেন। কিন্তু ক্রমাগতই সে বিশ্বাসভঙ্গের কাজ করে যেতে থাকল। শেষ অবধি ড্রেন্থ (Drenthe) যাওয়াটাই সব থেকে ভালো সমাধান বলে মনে হল। কাজের জন্যেও বটে, পয়সার দিক থেকেও বটে। ছবি আঁকারই জয় হল। ১১ সেপ্টেম্বর ১৮৮৩ হোগেভেন (Hoogeveen) শহরে আলবার্টুস হার্টসুইকারের (Albertus Hartsuiker) সরাইখানায় গিয়ে উঠলেন ভিনসেন্ট।

ড্রেন্থ জায়গাটা ধূ-ধূ করছে, চারদিকে বোদমাটির জলা, খোলা মাঠ, হীদারের ঝোপ আর খাল। সঙ্গিনীকে ছেড়ে এসেছেন। অন্য কারও সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে তোলা তাঁর পক্ষে অসম্ভব, টানাটানিও বাড়ছে। ডুবে গেলেন ছবিতে। যদিও বুঝতে পারছেন বিষণ্ণতা, ক্ষোভ আর মোহমুক্ততার হাত থেকে নিস্তার পাবেন না আর কোনো দিন। ভিনসেন্টকে চাঙ্গা করার উদ্দেশ্যে তেও বললেন পারিতে তাঁর কাছে চলে আসতে। নাঃ, বরং তেও-ই ছবি আঁকা শুরু করুক, চলে আসুক তাঁর কাছে। ওস্তাদে, ভান আইক, ব্রেতঁদের সব ভাইরাই তো ছবি এঁকে গেছেন। তেওর পক্ষে তা অসম্ভব। এই ড্রেন্থে থাকতেই প্যালেটে কালো রঙের প্রভাব বাড়ে। নুয়েনের পারিবারিক গির্জায় আবার ফিরে গেলেন। ব্যর্থতার সেই পুরানো স্বাদ—'সেই বুনো স্বভাবের ধেড়ে কুকুরের মতো ভিজে পায়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়া'।

বাপ-মা বাধ্য হয়ে একটা ঘর ছেড়ে দিলেন তাঁকে। সেটা হল তাঁর স্টুডিও। খাইখরচা দিতে হল না, ফলে দেনা শোধ করতে পারবেন। কিন্তু তেওর সমালোচনা সহ্য হয় না, ঝগড়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। এই সময় একটা নতুন বিষয় নিয়ে আঁকতে শুরু করেন—তাঁতি। কাজ করতে করতে অক্টোবর মাসে দেখলেন ফিরে পেয়েছেন মনের আনন্দ।

রাপার্ড এসে পড়লেন নুয়েনেনে। এদিকে আইন্ডহোভেনের (Eindhoven) রঙ বিক্রেতা কয়েক-জনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলেন, ছবি আঁকা শিখবে ভিনসেন্টের কাছে। একজন ডাককর্মী ভিলিয়াম ভানডার ভাঙ্কেরে আর একজন লিথোগ্রাফারের ছেলে ডিমেন গেস্টেল। আর একজন চামড়া ট্যান করেন আন্টন কের্সেমাকেরস। এতদিন যে ধরনের ছবি আঁকবেন সেসব ছেড়ে দিলেন ডিসেম্বর মাসে। এখন শুধু মাথার ছবি। যাঁদের গুরু বলে মানতেন তাঁদের ধরনে, বাস্তব জীবনের মানুষের মাথা, তবে রঙ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন না।

২৬ মার্চ ১৮৮৫ গির্জার দরজাতেই স্ট্রোক হয়ে পড়ে মারা গেলেন বাবা। আগে যতই মনোমালিন্য ঘটে যাক গভীর শোক পেলেন ভিনসেন্ট। কয়েক সপ্তাহ পরে কবরখনকের বাসায় গিয়ে উঠলেন, সেখানেই ছিল তাঁর স্টুডিও। একমাত্র আকাঙ্ক্ষা গ্রামাঞ্চলে থাকবেন কৃষক জীবনের ছবি আঁকবেন। এই সময়েই শুরু হল সেই বিখ্যাত ছবি 'আলুভোজী' (The Potato Eaters) এই প্রথম বড়ো মাপের ছবি। শেষ হলে তেওকে পাঠিয়ে দিলেন পারিতে।

কয়েক বছর আগে থেকেই ইম্প্রেশনিস্টদের আঁকা ছবি নিয়ে পারিতে ঢি ঢি পড়ে গিয়েছিল। নুয়েনেনে থাকার ফলে সেসব খবর তাঁর কানে বিশেষ পৌঁছয়নি। তবে কারা যে মৌলিক আর সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং কাদের কেন্দ্র করে যে ল্যান্ডস্কেপ আর কৃষকের ছবি আঁকার রীতি আবর্তিত হবে তা তিনি জানতেন: এঁরা হলেন 'দ্যলাক্রোয়া, কোরো, মিইয়ে প্রমুখ'। রাপার্ডকে প্রথম সংকরণ 'আলুভোজী' ছবির লিথোগ্রাফ এক কপি পাঠিয়ে দিলেন। তাঁর পছন্দ হল না। ভিনসেন্ট তাঁর কথা মানলেন না। বলেন: ছবি আঁকার মানে প্রকৃতির নকল করা নয়, তা হল পুনঃসৃষ্টি। এই তাঁর বিশ্বাস। কিন্তু নুয়েনেনে সে কাজ করার মতো উপকরণ বড়ো কম। নভেম্বর মাসে চলে গেলেন আন্টোয়ার্প। 'খুব সম্ভব সেখানকার সবকিছুও সেই সর্বত্র যে রকম সেই রকমরেই হবে, অর্থাৎ মোহমুক্ততা।' এই পর্যায়ে নিজের অজ্ঞাতসারেই তিনি এক্সপ্রেসনিজমের অভ্যাস করছেন; অর্থাৎ পার্সপেক্টিভ ও অ্যানাটমির সঠিকতার থেকে চরিত্র ও ভাবদ্যোতনার ওপর বেশি জোর দিচ্ছেন।

ফ্লেমিশ শিল্পী রুবেন্সর (Peter Paul Rubens) ছবির সারল্য তাঁকে মুগ্ধ করে। তাঁর টেকনিকের ব্যাখ্যা খুঁজতে থাকেন ভিনসেন্ট। নতুন বছরের অর্থাৎ ১৮৮৬র জানুয়ারিতে আন্টোয়ার্পের একোল দ্যে বোজার্তে (Ecole des Beaux-Arts) ভর্তি হলেন তিনি। ভেরলাট ও ভিঙ্কের (Verlat, Vink) কাছে পাঠ নেন। প্লাস্টার ছাঁচ দেখেও আঁকেন। সন্ধ্যাটা ক্লাবে কাটিয়ে আবার রাত এগারোটা থেকে সঙ্গী সিবার্টের (Siberdt) সঙ্গে ছবি আঁকেন। শরীর ভেঙে পড়ে। অর্থেরও টানাটানি। অতএব ফেব্রুয়ারি শেষ হবার আগেই আন্টোয়ার্প ত্যাগ। চললেন পারি, কারণ দুটি। ভাইয়ের সঙ্গে থাকলে পয়সার সাশ্রয় হবে, কিছু বাঁচাতে পারবেন, আর করমোঁ (Cormon) নামে পরিচিত ফার্নাদঁ-আন পিয়েস্ত্রর (Fernand-Anne Piestre) স্টুডিওতে যোগ দিতে চান। করমোঁ ইতোমধ্যেই সালোঁতে একাধিক মেডেল পেয়েছেন। প্রথম পেয়েছেন ১৮৭০ সালে নস দেজ নিবেলুঁজ্যাঁ (Noces des Nibelungen) ছবি দেখিয়ে। তুলুজ-লোত্রেক ১৮৮৩ থেকে ১৮৮৬ তাঁর কাছে শিক্ষা করেছেন। তাঁর বিখ্যাত স্টুডিওতেও অনেক ছাত্র ভিড় করত।

পারির বুলভার মঁমার্ত্রে গুপিল-বুসো ও ভালাদঁ ফার্মের অফিসে বসে ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৬ তারিখে তেও হঠাৎ ভিনসেন্টের কাছ থেকে একটা চিঠি পেলেন। তাতে লেখা তিনি পারিতে এসেছেন সবে, লুভ্‌র্-এ 'সালোঁ কারে'তে (Salon Carré) তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান। তেও ভাইকে সাদর অভ্যর্থনা জানায়, ডেকে নিয়ে আসে মঁমার্ত্র পাহাড়ের কোলে রূ লাভালে (পরে এর নাম হয়েছে রূ ভিক্তর-মাসে) তার ছোট্ট বাসায়। দশ বছর আগে বুসো তাঁকে ইস্তফা দিতে বলার পর এই অবধি পারিতে আসেন নি আর। মালিক বুসো আর ভালাদঁ, ম্যানেজার তেও গ্যালারির। তার মেজানিন ফ্লোরে ইম্প্রেশনিস্ট চিত্রকরদের ছবি টাঙানো হয়েছে তেওর উদ্যোগে। দু বছর আগে তেও প্রথম যে ইম্প্রেশনিস্ট চিত্রকররের ছবি কেনেন তাঁর নাম কামিল পিসারো। দোমিয়েরের (Honoré Daumier) ছবিও তেও টাঙিয়েছেন।

পারিতে এসে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই এঁদের কাজ ভিনসেন্ট প্রথম স্বচক্ষে দেখলেন এবং কয়েকজনের কাজ তাঁর ভালো লাগল। ওঁদের বাসা থেকে কাছেই প্লাস পিগালের ওপর 'লা নুভেল আতেনে'তে তাদের আড্ডা। কাছেই জুলিয়ে তাঁগির রঙের দোকান রূক্লোজেলে। মালিককে সবাই প্যার তাঁগি বা 'তাঁগিবাবা' বলে ডাকে। কয়েক ফ্রাঁ দামে মধ্যে মাঝে ছবি বিক্রি করেন। খুব মিতব্যয়ী মানুষ। ভিনসেন্টকে দুহাত বাড়িয়ে ডেকে নিলেন তাঁগি, করমোঁর স্টুডিওতে কাজ করা কয়েকজন শিল্পীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তাঁরা হলেন এমিল বার্নেয়ার, লুই আঁকেতঁ্যা, জন রাসেল আর আঁরি দ্য তুলজ-লোত্রেক। এপ্রিল মাসে ভিনসেন্টও তাঁদের সঙ্গে স্টুডিওতে যোগ দিলেন, কিন্তু যে জিনিসের সন্ধান করছেন তা পেলেন না। ফলে মাত্র চার মাস পরেই সেখানে যাওয়া ছেড়ে দিলেন। এই নতুন অধ্যায়ে কেবল নিজের ছবিরই নয় রাসেল, লুসিয়েঁ পিসারো, তুলুজ-লোত্রেক প্রমুখ অন্যান্য শিল্পীর মডেল হিসাবেও তিনি কাজ করেন। ৫৪ নম্বর রূ লেপিকে দুই ভাইয়ের নতুন বাসা। একখানা ঘর ভিনসেন্ট নিজের স্টুডিও হিসাবে ব্যবহার করতে থাকেন। ছবিতে রঙ দেখা দিল, তার সঙ্গে এল স্টিল-লাইফ আর ল্যান্ডস্কেপ। একটা চিঠিতে লিখছেন:

রঙের কাজওয়ালা এক থোক ছবি করেছি, শুধু ফুল, লাল পপি, নীল কর্নফ্লাওয়ার

> আর ফর্গেট-মি-নট, সাদা আর গোলাপী-গোলাপ, হলুদ ক্রিসেন্থিথাম— নীলের সঙ্গে কমলা, সবুজের সঙ্গে লাল, বেগুনির সঙ্গে হলুদের বিরোধের সংঘাত ঘটাতে চেয়েছি... ধূসর রঙের হার্মনি নয়, গাঢ় রঙ ফোটাতে চেষ্টা করেছি...ডজনখানেক ল্যান্ডস্কেপও করেছি। খোলাখুলি সবুজ, খোলাখুলি নীল রঙের।

এইসময়টাতে তিনি প্রচুর আলোচনা করেছেন ছবি নিয়ে। সমালোচক ফেলিক্স ফেনেঅঁর সঙ্গে আলোচনারত অবস্থায় তাঁর ছবি এঁকেছেন লুসিয়েঁ পিসারো। আলোচনার সঙ্গে সমান পরিমাণে চলত আবসাঁৎ।

রূ লাফিতের কাছেই বিখ্যাত রেস্তোরাঁ লা ম্যায়জঁ দোরের ওপর তলায় ১৫ মে ১৮৮৬ উদ্বোধন হল অষ্টম ইম্প্রেশনিস্ট প্রদর্শনী। এদুয়ার মানের ভাই ইউজেন মানে, ইউজেনের স্ত্রী চিত্রশিল্পী বার্তা মরিজো এটি সংগঠিত করেন। মনে, রেনোয়া আর আলফ্রেদ সিজলির ছবি না থাকলেও এদগার দেগার আর কামিল পিসারো বেশ কেষ্ট করে পল সিন্যাক ও জর্জ সোরোর ছবিও রাখার ব্যবস্থা করেন। এই সোরোর 'লা গ্রাঁদ যাত দ্বীপে রবিবারের বিকাল' ছবিটি নিয়ে খুব জল ঘোলা হয়। 'সায়েন্টিফিক ইম্প্রেশনিস্টদের' সেই বিখ্যাত পোয়াতিলিজম টেকনিক ভিনসেন্ট তাঁর নিজের মতো করে নিয়ে আঁকলেন রূ লেপিকের বাসার জানালা দিয়ে বা মঁমার্ত্রের বাগান থেকে তাঁর চোখ দিয়ে দেখা পারির ছবি। ১৮৮৭র বসন্তকাল।

এখানে থাকার সময় এমিল বার্নিয়েরর সঙ্গে প্রায়ই তিনি আজনিয়েরে যেতেন, ল্যান্ডস্কেপ আঁকতেন। এখানকার মতো রঙের ছড়াছড়ি অন্য কোথাও দেখেন নি বলে তিনি লিখেছেনও এক চিঠিতে! মনে, রেনোয়া, গুস্তাভ কাইয়েবোত, কামিল পিসারোর মতো ভিনসেন্টও এখানকার সেন নদীর পাড়ে তাঁর ইজেল পেতেছিলেন। তখন ১৮৮৭র গ্রীষ্মকাল।

আভেন্যু দ্য স্যাঁত-উয়েঁ আর আভেন্যু দ্য ক্লিশির মোড়ে 'আ লা ফুর্শ' নামে একটা খুব জনপ্রিয় রেস্তোরাঁ ছিল। সেখানে এমিলের সঙ্গে একত্রে ছবির প্রদর্শনী করেন, কিন্তু ম্যানেজারের সঙ্গে খিটিমিটি লাগায় প্রদর্শনী বন্ধ হয়ে গেল। অবশ্য 'লা তঁবুরাঁ' নামে একটা পানশালা ছিল বুলভার দ্য ক্লিশিতে। সেখানেই তাঁদের যৌথ প্রদর্শনীটা হল। এঁরা হলেন পেতি বুলভারের চিত্রশিল্পী। গ্রাঁ বুলভারের শিল্পীরা হলেন মনে, রেনোয়া, দেগা আর সিজলি।

লা তঁবুরাঁ চালাতেন আগোস্তিনা সেগাতোরি। দেগার মডেল হয়ে কাজ করেছেন তিনি। তাঁর সঙ্গে অল্প কিছুদিন ঘনিষ্ঠতা চলল ভিনসেন্টের, আর জাপানী ছবির সঙ্গে বিশেষ করে হোকুসাই-এর ছবির সঙ্গে। পারিতে আসার পরে পরে জায়গাটা যেমন ভালো লেগেছিল দেড় বছর যেতে না যেতেই তেমনি অসহ্য হয়ে উঠল সেটা তাঁর কাছে। সকলের সঙ্গে খটাখটি বাধে। আরমাঁ গিলোম্যাঁর সঙ্গে ঝগড়া। প্যার তাঁগির স্ত্রীকে ভয় দেখান। তেও-ও রীতিমত বিরক্ত, ভাবেন ভাইকে বলবেন চলে যেতে। ভিনসেন্টও মাঝে মাঝে বলেন অন্যত্র চলে যাবেন, কিন্তু তেও যদি সেকথা উচ্চারণ করেন তাহলে হয়তো ফল হবে বিপরীত। অবস্থা তাই রইল যথাপূর্বম। তারপর একদিন যেমন হঠাৎ এসেছিলেন তেমনি হঠাৎই পারি ছেড়ে চলে গেলেন ভিনসেন্ট। তেও স্টেশনে গিয়ে ট্রেনে তুলে দিয়ে এলেন। এবার আর্লে।

ষোল ঘন্টা ট্রেনজার্নি করে আর্লেতে এসে নামলেন ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৮। বরফে ঢাকা

শহর। পরের দিন তেওকে লেখা চিঠিতে আছে :

> বিশ্রাম করার মতো এমন কোনো জায়গা যদি না থাকে যেখানে গেলে মানুষ তার মনের সজীবতা প্রশান্তি ও ভারসাম্য ফিরে পেতে পারে, তাহলে পারিতে বসে কাজ করা আমার পক্ষে প্রায় অসম্ভব।

এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্যের প্রথম যে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন তাতে সে-আশা পূর্ণ হওয়ার প্রত্যয় আছে।

> বরফে ঢাকা এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য, বরফের মতোই উজ্জ্বল আকাশের পটভূমিতে সাদা পাহাড়ের চূড়াগুলো, ঠিক যেন জাপানীদের আঁকা শীতকালের ভূচিত্র।

প্রভাঁস অঞ্চলের ঝকঝকে আলো আর আর্লেতে এই নির্জনবাস তাঁর মনের শান্তি ফিরিয়ে আনল। আলফঁস দোদে বা এমিল জোলার বই পড়া, বা প্যার তাঁগির ওখানে পল সেজানের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকারের ফলে বা আদলফি মন্তিচেল্লির ল্যান্ডস্কেপগুলো দেখেই যে এই জায়গাটার ওপর তাঁর টান দেখা গিয়েছিল তা বলা যায় না। পারিতে থাকতেই বুঝেছিলেন যৌবন তাঁর বিদায় নিয়েছে, তবু এমন কিছু ছবি আঁকার সম্ভাবনা আপনার মধ্যে অনুভব করেছিলেন যার মধ্যে যৌবন ও সজীবতার কিছুটা হয়তো থেকে যাবে একথা তিনি লিখেছেন। আর্লের আশপাশে বরাবরের সেই প্রিয় পরিবেশ চোখে পড়ল তাঁর। গ্রাম, গ্রামের মানুষের কর্মব্যস্ত জীবন। অভিলাষ পূরণ করার জন্যে কারেল হোটেলে একটা ঘর নিলেন। ২২ ফেব্রুয়ারি তারিখেই দেখা যাচ্ছে রঙ ক্যানভাস ইত্যাদি কিনছেন কোনো মুদিখানা বা বইয়ের দোকান থেকে। লাল চুলওয়ালা এক ডাচ চিত্রকরকে দেখে স্থানীয় লোকেরা অবাক হয়ে গেল। কয়েকদিন পরে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন এক মুদী আর এক ম্যাজিস্ট্রেট; দুজনেই অ্যামেচার চিত্রকর। ব্যস। সেই শেষ অতিথি। স্থানীয় শিল্পীরা তাঁকে পাত্তা দিলেন না, আর ভাঙাগলা এই নিঃসঙ্গ চিত্রকরকে দেখে সাধারণ লোকে ভয় পেতে থাকে।

বিষয়বস্তুর সন্ধানে আশপাশের গ্রামে গ্রামে সারাদিন ঘুরে বেড়ান, কোনো ব্রিজ বা ফলবাগিচার সন্ধান করেন আকাশ ভালো থাকলেই যেখানে তাঁর ইজেলটা খাটতে পারেন। খাবার দিতে বলা ছাড়া সারাদিন কারও সঙ্গে একটিও কথা বলেন না। শুধু চিঠি লেখেন— বিরাট লম্বা চিঠি—তেওকে, গোগ্যাঁকে, এমিলকে আর তুলুজ-লোত্রেককে। শেষের জন অবশ্য কখনও জবাব দিতেন না। জায়গাটা প্রথম প্রথম খুব সুন্দর, আলো ঝলমল আর প্রফুল্ল বলে মনে হলেও নির্বাসনের নিঃসঙ্গতা ও এই শহরেই তিনি প্রথম উপলব্ধি করলেন।

মার্চমাসের শেষ দিকে তেওর চেষ্টায় পারির সালোঁ দেজ্যাঁদেপ্যাঁদাঁতে তাঁর তিনখানি ছবি লোককে দেখানো হল। একটা স্টিল-লাইফ—একগাদা ফরাসী উপন্যাস আর একটি গ্লাসে রাখা গোলাপ, অন্য দুটি ল্যান্ডস্কেপ—একটি মঁমার্ত্র পাহাড়ের, অন্যটি গালেতের একটি গমের চাকি। এই উপলক্ষেই তাঁর ভিনসেন্ট নামের প্রচলন।

পঁয়ত্রিশ বছর বয়স, নিঃসঙ্গ। সারাদিন ধরে এক ফলবাগিচায় ছবি এঁকে ঘরে ফিরে একদিন

পেলেন একখানা চিঠি। লিখেছেন বোন ভিলহেলমিনা। চিঠিতে জানিয়েছেন আন্টন মাউভ মারা গেছেন। এই মাউভই তাঁর হাতে প্রথম রঙের তুলি তুলে দিয়েছিলেন। সদ্য সমাপ্ত একটি ছবির ওপর সঙ্গে সঙ্গে তিনি লিখলেন 'মাউভের স্মারকচিহ্ন'। ল্যান্ডস্কেপ আঁকতে শুরু করেছেন কয়েকদিন আগে। এক ঝাঁক আঁকা হয়ে গেছে। তাঁরই মধ্যে সব থেকে ভালো এই ছবিটি। এপ্রিল-মে মাসের, মানে ভরা বসন্তের পীচ গাছ। প্রভাঁস অঞ্চলে ফলের গাছে ফুল ধরে আগে আগে। তারই ছবি। রঙের ঝরনা ঝরে পড়েছে অবিরাম ধারায়— বাদাম খোবানি আর পীচ ফলের গাছ, নীলাভ লাল তার ফুল। হল্যান্ডের কথা মাথায় ভিড় করলেও আর্লেতে থাকতে কোনো খেদ নেই মনে। বোনকে বুঝিয়ে লিখলেন:

> প্যালেটটা ইদানিং সুস্পষ্টভাবে রঙে ভরা— আসমানী, নীল, কমলা, নীলাভ লাল, সিঁদুরে লাল, উজ্জ্বল হলুদ, উজ্জ্বল সবুজ, টকটকে বুর্গুঁদি (লাল মদ) আর বেগুনি।

যত প্রচণ্ড আগ্রহ নিয়েই কাজ করুন না কেন 'তুমি নিজে কিন্তু বাস্তব জীবনের মাঝখানে নেই, এই বিষাদময় চিন্তার' একটুও বদল হয় না মাথার মধ্যে।

সব কিছুকে এমন কি প্রভাঁস অঞ্চলের প্রচণ্ড উত্তরপশ্চিমা মিস্ত্রাল ঝড়কেও পরাস্ত করল ভিনসেন্টের ছবি আঁকার প্রয়োজন। এদিকে তেও একত্রিশ বছরে পা রেখেছে। সেই উপলক্ষে তার জন্যে একটা ফলবাগিচার ছবি আঁকলেন এই সময়: তাতে দেখা যাবে 'মূল সাদা জমির ওপর খুব হাল্কা হলুদ আর লাইল্যাক রঙ চাপ চাপ করে লাগানো হয়েছে প্রচণ্ড আবেগে'।

কিছুদিন অবশ্য ছবি আঁকা বন্ধ রইল পেটব্যথা আর দাঁতের যন্ত্রণার জন্যে। ভিনসেন্টের ধারণা পারিতে থাকতে সস্তা মদ প্রচুর খেতেন; তারই ফলে এই যন্ত্রণা।

আর্লেতে আসার মাস দেড়েকের মধ্যেই বুঝলেন এখন থেকে এইখানেই তাঁকে থাকতে হবে। শহরটা নোংরা হলেও পারির মতো অতটা প্রকৃতিবিরুদ্ধ নয় এখানকার জীবনযাত্রা। এদিকে তাঁর ধারণা হল অন্য খরিদ্দারদের থেকে তিনি বেশি জায়গা ভোগ করছেন এই অজুহাতে হোটেলওয়ালা তাঁর কাছ থেকে বেশি খরচা আদায় করছে। ফলে পয়লা মে থেকে দু নম্বর প্লাস লামার্তিনে একটা বাড়ি নিলেন মাসিক পনের ফ্রাঁ ভাড়ায়। 'বাইরেটা হলুদ রঙ করা, ভিতরে সাদা চুনকাম রোদঝলমলে দিকটায়।' কিন্তু আসবাবপত্র তো আর ধারে পাওয়া যায় না। তেওর পাঠানো হাতখরচের টাকার জন্যে অপেক্ষা করা ছাড়া পথ নেই। তবে ভিনসেন্ট নিশ্চিত যে 'ইম্প্রেশনিস্ট ছবিগুলোর দাম বাড়বে, আর আমরা যে পুঁজি খাটিয়েছি সেটা আবার ফিরে আসবে আমাদের পকেটে, নগদে না হোক, মজুত মালের মূল্য হিসাবে।'

জায়গাটা বদলাতে চাইলেন। মনে একটু একটু ভয় হয় কি জানি ভবিষ্যতের চিত্রকর তিনি হতে পারবেন তো, যে চিত্রকরকে হতে হবে 'এমন রঙের ওস্তাদ যা আগে কখনও দেখা যায় নি... কিন্তু এই যে চিত্রকর অর্বিভূত হবেন— আমি ভাবতেই পারি না ইনি থাকবেন কিনা ছোটো ছোটো কাফেতে, বাঁধানো দাঁত পরে কেবলই কাজ করে চলেছেন, আর আমারই মতো যাতায়াত করছেন সৈনিকদের জন্যে নির্দিষ্ট গণিকালয়ে।'

নিজেকে 'শিল্পীদের সারিতে পরস্পরের মধ্যে একটা যোগসূত্রের' বেশি অন্য কিছু বলে

ভিনসেন্ট কখনও দাবি করেন নি। হলুদ রঙের যে বাড়িটা তিনি গোছগাছ করছেন সেখানে কিন্তু তিনি নিজে একা থাকতে পারবেন না। 'কিন্তু আমাদের পায়ের চিহ্ন ধরে যে সব শিল্পী আসবেন তাঁদের ভালোভাবে বসবাস করার জন্যে আমরা ব্যবস্থা করছি এই কথাটা যদি ঠিক হয় তাহলে এটা একটা ব্যাপার হবে বটে।' তারপর যোগ করেছেন, 'স্টুডিওটাতে বন্ধুরাও কাজ করতে পারবে।'

একটা টেবিল আর এক জোড়া চেয়ারের ব্যবস্থা করার পর হাতে যা রইল স্যুপ আর কফির খরচা মেটাতে সেটা যথেষ্ট। নতুন নতুন ল্যান্ডস্কেপ আঁকা হতে থাকল, আর স্টিল-লাইফ। মঁমাজের (Montmajcur) মঠে প্রায়ই যান। হলুদ রঙের বাড়িতেই রাত্রে ঘুমান, বিছানা ছাড়াই।

এদিকে তেওর চিঠিতে জানলেন গোগ্যাঁ অসুস্থ, প্রচুর ধার, আর চরম নিরুদ্যম। গোগ্যাঁকে নিজেই লিখে দিলেন আর্লেতে তার কাছে চলে আসতে। গোগ্যাঁ তখন পঁতাভেনে। হলুদরঙের বাড়িটা আগাগোড়া নতুন করে রঙ করা হচ্ছে। সেই পাঁচটা দিন ভিনসেন্ট থাকেন স্যাঁত-মারি-দ্য-লা-ম্যার-এ। এই সময়ে আঁকা তাঁর বিখ্যাত ছবি 'সমুদ্রতটে মাছ ধরা নৌকা' (১৮৮৮ জুন)। এই পাঁচ বছরে তাঁর স্টাইল পুরোপুরি পাল্টে গেছে। শেভেনিনগেনে থাকতে তিনি রঙছুট কন্টুরের সন্ধান করতেন। এখন স্যাঁত মারিতে সন্ধান করেন রঙের ছবিকে যা দেবে কন্টুর। 'আরও বেশি একরোখা, আরও বেশি বাড়িয়ে দেখানো ড্রয়িং-এর ফর্ম' আয়ত্ত করতে চাইছেন তিনি। রঙ লাগানোর স্টাইলেরও অভিব্যক্তি ঘটছে। আরও বড়ো ফর্মাতে কাজ করার প্রয়োজন অনুভব করছেন। এইরকম মানসিক অবস্থায় গোগ্যাঁর কাছ থেকে সাড়া আসার জন্যে অপেক্ষা করতে থাকেন ভিনসেন্ট। দুজনে মিলে 'আরও একধাপ' এগিয়ে যেতে পারবেন এ বিষয়ে তিনি নিশ্চিত। প্রভঁ্যাসে থাকতে থাকতেই এই পদক্ষেপ নিতে হবে; কারণ, 'নতুন শিল্পকলার গোটা ভবিষ্যৎটা রয়েছে মিদি অঞ্চলে', কারণ এখানকার বাতাস স্বচ্ছ (যদিও একথা তাঁর মনে ছিল যে সেজান প্রায়ই জায়গাটার 'কর্কশ দিকটাও' তুলে ধরতেন)। মানুষ আঁকার প্রবল ইচ্ছা। 'মানুষের মূর্তি আঁকাটা অপ্রয়োজনীয় বলে যতই পাশ কাটাতে চেষ্টা করি না কেন ঠিক এইটাই আমার গন্তব্য।' আর্লে শহরের নানা রঙের পোশাকপরা সুন্দরী রমণী বা স্যাঁত-মারির 'পাতলা ছিপছিপে, স্পষ্টভাষী, ঈষৎ বিষণ্ণ ও মিস্টিক প্রকৃতির' মেয়েদের দেখে প্রাক্-বেনেসাঁস যুগের ইতালীয় শিল্পী সিমাবু বা জিয়োত্তোর আঁকা স্ত্রীলোকদের কথা তাঁর মনে পড়ে যেত। কিন্তু এরা কেউই ছবি আঁকার জন্যে তাঁর সামনে পোজ দিয়ে বসতে রাজী নয়। যে দুজন মাত্র লোক রাজী হলেন তাঁদের মধ্যে একজন ফরাসী জুভ—সেনাদলের এক সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট—এঁকে ভিনসেন্ট ড্রয়িং আর পার্সপেক্টিভ শেখাতেন— অন্যজন হলেন রাস্তার একটি মেয়ে।

জুনের শেষাশেষি গোগ্যাঁ আসতে রাজী হয়েছেন এই খবর পেয়ে ভিনসেন্ট খুব উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। কয়েকটা ক্যানভাসে নতুন করে রঙ চাপাতে গিয়ে এত পরিশ্রম হল যে ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়লেন তিনি। 'ভীষণ অন্যমনস্ক, আর সাধারণ নানা কাজকর্ম করতেও অপারগ' হয়ে পড়লেন। আর্লে, বন্ধ্যাভূমি ক্রাউ অঞ্চল ও রোন নদীর মাঝখানে কামার্গ দ্বীপপুঞ্জের আশপাশে ছবি আঁকার বিষয়বস্তু এত পেলেন যে মনে খুব আনন্দ হল, কিন্তু কেবলই মনে পড়ে যায় হল্যান্ডের কথা, রুইজডায়েলের কথা। এদিকে গোগ্যাঁও আসছেন না। এই সময় বার্নিয়েরের সঙ্গে এত দীর্ঘ চিঠিপত্র চলে যে সেটা যেন চিত্রকর ও চিত্রকলা সম্বন্ধে একটা আলাপ-আলোচনা

হয়ে ওঠে। এসব চিঠিতে কেবলই উল্লেখ করেছেন রেমব্রান্ট, হাল্‌স্‌, দ্যলাক্রোয়া, মিইয়ে আর দোমিয়েরের কথা।

অগাস্টের গোড়াতে পোস্টম্যান জোসেফ রুল্যাঁর পোর্ট্রেট আঁকেন ভিনসেন্ট। কট্টর রিপাবলিকপন্থী। একে দেখে প্যার তাঁগির কথা মনে পড়ে যায়। কয়েক সপ্তাহ পরে পাস্যাঁস এসকালিয়ে নামে এক মালির পোর্ট্রেট আঁকেন। নুয়েনের সেই আলুচাষীদের ছবি আঁকার পর কোনো চাষীর পোর্ট্রেট আজ অবধি আর আঁকেন নি। প্রতিটি পোর্ট্রেটই বার বার করে আঁকতেন। ফলে পারিতে থাকতে ইম্প্রেশনিস্টদের কাছে যা কিছু শিখেছিলেন আস্তে আস্তে সে-সব কিছু তিনি ত্যাগ করলেন।

গোগ্যাঁ আসছেন বলে দুটো খাট কেনা হল, আর একডজন চেয়ার। থাকার খরচাপাতি সংক্রান্ত তেও-র সব শর্ত মেনে নিলেন গোগ্যাঁ। ছবি দিয়ে দাম চুকানো হবে। অবশেষে ২৮ অক্টোবর ১৮৮৮ আর্লেতে এসে পৌঁছলেন গোগ্যাঁ। শুধু পোর্ট্রেট দিয়ে সাজানো কোনো বাড়ি দেখতে পেলেন না তিনি। বাড়ির ব্যাপারস্যাপার দেখে দোমিয়েরের আঁকা ছবির মতো মনে হয়। গোগ্যাঁর থাকার ঘরটা সূর্যমুখী ফুলের নানা ছবি দিয়ে সাজানো, যথার্থ শিল্পী মনের কোনো মহিলার বুদোয়ারের মতো; আর ভিনসেন্টর নিজের ঘরটা অনেকটা মঠের সন্ন্যাসীদের থাকার খুপরির মতো দেখতে। দুজনে বাস করেন একত্রে, জুভদের পতিতালয়ে একসঙ্গে যান স্কেচ করতে। ছবি আঁকেন একসঙ্গে, আর আঁকতে আঁকতে চলে দুজনে আলোচনা।

কিন্তু মাস খানেকের মধ্যেই আলোচনা গিয়ে দাঁড়াল তর্কাতর্কিতে। গোগ্যাঁ চলে যেতে চান বলে তেওকে লিখলেন। ভিনসেন্ট বিশ্বাস করবেন না সে-কথা। শেষে ২৩ ডিসেম্বর ডিনারের পর গোগ্যাঁ একলা বেড়াতে বেরিয়েছেন শহরটা পায়ে হেঁটে ঘুরে দেখতে। হঠাৎ পিছনে পায়ের শব্দ। দেখেন খোলা ক্ষুর হাতে ভিনসেন্ট তেড়ে আসছেন তাঁর দিকে, তারপর হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়েই আবার ফিরে গেলেন হলুদ রঙের বাড়িতে। সে-রাতটা একটা হোটেলে কাটিয়ে এক দিন পরে প্লাস লামার্তিনে ফিরে গোগ্যাঁ দেখেন বাড়ির সামনে লোকে লোকারণ্য, পুলিস গিজগিজ করছে। একজন ইন্সপেক্টর বলল ভিনসেন্ট মারা গেছেন। গোগ্যাঁ পুলিসকে বললেন ডাক্তার ডাকতে আর ভিনসেন্ট যদি তাঁর কথা জানতে চান তাহলে যেন বলা হয় তিনি পারি চলে গেছেন। পারিতে তেওকে টেলিগ্রাম করলেন গোগ্যাঁ। ওতেল-দিউ হাসপাতালে ভর্তি করা হল ভিনসেন্টকে। ২৫ ডিসেম্বর এখন-তখন অবস্থা।

তেও এসে পড়লেন পারি থেকে। বিকারগ্রস্ত ক্ষিপ্ত অবস্থাটা কেটে যেতে আবার ফিরে গেলেন, সঙ্গে গোগ্যাঁও। হাসপাতালের ডাক্তার রে, রেভারেণ্ড সাল, জোসেফ রুল্যাঁ সকলেই তেওকে আশ্বাস দিলেন তাঁরা তাঁর ভাইকে সাহায্য করবেন। দুদিন পরেই আবার ভেঙে পড়লেন ভিনসেন্ট, কথা বলবেন না খাবেন না। এখ-অ্যাঁ-প্রভ্যাঁসের একটা অ্যাসাইলামে কয়েক দিন কাটিয়ে আবার ফিরে এলেন হলুদ কুঠিতে ছবি আঁকা শুরু করার তাগিদে। ভাই ও মা-বোনকে আশ্বস্ত করে। 'যেটা ঘটেছিল আশা করি সেটা শুধু শিল্পীর খ্যাপামির ব্যাপার একটা, আর প্রচণ্ড জ্বরটা হয়েছিল একটা ধমনী কেটে ফেলার জন্যে, তবে খিদে ফিরে এসেছে, হজমও ভালোই হচ্ছে,...ইত্যাদি'। জানুয়ারি ১৮৮৯ কাটা কানের ওপর ব্যাণ্ডেজ-জড়ানো অবস্থার একটা আত্মপ্রতিকৃতিও আঁকলেন।

এদিকে হাসপাতাল ও ধোবানির খরচ-খরচা মিটিয়ে হাতে একটিও পয়সা নেই, ওদিকে একেবারে নিঃসঙ্গ। তেওর বিয়ের ঠিকঠাক যোহান্না বার্জারের (Johanna Berger) সঙ্গে। আর্লের একমাত্র বন্ধু রুল্যাঁও চলে গেল মার্সেই। চুপচাপ ছবি এঁকে যাওয়াই তাঁর ইচ্ছা, কিন্তু বাদ সাধে মস্তিষ্ক। ওতেল-দিয়োতে সপ্তাহ খানেকের মতো আবার কাটাতে হল। এদিকে স্থানীয় লোকজন পুলিস কর্তৃপক্ষের কাছে গণ-আবেদন জানাল ডাচ চিত্রকরের মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছে, প্রতিবেশীদের কাছে সে এক বিপজ্জনক ব্যক্তি, ব্যবস্থা নেওয়া হোক। 'হলুদ কুঠির' দরজায় তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হল। তাঁকে বন্ধ করা হল হাসপাতালের কুঠরিতে। সিন্যাক তাঁকে একদিনের জন্য হলুদ কুঠিতে নিয়ে এসে সারাদিন ছবির আলোচনা করলেন। সেদিন ২৫ মার্চ। কিন্তু সেইদিনই তার্পিন তেল খেয়ে ফেলার চেষ্টা করায় সিন্যাক তৎক্ষণাৎ আবার তাঁকে হাসপাতালে ফিরিয়ে আনলেন। জিনুখ (Ginoux) কাফে দ্য-লা-গ্যারে কিছু আসবাবপত্র রেখে যেতে অনুমতি দিল। একা থাকার মতো ক্ষমতা তাঁর আর ছিল না। স্যাঁ-রেমি-দ্য-প্রভঁ্যাসের কাছে স্যাঁ পল দ্য-মোসোল (Saint Paul-de-Mausole) নামে একটা উন্মাদাশ্রমে গিয়ে উঠলেন ৮ মে তারিখে। ইতোমধ্যে দোসরা মে তেওকে দু বাক্স ছবি পাঠিয়ে দিয়েছেন।

উন্মাদাশ্রমে ডাক্তার পেইরোঁ (Peyron) আর প্রধান নার্স জাঁ-ফ্রাঁসোয়া পুলে (Jean-François Poulet) তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। দুটি পাশাপাশি ঘর বরাদ্দ করা হল, তার একটি স্টুডিওর কাজ করবে। ছবি আঁকা শুরু হয়ে গেল পরের দিন থেকেই। জানালা দিয়ে দেখা প্রাকৃতিক দৃশ্য। রুইজডায়েলের কথা মনে পড়ে যায় 'তবে শ্রমজীবী মানুষদের দেখা পাওয়া যায় না এখানে'। মডেল হিসাবে মিইয়ে, দ্যলাক্রোয়া, রেমব্রান্ট আর গুস্তাভ দোরের কাজ ব্যবহার করেন। আর নিজের ছবিরই নকল করেন বার বার। জানুয়ারি মাসে 'মধ্যাহ্নের বিশ্রাম' নামে একটি ছবি তিনি আঁকলেন মিইয়ের 'দ্য ফোর আওয়ার্স অর দা ডে' ছবির অনুসরণে।

৭ জুলাই ভিনসেন্ট আবার ফিরে এলেন আর্লেতে। এদিকে যোহান্নার সন্তান হবে। ছেলে হলে তার গডফাদার হতে ভিনসেন্টের সম্মতি চেয়ে যোহান্না চিঠি লিখেছেন। কিন্তু আর্লেতে ফিরতেই আবার হল আক্রমণ। তেওকে অনুরোধ করলেন ডাক্তার পেঁইরো যেন ছবি আঁকার অনুমতি দেন। 'অন্য সব কিছুর থেকে কাজই আমাকে সব থেকে ভালোভাবে অন্যমনস্ক করে; একবার যদি যথার্থই সমস্ত শক্তি দিয়ে তাতে ডুবে যেতে পারি তাহলে সম্ভবত সেটাই হবে আরোগ্যের সব থেকে ভালো উপায়।'

এদিকে সালো দেজ্যাঁদেপ্যাঁদাঁতে ভিনসেন্টের দুটি ছবি দেখানো হয়েছে— 'আইরিস ফুল আর তারায় ভরা রাত'। তেও ভাবছেন ভিনসেন্টকে পারি বা কাছাকাছি কোথাও ফিরিয়ে আনবেন, কিন্তু কামিয়ে পিসারো ভুগছেন চোখ নিয়ে। ভিনসেন্টকে অপেক্ষা করতেই হচ্ছে। কারণ এই পিসারোই তেওর পরামর্শদাতা এই ব্যাপারে, এরানির (Eragny) বাড়িতে তাঁকে এখন আসতে বলতে পারছেন না। আশু ফিরে আসায় ভিনসেন্টের পক্ষে বিপদের আশঙ্কা। ডা. পেইরোঁও বলছেন শীতটা ওখানেই কাটানো ভালো। আর্লে থেকেই ভিনসেন্ট ভাইকে ছবির পর ছবি পাঠাচ্ছেন।

শেষে পিসারো জানালেন পল গাসে (Paul Gachet) বলে এক ডাক্তারকে তিনি চেনেন শিল্পসংক্রান্ত অ্যানাটমির শিক্ষক, নিজেও ছবি আঁকেন আর ক্ষোদনের কাজ করেন। ওভ্যার-

স্যুরোয়াজ-এ (Auvers-sur-Oise) যত ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পী বা মানুষজন আসা যাওয়া করেন সকলেরই তিনি বন্ধু। ভিনসেন্ট সেখানে সহৃদয় পারিবারিক পরিবেশ পাবেন। কিন্তু অনেক দিন ধরে রোগের লক্ষণ আর দেখা না দেওয়ায় পরিকল্পনাটা স্থগিত রইল। নভেম্বরে ব্রুসেলসের শিল্পী সঙ্ঘ 'লেজেখেখ'-এর (Les X X) সম্পাদক ওক্তাভ মো (Octave Maus) তাঁদের আগামী প্রদর্শনীতে দেখানোর জন্যে ভিনসেন্টের কাছ থেকে কয়েকটি ছবি চেয়ে পাঠালেন। পুঁভ দ্য শাভান্নে, সেজান, জাঁ লুই ফোরেঁ, তুলজ-লোত্রেক, রেনোয়া আর সিজলির কাছেও ছবি চাওয়া হয়েছিল। প্রস্তাবটা গ্রহণ করে ভিনসেন্ট ৩০ নভেম্বর ছ খানা ছবি পাঠিয়ে দিলেন সেখানে।

ডিসেম্বরে বার্নয়ারকে লেখা চিঠি থেকে জানা যায় স্যাঁ-রেমিতে থাকতে 'চাষীর মতো কঠোরভাবে ও বিনা আড়ম্বরে' তিনি কাজ করতেন। লিখছেন:

> সারা বছর প্রকৃতির ওপর ক্রীতদাসের মতো পরিশ্রম করেছেন, ইম্প্রেশনিজম বা এটা ওটা মতবাদের কথা আদৌ ভাবে নি। আর তা সত্ত্বেও, আরও একবার নক্ষত্রলোকে বড়ো বড়ো তারায় পৌঁছনোর চেষ্টা করলাম—কিন্তু নতুন করে ব্যর্থতা—যথেষ্ট ব্যর্থতা ভোগ করলাম আমি।

এই সময় ফলবাগিচার জায়গায় সাইপ্রেস গাছ দেখা গেল তাঁর ছবিতে। ২৫ জুন ১৮৮৯ তেওকে লিখছেন:

> সাইপ্রেস গাছগুলো অবিরত আমার মন জুড়ে আছে। সূর্যমুখী ফুলের ছবির মতো সেগুলো দিয়েও কিছু করার ইচ্ছা আমার হয়, কারণ আমি অবাক হয়ে যাই মিশরীয় স্মৃতিফলকের মতো সেগুলোর অঙ্গসৌষ্ঠব দেখে, আর সবুজটাও এমন বিশেষ ধরনের।

২৪ ডিসেম্বর হঠাৎ আবাব রোগটার আক্রমণ হল। সপ্তাহখানেক কাজকর্ম বন্ধ রইল। অসুখ কমতেই আবার কাজ। ১৯ জানুয়ারি ১৮৯০ আর্লেতে ফিরে এসে জিনুখদের সঙ্গে দেখা করলেন। দুদিন পরে আবার আক্রমণ। সাতদিন কোনো কাজ করতে পারলেন না। এদিকে ৩১ জানুয়ারি পারিতে ভাইপো ভিলেম ভ্যান গঘ ভূমিষ্ঠ হল। আলবেয়ার ওরিয়েরের (Albert Aurier) বিখ্যাত নিবন্ধ 'বিচ্ছিন্ন মানুষেরা' (The Isolated Ones) প্রকাশিত হল *মার্কর দ্য ফ্রাঁস* পত্রিকার জানুয়ারি সংখ্যায়। নিজের ছবি সম্বন্ধে এই ধরনের নিবন্ধ প্রকাশিত হতে দেখে বিস্মিত হন ভিনসেন্ট। কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে তাঁর মন লেখকের প্রতি। ওরিয়েরকে লিখছেন:

> ...একথা আপনাকে বলা নিস্প্রয়োজন যে আমি এই চিন্তাই করতে থাকব বলে আশা করি যে ঐরকম ছবি আমি আঁকি না, তবে এটা আমি নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছি কি ভাবে আমার ছবি আঁকা উচিত।

এতদিনে এই প্রথম এবং জীবিতকালে এই একবারই ভিনসেন্ট তাঁর একটি ছবি বিক্রি করতে পারলেন, যদিও সাত'শ ছবি ইতোমধ্যেই তিনি এঁকেছেন। 'লাল আঙুরখেত' (The Red

Vineyard) ছবিটা আন্না বখের কাছে চার শ ফ্রাঁতে বিক্রি হল। আর্লেতে থাকতে তাঁর ভাই ইউজেনের দুখানা পোর্ট্রেট ভিনসেন্ট এঁকেছিলেন। ডাক্তার পেইরোঁ ভেবেছিলেন রোগটা বুঝি সেরে গেল। কিন্তু আবার একবার আক্রমণ হল। এপ্রিলের শেষদিকে আবার যখন চিঠি লেখার ক্ষমতা ফিরে পেলেন তেওকে লিখলেন, 'মঁসিয়ে ওরিয়েরকে বলবে তিনি যেন আমার ছবি নিয়ে নিবন্ধ আর না লেখেন, ভালো করে জোর দিয়ে বলবে যে প্রথমত আমার সম্বন্ধে তিনি ভুল ধারণা করেছেন, কারণ দুঃখে আমি এতই বিচলিত যে প্রচারের সামনাসামনি হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ছবি আঁকলে আমি অন্যমনস্ক থাকি, কিন্তু সে সম্বন্ধে কথাবার্তা হলে আমার যা কষ্ট হয় তা তিনি জানেন না।'

স্যাঁ পল দ্য মোজোল অ্যাসাইলামটা আর ভিনসেন্টের সহ্য হচ্ছে না। ভাইকে লিখলেন এখান থেকে চলে যেতেই হবে। ১৫ মে'র পরে আর একটি দিনও নয়। ডাক্তার পেইরোঁ আর আপত্তি করলেন না।

১৭মে পারির গ্যার দ্য লিয়ঁ স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দুই ভাইয়ে দেখা হল। সেখান থেকে সোজা ৮ নং সিতে পিগাল-এ তেওর বাসায়। দুই ভাই ঝুঁকে পড়ে শিশু সন্তানটির দিকে তাকিয়ে থাকেন। দুজনেরই চোখে জল।

পরের দিন তেও ভিনসেন্টকে নিয়ে গেলেন প্যার তাঁগির ভাঁড়ার ঘর দেখাতে, সেখানে রাসেল, গিলোম্যাঁ, গোগ্যাঁ, বার্নেয়ার আর তাঁর নিজের আঁকা সব ছবি। পুরানো সালোঁ থেকে যারা বেরিয়ে গিয়েছিল তাদের প্রদর্শনী দেখত শাঁ দ্য মারের (Champs-de-Mars) সালোঁতে গেলেন। একোল দ্যে বোজার্তে জাপানী ছবির প্রদর্শনী দেখার মতো যথেষ্ট সময় হাতে নেই। ভিনসেন্টের ইচ্ছা নয় পারিতে আর এক মুহূর্তও থাকেন। নিজের আঁকা চারখানি ছবি আর একটি পরিচয়পত্র সঙ্গে নিয়ে হাজির হলেন ওভার-স্যুরোয়াজে। ডাক্তার গাসে নিজে স্টেশন থেকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন প্লাস দ্য লা মেরিতে (Place de la Mairie)। রাভুখ পরিবারের সঙ্গে থাকাই স্থির হল, তাতে খরচা কম। দিনে মোটে সাড়ে তিন ফ্রাঁ।

ওভার শহরটা ছবির মতোই লাগে ভিনসেন্টের, ছবি আঁকতে শুরু করে দিলেন সঙ্গে সঙ্গে। মাঝে মাঝে ডাক্তার গাসের আমন্ত্রণে তাঁর বাড়িতে গিয়েও ছবি এঁকে দেখান। ডাক্তার নিজেও ক্ষোদনের কাজ করতেন এবং নিজের প্রেসে তা ছাপাতেন। ভান রিজলে ছদ্মনামে ছবিতে সই করতেন। তাঁর জন্মস্থান লিইয়ে (Lille) শহরের ফ্লেমিশ ভাষায় নাম এটাই! স্যাঁ-রেমিতে আঁকা ছবিগুলো তেওর বাড়ি এসে পৌঁছল। ওদিকে ভিনসেন্ট একের পর এক ল্যান্ডস্কেপ আর রাভুখের, আর ডাক্তার গাসের মেয়ে মার্গরিটের পোর্ট্রেট এঁকে চলেছেন।

বুসো আর ভালাদঁরা তেওকে খাটিয়ে নিচ্ছে কিন্তু সেরকম ভালো পয়সা দিচ্ছে না। এদের চাকরি ছেড়ে দিয়ে নিজেই ছবির ব্যবসায়ে নামবেন কিনা ভাবছেন তেও। এই সময় ওরিয়ের একদিন পারিতে এলেন ভিনসেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে। তুলুজ-লোত্রেকও হাজির লাঞ্চে। গিলোম্যাঁর আসা অবধি তর সইল না ভিনসেন্টর, তিনি ছুটলেন ওভারের ট্রেন ধরতে। পথে তেও তাঁকে জানিয়ে দিলেন টাকাপয়সার ব্যাপারে আরও কঠোর হওয়ার দরকার। এই সময়ের বিখ্যাত ছবি 'গমখেত', 'উড়ন্ত কাকের ঝাঁক' ইত্যাদি।

> এখানে ফিরে এসে আরও বিষণ্ণ লাগছে নিজেকে। আমার জীবনের মুলেই আক্রমণ হচ্ছে, যেসব পদক্ষেপ আমি নিচ্ছি সেগুলোতে স্থিরতা নেই।

পয়সার অভাব। তেও সপরিবারে হল্যান্ডে গেছেন। সেখান থেকে ফিরেই অবশ্য পঞ্চাশ ফ্রাঁ পাঠিয়ে দিলেন ভাইকে। এই সময় ১৪ই জুলাই—বাস্তিলদিবস—টাউনহলের ছবি আঁকলেন ভিনসেন্ট, পতাকা দিয়ে সাজানো হল, পাবলিক স্কোয়ারে গাছে গাছে লণ্ঠন ঝোলানো। কিন্তু ২৭ জুলাই রাভুখরা খুব চিন্তায় পড়ে গেলেন। ডিনারের সময় পার হয়ে গেল ভিনসেন্ট তবু আসছেন না। সচরাচর তিনি ঠিক সময়েই খেতে আসেন। অথচ ঘরে ফিরতে তাঁকে দেখা গেছে। চিলকোঠায় তাঁর ঘরে গিয়ে দেখা গেল বিছানার ওপর হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে আছেন ভিনসেন্ট, রক্তে ভেসে গেছে বিছানা। গুলি করে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছেন। ডা. গাসে ও ডা. মাজেরি (Mazery) এলেন কিন্তু গুলিটা বার করতে রাজী হলেন না তাঁরা, গুলিটা সরাসরি হৃৎপিণ্ডে গিয়ে ঢুকেছে। তেওকে খবর পাঠাতে হবে, অথচ ভিনসেন্ট তাঁর ঠিকানা বলতে চাইলেন না। রাভুখরা আর গাসের ছেলে সারারাত বিছানার পাশে বসে রইল। হিরশিগও (Hirschig) সেই বাড়িতেই থাকতেন। তিনি পারি রওনা হলেন ২৮ তারিখের প্রথম ট্রেন ধরে। দুপুর বেলা তেও এসে পড়লেন। ভিনসেন্টকে ধূমপান করার অনুমতি দেওয়া হল। ডাচ ভাষায় দু-একটা কথা হল দুই ভাইয়ে। ২৯ জুলাই ১৮৯০ ভোর দেড়টার সময় ভিনসেন্ট ভ্যান গঘের জীবনদীপ নিভে গেল।

‘মৃত্যু মাঝে ঢাকা আছে যে অন্তহীন প্রাণ’

প্রিয় মহাশয় ভ্যানগঘ,

খুবই খারাপ লাগছে যে আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলাতে হচ্ছে, যা হোক আপনাকে অবিলম্বে লেখা আমার কর্তব্য বলে মনে করি, আজ, রবিবার, রাত নটায় আপনার ভাই ভিনসেন্ট আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, আমি যেন তাঁর সঙ্গে তক্ষুনি দেখা করি। গিয়ে দেখি তিনি খুব অসুস্থ। নিজেকে তিনি আহত করেছেন...

আপনার ঠিকানা না থাকতে আমাকে তিনি তা দিতে চান নি এই চিঠি আপনি পাবেন গুপিলের মাধ্যমে।

আপনাকে বলব আপনার স্ত্রী যিনি এখনও বুকের দুধ খাওয়াচ্ছেন তাঁর ব্যাপারে খুব বেশি রকম সাবধান হবেন।

আপনার কর্তব্য বিষয়ে কিছু বলা প্রয়োজন মনে করি না, তবে আমার বিশ্বাস আসা আপনার কর্তব্য, যদি গুরুতর কিছু ঘটে যায়...

আপনার চিরদিনের
গাসে
ওভার-সুরোয়াজ
রবিবার ২৭ জুলাই ৯০

ওভার ২৮ জুলাই ১৮৯০

আমার প্রিয় সোনামণি বউ,

আমাদের পক্ষে এ এক কঠিন সময় প্রিয়া আর বার বার সেইসব ঘটনা ঘটছে যা আমরা চাই না। আজ সকালে একজন ওলন্দাজ শিল্পী তিনিও ওভারে থাকেন ডা. গাসের কাছ থেকে একটা চিঠি নিয়ে এসেছিলেন তাতে ভিনসেন্ট সম্পর্কে খারাপ খবর ছিল আমাকে যেতে অনুরোধ করেছিলেন তিনি। সবকিছু ফেলে রেখে তখনই বেরিয়ে পড়লাম যতটা ভেবেছিলাম তার চেয়ে ভালো দেখলাম তাকে যদিও সে খুবই অসুস্থ। সব কথা এখন খুলে বলব না, খুবই দুঃখের, তবে সোনামণি জেনে রাখো তার জীবন সংকটাপন্ন। কী বলব অথবা কী আশা তার জন্য আমাদের করা উচিত ? আমি এসেছি দেখে সে খুব খুশি আমরা প্রায় সর্বক্ষণ এক সঙ্গেই আছি। রাতটা যদি ভালোভাবে কেটে যায় আমি কাল সকাল-সকাল পারি ফিরে যাব, তা নাহলে এখানে থেকে যেতে হবে আমাকে। বেচারা, খুব বেশি শান্তি সে পায় নি, আর কোনো মরীচিকার আশাও সে করে না। কখনো-সখনো এই তো তার পক্ষে অনেক, এত নিঃসঙ্গ সে মনে করে। সোনামণি বউ আমার, অত বেশি নিরাশ হয়ো না, হবে কি, তুমি জান আমি কীরকম নিরাশাবাদী, সম্ভবত

সে সেরে উঠবে এবং সুসময় দেখবার জন্য বেঁচে থাকবে। তাঁগি এসে পড়াতে আমাকে আটকে পড়তে হল তাই তোমাকে এই চিঠি লিখছি। বলছিলাম কি, গতকাল ড্রায়েস আর অ্যানির সঙ্গে মেডোর অরণ্যে গিয়েছিলাম, কী-যে সুন্দর, তোমার কথা খুব মনে হচ্ছিল আর বাড়ির কথা যে-চিঠিতে তুমি লিখেছিলে তার কথা মনে ছিল। ড্রায়েসকে এ-বিষেয়ে বলাতে ভালো বলল। এ কথা সে লিখেছিল মাথা গরম-মুহূর্তে। আমস্টার্ডামে গেলে মায়ের সঙ্গে এ-বিষয়ে কথা বলার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু তোমার দ্বিতীয় চিঠি পড়ে বুঝলাম এ সেই শেষ শীতের সময়কার কথা যখন বাচ্চা এসেছিল, মা-ও করুণাপরবশ হয়ে আমাকে সাহায্য করার জন্য এসেছিল। সোনামণি, ভিনসেন্টের যদি কিছু একটা হয়ে যায়, তোমার হল্যান্ডে থাকাই শ্রেয় আর শক্ত থেকো। আশ্চর্য, তাই নয় কি, যে গত সারাটা সপ্তাহ এত নার্ভাস আর চঞ্চল ছিলাম আমি, যেন আগে থেকেই টের পেয়েছি কিছু-একটা ঘটবে। সে এত বাধ্যরকম কথা বলছিল আমার সঙ্গে এবং তোমার আর বাচ্চার বিষয়ে খোঁজখবর নিচ্ছিল আর বলল যে জীবনে এ রকম দুঃখের কথা তুমি কখনো. কল্পনাও করনি, আমরা যদি তাকে আবার জীবনের প্রতি বিশ্বাস ফিরিয়ে দিতে পারতাম। আবারও বলছি, এটাকে অত বেশি মনের মধ্যে পাত্তা দিয়ো না তাতে ভালো-কিছু হবে না। যা হয় হবে, মনে রেখো একে আমি বীরের মতো সামলাব কারণ বেঁচে থাকবার জন্য তুমি তো আছ; আমি যেন কখনও একা না হই, কেননা আমার বৌ-ছোটো ছেলে আছে। দুঃখ পেতে পারি তা বলে যেন হতাশ না-হই আমরা। এখন, প্রিয়তমা, রোগীর কাছে যেতে হবে নইলে সে আবার খোঁজ করবে, অতএব বিদায়, প্রিয়া। কল্পনায় তোমাকে বুকে টেনে নিই আর বলি তুমি আমার একমাত্র একমাত্র আরাম। চিন্তা করো না, ঘটনা আগের মতোই নৈরাশ্যজনক আর ডাক্তাররা তার শক্ত জান্ দেখে অবাক হয়ে গেছেন। বিদায় প্রিয়া, খোকাকে চুমু, তোমাকে সহস্র সহস্র আলিঙ্গন জানাই।

তোমার চিরদিনের এবং চিরদিনের প্রিয়

তেও

লীডেন ৩১ জুলাই

কল্যাণীয় তেও,

নিদারুণ খবরটা পেয়ে আমরা সবাই বিপর্যস্ত আছি। জো আমাদের তৈরি করে দিয়েছিল আর আজ সকালে যখন ভিলের চোখে জল দেখলাম, বললাম সে কি মারা গেছে? আদরের তেও, তোকে ধন্যবাদ, তার জন্য তুই যা করেছিস। তোর ভালোবাসা আর উৎকণ্ঠা তার জীবনকে মূল্যবান করেছিল। করুণাময় ঈশ্বর এ সব দেখেছেন। তিনি আদেশ দিয়েছেন খুব কাছ থেকে তাকে তুই দেখ, শান্তিতে শুইয়ে দে তাকে এই তোর পুরস্কার। যে ভালোবাসাকে তুই মূল্যবান মনে করেছিলি এই তার পুরস্কার। এই সব সাংঘাতিক অপ্রত্যাশিত ঘটনার মাঝখানে, ধন্যবাদ যে, সে শান্ত, সু-পরিবেশে ছিল, তোর সঙ্গে কথা বলতেও পেরেছিল এবং তোর চিঠি অনুযায়ী

অকারণ না ভুগে সে সেই দেশে চলে গিয়েছে যেখানে ঝঞ্ঝাট, কষ্ট আর নেই। পনেরো দিন আগে লেখা তার চিঠি তোকে পড়তে দেব, দেখবি কী সে অনুভব করেছিল। সে লিখেছিল যে প্রায়ই সে আমাদের আবার দেখতে চাইত। কী সৌভাগ্য যে তোর অনুগত ভালোবাসা একেবারে শেষ পর্যন্ত তার পাশে ছিল। তেও, আমাদের সকলের স্নেহাশীর্বাদ জানাই, করুণাময় প্রভু তোকে, জো-কে আর আদরের ছোট্ট ভিনসেন্টকে আশীর্বাদ করুন। সে তোর জীবনের আনন্দ হয়ে উঠুক। কৃতজ্ঞ চুমু আর অনেক ধন্যবাদ

তোর আদরের মা

লীডেন ৩১/৭ '৯০

প্রিয় তেও,

গতকাল বিকেলে তোমার চিঠিতে ভিনসেন্টের মৃত্যুর দুঃখজনক খবর পেলাম। বেশ কল্পনা করতে পারি কতখানি আঘাত তুমি পেয়ে থাকবে।

তাঁর সঙ্গে তোমার এমন এক নিবিড় সম্পর্ক ছিল আর সেই সঙ্গে অন্যদের চেয়ে তাঁকে তুমি বেশি করে জানতে। এটা তোমার পক্ষে স্বস্তিকর যে শেষ দিকে তাঁকে ভুগতে হয় নি, আর আমি সত্যি সত্যি আনন্দিত যে ঠিক সময়ে তুমি পৌঁছেছিলে। আমি জানি, তুমি ছিলে তাঁর ভাইয়ের চেয়ে অনেক বেশি, কিন্তু এই কারণেই তোমার ক্ষতি দ্বিগুণ হয়ে বাজবে।

তোমার ক্ষতিতে আমার আন্তরিক সমবেদনা জেনো আর যত্নভরা জীবনের পর এখন তিনি শান্তিতে থাকবেন এই জেনে তুমি স্বস্তি বোধ করো।

গতকাল সন্ধ্যায় মা আর মিয়েনকে বললাম যে তুমি আবারও ওভার থেকে দুঃসংবাদ পেয়েছ, আর আজ সকালে তাঁকে পুরো ঘটনাটা বললাম। তাঁরা যে খুবই ভেঙে পড়েছেন সে-কথা বলাই বাহুল্য; এটা তবুও অনভিপ্রেত ছিল, তাঁর ভাবনার সঙ্গে পরিচিতদের কাছেও ছিল অপ্রত্যাশিত, মোটের ওপর, ভিনসেন্ট ও ধরনের আক্রমণ কাটিয়ে উঠতেন, তাঁর শক্তসমর্থ শারীরিক গঠনকে ধন্যবাদ।

মাকে শান্ত নিশ্চিন্ত করে এসেছি, বুঝিয়েছি যে অবশেষে তিনি শান্তি খুঁজে পেয়েছেন।

নিঃসন্দেহে এ তোমার জীবনে এক সাংঘাতিক শূন্যতার সৃষ্টি করবে, তোমার স্ত্রী-পুত্র, সুখের কথা, তা ভরে তুলতে চেষ্টা করবে। আমস্টার্ডাম থেকে তোমার দেওয়া খবর পেয়ে সুখী হয়েছি যে ছেলেটা বড়ো হচ্ছে আর জো-রও ওজন বাড়ছে।

তোমাকে লিখছি তাড়াহুড়োতে, ছোটো করার জন্য ক্ষমা করো।

বিদায়, বিশ্বাস করো

তোমার চিরদিনের জোয়ান

বৃহস্পতিবার সকাল
(৩১ জুলাই ১৮৯০)

প্রিয় বন্ধু

তোমার হতভাগ্য ভাইয়ের মৃত্যুসংবাদ-এর চিঠি এত দেরীতে পেলাম যে তখন আর শোকযাত্রায় যাওয়া যায় না। তুমি তো জান তিনি আমার কেমন বন্ধু ছিলেন আর তাঁর স্নেহ দেখাতে কতটা আগ্রহী তিনি ছিলেন।—ইচ্ছে করে না, কফিনের সামনে তোমার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে শুধু এই কথাগুলোই বলতে পারি। সেই কাজটাই করছি এই চিঠিতে. বিশ্বাস করো।

এইচ টি লত্রেক

শ্রীমতী ভ্যান গঘকে আমার কথা বলো।

প্রিয় তেও,

আমি বিশ্বাসই করতে পারি না ভাবতেও পারি না যে তিনি আর নেই। তাঁর শান্তিতে আমাদের ব্যাঘাত ঘটানো উচিত নয়, কিন্তু তোমার পক্ষে যে কী কঠিন হবে এ। আশ্চর্য যে তুমি তাঁর সঙ্গে ছিলে, এ তোমার প্রাপ্য! আর তিনি যে শান্তিতে চলে গেছেন সম্ভবত এ হল সবচেয়ে বড়ো আশীর্বাদ। কী আশ্চর্য সমপাতন, যেভাবে ঘটনাগুলো ঘটে, এ রকমই তাঁর ইচ্ছে ছিল আর তিনি বাঁচতে চেয়েছিলেন সাধারণ মানুষের মতো, তোমার এতো কাছে তিনি ছিলেন। নিশ্চয় এর চেয়ে বেশি সুখী ছিলেন তিনি যেমন তিনি বলেছেন, মনে পড়ছে, তাঁর শেষ চিঠিতে। জো যে তাঁকে দেখতে যেতে পেরেছিলেন সে কারণে নিশ্চয় তুমি খুশি। জো হয়তো ভেবেছিলেন এই তাঁর শেষ দেখা, ছোট্ট ভিনসেন্টকেও তিনি দেখতে পেয়েছিলেন। বেচারা, এখন বৌ তোমার কাছে নেই, তাড়াতাড়ি চলে এসো হল্যান্ডে, তোমাকে এতো আশা করছি, পরের সপ্তাহে আসতে পার না? ভালো থেকো আর নিজের যত্ন নিয়ো, স্নেহাশিস।

তোমার ভিল

(৩১ জুলাই ১৮৯০) ডা. গাসেকে আমাদের হয়ে ধন্যবাদ দিয়ো।

প্রিয় মহাশয়,

আমাকে পাঠিয়ে দেওয়া শোকসংবাদ পড়ে জানতে পারলাম কী সাংঘাতিক আর সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত বিপর্যয়ের আঘাত আপনি পেয়েছেন। আপনাকে বলতে চাই আপনার দুঃখে আমিও কতখানি মর্মাহত।

আপনাকে বলতে ইচ্ছে করে না—আপনি তো জানেনই—আজ যাঁর জন্য আপনি শোক করছেন তাঁর শিল্পীসুলভ গুণকে আমি কত শ্রদ্ধা করি। আমি শুধু একটা কথাই বলব: তাঁর

মতো মানুষেরা কখনো পুরোপরি মারা যান না। তিনি পেছনে ফেলে গেছেন কাজ যা তাঁর সত্তারই অংশ আর যা একদিন আপনি এবং আমি সুনিশ্চিত, তাঁর নামকে আবার চিরকালের জন্য বাঁচিয়ে তুলবে। সন্দেহ নেই আপনার কাছে এ সামান্য সান্ত্বনা বলে মনে হবে কারণ তাঁকে আপনি ভাইয়ের মতো ভালোবাসতেন, কিন্তু এটা তো সান্ত্বনাই এবং বহু মানুষকেই যার মুখোমুখি হতে হয়েছে অপূরণীয় মৃত্যুর যা নেই।

অনুগ্রহ করে, প্রিয় মহাশয়, আমার আন্তরিক সমবেদনা গ্রহণ করবেন।

জি. আলবেয়ার ওরিয়ের

১ অগাস্ট ১৮৯০

পোর্টসালিও ৪ অগাস্ট ৯০

প্রিয় মহাশয় ভ্যান গঘ,

আপনার ভাই মহাশয় ভিনসেন্টের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে এতো কষ্ট লাগছিল; একজন মহান শিল্পীর মৃত্যু হল।

আপনার বিপুল বেদনার সময় সমবেদনা জানাই।

আপনার চিরকালের
ইউজিন বক

কুরোর্ট স্টুজ, সুইজারল্যান্ড
১৪ অগাস্ট ১৮৯০

প্রিয় মহাশয়,

লন্ডনের মি. ভেলটেন-এর কাছ থেকে এইমাত্র খবর পেলাম প্রিয় সহোদর ভিনসেন্ট-এর মৃত্যুতে কী নিদারুণ ক্ষতি হয়ে গেল আপনার। এই বিপর্যয়ের ক্ষণে আপনাকে আমার আন্তরিক সমবেদনা জানাই। ভবদীয়

সি. ওবাক

১৫ অগাস্ট ৯০

প্রিয় মহাশয় ভ্যান গঘ,

ক্ষমা করবেন। আপনাকে আঘাত হানা সেই ঘটে যাওয়া ট্র্যাজেডির পর প্রতিদিনই ভাবি সান্ত্বনার কথা লিখব আপনাকে, কিন্তু আছি মহা কর্মসংকটের মাঝখানে, সকাল পাঁচটায় বেরিয়ে যাই, খাওয়ার জন্য কেবল ফিরে আসি, আর এমন কাজে ডুবে আছি যে সবকিছু ভুলে যাই।

অনুগ্রহ করে ক্ষমা করবেন আমাকে, আপনার যে-সাংঘাতিক ক্ষতি হয়ে গেল তা যে আমাকেও গভীরভাবে আলোড়িত করেছে, বিশ্বাস করুন। আপনার ভাইয়ের সম্পর্কে আমার কথা তো আপনাকে বলেছিই, আপনার পক্ষে এ হল দুনো ট্র্যাজেডি।

সশ্রদ্ধায়

ক্লদ মোনে

প্রিয় ভ্যান গঘ

খুব আক্ষেপ রয়ে গেল যে আপনার ভাইয়ের শেষ বিশ্রামের জায়গায় যেতে পারলাম না, যে সময় বের হব সেই সময় চিঠি নিয়ে দেখা করতে এলেন একজন, ফলে বাড়িতে থাকতেই হল।

গতকাল পারি গিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম নিজে গিয়ে বলতে পারব আপনাকে যে আপনার এই নিদারুণ মনোব্যথা কেমন বেজেছে আমাকে, আপনার স্ত্রীও নিশ্চয় ভীষণ আঘাত পেয়েছেন, কিন্তু এক মুহূর্ত সময় পেলাম না। আশা করি আজ আপনি এই শোকসান্ত্বনার পত্র পেয়ে যাবেন।

অনুগ্রহ করে আমার সমবেদনা গ্রহণ করবেন, আশা করি অচিরেই দেখা হবে, সবল থাকুন।

ভিক্টর ভিন

প্রিয় ওরিয়ের

পারিতে তুমি নেই তার মানে সেই বেদনাদায়ক খবরটা পাওনি আর একদিনও দেরী না করে যা আমি তোমাকে জানাতে চাই: আমাদের প্রিয় বন্ধু ভিনসেন্ট চার দিন আগে মারা গেছেন।

আমার সন্দেহ তুমি ইতিমধ্যে অনুমান করতে পেরেছ যে তিনি আত্মহত্যা করেছেন। রবিবার সন্ধেবেলা ওভারের কাছে গ্রামের দিকে গিয়েছিলেন তিনি, খড়ের গাদায় ইজেলকে ঠেস দিয়ে দাঁড় করিয়ে দুর্গের পেছনে গিয়ে নিজেকে লক্ষ্য করে রিভলবার ছোঁড়েন। আঘাতের ভয়াবহতা (বুলেট তাঁর হৃদ্‌পিণ্ডের নীচে বিঁধেছিল) তাঁকে ফেলে দিয়েছিল, তিনি উঠে দাঁড়ান এবং তিনবার পড়ে যান, সরাইখানায় যেখানে তাঁর জিনিসপত্র রেখেছিলেন (রাভো, প্লাস দ্য লা মেইরি) সেখানে ফিরে যাওয়ার আগে নিজের আঘাতের বিষয়ে কাউকে কিছু বলেন নি। শেষ পর্যন্ত সোমবার সন্ধ্যায় তিনি মারা যান পাইপে ধূমপান করতে করতে আত্মহত্যা যে ইচ্ছে করে করেছেন সে ব্যাপারে কৈফিয়ত দিতে চান নি আর তা তিনি ঠাণ্ডা মাথায় করেছেন। এক বিচিত্র বিবরণের কথা বলা হয়েছে আমাকে যে ডা. গাসে যখন তাঁকে বললেন যে তাঁর প্রাণ বাঁচানোর আশা তখনও আছে, তিনি বলেছিলেন, 'আমাকে তাহলে আবার ওটা করতে হবে।' হায়, তাঁকে বাঁচানো আর সম্ভব ছিল না...

বুধবার ৩০ জুলাই তার মানে গতকাল, দশটা নাগাদ আমি ওভারে পৌঁছই। সেখানে তাঁর ভাই থেওডোর ভ্যান গঘের সঙ্গে ডা. গাসে ছিলেন। তাঁগিও (তিনি ছিলেন নটা থেকে)। আমার সঙ্গে চার্লস লাভাল যায়। ইতিমধ্যে কফিন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে আমি এত দেরীতে

পৌঁছেছিলাম যে মানুষটাকে আর একবার দেখতে পেলাম না চার বছর আগে মানুষটা আমাকে ছেড়ে চলে এসেছিলেন সব রকম প্রত্যাশায় এতো পূর্ণ ছিলেন তিনি... সরাইখানার মালিক দুর্ঘটনার সমস্ত বিবরণ আমাদের দিয়েছেন, পুলিসের আক্রমণাত্মক আগমন তারা তাঁর বিছানার কাছে চলে গিয়ে ভর্ৎসনা পর্যন্ত করে যে এই কাজের জন্য একমাত্র তিনিই দায়ী... ইত্যাদি।

যে ঘরে তাঁকে রাখা হয়েছিল তার দেয়ালে টাঙানো হয়েছিল তাঁর শেষ ক্যানভাসগুলো এতে করে তাঁর জন্য যেন এক দিব্যবিভার সৃষ্টি হয়েছিল আর সেই প্রতিভা থেকে যে ঔজ্জ্বল্য বিচ্ছুরিত হয়েছিল তা এই মৃত্যুকে আরও বেদনাদায়ক করে তুলেছিল আমরা যে-শিল্পীরা সেখানে ছিলাম তাদের কাছে। সাদাসিধে সাদা কাপড় আর যা তিনি এতো ভালোবাসতেন সেই সূর্যমুখী ফুল দিয়ে তাঁর কফিন ঢেকে দেওয়া হয়েছিল, সর্বত্র হলুদ ডালিয়া, হলুদ ফুল। তোমার মনে আছে, হলুদ তাঁর প্রিয় রঙ, মানুষের হৃদয়ে আর সমস্ত শিল্পসৃষ্টিতে যে-আলো থাকে বলে তিনি স্বপ্ন দেখতেন তার প্রতীক।

মেঝেতে তাঁর কফিনের সামনে ছিল তাঁর ইজেল, ফোল্ডিং স্টুল আর ব্রাশ। অনেকে এসেছিলেন, বেশির ভাগই শিল্পী, যাঁদের চিনতে পারলাম তার ভেতরে লুসিয়েন পিসারো আর লজে অন্যদের চিনতে পারলাম না, স্থানীয় কিছু মানুষ ছিল যারা তাঁকে সামান্য জানত, এক-দুবার দেখেছে আর যারা তাঁকে ভালোবাসত এতখানি উদার হৃদয় মানবিক ছিলেন তিনি...

এই কফিন ঘিরে আমরা সবাই রয়েছি, নির্বাক, কফিনে রয়েছেন আমাদের বন্ধু। তাঁর স্টাডিগুলোর দিকে তাকালাম; একটা দ্যলাক্রোয়ার La vierge et Jésus অবলম্বনে খুব সুন্দর আর দুঃখের। জেলখানার উঁচু পাঁচিল বন্দীরা গোল হয়ে হাঁটছে, ডোরের সাংঘাতিক ভয় জাগানো কাজের অনুপ্রেরণায় করা, এ তাঁর অন্তিমের প্রতীকও। জীবন কি তাঁর এমন ছিল না, এইরকম জেলখানা পাঁচিল দেওয়া— কী উঁচু... আর এই লোকগুলো এই গর্তে অন্তহীন হেঁটে চলেছে গোল হয়ে, তারা কি দরিদ্র শিল্পীরা নয়, হতভাগ্য তিরস্কৃত হৃদয়রা যারা নিয়তির চাবুকের নীচে হাঁটছে ?...

বেলা তিনটের সময় তাঁর দেহ সরানো হল, বন্ধুরা তাঁকে নিয়ে গেল শববাহী গাড়ির কাছে, অনেকেরই চোখে জল। থেওডোর ভ্যান গঘ ভাইয়ের জন্য নিজেকে যিনি উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন, তাঁর শিল্প-সংগ্রামে সবসময়ে সমর্থন করেছেন, সারাক্ষণ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে করুণভাবে কাঁদছিলেন...

বাইরে সাংঘাতিক ঝাঁঝালো রোদ। ওভারের বাইরে আমরা পাহাড়ে উঠলাম তাঁর কথা বলতে বলতে, শিল্পে তিনি কী বেপরোয়া জীবন দিয়ে গেছেন, যে-সব মহান পরিকল্পনার কথা তিনি ভাবতেন, আর আমাদের সকলের মঙ্গলের জন্য তিনি কী করেছেন।

আমরা কবরখানায় পৌঁছলাম, ছোট্ট নতুন কবরখানা নতুন স্মৃতিফলক। মাঠের ওপর ছোট্ট পাহাড়ের মাথায়, বিস্তৃত নীল আকাশের নীচে সেই ফসল পাকার অপেক্ষায় রয়েছে, যে আকাশ তিনি তখনও ভালোবাসতেন...সম্ভবত। তারপর তাঁকে কবরে শুইয়ে দেওয়া হল...

সে মুহূর্তে যে-ই থাকুক না কেন, কাঁদতে শুরু করে দিত... দিনটা ছিল বিশেষ করে তারই জন্য যাকে কল্পনা করতে হবে না যে তিনি বেঁচে আছেন আর এ উপভোগ করছেন...

ডক্টর গাসে (তিনি একজন মস্ত শিল্পপ্রেমী এবং বর্তমানকালের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ

ইম্প্রেশনিস্ট ছবির সংগ্রাহক) ভিনসেন্ট এবং তাঁর জীবন সম্পর্কে শ্রদ্ধা জানিয়ে কিছু কথা বলতে চাইলেন, কিন্তু তিনিও এমন ফোঁপাচ্ছিলেন যে তোৎলাতে তোৎলাতে খুব একটা ধাঁধা-লাগানো বিদায় জানানো ছাড়া কিছু করতে পারলেন না... (বোধহয় এটা করাই ছিল সবচেয়ে সুন্দর উপায়)

ভিনসেন্টের সংগ্রাম এবং তাঁর কৃতিত্বের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তিনি দিলেন, বললেন যে কী সরল ছিল তাঁর লক্ষ্য এবং তাঁর প্রতি কী গভীর শ্রদ্ধা ছিল তাঁর (যদিও মাত্র অল্পদিনই তাঁকে জেনেছিলেন তিনি)। গাসে বললেন, তিনি ছিলেন একজন সৎমানুষ, মহান শিল্পী, তাঁর ছিল মাত্র দুটি লক্ষ্য, মানবিকতা আর শিল্প। সব কিছুর উপরে তিনি মূল্য দিতেন শিল্পকে এবং শিল্পই তাঁর নাম বাঁচিয়ে রাখবে।

তারপর আমরা ফিরে এলাম। বিষাদে ভেঙে পড়েছিলেন থেওডোর ভ্যান গঘ; সঙ্গে যাঁরা গিয়েছিলেন সবাই খুব বিচলিত হয়েছিলেন, কেউ কেউ ওপন কান্ট্রিতে ফিরে গেলেন, কেউ স্টেশনে।

লাভাল আর আমি রাভোর বাড়িতে ফিরে এলাম, তাঁর বিষয়ে কথাবার্তা বললাম...

প্রিয় ওরিয়ের, সেই তো যথেষ্ট, যথেষ্ট, তোমার কি তা-ই মনে হয় না, আজকের এই বেদনার দিনে। তুমি জান তাঁকে আমি কতখানি ভালোবাসতাম আর তুমি কল্পনা করে নিতে পার কতটা কেঁদেছিলাম আমি। তুমি তাঁর সমালোচক, তাই ভুলে যেয়ো না তাঁকে বরং চেষ্টা করো আর দু-এক কথা লিখে সকলকে জানাও যে তাঁর শোকমিছিল ছিল মুকুটিত উপসংহার যা তাঁর মহৎ হৃদয় এবং মহৎ প্রতিভার প্রকৃত মূল্য।

আন্তরিক শুভেচ্ছাসহ
বার্নার্দ

প্রিয় ভ্যান গঘ

আমরা এইমাত্র তোমার দুঃখের খবর পেয়ে গভীরভাবে বিচলিত আছি।

এ অবস্থায়, গৎ-বাঁধা সান্ত্বনার কথা লিখতে চাই না তোমাকে—তুমি তো জান সে ছিল আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু; আর সে ছিল আমাদের কালের এক দুর্লভ শিল্পী। তার কাজগুলো তুমি নিরবচ্ছিন্ন দেখতে পাবে। ভিনসেন্ট প্রায়ই বলত—পাথর ক্ষয়ে যাবে, কথা রয়ে যাবে।

তার কাজের মধ্যে তাকে দেখব নয়ন আর হৃদয় দিয়ে, এই তো জানি।

সান্তরিক, তোমার চিরকালের
পি গোগ্যাঁ

এরাগনি গিসোরের কাছে

প্রিয় ভ্যান গঘ।

আজ সকালে আমরা তোমার হতভাগ্য ভাইয়ের মর্মান্তিক মৃত্যুসংবাদ পেলাম; আমার পুত্র লুসিয়েনের হাতে ট্রেন ধরার জন্য অল্প কয়েক মিনিট ছিল, যাতে শোকমিছিলে সে যোগ দিতে

পারে। আমারও যাওয়ার প্রবল ইচ্ছে ছিল, কিন্তু সময়ে পৌঁছতে পারতাম না। এর জন্য পরিতাপ রয়ে গেল। তোমার ভাইয়ের ছিল সত্যিকার শিল্পী হৃদয়, তাঁর প্রতি আমার গভীর অনুরাগের কথা স্মরণ করি, পরবর্তী প্রজন্ম তাঁর অভাব গভীর ভাবে উপলব্ধি করবে।

প্রিয় বন্ধু, তোমার জন্য আমার সত্যি দুঃখ হয়, আমার আন্তরিক সমবেদনা জেনো

তোমার একান্ত
সি. পিসারো

জর্জ ল্যেকঁৎ

এইমাত্র প্যারিসে ফিরেছি আপনার শোকসংবাদ পড়ে জানতে পারলাম কী ভয়াবহ আঘাত আপনি পেয়েছেন, এবং আপনাকে জানাতে চাই আপনার প্রচণ্ড দুঃখ আমাকে কীরকম ব্যথিত করেছে। একজন খুব সাহসী শিল্পীকে আমরা হারিয়েছি।

২০, বুলেভার দ্য ক্লিশি

বেল-ইল
মরবিহাঁ

প্রিয় মহাশয়,

আপনার ভাইয়ের মৃত্যুতে নিদারুণ শোকাহত। তিনি ছিলেন আমার এক পরম বন্ধু। পুরোপুরি সেরে ওঠার পর তাঁর সঙ্গে দেখা করার কথা ভাবছিলাম; এই কিছুদিন আগে আশাপূর্ণ ভবিষ্যতের কথা জানিয়ে আমাকে এক চমৎকার চিঠি লিখেছিলেন তিনি। বন্ধুকে কখনো ভুলে না যাওয়ার দুর্লভ গুণ ছিল তাঁর। তাঁর কাজের প্রদর্শনী দেখব বলে কত আশা করি। মিডিতে থাকার সময় নিজের কাজের বিষয়ে আমাকে কদাচিৎ লিখতেন তিনি। আপনার ভাইয়ের কাজ ছিল একেবারেই মৌলিক। দুঃখের বিষয় যে-সময় নিজের শক্তি সম্পর্কে তিনি উপলব্ধি করছিলেন সেই সময় তাঁকে চলে যেতে হল।

গভীর সমবেদনা সহ

আপনার বিশ্বস্ত
জন পি রাসেল

অনুবাদ : অনির্বাণ রায়

স্মৃতির ক্যানভাস

রেভারেণ্ড জে ক্রিশপীলস

ডাচ ব্যাকরণ ক্লাসে এইরকম প্রশ্ন করতেন পণ্ডিতমশাই, "ভ্যান গঘ, এটা কর্তৃকারক না কর্মকারক?" ভ্যান গঘ উত্তর দিত, "মাস্টারমশাই, ও-সব নিয়ে আমার মাথা ব্যথা নেই।"

তার ভেতরে আর-একটা গুণ সুপ্ত ছিল: ছবি আঁকার শিল্প। যে-জিনিসটা সে পছন্দ করত তা হল বাইবেল বা অন্য বই থেকে অদ্ভুত জিনিস খুঁজে বার করা। অন্য ছাত্রদের সঙ্গে সে গ্রীক পড়তে চেয়েছিল কিন্তু তাকে পড়তে দেওয়া হয় নি যেহেতু অন্যান্য বিষয় শিখতে সে অস্বীকার করেছিল। আত্ম-নির্যাতন স্বরূপ লেখার সময় সে কখনো টেবিল ব্যবহার করত না, হাঁটুর ওপর খাতা রেখে লিখত।...

একবার সে ভয়ানক রেগে গিয়েছিল। ফরাসী পাঠে falaise বা চূড়া শব্দটা পাওয়া গিয়েছিল। মাস্টারমশাই শব্দটা আমাদের ব্যাখ্যা করে দিলেন। ভ্যান গঘ বলল, "স্যার, আমাকে একটা চূড়ো আঁকতে দেবেন ব্ল্যাকবোর্ডে?" মাস্টারমশাই অবশ্য এটা অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করলেন।

ক্লাস শেষে মাস্টারমশাই চলে গেলেন। ভ্যান গঘ অমনি ব্ল্যাকবোর্ডে গিয়ে একটা চূড়া আঁকতে শুরু করে দিল। এক ক্ষুদে পড়ুয়া মজা করবার জন্য পেছন থেকে ভ্যান গঘের জ্যাকেট ধরে টেনেছিল। ভ্যান গঘ ঘুরে তার মুখের দিকে এমনভাবে তাকাল, আর তাকে এমন ঘুঁষি মারল যে সে আর ফিরে এল না।

ওঃ! অপমানে রাগে তার সেই জ্বলন্ত মুখ!

ড. এম. বি. মেন্দেস দা কোস্টা

সম্ভবত ১৮৭৭ সাল বা তার কাছাকাছি সময় হবে। রেভারেন্ড মি. জে. পি. স্ট্রিকার, আমস্টার্ডামে তাঁকে ধর্মযাজক হিসেবে সকলেই শ্রদ্ধা করে, আমাকে জিজ্ঞেস করলেন আমি তাঁর আত্মীয় ভিনসেন্টকে, এট্টেন এবং ডি হোয়েভেনের যাজক মি. টি. ভ্যান গঘের পুত্রকে, ম্যাট্রিকুলেশনের জন্য লাতিন আর গ্রীক শেখাতে রাজি কি না। আমাকে সতর্ক করে দেওয়া হল যে সে কোনো সাধারণ বালক নয়, তার ধরনধারণ যে সাধারণ মানুষের আচার-আচরণ থেকে বেশ অন্যরকম, সেটাও জানানো হল। তা সে যাইহোক, আমি এতে দমলাম না। মি. স্ট্রিকার ভিনসেন্ট এবং তার পরিবারের লোকজন সম্পর্কেও বলেছিলেন। তাতে স্নেহ মিশ্রিত ছিল।

শিক্ষক এবং ছাত্র হিসেবে আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ খুব সুখকর হয়েছিল। কম-কথার যুবক আমারই মতো—আমাদের বয়েসের তফাৎ সামান্যই, আমার ছাব্বিশ, সে-ও নিশ্চয় কুড়ির ওপর হবে—অচিরেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করল। তার লম্বা লাল চুল, ভাঙা ভাঙা মুখ, দেখতে মোটেই আকর্ষণীয় নয়।... অবিলম্বে আমি তার আস্থা আর বন্ধুত্ব জয় করলাম, এক্ষেত্রে এটার খুবই প্রয়োজন ছিল। তারও খুব আগ্রহ পড়ালেখায়, শুরুতেই বেশ খানিকটা এগিয়ে গেলাম আমরা। একজন লাতিন লেখকের লেখা অনুবাদ করতে দিলাম তাকে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, যে-কিনা

পড়ালেখায় এতখানি নিবেদিত, তখনই লাতিনের স্বল্প জ্ঞান সম্বল করে মূলে পড়তে শুরু করে দিল টমাস আ কেম্পিস।

এ পর্যন্ত সব কিছু বেশ ঠিকঠাক চলছিল, এমন কি অঙ্কও। ইতিমধ্যে আর একজন মাস্টারের কাছে সে অঙ্ক শুরু করেছিল; কিন্তু কিছুকাল পরে গ্রীক ক্রিয়াপদগুলো সে আর সামলাতে পারল না। যাইহোক আমি তার পড়া প্রাণবন্ত করার জন্য যে-কৌশলই করি না কেন, কিছুই কোনো কাজে আসে না। সে বলত, "মেন্দেস"—আমরা কেউ কাউকে 'মিস্টার' আর বলতাম না— "মেন্দেস, তুমি কি সত্যি বিশ্বাস কর যে এই সব ভয়াবহ ব্যাপার একজন মানুষ যে আমি যা করতে চাই তা-ই করে তার পক্ষে অপরিহার্য; গরিব মানুষগুলোকে শান্তি দেবে, এই দুনিয়ায় তাদের বেঁচে থাকাকে মানিয়ে নেবে।"

স্বভাবতই আমি তার শিক্ষক হিসেবে একমত হতে পারতাম না তবে কিনা আমার অন্তরের অন্তরে বিশ্বাস করতাম যে সে—মনে রাখবেন, আমি বলছি সে, ভিনসেন্ট ভ্যান গঘ!—ছিল খুব ঠিক, আমি আমার সবচেয়ে ভয়ঙ্কর যুক্তিটা খাড়া করতাম; তা সে কোনো কাজেই লাগত না।

"জন বুনিয়ানের *পিলগ্রিমস প্রগ্রেসটাই* আমার সবচেয়ে বেশি দরকার, আর টমাস আ কেম্পিস আর *বাইবেলের* একটা অনুবাদ। আর আমার কিচ্ছু চাই না।" সত্যি সত্যি আমি জানি না এ কথা আমাকে সে কতবার বলেছিল, আমিও রেভারেন্ড স্ট্রিকারের কাছে বিষয়টা আলোচনার জন্য কতবার গিয়েছিলাম জানি না। এর পর এটাই ঠিক হয়েছিল যে ভিনসেন্টকে অন্য কোনোভাবে বার বার চেষ্টা করতে হবে।

নতুন করে আবার কোনো সমস্যা দেখা দিলে সে আবার আমার কাছে এসে কী বলবে তা ভালো করেই জানা ছিল, "মেন্দেস, কাল রাত্তিরে আবার লাঠি ব্যবহার করেছি," অথবা, "মেন্দেস, কাল রাতে নিজেকে আবার বন্ধ করেছিলাম।" মনে রাখা ভালো, সে যখন ভাবত কোনো কর্তব্য ঠিকমত পালন করা হয়নি তখন এইভাবে নিজেকে শাস্তি দিত। সে সময় সে তার কাকার বাড়িতে থাকত। কাকা ছিলেন নৌবাহিনীর আমস্টার্ডাম বেসের ডিরেক্টর ও কম্যান্ডার। বন্দর এলাকায় তাঁর মস্ত বড়ো বাড়ি। তা, ভিনসেন্ট যখন ভাবত যে সে উল্টোপাল্টা ভেবেছে যা তার মোটেই উচিত হয়নি, তখন রাত্তিরে বিছানায় যাবার সময় একটা ছোটো লাঠি সঙ্গে নিত আর তাই দিয়ে নিজেকে খুব পেটাত। যখন সে উপলব্ধি করত বিছানায় শোওয়া মোটেই তার ঠিক হয়নি, তখন কাউকে কিছু না বলে রাত্তিরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেত। ফিরে এসে দেখত দরজায় ডবল তালা পড়ে গেছে। বাধ্য হয়ে এক কাঠের ছাউনির মেঝেতে না-বিছানা না-চাদর শুয়ে থাকত। এই কাজটা সে বেশির ভাগ শীতকালে করত যাতে তার শাস্তির মাত্রাটা বেশ জোরদার হয়।

সে ভালো করেই জানত এ সব আমি অপছন্দ করি সেইজন্য আমাকে যথাসাধ্য খুশি করাব জন্য সে তার স্বীকারোক্তির আগে বা পরের দিন, খুব সক্কালবেলা, চলে যেত উস্টারবিগ্রাফপ্লাটস (পূর্ব সমাধিস্থল), সেটা ছিল তার হাঁটবার প্রিয় জায়গা, আমার জন্য স্নোড্রপ গাছ নিয়ে আসত বিশেষ করে বরফের নীচ থেকে। আমি তখন জোনাস ডানিয়েল মায়ার স্কোয়ারে থাকি: চার তলায় আমার পড়ার ঘর। মানসনয়নে এখনো দেখতে পাই স্কোয়ার পেরিয়ে সে আসছে নিউ হেরেনগ্রাকট্ সেতুর দিক থেকে, অতিরিক্ত শাস্তিস্বরূপ গায়ে কোনো ওভারকোট নেই, ডান বগলে

বইপত্তর ধরে আছে, বাঁ হাতে স্নোড্রপের গুচ্ছ বুকের কাছে চেপে ধরা, মাথা ডাইনে ঈষৎ হেলানো, মুখে অবর্ণনীয় দুঃখ-হতাশার ছাপ। ওপরে উঠে এসে সেই বিষদ মাখা গভীর গলায় বলবে, "মেন্দেস, আমাকে পাগল ভেবো না; তোমার জন্য এই স্নোড্রপের তোড়া নিয়ে এসেছি তুমি আমার ওপর এতটা সদয়।"

এই অবস্থায় শুধু আমি কেন, কারো পক্ষেই তার ওপর রাগ করা অসম্ভব।

হতভাগ্যদের সাহায্য করব—সেই সময় এই ভাবনাতেই সে আবিষ্ট ছিল। আমার বাড়িতেই লক্ষ করেছি, আমার মূক-বধির অনুজের প্রতি তার কীরকম আগ্রহ। আমাদের এক দরিদ্র খুড়িমাকে বাড়িতে এনে রেখেছিলাম। একটু বিকৃতমস্তিষ্ক সেই মহিলা, ঠাট্টা-রসিকতা করলে বুঝতে সময় লাগত, কথা বলতে কষ্ট হত বলে লোকেরা তাঁকে ভ্যাঙাত, তাঁর সঙ্গে ভিনসেন্ট কেমন সসম্ভ্রমে কথা বলত। খুড়িমার কাজ ছিল 'ঘন্টা বাজল কিনা' সেদিকে খেয়াল রাখা। এইভাবে তিনি সাহায্য করতে চাইতেন। ভিনসেন্ট আসছে দেখলেই খুড়িমা যতটা সম্ভব পারতেন ছোটো ছোটো বয়স্ক পা নিয়ে সদর দরজায় দৌড়তেন তাকে এই কথাটা বলার জন্য, 'সুপ্রভাত মি. ভ্যান গোর্ট।'

ভিনসেন্ট বলত, "মেন্দেস, তোমাদের খুড়িমা আমার নাম যতই ছাঁটকাট করুন-না কেন, তাঁর অন্তঃকরণ ভালো, আমি তাঁকে খুব পছন্দ করি।"

সে সময় আমার খুব একটা কাজ ছিল না। পড়াশুনোর শেষে অনেকটা সময় সে থেকে যেত গল্প করার জন্য। স্বভাবতই আমরা তার আগেকার জীবিকা নিয়ে আলোচনা করতাম, সেই ছবি বিক্রির ব্যাপারটা। সে-সময় সংগৃহীত অনেকগুলো ছবির প্রিন্ট সে সযত্নে রক্ষা করেছিল, ছোটো লিথোগ্রাফ পেন্টিং ইত্যাদি। কয়েকবারই সে-সব এনে আমাকে সে দেখিয়েছিল, তবে সবই পুরো নষ্ট হয়ে গেছে: ছবির সাদা ধারগুলো টমাস আ কেম্পিস আর বাইবেল থেকে নেওয়া উদ্ধৃতিতে ভর্তি, বিষয়ের সঙ্গে কম-বেশি সম্পর্কিত। একবার সে আমাকে *দ্য ইমিটেশন ক্রিস্টি* উপহার দিয়েছিল ধর্মান্তরিত করার জন্য নয়, বইটার গভীর মানবিকতার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে।

সে-সময় কোনোভাবে কেউই বুঝতে পারেনি, সে নিজেও নয়— যে তার ভেতরে সুপ্ত ছিল ভবিষ্যৎ রঙের স্বপ্ন।

ভিক্টর হাজেমান

আমি তখন ড্রয়িং ক্লাসের ছাত্র। পাঠক্রম শেষ হতে আর কয়েক সপ্তাহ বাকি। বেশ মনে পড়ে সেই জলহাওয়ালাঞ্ছিত নার্ভাস অশান্ত মানুষটা আন্তোয়ার্পের অ্যাকাডেমিকে তছনছ করে দিলেন বোমার মতো, তার পরিচালক ড্রয়িংমাস্টার, ছাত্রদের নাজেহাল করে ছাড়লেন।

ভ্যান গঘের বয়স তখন একত্রিশ। প্রথমে তিনি গেলেন পেন্টিং ক্লাসে। অ্যাকাডেমির পরিচালক ভেরলাট। একেবারে পাকা অফিসিয়াল শিল্পী বোঝাতে যা বোঝায় তিনি তাই। পেন্টিং দেখান। তাঁর কাজ ছিল পেন্টিঙের কলাকৌশল ব্যাখ্যামূলক উপলব্ধির মাধ্যমে উত্তরপুরুষদের কাছে তুলে ধরা। এক সকালে ভ্যান গঘ ক্লাসে এলেন। ষাট-ছাত্রের ক্লাস। তার মধ্যে এক ডজনের

বেশি হবে জার্মান বা ইংরেজ। ভ্যান গঘ পড়েছিলেন নীল রঙের একটা জামা, সাধারণত ফ্লেমিশ গবাদি পশু-ব্যবসায়ীরা যেমন পরে, মাথায় ফারের টুপি। প্যালেটের বদলে তিনি ব্যবহার করতেন প্যাকিং বাকসো থেকে ছিঁড়ে-নেওয়া বোর্ড, তাতে তখনো চিনি আর ঈস্ট লেগে আছে। প্ল্যাটফর্মের ওপর দাঁড়িয়ে আছে কোমর পর্যন্ত অনাবৃত দুই কুস্তিগীর—তাদের সেদিন আঁকতে হবে।

ভ্যান গঘ এমন উত্তেজনার সঙ্গে, এমন সাংঘাতিক দ্রুততায় আঁকতে শুরু করে দিলেন যে সহপাঠীরা সকলে অবাক হয়ে গেল। "এমন পুরু করে ও রঙ চাপিয়েছে," মি. হাজেমান বললেন আমাদের, "যে তার ক্যানভাস থেকে মেঝের ওপর টপটপ করে রঙ গড়িয়ে পড়ছে।"

ভেরলাট এই কাজ এবং তার অসাধারণ স্রষ্টাকে দেখে খানিকটা হতভম্ব হয়েই ফ্লেমিশে জিজ্ঞেস করলেন, "কে তুমি?"

ভ্যান গঘ শান্তভাবে উত্তর দিলেন,"আমি ভিনসেন্ট, একজন ডাচ।" নবাগতদের ক্যানভাস দেখিয়ে পরিচালকমশাই অবজ্ঞাভরে ঘোষণা করলেন, "এরকম পচা কুকুরদের আমি সংশোধন করব না। বাছা, এখনি ড্রয়িং ক্লাসে যাও।"

রাগে ভ্যান গঘের গাল লাল হয়ে উঠেছে। রাগ সামলে ভ্যান গঘ মি. সিয়েবারের ক্লাসে দৌড়লেন। মি. সিয়েবারও এই ঘটনায় ভয় পেয়েছিলেন তবে তিনি পরিচালকমশাইয়ের মতো অমন রাগী ছিলেন না।

কয়েক সপ্তাহ সেখানে ছিলেন ভ্যান গঘ, আঁকতেন ঈর্ষাভরে, বিষয়টাকে ধরতে তাঁর কষ্ট হত, যন্ত্রণা হত। কাজ করতেন দ্রুততার সঙ্গে, সংশোধন করতেন না। বেশির ভাগ সময় ছিঁড়ে ফেলতেন সদ্য-আঁকা ছবিটা কিংবা পেছনে ছুঁড়ে ফেলে দিতেন। হলঘরে যা-কিছু দেখতে পাওয়া যেত সব আঁকতেন: ছাত্রের দল, তাদের পোশাক, আসবাবপত্র, ভুলে যেতেন যে মাস্টারমশাইয়ের দিয়ে যাওয়া প্লাস্টার ঢালাইটা নকল করতে হবে। ইতিমধ্যে সকলেই তাঁর কাজের দ্রুততা দেখে চমৎকৃত হয়ে গেছে, একই ড্রয়িং, পেন্টিং সে দশ থেকে পনেরোবার করত।

আন্তোয়ার্প অ্যাকাডেমিতে একদিন যেন-বা ভুল করে ভেনাস ডি মিলোর একটা ঢালাই দেওয়া হয়েছে ছাত্রদের—প্রতিলিপি করার জন্য। মডেলের প্রয়োজনীয় কতকগুলো বৈশিষ্ট্য দেখে ভ্যান গঘ ভয়ানক আকৃষ্ট হয়েছেন। তার পেছনের নিতম্বের প্রস্থ মাপলেন এবং ভেনাসকে এমন বিকৃতির শিকার করে ফেললেন যেমন করেছেন মিইয়ের 'বীজ বপনকারী' বা দ্যলাক্রোয়ার 'সু-সামারিটান', আঁকিয়ে জীবনে ছবি নকলের ক্ষেত্রে অন্যদের বেলায় যা করেছেন। সুন্দরী গ্রীক দেবী হয়ে গেলেন পেল্লায় চেহারার ফ্লেমিশ মেট্রন। মি. সিয়েবার এই দেখে পেনসিলের কয়েকটা সংশোধনী টানটোন দিয়ে ভ্যান গঘের ড্রয়িং ছিঁড়ে ফেললেন, শিষ্যকে মনে করিয়ে দিলেন শিল্পশাস্ত্রের কয়েকটি অলঙ্ঘনীয় সূত্র।

তরুণ ডাচ, যার ঔদ্ধত্য পারিতে গুপিলের শান্ত ক্রেতাদের ভয় পাইয়ে দিয়েছিল, ভয়ানক খেপে উঠে অধ্যাপকমশাইকে চিৎকার করে শোনাতে লাগলেন, "যুবতী মেয়েমানুষ বলতে কী বোঝায় আপনি কিচ্ছু জানেন না। চুলোয় যান আপনি! মহিলাদের নিতম্ব থাকবে, শ্রোণী থাকবে

যাতে তারা সন্তান ধারণ করতে পারে।"...আন্তোয়ার্প অ্যাকাডেমিতে এইছিল ভ্যান গঘের শেষ পাঠ যা তিনি নিয়েছিলেন বা দিয়েছিলেন।

যাজক এম. বঁতে

তা প্রায় বছর পঁয়তাল্লিশ আগে তাঁকে জানতাম। বরিনেজে তিনি তখন ধর্মীয়-প্রচারক। ওয়াজমেসে এক বছর কাজ করেছিলেন তিনি।

পাতুরাজেসে তাঁর আগমন আমার স্পষ্ট মনে পড়ে: হালকা বাদামি গায়ের রঙ, মাঝারি উচ্চতা, কমনীয় মুখ। সুবেশ, সুন্দর ব্যবহার, ব্যক্তিগত দর্শনে ডাচ পরিচ্ছন্নতার সকল বৈশিষ্ট্য দেখালেন।

যা-বলার বললেন বিশুদ্ধ ফরাসীতে। ওয়াজমেসের প্রোটেস্ট্যান্টদের ছোট্ট ধর্মীয় জমায়েতে যথেষ্ট সন্তোষজনকভাবে ধর্মের বাণী প্রচার করতে পারতেন।

পেতি-ওয়াজমেসের এক পুরনো খামারবাড়িতে আস্তানা নিয়েছিলেন আমাদের তরুণ। মোটামুটিভাবে বাড়িটা ছিল সুন্দর...পরিবারটির জীবনধারা ছিল সাধারণ, শ্রমিকদের মতো তারা জীবনযাপন করত।

আমাদের ধর্মপ্রচারক কিন্তু অচিরেই দেখিয়ে দিলেন কোন দিকে তাঁর মন টানে। তাঁর মনে হল থাকার ব্যবস্থাটা বড়ো বেশি বিলাসবহুল। তাঁর খ্রীস্টান মনে তা আঘাত করল, খনিশ্রমিকদের থেকে আলাদারকম ভাবে থাকাটা তিনি মেনে নিতে পারলেন না। যাঁরা তাঁকে সহানুভূতি দিয়ে ঘিরে রেখেছিলেন তাঁদের ছেড়ে তিনি একটি ছোট্ট কুটীরে চলে গেলেন থাকবার জন্য। সেখানে তিনি ছিলেন একা; কোনো আসবাবপত্র ছিল না। লোকেরা বলে চুল্লীঘরের এক কোণে গুড়িসুড়ি দিয়ে ঘুমোতেন।

এছাড়া, যে পোশাকপরিচ্ছদ তিনি পরিধান করতেন তা থেকেই বোঝা যেত কী তাঁর অভিপ্রায়। পুরানো সৈনিকের উর্দি, ময়লা টুপি এই পোশাকেই তিনি গ্রামে ঘুরে বেড়াতেন। যে ভালো স্যুট পরে প্রথম দিন তিনি এসেছিলেন তা তাঁর অঙ্গে আ'র কখনো দেখা যায় নি। তিনিও আর নতুন কোনো স্যুট কেনেন নি। ভদ্রগোছের পারিশ্রমিক পেতেন। তা দিয়ে তিনি যে-সামাজিক স্তরের মানুষ ছিলেন তার উপযুক্ত পোশাকপরিচ্ছদ কেনা যেত। তবে তিনি কেন এমন বদলে গিয়েছিলেন ?

পরিদর্শনের সময় কারো কোনো দুঃখদুর্দশা দেখলে নিজের সমস্ত জামাকাপড় বিলিয়ে দিতেন। গরিবদের সব টাকা বিলিয়ে দিতেন, নিজের বলতে কিছুই থাকত না। তাঁর ধর্মচেতনা ছিল খুবই আন্তরিক। যীশু খ্রীস্টের সমস্ত কথা তিনি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতে চাইতেন।

তিনি চাইতেন প্রথম দিকের খ্রীস্টানদের নকল করতে। যাদের জন্য খ্রীস্টের বাণী প্রচার করতে এসেছেন সংখ্যাগরিষ্ঠ সেই মানুষগুলোর চেয়েও খারাপ অবস্থায় থাকতে।

মন্দ বিলাস বলে সাবান পরিত্যাগ করেছিলেন। আমাদের এই ধর্মপ্রচারক যখন কয়লা-গুঁড়োয় পুরো ঢাকা পড়েন নি তখনও তাঁর মুখ খনিশ্রমিকদের তুলনায় অপরিষ্কার। বহিরঙ্গ খুঁটিনাটি তাঁকে কষ্ট দিত না। তিনি তাঁর আত্মত্যাগের আদর্শে তন্ময় হয়ে ছিলেন।

হতভাগ্য, আহত, অসুস্থ মানুষদের কাছে যেতে তিনি পছন্দ করতেন, তাদের কাছে

অনেকটা সময় থাকতেন। তাদের যন্ত্রণা লাঘব করার জন্য যে-কোনো রকমের ত্যাগ স্বীকার করতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন।

শুধু মানবজাতির প্রতিই তাঁর গভীর মনস্কতা সীমাবদ্ধ ছিল না। ভিনসেন্ট ভ্যান গঘ প্রতিটি প্রাণীর জীবনকেই শ্রদ্ধা করতেন।

শুঁয়োপোকা তাঁকে বিরক্ত করতে পারত না। শুঁয়োপোকা তো জীবন্ত প্রাণী অতএব তার নিরাপত্তা প্রয়োজন।

যে পরিবারটির সঙ্গে তিনি থাকতেন তাঁরাই আমাকে বলেছেন, বাগানে একটা শুঁয়োপোকা দেখতে পেলে হল, ভ্যান গঘ তাকে সাবধানে তুলে নিয়ে গাছে রেখে দেবেন। এই বৈশিষ্ট্যটুকু ছাড়াও, কেউ কেউ একে তুচ্ছ অথবা বোকামি বলে ঠাউরাবেন, আমার মনে এই ছাপটুকু রয়ে গেছে যে ভিনসেন্ট ভ্যান গঘ একটা উচ্চ আদর্শ মেনে চলতেন: আত্ম-বিস্মৃতি এবং অন্যান্যদের ভক্তি করা এই চালিকা-নীতিকে তিনি সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করেছিলেন।

স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে তাঁর একটা দুর্বলতা ছিল: তিনি ছিলেন অপ্রতিরোধ্য ধূমপায়ী। কত সময় তাঁকে এই নিয়ে বিরক্ত করেছি। আমি নিজে ধূমপান করি না। তাঁকে বলেছিলাম ধূমপান পরিত্যাগ না করে আপনি ভুল করছেন, তা আমাকে তিনি পাত্তাই দেন নি—শিল্পীরা বোধহয় ছবিতে একটা দাগ না দিয়ে পারেন না।...

জে. বি. কাম

ভ্যান গঘের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা সম্ভবত ১৮৮০র খ্রীস্টমাসের আগে রুজেনডাল স্টেশনে। দুজনে আমরা এট্টেনে বেড়িয়েছিলাম। সে বোধহয় বেলজিয়াম থেকে এসেছিল, মনে হয় আন্তোয়ার্প থেকে যেখানে সে অ্যাকাডেমিতে কাজ করছিল আর কামারদের স্টোভ নিয়ে এসেছিল। এমনও হতে পারে আমাদের দেখা হয়েছিল ১৮৮১তে ইস্টারের ঠিক আগে। সেইসময় তার আঁকা একটা ড্রয়িং দেখেছিলাম: সকালবেলা বরফের ভেতর দিয়ে খনিশ্রমিকেরা চলেছে খাদের দিকে, আঁকা হয়েছে আদিম পদ্ধতিতে, পরিপ্রেক্ষিতের জ্ঞান ছাড়াই, ছোটো কিন্তু বেশ ব্যঞ্জনাময়। আবার এখন দেখালে আমি অমনি চিনতে পারব। ১৮৮১র জুনে আরো একবার গিয়েছিলাম ভিনসেন্টের সঙ্গে দেখা করতে। অভিভাবকদের ছেড়ে সে তখন এট্টেনে থাকত। সেখানে বাড়ির লাগোয়া একটা ঘর ছিল তার কর্মশালা। সেখানে সে নিদ্রাও যেত। একটিমাত্র বস্ত্র পরত। তার আবার কলার নেই, পেন্সিলে গাছ অথবা গুল্মের স্টাডি করত।

একটা পোর্টফোলিও সঙ্গে নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ত। একটা খসখসে ড্রয়িং-বোর্ড— তার উপর ছড়িয়ে দিত কাগজ। সে চাইত একটা শক্ত তল (surface) কারণ ছুতোরদের চওড়া মোটা সাধারণ পেন্সিলে সে কাজ করত। কখনো কখনো দেখেছি সেটাকে পুরোপুরি আঁকড়ে ধরে কাগজের উপর এমন কাজ করে চলেছে যে কাগজ ছিঁড়ে যাওয়ার দাখিল। সেই সময় বেলজিয়াম থেকে ভান রাপার্ড এসেছিল তার কাছে। কাছাকাছি একটা জায়গায় তৈল মাধ্যমে সে একটা স্টাডি করেছিল। একবার আমরা তিনজনে সকালবেলা বেরিয়ে পড়লাম। আমি একটা স্টাডি করলাম। বাকি দুজন করল ড্রয়িং। ভ্যান গঘ দারুণ মেজাজে ছিল তখন। এইরকম খুশি তাকে

পরে আর কখনো দেখিনি। সেবার গরমকালে তাকে নিয়ে কয়েকবার বেরিয়েছিলাম। আবার দেখেছি নিজের ঘরে দারুণ আবেগে বার্গের ছবির প্রতিলিপি করেছে। আমার বিশ্বাস, একশোটা ভঙ্গীমার সে প্রতিলিপি করবে বলে মনস্থ করেছিল, মনে হয় সব কটাই সে করেছিল। সে সময় সে জোলা পড়ছিল আর পরিপ্রেক্ষিত বিষয়ে ছোট্ট একটা সরল ফরাসী পুস্তিকা পড়ছিল সমনোযোগে। সেই সময় আমরা দুজনে একবার প্রিন্সেনহেগে তার কাকার সংগ্রহ দেখতে গিয়েছিলাম, বসবুমের একটা সুন্দর ছোট্ট ড্রয়িং সম্পর্কে সে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে। মরিস, মভ আর কিছু ফরাসীদের সম্পর্কেও বলে কিন্তু সবার উপরে মিইয়ে সম্বন্ধে। সে সময় সে বীজবপনকারীদের ড্রয়িং করছিল, ঘরকন্নার কাজে ব্যস্ত মহিলাদের আঁকার জন্য তাদের ঝুপড়িতে গিয়েছিল। লোকজনকে সে বাধ্য করত তার জন্য 'পোজ' দিতে। তারা ভয় পেত। তার সঙ্গে যাওয়াটা মোটেই উপভোগ্য হত না। তারপর ড্রয়িঙে সে কিছু কিছু রঙ প্রয়োগ করতে শুরু করল। টালি দেওয়া ঘরের যে-মেঝে সে এঁকেছিল তাতে সে জলরঙা লাল 'টিন্ট' ব্যবহার করল। ইন্ডিয়ান কালি—খাগের কলমও সে ব্যবহার করত, পরে তাতে ফ্ল্যাট টিন্ট দিত— এই পদ্ধতিটা আমি আর আমার ভাই পরে নকল করেছিলাম। সেই সময়কার বিশিষ্ট রঙগুলোর কথা আমার মনে পড়ে না। বোধহয় তার একটা পরে দেখেছিলাম রটারডামের ওল্ডেনজীল-এ। তারপর হেমন্তে সে এট্টেন ছেড়ে চলে যায়। মনে হয় ডোরড্রেক্টে যায়, তারপর সেখান থেকে দ্য হেগ-এ। পরের বছর অর্থাৎ ১৮৮২তে তাকে শেষবার দেখি শেঙ্কওয়েগ-এ তার অ্যাপার্টমেন্টে। দেখলাম তার ঘরে বালতি বালতি নোংরা জল, তাই দিয়ে সে তার স্টাডিগুলো অনবরত স্পঞ্জ করছে। এক অতি রোগা মহিলা তার মডেল। তাকে সে বার বার স্কেচ করেছিল। দ্য হেগে থাকার সময় শহরের কয়েকটা দৃশ্য সে এঁকেছিল। সেগুলো কুপ্রিয়েতে প্রদর্শিত হওয়ায় সে সময় সে খুব সুখী ছিল। মনে হচ্ছে ছটা দৃশ্য এঁকেছিল, সবগুলোই বিক্রি হয়ে যায় সম্ভবত তার ভাই তেওর অনুরোধে। তারপর আর কখনো ভিনসেন্টের সঙ্গে আমার দেখা হয়নি।

আন্তন কের্সেমাকেরস

ন্যুয়েনেনে প্রথমবার তাঁর স্টুডিয়োয় তাঁর কাজের বিষয়ে ঠিক ধারণা করা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। যা ভেবেছিলাম তা থেকে এতই অন্যরকম, এত রুক্ষ এলোমেলো, এত কর্কশ, অসম্পূর্ণ যে সদিচ্ছা থাকলেও ভেবে উঠতে পারলাম না সে ভালো না সুন্দর। আর এমন বিশ্রীরকম নিরাশ হলাম যে ঠিক করলাম দ্বিতীয়বার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাব না।

তা যাই হোক, কিছুদিন পরে আবিষ্কার করলাম তাঁর কাজ আমার উপর এমন প্রভাব বিস্তার করেছে যে মন থেকে মুছে ফেলা শক্ত। সব সময় তাঁর স্টাডি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে। ঠিক করলাম আর একবার যাব তাঁর স্টুডিয়োয়।

দ্বিতীয়বারে ধারণাটা একটু ভালো হল যদিও আমারই অজ্ঞাতায় ঠিক বুঝতে পারলাম না তিনি আঁকতে পারেন না, নাকি ফিগার আঁকেন কোনোরকমে হেলাফেলায়। কথাটা তাঁকে সরাসরি বলেই ফেললাম।

অবাক হলেন না তিনি। খানিক হেসে শান্তভাবে বললেন, পরে অন্যরকম ভাববে। আসবার

সময় আমাকে 'দ্য গ্রাফিক'-এ প্রকাশিত কয়েকটা এনগ্রেভিং দিলেন। বললেন, বাড়ি গিয়ে তাড়াহুড়ো না করে যেন এগুলো সযত্নে দেখি, এ থেকে কপি করি। "এ থেকে দুটো-একটা জিনিস তুমি শিখতে পারবে।"

আর একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার সময় আমার করা কয়েকটা স্টাডি নিলাম, সেগুলো সম্বন্ধে কী বলেন তা জানার জন্য।

আমাকে বোধহয় নিরাশ করতে চান না বলেই তিনি বললেন:

"শোনো, কিছু ভালো কাজ এখানে আছে। তবে আমি বলি কি, ল্যান্ডস্কেপ না করে প্রথমে কিছু স্টিল লাইফ করো। এ থেকে তোমার অনেক কিছু শেখা হবে। এরকম পঞ্চাশটা আঁকার পর দেখতে পাবে কতখানি তোমার হল। তোমাকে আমি সাহায্য করতে রাজি। তোমার সঙ্গে আমিও একই বিষয়ে রঙ চাপাব তার কারণ আমাকেও অনেক কিছু শিখতে হবে..."

এইভাবে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ অশেষ ধৈর্যসহকারে আমাকে তিনি সাহায্য করতে চেষ্টা করেছেন। ইতিমধ্যে অজস্র ড্রয়িং, জলরঙ, স্টাডি করার জন্য প্রচুর পরিশ্রম করেছেন—কী ঘরে কী বাইরে।

একবার, কিছু হবে না বলে হাল ছেড়ে দিয়ে বলেছিলাম তাঁকে, "আমার দ্বারা কিছু হবে বলে মনে হয় না, এই বুড়ো বয়সে কি আর শিল্পী হওয়া যায়," তখন তিনি বললেন কোনো কোনো শিল্পী বেশি বয়সে জীবন শুরু করে শেষ পর্যন্ত গ্রেট মাস্টার হয়েছিলেন, এঁদের মধ্যে এইচ. ডব্লু, মেস ডাগ ছিলেন।

ডিমেন গেস্টেল

ভিনসেন্ট একবার আমাদের ছাপাখানায় এসেছিলেন। ছাপার কালি চাইলেন। পরেও কয়েকবার এসেছিলেন এই কারণে। একবার এসে লিথোগ্রাফের ছোটো পাথর চাইলেন। লিথোগ্রাফ পেনসিলে 'আলুভোজীরা' ছবিটা এতে এঁকে তার কয়েকটা প্রতিলিপি করে পাথরটা ফেরত দিলেন...

ওক্তাভ মির্ব্যু

আহা! বেচারা ভিনসেন্ট! কী দুর্ভাগ্য। মঁসিয়ে মির্ব্যু! কত বড়ো দুর্ভাগ্য! এইরকম একটা প্রতিভা! আর এমন সুন্দর ছেলে। দাঁড়ান, তার আরও ভালো ভালো কাজ দেখাই আপনাকে! একে অস্বীকার করার উপায় নেই, ঠিক কি না? এসব মাস্টারপীস।

আর সাহসী প্যার তাঁগি বগলে চার-পাঁচটা, দু হাতে দুটো ক্যানভাস নিয়ে দোকানের পেছন থেকে ফিরে এসে চেয়ারের হাতলে ঠেস দিইয়ে তাদের দাঁড় করিয়ে দিলেন সোহাগ ভরে আমাদের চারপাশে। ক্যানভাসগুলোর জন্য ঠিক-ঠিক আলো চেয়ে তিনি আবার গোঙাতে শুরু করলেন:

'বেচারা ভিনসেন্ট! ওগুলো মাস্টারপীস কি না? আর এ-তো। আর এতোও! আর এতো

সুন্দর, দেখুন-না, যখন ওদের দিকে তাকাই আমার গলা বুঁজে আসে: কাঁদতে চাই চীৎকার করে! আর তাকে দেখতে পাব না, মঁসিয়ে মির্ব্যু। না, ব্যাপারটা আমার মাথায় আসেনি! আর মঁসিয়ে গোগ্যাঁ, তিনি যে ওকে এতো ভালোবাসতেন। নিজের ছেলে মারা গেলেও বোধহয় তাঁর এমন খারাপ হত না।'

শিল্পীরা যেমন করেন, বাতাসে তিনি একটা বৃত্ত আঁকলেন: 'আকাশটা দেখুন! ওই গাছটা! সে কি এটা পায়নি? এই তো, এই তো! কী রঙ, কী গতিময়তা। মানুষের কি এমন করে মরা উচিত? আপনাকে জিগ্যেস করছি, এটা কি ভালো?... শেষ যেবার সে এল, ওই আপনি যেখানটা বসে আছেন, সেখানে বসেছিল! ওহ্! কী যে বেদনার। গিন্নীকে বললাম: 'ভিনসেন্টকে এতো মন-মরা লাগছে... ওর দৃষ্টি অন্য কোথাও রয়েছে, এখান থেকে অনেক দূরে। আমার মন বলছে কিছু একটা গোলমাল হয়েছে! সেরে সে ওঠে নি আদৌ! সেরে সে ওঠে নি আদৌ!' সেই বেচারা ভিনসেন্ট। আপনার সঙ্গে বাজি রইল তার *ফুলদানি* আর *গ্লাডিওলি* আপনি জানেন না। তাঁর আঁকা শেষ ছবির এ একটা। একটা আশ্চর্য! আপনাকে এটা দেখানো দরকার। ফুলগুলোকে, দেখুন আপনি, তাঁর মতো করে কেউ অনুভব করে নি। সব কিছু সে অনুভব করেছে, বেচারা ভিনসেন্ট। বড়ো বেশি অনুভব করত সে। এই কারণেই সে অসম্ভবকে চাইত। আপনার জন্য *ফুলদানি* আর *গ্লাডিওলা* খুঁজতে যাচ্ছি। মঁসিয়ে পিসারো এটা বহুক্ষণ তাকিয়ে দেখতেন, আর অন্যান্য ভদ্রলোকেরাও বলেছেন, 'ভিনসেন্টের ফুলেদের দেখলে মন হয় রাজকন্যে!' হাঁ, হাঁ, ওই তো ওখানে কখানা রয়েছে। এক মিনিট সবুর করুন। *গ্লাডিওলা*টা সঙ্গে করে নিয়ে আসছি।'

ভ্যান গঘের ট্র্যাজিক, মর্মান্তিক মৃত্যুর দিন কয়েক পরে প্যার তাঁগি-র দৃশ্যটা মনে পড়ছে। তাঁর অন্য বন্ধুদের মতো ছোটোখাটো এই মানুষটাও তাকে ভিনসেন্ট বলে ডাকতেন।

অনুবাদ : অনির্বাণ রায়

পল গোগ্যাঁ

আমাকে বেশ কয়েকবার আসতে বলার পর ভিনসেন্ট ভ্যান গঘের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য আমি আর্লে যাই। সে বলত সে চায় আতেলিয়ে দ্যু মিদি প্রতিষ্ঠা করতে, আর আমি হব সেটার নেতা। এই বেচারা ডাচম্যান আগাগোড়া উৎসাহ ও আগ্রহে ভরপুর। *তার্তার্যাঁ দ্য তারাস্কঁ* বইটি পড়ে মিদি সম্বন্ধে অসাধারণ এক ধারণা গড়ে ওঠে তার মনে যেটাকে অগ্নিশিখায় প্রকাশ করতে হবে।

আর তার পটের উপর উজ্জ্বল হলুদ ফেটেও পড়ল; সেগুলোর সূর্যালোকে মা[১] এবং গোটা কামার্গ সমতলভূমিকে প্লাবিত করত।

আমার হলুদ রঙের ঘরটিতে রক্ত-বেগনি চোখওয়ালা সূর্যমুখীগুলো সাজানো হলুদ পটভূমির উপর; তাদের ডাঁটির শেষদিকটা একটা হলুদ টেবিলের উপর হলুদ রঙের পাত্রের জলে ডোবানো। ছবিটির এক কোণে চিত্রকরের সই ভিনসেন্ট। আর আমার ঘরের হলুদ রঙের পর্দাগুলোর ভিতর দিয়ে সূর্যের হলুদ আলো এই সমস্ত ফুটন্ত ফুলকে সোনার রঙে ভাসিয়ে দেয়, বিছানায় যখন আমার ঘুম ভাঙে আমার মনে তখন এই ছাপ পড়ে যে ব্যাপারটা সবই খুব চমৎকার।

হাঁ, হাঁ! হলুদ রঙ সে ভালোবাসত। ভালামানুষ ভিনসেন্ট, হল্যান্ড থেকে আসা এই চিত্রকরটির আত্মাকে কবোষ্ণ করে তুলত সূর্যালোকের ঝলক; কুয়াশাকে সে পছন্দ করত না। উষ্ণতার জন্য এক ব্যগ্র কামনা।

আর্লে আমরা যখন ছিলাম, দুজনেই আমরা পাগল, এবং সুন্দর সুন্দর রঙ নিয়ে দুজনের নিরন্তর লড়াই চলত, আমি ভালোবাসতাম লাল; নিখুঁত সিঁদুরে রঙ পাই কোথা? সে তার সব থেকে বেশি হলুদ রঙের তুলিটা নিয়ে হঠাৎ রক্ত-বেগনি হয়ে ওঠা দেওয়ালের উপর লিখে দিত:

মনে আমি সুস্থ
'পবিত্র আত্মা' আমি।

আমার হলুদ ঘরে ছোট্ট একটা স্টিল-লাইফ; রক্ত-বেগনি রঙের। বড়ো বড়ো, জরাজীর্ণ এক জোড়া তালতোবড়ানো জুতো। ভিনসেন্টের জুতো জোড়া। একদিন সকালে উঠে যেটি পরেছিল, যখন সেটি নতুন ছিল, পায়ে হেঁটে হল্যান্ড থেকে বেলজিয়াম যাবে বলে। তরুণ যাজক। (বাবার মতো ধর্মোপদেশক হবে বলে তখন সে সবেমাত্র তার ঈশ্বরতত্ত্ব সংক্রান্ত লেখাপড়া শেষ করেছে) বেরিয়ে পড়েছেন খনিশ্রমিকদের দেখবেন বলে, যাদের তিনি নিজের ভাই বলতেন বাইবেলে যেমন তাদের উল্লিখিত দেখেছিলেন— সরল মানুষ নিপীড়িত, ক্ষমতাশালী ও উচ্চপদস্থদের বিলাস সামগ্রী তৈরির জন্য যারা মেহনত করত।

তাঁর শিক্ষক, প্রাজ্ঞ ডাচদেশীয়রা তাঁকে যা বলেছিলন তার বিপরীতে ভিনসেন্ট এমন এক যীশুতে বিশ্বাস করতেন যিনি দরিদ্রদের ভালোবাসতেন, আর তার আত্মা, করুণায় গলে গিয়ে,

১. Mas: দক্ষিণ ফ্রান্সের হীন খামার বাড়ি।

সান্ত্বনার বাণী এবং আত্মবলি দুই-ই আকাঙ্ক্ষা করত, দুর্বলের স্বপক্ষে সবলের বিপক্ষে লড়াই করতে চাইত। তিলমাত্র সন্দেহ নেই যে ভিনসেন্ট তখনই উন্মাদ!

খনি-অঞ্চলে যেভাবে সে বাইবেল শিক্ষা দিত, আমার বিশ্বাস তা ছিল নিচের তলার খনিশ্রমিকদের পক্ষে হিতকর, আর উপরের মহলের, মাটির উপরকার অধিবাসী উপরওয়ালাদের কাছে বিরক্তিকর। অল্প দিনের মধ্যেই তাকে ফিরিয়ে আনা হল, ছাঁটাই করা হল; পারিবারিক পরামর্শসভা বসল এবং সিদ্ধান্ত হল ও উন্মাদ, উন্মাদ আশ্রমে ওকে আটকে রাখা উচিত। ভাই তেওর কল্যাণে, তাকে অবশ্য আটক করা হল না।

অন্ধকার কালো খনিটা একদিন উজ্জ্বল হলুদ রঙে প্লাবিত হয়ে গেল, অগ্নিগর্ভ জলাভূমির ভয়ঙ্কর আলোর ঝলক, ধনীর ডাইনামাইট কখনও বিস্ফোরিত হতে যা ব্যর্থ হয় না। সেই মুহূর্তে নোংরা কয়লার উপর শুয়েছিল যে-সব প্রাণী তারা সেদিন ধরাধাম ত্যাগ করল, ঈশ্বরের এতটুকু নিন্দা না করে, মানুষের কাছে বিদায় জানাল।

খনিশ্রমিকদের একজন সাংঘাতিকভাবে ছিন্নভিন্ন দেহ একটি মানুষ, মুখ তার আগুনে পোড়া, ভিনসেন্ট তাকে নিজে ঘরে নিয়ে এল। কোম্পানির ডাক্তার বললেন, 'কিন্তু ও তো গেছেই অলৌকিক কোনো কিছু যদি না ঘটে অথবা সব থেকে প্রগাঢ় মাতৃসুলভ সেবাযত্ন পায়। নাঃ, ওর যত্নআত্তি করা নিতান্তই বোকামি।'

ভিনসেন্ট অলৌকিকে বিশ্বাস করত এবং মাতৃস্নেহে।

পাগল লোকটা (লোকটা যে পাগল ছিল সে বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নেই) চল্লিশ দিন ধরে মুমূর্ষু লোকটির শয্যার পাশে বসে রইল; লোকটির ক্ষতে যাতে হাওয়া না লাগে সেদিকে সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখল আর ওষুধের দাম মেটাতে থাকল। সান্ত্বনাদাতা এক যাজক (সে যে পাগল ছিল সে-বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নেই), সান্ত্বনার কথা বলতে থাকল। তার উন্মাদ উদ্যোগ এক মৃত মানুষকে, একজন খ্রীস্টানকে আবার বাঁচিয়ে তুলল।

অবশেষে আহত মানুষটি যখন বিপদমুক্ত হয়ে আবার খনিতে কাজ করতে ফিরে গেল ভিনসেন্ট তখন বলল শহীদ খ্রীস্টের মাথাটা আপনি দেখতে পেতেন, কপালে তার দিব্যজ্যোতি, কাঁটার মুকুটের আঁকাবাঁকা দাগ, খনিমজুরটির পাঁশুটে হলুদ কপালের উপর লাল ক্ষতচিহ্ন।

লোকটা যে পাগল ছিল সে-বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নেই।

*

বরফ পড়তে শুরু করেছে, শীতকাল, শবাচ্ছাদন বস্ত্রটার কথা আর লিখলাম না, সেটা স্রেফ বরফ। গরীব লোকগুলো খুব কষ্ট পাচ্ছে। বাড়িওয়ালারা প্রায়ই সেটা বুঝতে পারে না।

এখন এই বিশেষ ডিসেম্বর মাসটাতে আমাদের সুন্দর পারি শহরের রু ল্যাপিক গলিতে পথচারীরা স্বাভাবিকের থেকে বেশি দ্রুত হাঁটছে, তানানানা করার কোনোরকম ইচ্ছা তাদের নেই। তাদের মধ্যে অদ্ভুত পোশাকপরা একটা লোক শীতে ঠকঠক করতে করতে বাইরের বুলভারের দিকে এগিয়ে চলেছে। লোকটার গায়ে একটা ছাগলের চামড়া জড়ানো, মাথায় একটা পশু লোমের টুপি, নিঃসন্দেহে খরগোসের লোম, খোঁচা খোঁচা লাল দাড়ি। ভেড়া চরানোদের বেশ।

আলগোছে দৃষ্টিতে তাকাবেন না ওর দিকে এবং ঠাণ্ডা সত্ত্বেও তার ধবধবে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ হাত, ভারি স্বচ্ছ নীল চোখ, ভারি ছেলেমানুষের মতো চোখের দিকে মনোযোগ দিয়ে না তাকিয়ে

আপনি কিন্তু আপনার পথ ধরে চলে যাবেন না। নিশ্চয়ই এক হতভাগ্য ভবঘুরে।

ওর নাম ভিনসেন্ট ভ্যান গঘ।

এক আদিম মানুষদের তীর, মরচে ধরা ধাতুর জিনিসপত্র এবং সস্তা অয়েল পেন্টিং বিক্রেতার দোকানে তাড়াতাড়ি সে ঢুকল। বেচারা শিল্পী! এই যে ছবিটা বিক্রি করতে তুমি এসেছ এটা আঁকার সময় তোমার আত্মার খানিকটা অংশ এতে তুমি ঢেলে দিয়েছ।

এটা একটা ছোট্ট স্টিল-লাইফ, গোলাপী কাগজের উপর গোলাপী বাগদা চিংড়ি।

"এই ছবিটার বদলে সামান্য কিছু টাকা আমায় দিতে পারেন, যাতে ঘরভাড়া দিতে পারি ?"

"দেখ ভায়া, খদ্দেররা আজকাল বেয়াড়া হয়ে উঠেছে; মিয়িয়ের সস্তা ছবি তারা চায় আমার কাছে। আর একটা ব্যাপার," দোকানদার যোগ করে, "তোমার ছবি খুব হাসিখুশি নয়, জানোই তো; আজ বুলভারে রেনেসাঁস যুগের ছবি এসেছে। যাই হোক, লোকে বলে তোমার সহজাত ক্ষমতা আছে;আর আমিও চাই তোমার জন্যে কিছু করতে। এই নাও একশ স্যু।"

কাউন্টারের উপর মুদ্রাটা ঠং করে বেজে উঠল। ভ্যান গঘ একটুও প্রতিবাদ না করে সেটা নিয়ে, দোকানদারকে ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে এল দোকান থেকে। রু ল্যাপিক ধরে ক্লান্ত পায়ে হেঁটে ফিরে চলল। বাসার কাছাকাছি প্রায় এসে পড়েছে, স্যাঁ লাজার জেলখানা থেকে ছাড়া পাওয়া এক গরীব স্ত্রীলোক চিত্রকরের দিকে তাকিয়ে হাসল, তার সঙ্গে কারবারের ইচ্ছায়। গ্রেটকোটের তলা থেকে সুন্দর সাদা হাতটি বেরিয়ে এল; ভ্যান গঘ বই পড়তে ভালোবাসতেন, *লা ফিল এলিজা* বইটার কথা তার মনে পড়ল (এদমঁদ দ্য গোঁকুরের লেখা একটি উপন্যাস) এবং তার পাঁচ ফ্রাঁর মুদ্রাটি দুঃখী স্ত্রীলোকটির সম্পত্তি হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি, যেন নিজের করুণার জন্য কুণ্ঠিত হয়ে, লোকটা সরে পড়ল, পেটে তার কিছু পড়ে নি।

*

একদিন আসবে আর সেটা যেন এসে গেছে বলে আমি দেখতে পাচ্ছি। নীলামখানার নয় নম্বর ঘরে ঢুকছি; নীলামদার ছবির সংগ্রহ বিক্রি করছে! ভিতরে গেলাম আমি। " 'গোলাপী চিংড়ি মাছ' চার শ ফ্রাঁ, চার শ পঞ্চাশ, পাঁচ শ! আসুন আসুন মশাইরা, এটার দাম আরও অনেক বেশি।"

কেউ একটা কথাও বলল না। বিক্রি হয়ে গেল। ভিনসেন্ট ভ্যান গঘের আঁকা 'গোলাপী চিংড়ি মাছ'।

আজ অনেক দিন হল ভাবছি ভ্যান গঘ সম্পর্কে লিখব, আর লিখবও ঠিক একদিন, লেখার মেজাজ এলে; আপাতত কয়েকটা কথা বলছি তার সম্পর্কে, যা বলা যেতে পারে আমাদের সম্পর্কে, যাতে করে কোনো কোনো মহলে যে মিথ্যা গুজবটা চলছে তা বন্ধ হবে।

এটা অবশ্যই একটা কাকতালীয় ব্যাপার যে আমার জীবৎকালে, কয়েকজন মানুষ যারা প্রায়ই আমার সাহচর্যে ছিলেন এবং আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলেছেন তাঁরা পাগল হয়ে গেছেন।

দুই ভ্যান গঘ ভাইয়ের সম্পর্কেই এটা সত্য, এবং কিছু কিছু লোক হয় বিদ্বেষের কারণে, না হয় অতিসরল বলে, এদের উন্মাদ হওয়ার জন্য দোষটা আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে কিছু লোকের তাদের বন্ধুদের উপর বেশি বা কম মাত্রার একটা প্রভাব

থাকতে পারে, কিন্তু তাদের পাগল করে দেওয়ার জন্যেও তারা দায়ী একথাটা বড়োই বাড়িয়ে বলা। সেই বিপর্যয়াত্মক ঘটনার অনেক পরে যে উন্মাদ আশ্রমে তার চিকিৎসা চলছিল সেখানে থেকে আমাকে সে চিঠি দিয়েছিল। সে লিখেছিল: "তোমার কী সৌভাগ্য যে তুমি পারিতে রয়েছ! যাই বল না কেন, মস্ত লোকেরা ঐখানেই থাকে, আর তোমার নিশ্চয়ই একজন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া উচিত যিনি তোমার পাগলামি সারাতে পারেন। আমরা সবাই কি পাগল নই ?"

পরামর্শটা খুবই ভালো ছিল, আর সেই কারণেই সেটা আমি গ্রহণ করি নি, বৈপরীত্যের কারণেই, নিঃসন্দেহে।

'মার্কারি' পত্রিকার পাঠকরা দেখেছেন, কয়েক বছর আগে তাতে প্রকাশিত ভ্যান গঘের একটি চিঠিতে আছে সে কত পীড়াপীড়ি করেছিল আমি যাতে আর্লে এসে তার ধ্যানধারণা অনুযায়ী একটা স্টুডিও প্রতিষ্ঠা করি এবং সেটার পরিচালক হই।

সে-সময় ব্রিতানির পঁতাভেন-এ আমি কাজ করছি, আর হয় যে-স্টাডিগুলো সেখানে আমি শুরু করেছিলাম তার জন্য সেখানেই আমি থেকে যেতে চেয়েছিলাম, না-হয় অস্পষ্ট একটা সহজপ্রবৃত্তি অস্বাভাবিক কিছু একটা ঘটার কোনো পূর্বানুভূতি আমাকে দিয়েছিল, আমি বেশ অনেকদিন পার করে দিই; কিন্তু একদিন, ভিনসেন্টের আবেগপূর্ণ বন্ধুত্বে অভিভূত হয়ে আমি রওনা দিলাম আর্লের উদ্দেশ্যে।

অনেক রাতে গিয়ে পৌঁছলাম সেখানে। সারারাত-খোলা এক কাফেতে উঠে অপেক্ষা করতে থাকলাম সকালের আলো ফোটার জন্য। কাফের মালিক আমার দিকে তাকিয়ে উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলে উঠল: "তাহলে তুমিই তার স্যাঙাৎ! ঠিক চিনেছি!"

কাফে মালিকের বিস্ময়োক্তির ব্যাখ্যা করার পক্ষে ভিনসেন্টকে পাঠনো আমার একটা আত্মপ্রতিকৃতিই যথেষ্ট। আমার প্রতিকৃতিটা তাকে দেখিয়ে ভিনসেন্ট বুঝিয়ে দিয়েছিল যে সেটা তার এক বন্ধুর যে খুব শিগগিরই ওখানে আসবে।

খুব সকাল সকালও নয়, আবার খুব বেলা করেও নয়। আমি গেলাম ভিনসেন্টকে জাগাতে। সারা দিনটা কেটে গেল আমার মালপত্র গোছগাছ করতে, প্রচুর কথাবার্তা বলতে আর আশপাশে ঘুরে বেড়াতে যাতে করে আর্লের সৌন্দর্য এবং তার অধিবাসীদের আমি প্রশংসা করতে পারি, যাদের সম্পর্কে, এই ফাঁকে বলে রাখি, আমি খুব একটা উৎসাহ বোধ করলাম না।

পরের দিনই আমরা কাজ শুরু করে দিলাম—সে যে-সব কাজ শুরু করেছিল সেগুলোই চালিয়ে যেতে থাকল, আর আমি শুরু করলাম নতুন কাজ। আপনাদের বলে রাখা উচিত অন্যলোকরা বিনা যন্ত্রণাতেই তাদের তুলির ডগায় যে-সব মানসিক ক্ষমতার সন্ধান পায় আমার মধ্যে তা কোনো দিনই ছিল না। ঐ ধরনের লোকরা ট্রেন থেকে নেমেই তাদের প্যালেট বার করে, ঝটপট সূর্যালোকের প্রভাব এঁকে ফেলতে পারে। শুকিয়ে গেলেই সেটা লুক্সেমবুর্গ চলে যায় আর তার নিচে সই থাকে লাতিন ভাষায় কারোলুস-দুরাণ, সে-সব ছবি আমি পছন্দ করি না, তবে লোকটাকে করি।

লোকটা এত আস্থাবান, এত প্রশান্ত।
আমি এত অনিশ্চয়, এত উৎকণ্ঠিত।

প্রত্যেক দেশেই আমাকে একটা তা দেওয়া পর্যায়ের ভিতর দিয়ে যেতে হয়; প্রত্যেকবারেই নানা প্রজাতির গাছ গুল্ম, প্রকৃতির যাবতীয় কিছু চিনতে শিখতে হয় আমায়। সেগুলো ভারি বিচিত্র আর খামখেয়ালি, নিজেদের গোপন রহস্য কিছুতেই তারা জানাতে চায় না, কিছুতেই আত্মসমর্পণ করতে চায় না তারা।

ফলে কয়েক সপ্তাহ ধরে সেখানে থাকার আগে আর্ল আর তার পারিপার্শ্বিকের কড়া স্বাদটা স্পষ্ট উপলব্ধি করে উঠতে পারলাম না। যাই হোক আমরা কঠোর পরিশ্রম করতে থাকলাম, বিশেষ করে ভিনসেন্ট। তার আর আমার মধ্যে, দুটি মানুষের মধ্যে একজন আগ্নেয়গিরির মতো, অপরজনও ফুটন্ত, তবে ভিতরে ভিতরে, বলতে গেলে একটা ফাটাফাটি জমা হয়েই রইল।

প্রথমেই বলি, সব কিছুই এমন জগাখিচুড়ি পাকানো অবস্থায় ছিল যে আমি ভীষণ ধাক্কা খেলাম। রঙের বাক্সটা এমন বড়ো যে সব টিউবগুলো কোনোমতে ধরে তার মধ্যে; সেগুলো টিপে রঙ বার করা হয়েছে কিন্তু মুখের ঢাকাটা তাতে আর লাগনো হয় নি। অথচ এই বিশৃঙ্খলা আর তালগোল পাকানো সত্ত্বেও ওর ক্যানভাসগুলো জ্বলজ্বল করত, আর তার কথাগুলোও সেইরকম। দোদে, দা গোঁকুর, আর বাইবেল এই ডাচ লোকটির মাথা খাক্ করে দিচ্ছিল। আর্লের জাহাজঘাটা, ব্রিজ, নৌকো, গোটা মিদি অঞ্চলটাই তার কাছে হল্যান্ড হয়ে উঠেছিল। এমন কি ডাচভাষায় লিখতেও সে ভুলে গেল, ভাইকে লেখা তার চিঠিগুলো থেকেই দেখা যাবে একমাত্র ফরাসী ভাষাতেই সে সব সময় লেখালেখি করত, আর সেটা লিখতও বেশ চমৎকার, তার মধ্যে 'তাঁত ক্য' (যেহেতু), 'কাঁতা' (এই ব্যাপারে) ইত্যাদি কথার ছড়াছড়ি থাকত।

সেই বিশৃঙ্খল মস্তিষ্কের ভিতর থেকে তার সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গীর সপক্ষে কিছু যুক্তিযুক্ত কারণ খুঁজে বার করার যথেষ্ট চেষ্টা করেও তার ছবি আর তার মতামতের মধ্যকার যাবতীয় পরস্পর বিরোধিতার ব্যাখ্যা করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি। যেমন ধরুন, মেইসোনিয়েরকে সে ভীষণ শ্রদ্ধা করত, আর অ্যাঁগরকে করত প্রচণ্ড অপছন্দ। দেগা সম্বন্ধে তার ছিল হতাশা আর সেজান তো একটা হামবড়া লোক ছাড়া আর কিছুই নয়, মঁতিচেল্লির কথা ভাবলেই তার কান্না পেত।

একটা ব্যাপারে সে খুব চটে উঠত, সেটা হল আমি যে বুদ্ধিমান এই কথাটা স্বীকার করা, কারণ আমার কপালটা ছিল খুবই নিচু, সেটা তো নির্বুদ্ধিতারই লক্ষণ! আর এইসব কিছুর মধ্যে ছিল এক বিশাল কোমলতা, বা বলা যায় 'সুসমাচার' ধরনের পরহিত-চিন্তা।

প্রথম মাস থেকেই আমার নজরে পড়ল যে আমাদের যৌথ অর্থভাণ্ডারটিও একই রকমের একটা জগাখিচুড়ি ব্যাপার হয়ে উঠেছে। কী করি আমরা? পরিস্থিতিটা বেশ বিড়ম্বনাময়। অর্থভাণ্ডারটা মাঝামাঝি ধরনের, ওর ভাই সেটা পূরণ করত। ভাই কাজ করত গুপিল কোম্পানিতে। আমার অংশটা দেওয়া হত ছবির বিনিময়ে। ওর অত্যধিক স্পর্শকাতর মনকে বিঘ্নিত করার ঝুঁকি নিয়েই ব্যাপারটার আলোচনা তুলতে হল। খুব সাবধানে আর মিষ্টি কথা বলে, যা আমার রীতিমত স্বভাববিরুদ্ধ, ব্যাপারটা আমি তুললাম। যতটা ভেবেছিলাম তার থেকে অনেক বেশি সহজেই আমি যে সফল হলাম একথা আমায় স্বীকার করতেই হবে।

এত টাকা রাত্রিবেলার জন্য, এত টাকা স্বাস্থ্যকর ভ্রমণের জন্য, এত টাকা তামাকের জন্য, ঘরভাড়া সমেত আচমকা খরচ বাবদ এত টাকা—এই ভাবে ভাগ করে একটা বাক্সতে সব

টাকাপয়সা আমরা রাখলাম। সেই সঙ্গে রইল কাগজ-পেন্সিল, ক্যাশবাক্স থেকে আমরা যে যা নিচ্ছি সততার সঙ্গে তার হিসাব লিখে রাখার জন্য। অন্য একটা বাক্সে চার ভাগে ভাগ করে রাখা হল বাকি সম্পদ, প্রত্যেক সপ্তাহের খাইখরচ বাবদ। আমাদের ছোটো রেস্তোরাঁটায় যাওয়া আমরা বন্ধ করে দিলাম। একটা ছোট্ট গ্যাসস্টোভে আমি রান্না করতাম, আর ভিনসেন্ট বাজার করে আনত বাড়ি থেকে বেশি দূর না গিয়ে। একদিন অবশ্য ভিনসেন্ট চাইল স্যুপটা রাঁধবে। কী ভাবে যে আনাজপাতি মেশাল জানি না—যে ভাবে সে তার ছবিতে রঙ মেশাত সেই মতোই হবে সম্ভবত। যাই হোক সে-জিনিস আমরা মুখে দিতে পারলাম না। আর ভিনসেন্ট আমার হো-হো করে হেসে উঠে বলল: 'তারাসঁ! লা কাসকেত ও প্যার দোদে!' যার অর্থ 'তারাসঁ! বুড়ো দোদের গল্পের মুষলধারা!'

কতদিন আমরা একসঙ্গে ছিলাম? ঠিক বলতে পারব না, কারণ সে-সব কথা আমি সম্পূর্ণ ভুলে গেছি। যদিও বিপর্যয়টা খুব তাড়াতাড়িই ঘটেছিল, আর আমিও অধীর হয়ে কাজ শুরু করে দিয়েছিলাম, ঐ সময়টা আমার কাছে মনে হয় যেন এক শতাব্দীর মতো।

লোকে এ কথা জানে না যে দুজন মানুষ সেই সময়টায় বিপুল পরিমাণ কাজ করেছে আর তাদের দুজনেরই তাতে উপকার হয়েছিল। অন্যদেরও সম্ভবত তাই? কিছু কিছু জিনিসে ফল ধরে।

আর্লে গিয়ে যখন পৌঁছলাম ভিনসেন্ট তখন নিও-ইম্প্রেশনিস্টদের মতবাদে ডুবে আছে আর বেশ নাকানি-চোবানি খাচ্ছে, তাতে তার কষ্ট হচ্ছিল। ঐ মতগোষ্ঠীটা যে, অন্যান্য মতগোষ্ঠীর মতোই, খারাপ ছিল সেই কারণে নয়। কারণটা হল এটা তার স্বভাবের সঙ্গে খাপ খেত না, তার স্বভাবটা ছিল ধৈর্যহীন আর স্বাধীনচেতা মানুষের।

নীলাভ লালের উপর হলুদের মিশ্রণ যতই সে করুক না কেন, কমপ্লিমেন্টারি রঙ নিয়ে এলোপাথাড়ি যত কাজই করুক না কেন, যেটুকু সে আয়ত্ত করতে পেরেছিল তা হল কিছু কিছু কোমল, অসম্পূর্ণ, একঘেয়ে হার্মনি: তূর্যধ্বনি শোনা যায় নি।

ওকে এ-বিষয়ে আলোকিত করার দায়িত্ব আমি নিলাম। কাজটা বেশ সহজই হল, কারণ জমিটা দেখলাম সমৃদ্ধ আর উর্বরা। ব্যক্তিত্বের ছাপওয়ালা যাবতীয় স্বাধীন প্রকৃতির মানুষের মতো লোকে কী বলবে তা নিয়ে ভিনসেন্টের এতটুকু মাথাব্যথা ছিল না, এতটুকু একগুঁয়েমিও তার ছিল না।

সেদিন থেকে আমার বন্ধু ভ্যান গঘ আশ্চর্য রকমের উন্নতি করতে থাকল; নিজের ভিতরে যা কিছু ছিল সেই সব-কিছুর আভাস সে দেখতে পাচ্ছে বলে মনে হতে লাগল, সেই থেকে এই সূর্যের পর সূর্য, সূর্যের আলোয় দীপ্যমান সূর্যের অবিচ্ছিন্ন সারি।

প্রকরণগত অনুপুঙ্খ নিয়ে কথা বলাটা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে। আমার লক্ষ্য হল আপনাদের এই কথাটা শুধু জানানো যে ভ্যান গঘ তার আপন মৌলিকতার এক কণাও না ছাড়িয়ে সব থেকে বেশি সাহায্য যাতে হয় এমন উপদেশ আমার কাছ থেকে নিয়েছিল। আর তার জন্য প্রতিদিন সে আমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকত। মঁসিয়ে ওরিয়েরকে সে যে লিখেছিল পল গোগ্যাঁর কাছে তার অনেক ঋণ তা দিয়ে এই কথাটাই সে বোঝাতে চেয়েছিল।

আমি যখন আর্লে গিয়ে পৌঁছলাম ভিনসেন্ট তখনও তার পথ খুঁজছে, আর বয়সে তার

থেকে অনেক বড়ো আমি তখন ইতোমধ্যেই পরিপক্ক একজন মানুষ। তা সত্ত্বেও ভিনসেন্টকে যেটুকু জ্ঞান দিয়ে আমি সাহায্য করেছিলাম তার সঙ্গে সঙ্গে অন্য কিছু কিছু ব্যাপারে আমিও তার কাছে ঋণী। কারণ সেই অভিজ্ঞতাটি ছবি আঁকা সম্বন্ধে আমার নিজের পূর্বতন ধ্যানধারণাগুলিকে সংহত করতে সাহায্য করল। আর আমার জীবনের কষ্টকর অধ্যায়গুলিতেও আমি মনে করতে পারি কিছু মানুষ আছে যারা আমার থেকেও বেশি অসুখী।

...আমার আর্লে থাকার শেষ দিকটাতে ভিনসেন্ট ভীষণ অসংলগ্ন ব্যবহার আর চেঁচামেচি করে উঠত; তারপরেই আবার চুপচাপ হয়ে যেত। কয়েকবার, রাত্রে, ঘুম ভেঙে উঠে ভিনসেন্ট আমার বিছানার উপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে থাকত তা দেখেছি।

কী করে যে ঠিক সেই সময়টাতেই আমার ঘুম ভেঙে যেত?

কারণ যাই হোক না, কী আর করব, গম্ভীরভাবে তাকে বলতাম, 'কী ব্যাপার, ভিনসেন্ট?' অমনি একটি কথাও না বলে সে ফিরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে মড়ার মতো ঘুমিয়ে পড়ত।

সূর্যমুখী ফুলের যে স্টিল-লাইফ আঁকতে সে খুব ভালোবাসত সেই ছবি-আঁকতে থাকা অবস্থায় তার একটা পোর্ট্রেট আঁকব স্থির করলাম। প্রতিকৃতিটা আঁকা শেষ হলে আমাকে সে বলল, 'ওটা আমি তা ঠিক, তবে পাগল হয়ে যাওয়া আমি।'

সেইদিনই সন্ধ্যায় কাফেতে গেলাম আমরা। ও একটা হালকা আবসাঁতের অর্ডার দিল। হঠাৎ গ্লাসটা এবং তার ভিতরের পানীয়টা সে আমার মুখে ছুঁড়ে দিল। আমি পাশ কাটিয়ে ওকে ধরে ফেললাম, কাফে থেকে ওকে বাইরে নিয়ে গিয়ে ভিক্তর উগো স্কোয়ার পার হয়ে চললাম। কয়েক মিনিট পরেই ভিনসেন্ট তার নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ল এবং কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল, সকালের আগে সে-ঘুম আর তার ভাঙল না।

ঘুম ভাঙার পর ও সম্পূর্ণ শান্ত, আমাকে বলল : "প্রিয় গোগ্যাঁ, আবছা মনে পড়ছে গতকাল রাত্রে তোমায় আমি আঘাত দিয়েছি।"

জবাব: "আমি তোমায় সানন্দে এবং সর্বান্তঃকরণে ক্ষমা করেছি, কিন্তু গতকালের ঘটনা আবার ঘটতে পারে, আর আমাকে যদি আঘাত করা হয়, আত্মসংযম হারিয়ে ফেলে আমি তোমার গলা টিপে ধরতে পারি। অতএব, অনুমতি দাও, তোমার ভাইকে লিখে দিই আমি ফিরে যাচ্ছি।"

কী একখানা দিন, হায় ভগবান! সন্ধ্যা হতে আমি অল্প একটু ডিনার খেলাম, ইচ্ছে হল একটু ফুটন্ত লরেলের সুবাসের মধ্যে পায়চারি করে আসি। ভিক্তর উগো স্কোয়ারের উল্টো দিকটায় প্রায় গিয়ে পৌঁছেছি এমন সময় কানে এল সুপরিচিত ছোটো ছোটো পায়ের শব্দ, দ্রুত এবং ঝাঁকি দিয়ে চলা পায়ের শব্দ। আমি ফিরে দাঁড়াতেই ভিনসেন্ট আমার দিকে ছুটে এল, হাতে তার খোলা একখানা ক্ষুর। আমার চোখের দৃষ্টিটা নিশ্চয়ই তখন খুব কঠিন হয়েছিল, কারণ সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, মাথা নিচু করল, আর তারপর দৌড়ে বাড়ির দিকে ফিরে গেল।

আমি কি কাপুরুষের মতো আচরণ করেছিলাম তখন? আমার কি উচিত ছিল তাকে নিরস্ত্র করে শান্ত করার চেষ্টা করা? এই ব্যাপারে নিজের বিবেককে আমি প্রায়ই প্রশ্ন করেছি, কিন্তু নিজেকে দোষ দেওয়ার মতো কিছু পাইনি। যার ইচ্ছে হয় আমার গায়ে ঢেলা ছুঁড়ুক! আমি

সোজা চলে গেলাম আর্লের একটা ভালো হোটেলে, কটা বেজেছে জেনে নিয়ে একটা ঘর ভাড়া করে শুয়ে পড়লাম। এত বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম আমি যে ভোর তিনটে অবধি ঘুমাতেই পারলাম না, উঠলাম যাকে বলে দেরি করে, প্রায় সাড়ে সাতটায়।

স্কোয়ারটায় পৌঁছে দেখলাম বেশ ভিড় জমে গেছে। আমাদের বাড়ির কাছে কয়েকজন পুলিস ঘোরাফেরা করছে, আর বোলার হ্যাট পরা একজন ছোটোখাটো চেহারার মানুষ, লোকটা পুলিস-প্রধান।

ব্যাপারটা ঘটেছিল এইরকম: বাড়ি ফিরে গিয়ে ভ্যান গঘ তৎক্ষাণাৎ তার কান কেটে ফেলে, মাথার খুব কাছ ঘেঁসে। রক্তস্রোত বন্ধ করতে নিশ্চয়ই তার অনেকক্ষণ সময় লেগেছিল, কারণ পরের দিন একতলার ঘর দুটির মেঝেয় কয়েকটা তোয়ালে পড়ে থাকতে দেখা যায়! রক্তটা দুটি ঘরকেই এবং আমাদের শোবার ঘরের দিকে উঠে যাওয়া ছোট্ট সিঁড়িটাকে নোংরা করে দিয়েছিল।

বাইরে বেরোবার মতো ভালো অবস্থা হতে মাথার উপর বেশ খানিকটা নিচু করে একটা বাস্ক দেশীয় বেরে টুপি পরে সে সোজা একটা বাড়িতে গিয়ে হাজির, যেখানে আপনার দেশগাঁয়ের কোনো মেয়েকে দেখতে যদি না-ও পান অন্তত কথাবার্তা বলার মতো একজনের দেখা পাবেন। যত্ন করে ধোয়া এবং খামে বন্ধ করা নিজের কানটি সেখানকার কর্তব্যরত পাহারাদার লোকটির হাতে তুলে দিয়ে বলে, "এই নাও, আমার স্মৃতিচিহ্ন।" তারপর সেখান থেকে পালিয়ে বাড়িতে গিয়ে বিছানায় শুতে যায় এবং ঘুমিয়ে পড়ে, তবে প্রথমে জানালার খড়খড়িগুলো বন্ধ করা এবং জানালার কাছেই টেবিলের উপর একটা ল্যাম্প জ্বালিয়ে রেখে দেওয়ার কষ্টটুকু স্বীকার করে।

দশ মিনিটের মধ্যে গণিকাদের জন্য সংরক্ষিত গোটা রাস্তাটাতে তুমুল হৈ চৈ পড়ে যায় আর যে ঘটনাটা ঘটেছিল তার সম্বন্ধে লোকে বলাবলি করতে থাকে।

আমি যখন আমাদের বাড়ির দরজায় পৌঁছলাম এসব ব্যাপারের কথা আমার মনে আদৌ সন্দেহ হয়নি, বোলার হ্যাট পরা লোকটি ধাঁ করে এবং খুব কর্কশস্বরে আমাকে বলল, "তা মশাই আপনার স্যাঙাতটির কী করেছেন আপনি?"

"আমি তো জানি না..."

"হাঁ, হাঁ, জানেন...বেশ ভালোই জানেন... সে মারা গেছে।"

এই অবস্থায় কোনো লোক পড়ুক আমি কামনা করি না, কয়েক মিনিট আমার লাগল ভালো করে চিন্তা করতে এবং বুকের ধড়ফড়ানি সামলে নিতে। রাগে, দুঃখে এবং কষ্টে আর ঐ সমস্ত লোকের চোখ আমাকে খুবলে খাওয়ার লজ্জায় আমার দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। তোতলাতে তোতলাতে বললাম, "ঠিক আছে, স্যার, চলুন উপরে যাই, সেখানে বসে ব্যাপারটা আলোচনা করা যাক।"

ভিনসেন্ট কুঁকড়ে সুঁকড়ে বিছানায় শুয়ে আছে, আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দেওয়া এবং মনে হচ্ছে প্রাণ নেই। আস্তে আস্তে, খুব ধীরে ধীরে তার গায়ে হাত দিলাম; গায়ের উত্তাপটা অনুভব করে বুঝলাম ও বেঁচে আছে। মনে হল আমার সমস্ত বুদ্ধি ও শক্তি যেন নবজীবন লাভ করল।

প্রায় ফিসফিস করে পুলিসের কর্তাকে বললাম: "স্যার, দয়া করে সাবধানে লোকটার ঘুম

ভাঙান, আপনি জানেন কেমন করে ভাঙাতে হয়, ও যদি আমার খোঁজ করে, বলবেন আমি পারি চলে গেছি; আমাকে দেখলে ব্যাপরটা ওর পক্ষে প্রাণঘাতক হবে।"

এ কথা আমাকে বলতেই হবে যে সেই মুহূর্ত থেকে পুলিসের কর্তা আমার সঙ্গে যতদূর সম্ভব ভদ্র হওয়া যায় ততদূর ভদ্র আচরণ করতে লাগল এবং হুঁস করে একজন ডাক্তার ও একটা গাড়ি ডেকে পাঠাল। ঘুম ভাঙতেই ভিনসেন্ট তার স্যাঙাতের খোঁজ করে, পাইপ আর তামাক চায়, এমন কি নিচের তলায় যে বাক্সটাতে আমাদের টাকাপয়সা থাকত সেটার খোঁজ নেওয়ার কথাও চিন্তা করে। নিঃসন্দেহে ও সন্দেহ করেছিল আমাকে—যে আমি যাবতীয় দুঃখদুর্দশার বিরুদ্ধেই ইতোমধ্যে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলাম!

ভিনসেন্টকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল আর সেখানে গিয়ে তৎক্ষণাৎ তার মন আবার এলোমলো ঘুরে বেড়াতে লাগল। বাকি সমস্ত ব্যাপার যাদের এতে আগ্রহ আছে তাদের কাছে ইতোমধ্যেই জানা হয়ে গেছে, আর সে-সব কথা আলোচনা করে লাভও কিছু নেই, একমাত্র একটি ব্যাপার ছাড়া। সেটি হল উন্মাদ আশ্রমে প্রত্যেক মাসেই যে লোকটার বুদ্ধিসুদ্ধি একটু একটু করে এতটা ফিরে এল যে নিজের অবস্থাটা সে বুঝতে পারে এবং প্রচণ্ড উন্মাদনায় তার সেইসব প্রশংসনীয় ছবিগুলি এঁকে যেতে থাকল সেই লোকটার কী যে যন্ত্রণা!

শেষ যে চিঠিটা আমি পাই সেটা ওভার থেকে, পঁ তোয়াজের কাছে, লেখা। লিখেছিল সে আশা করছে যথেষ্ট আরোগ্যলাভ করবে যাতে ব্রিতানিতে এসে আমার সঙ্গে মিলতে পারে, তবে আজ সে স্বীকার করতে বাধ্য যে আরোগ্যালাভ অসম্ভব। "প্রিয় গুরু" (এই একবারই মাত্র ঐ শব্দটা সে ব্যবহার করেছিল), "তোমাকে জানার পর এবং তোমাকে কিছু কষ্ট দেওয়ার পর মনের অধঃপতিত অবস্থার থেকে সুস্থ অবস্থায় মরাটা অনেক বেশি মূল্যবান।"

তারপর নিজের পেটে সে গুলি করে, আর তার বেশ কয়েক ঘণ্টা পরে, নিজের বিছানায় শুয়ে পাইপ টানতে টানতে সে মারা যায়। মন তার তখন পুরোপুরি সজাগ, নিজের শিল্পের প্রতি তার ভালোবাসা নিয়ে, মানবজাতির প্রতি এতটুকু ঘৃণা না নিয়ে সে মারা যায়।

লে মঁস্তর গ্রন্থে জাঁ দোল্যাঁ লিখেছেন: "গোগ্যাঁ যখন ভিনসেন্ট কথাটা উচ্চারণ করেন, তাঁর গলাটা ভারি নরম হয়ে যায়।" না জেনেও ব্যাপারটা তিনি আঁচ করেছিলেন। জাঁ দোল্যাঁ ঠিকই বলেছেন। বুঝতেই পারছেন কেন।

অনুবাদ : রণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পল সিন্যাক

ভিনসেন্টকে শেষ দেখি ১৮৮৯-এ আর্লে শহরে। তিনি তখন সেখানকার উন্মাদাশ্রমে দিন কাটাচ্ছেন।

এর কিছুদিন আগেই তিনি নিজের কানের লতি কেটে ফেলেছেন এবং সেটা যে কীবকম পরিস্থিতিতে তা আপনারা সকলেই জানেন। কিন্তু যেদিন আমি ওঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই, সেদিন উনি স্বাভাবিকই ছিলেন এবং তাঁর গৃহ-চিকিৎসক আমাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দেন।

তখন তাঁর মাথা জোড়া সেই বিখ্যাত ব্যাণ্ডেজ এবং ফারের টুপি। আমাকে তিনি পথ দেখিয়ে নিয়ে যান প্লাস লামার্তিন-এ, তাঁর নিজস্ব কক্ষে, যেখানে আমি দেখলাম তাঁর অনন্য সাধারণ চিত্রাবলী, তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তিসম্ভার ল্য আলিসফাঁপ, দ্য নাইট কাফে, ল্য বেসুর্য়জ, দ্য লক্, স্যাঁৎ-মরি, দ্য স্টারি নাইট প্রভৃতি। কল্পনা করুন চুনকাম-করা সেই ঘরের দেওয়ালের উজ্জ্বল দীপ্তি, যার গায়ে বিকশিত হচ্ছে সেই সমস্ত বর্ণময়তা তাদের বিশুদ্ধ রূপ নিয়ে।

সারাদিন আমার সঙ্গে কথা বলে গেলেন তিনি চিত্রাঙ্কন, সাহিত্য, সাম্যবাদ প্রসঙ্গে। সন্ধে নাগাদ ক্লান্ত হয়ে পড়লেন সামান্য। কিছুক্ষণ আগেই বয়ে গেছে প্রচণ্ড এক ঈশানী ঝড় এবং বোধ করি এই কারণেই তিনি অবসন্ন হয়ে থাকবেন। টেবিলের পর এক কোয়ার্ট বোতল তার্পিন তেল ছিল। তিনি তা চাইলেন পান করার জন্যে। উন্মাদাশ্রমে ফেরার সময় হয়ে গিয়েছিল।

পরদিন বিদায় নিতে গেলাম তাঁর কাছে; তারপর ক্যাসি অভিমুখে রওনা হলাম, সেখানে পৌঁছানোর পর শিল্প এবং মৈত্রী বিষয়ক বক্তব্যে পূর্ণ তাঁর একটি সুন্দর চিঠি পাই। আরও জানান আমার যাওয়াতে তিনি কতই না খুশি হয়েছিলেন, এবং সেইসঙ্গে একটি চমৎকার ছবি এঁকে দেন।

আর কোনোদিনও দেখা হয়নি তাঁর সঙ্গে...

অনুবাদ : অনির্বাণ রায়

জঁ কালমা

ভিনসেন্ট ছিল একেবারেই মুখচোরা। এখনো আমার চোখে একটা ছবি ভেসে ওঠে। আমি তখন একটা দোকানে কাজ করতাম। প্রায়ই দেখতাম একমাথা লাল চুল নিয়ে সে দোকানের দরজা আলতো ঠেলে ঢুকে পড়ত। ভারি বিনীত, লাজুক ভঙ্গি। একটা তুলি কিনবার আগে অনেকক্ষণ ধরে ওটাকে ও নেড়েচেড়ে পরখ করে নিত। তখন কি আর জানতাম, ছেলেটার ভিতরে এত বিরাট প্রতিভা লুকিয়ে আছে।

অনুবাদ : অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

[আমার কথা]

ভিনসেন্ট ভ্যান গঘ

শ্রদ্ধেয় মহাশয়,

এক যাজকের পুত্র, বাঁচবার জন্য যাকে কাজ করতে হয়, কিংস কলেজে পড়বার মতো যার না আছে সময় না অর্থ, সেখানে ভর্তি হবার সাধারণ বয়সও যে কয়েক বছর হল পেরিয়ে এসেছে এবং এমন কি লাতিন আর গ্রীক -এর প্রাথমিক পাঠ যে শুরু করেনি, তা সত্ত্বেও, চার্চ সংক্রান্ত কোনো কাজ পেলে সুখী হবে যদিও স্নাতক যাজকের পর্যায়ে পৌঁছান তার সাধ্যাতীত।

আমার পিতা হল্যান্ডের এক গ্রামের যাজক। এগারো বছর বয়সে আমি স্কুলে যেতে শুরু করি। ষোল বছর বয়স পর্যন্ত পড়েছিলাম। তারপর একটা জীবিকা ঠিক করে নিতে হয়েছিল আমাক যদিও জানতাম না কী ঠিক করব। আমার এক কাকার, আর্ট ডিলার আর এনগ্রেভিং প্রকাশক গুপিল অ্যান্ড কোম্পানির অংশীদার, সুপারিশে দ্য হেগে তাঁদের ব্যবসায়ে একটা কাজ পেয়েছিলাম। তিন বছর সেখানে কাজ করি। সেখান থেকে লন্ডন যাই ইংরেজি শিখতে, দু-বছর পরে লন্ডন ছেড়ে আসি পারিতে।

নানারকম পরিস্থিতির চাপে গুপিল অ্যান্ড কোম্পানি ছেড়ে দিই, রামসগেটে মি. স্টোকস-এর স্কুলে দু-মাস পড়াই। কিন্তু যেহেতু আমার লক্ষ্য হল চার্চ সংক্রান্ত কোনো কাজ করা, আমি অবশ্যই কিছু একটা আশা করব। যদিও চার্চের শিক্ষায় আমি শিক্ষিত নই, সম্ভবত আমার ঘুরে বেড়ানো, নানা দেশের অভিজ্ঞতা, নানারকম মানুষের সঙ্গে মেলামেশা, গরীব-বড়োলোক, ধর্মপ্রাণ-অধার্মিক, নানা ধরনের কাজের অভিজ্ঞতা—শারীরিক পরিশ্রম এবং দপ্তরের কাজ, একাধিক ভাষায় কথা বলা কলেজে-না-পড়া পুষিয়ে দিতে পারে। কিন্তু যে-কারণে আপনার কাছে নিজের পরিচয় তুলে ধরতে চাই তা হল চার্চ এবং চার্চ-সংক্রান্ত যে-কোনোকিছুর প্রতি আমার সহজাত ভালোবাসা। সবসময় এ ঘুমিয়ে থাকে আবার জেগেও ওঠে। আর, যদি এমন বলি, যদিও অনুভূতিতে ঘাটতি থাকতে পারে যথেষ্টই, "ঈশ্বর এবং মানব প্রীতি"। আর যখন আমার অতীত জীবন আর হল্যান্ডের গ্রামে পিতার বাড়ির কথা ভাবি, তখন আমার এই অনুভূতি হয়: "পিতঃ, স্বর্গের বিরুদ্ধে আমি পাপ করেছি, এবং তোমার কাছে, তোমার সন্তান বলে অভিহিত হবার যোগ্য আর আমি নই : আমাকে তোমার ভাড়াটে ভৃত্যদের একজন করে নাও। পাপী আমার প্রতি ক্ষমাশীল হও।"

লন্ডনে থাকার সময় আমি প্রায়ই চার্চে যেতাম আপনার কথা শুনতে, আপনাকে ভুলিনি। এখন একটা কাজের জন্য আপনার সুপারিশ প্রার্থনা করছি, প্রার্থনা করি কাজ পেলে আপনি আমার উপর পিতৃসুলভ দৃষ্টি রাখবেন। আমি বড়ো বেশি আত্মনির্ভর আর আমি মনে করি আপনার পিতৃপ্রতিম দৃষ্টি আমার মঙ্গল করবে। আমার জন্য আপনি যা করতে পারেন তার জন্য অগ্রিম ধন্যবাদ জানিয়ে...

অনুবাদ : অনির্বাণ রায়

[জীবন তীর্থযাত্রীর পথপরিক্রমা]

ভিনসেন্ট ভ্যান গঘ

গীতসংহিতা ১১৯ : ১৯ পৃথিবীতে আমি ভিন্‌দেশী, তোমার আজ্ঞাগুলি আমার কাছ থেকে গোপন করো না। আমাদের জীবন যে তীর্থযাত্রীর পথপরিক্রমা এ বোধটি প্রাচীন, এ বোধটি ভালোও বটে। কিন্তু এমনটি হলেও আমরা নিঃসঙ্গ নই কারণ পরমপিতা আমাদের সঙ্গেই আছেন।

আমরা তীর্থযাত্রী, আমাদের জীবন পৃথিবী থেকে স্বর্গে সুদীর্ঘ পরিক্রমা।

এ জীবনের সূত্রপাত এইরকম: একজনই আছেন যিনি 'একটি মানুষ পৃথিবীতে জন্মাল' এই আনন্দে জীবনের দুঃখ এবং মর্মযন্ত্রণা আব স্মরণ করেন না। তিনি আমাদের জননী। আমাদের তীর্থযাত্রার অন্তে আছে পিতার ভবনে প্রবেশ যেখানে অনেক মহল আছে, যেখানে তিনি আমাদের পূর্বেই গেছেন আমাদের স্থান প্রস্তুত করতে। আমরা যাকে মৃত্যু বলি তা-ই হল জীবনের অবসান, সে এক প্রহর যখন শব্দ উচ্চারিত হয়, কিছু কিছু ব্যাপার দৃষ্ট ও অনুভূত হয় যা পার্শ্ববর্তীদের হৃদয়ে গোপন কক্ষে রাখা থাকে— যথার্থই আমাদের সকলেরই হৃদয়ে এ সব বা এসবের পূর্বাভাস থাকে। যে লগ্নে কোনো মানবসন্তান পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে তখন থাকে দুঃখ, আবার গভীর অনুচ্চার্য আনন্দও, এমন কৃতজ্ঞতা যা ঊর্ধ্বতম স্বর্গে পৌঁছয়। হ্যাঁ, দেবদূতরা স্মিতহাস্য করে, আশা করে, উল্লাস করে যে একটি মানব পৃথিবীতে জন্ম নিল। মৃত্যুলগ্নে দুঃখ থাকে, কিন্তু যে ব্যক্তি জীবনে উত্তম যুদ্ধ করে গেল তার মৃত্যুলগ্নে অনির্বচনীয় আনন্দও থাকে। একজন বলেছেন, 'আমিই পুনরুত্থান ও জীবন, ও আমাকে বিশ্বাস করে তার মৃত্যু হলেও সে জীবিত থাকবে।' এক দেবপ্রেরিত ব্যক্তি স্বর্গ থেকে এই বাণী শুনলেন: 'ধন্য তারা যারা মৃত্যুতে প্রভুর মধ্যে বিলীন হয়, কারণ তারা কর্মের অন্তে বিশ্রাম পায় এবং তাদের কর্ম তাদের অনুগমন করে'। পৃথিবীতে কেউ জন্মালে আনন্দ হয় এবং সে-হর্ষের চেয়ে অধিকতর হর্ষ যখন একটি মানবাত্মা বিষম তাড়নার মধ্যে দিয়ে পেরিয়ে যায়, যখন স্বর্গে এক দেবদূতের জন্ম হয়। দুঃখ সুখের চেয়ে ভালো —এবং হর্ষের মধ্যেও হৃদয় বিষণ্ণ থাকে— এবং উৎসবের গৃহে যাওয়ার চেয়ে শেষের গৃহে যাওয়াই ভালো, কারণ বাহিরের লোকের মধ্যে দিয়ে হৃদয় উৎকর্ষ লাভ করে। আমাদের প্রকৃতিই দুঃখের, কিন্তু যারা যীশু খ্রীস্টকে দেখেছে বা দেখতে শিখছে তাদের পক্ষে সর্বদাই আনন্দিত হবার হেতু থাকে। সন্ত পলের কথাটি উত্তম 'দুঃখিত হয়েও সতত হৃষ্ট থাকা'। যারা যীশু খ্রীস্টকে বিশ্বাস করে তাদের কাছে কোনো মৃত্যু বা দুঃখই নেই যা আশার সঙ্গে সংসৃষ্ট নয়— কোনো নৈরাশ্য নেই—আছে শুধু প্রতিনিয়ত পুনর্জাত হওয়া, প্রতিক্ষণ অন্ধকার থেকে আলোকে উত্তীর্ণ হওয়া। যারা সম্পূর্ণ আশাহত তাদের মতো এরা বিলাপ করে না, খ্রীস্টীয় বিশ্বাস জীবনকে চিরহরিৎ জীবনে পরিণত করে।

পৃথিবীতে আমার তীর্থযাত্রী, বিদেশী— বহুদূর থেকে আমরা এসেছি, যাচ্ছিও বহুদূরে। পৃথিবীতে আমাদের এ যাত্রা স্নেহময়ী জননীর বক্ষ থেকে স্বর্গে পিতার ক্রোড় পর্যন্ত। পৃথিবীতে

সব কিছুরই পরিবর্তন হয়— এখানে আমাদের কোনো স্থায়ী বাসের নগর নেই—সকল মানুষেরই এই অভিজ্ঞতা। এই হল ঈশ্বরের ইচ্ছা যে পৃথিবীতে যা কিছু আমাদের প্রিয়তম তা আমাদের ছেড়ে যেতে হবে, আমরা নিজেরাও বহুভাবে পরিবর্তিত হব, আমরা যা ছিলাম তা এখন নই। যা এখন আছি তা থাকব না। শৈশব থেকে আমরা কিশোর-কিশোরী হয়ে উঠি, তরুণ-তরুণী —ঈশ্বর যদি সময় দেন তবে স্বামী-স্ত্রী, জনকজননীও হই যথাকালে এবং ক্রমে যে মুখ প্রভাতের শিশিরে সিক্ত হয়েছিল তা-ই হয়ে ওঠে কুঞ্চিত। যৌবনের আভায় ও আনন্দে দীপ্ত নেত্রদুটিও যেন এক গভীর আন্তরিক এবং একান্ত শোক প্রকাশ করে যদিও সেগুলিতে বিশ্বাস আশা ও করুণা থাকে—যদিও সেগুলিতে ঐশিক আত্মার উজ্জ্বলতা থাকে কেশ পলিত হয় বা বিরল হয়ে যায়— আহ, যথার্থই আমরা পৃথিবীর মধ্যে দিয়ে পার হয়ে যাই, জীবনের মধ্যে দিয়ে পার হয়ে যাই, পৃথিবীতে আমরা পরদেশী এবং তীর্থযাত্রী। পৃথিবী ও তার সমস্ত গৌরব বিলুপ্ত হয়ে যায়। আমাদের শেষের দিনগুলো যেন তোমার কাছাকাছি কাটে, এ দিনগুলোর চেয়ে যেন আরও ভালো হয়।

তবু আমরা যেমন তেমনভাবে এক প্রহর থেকে আর এক প্রহরে বেঁচে থাকতে পারি না। কী আমাদের করণীয়: আমাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে ঈশ্বরকে ভালোবাসতে হবে, সমস্ত ক্ষমতা দিয়ে, সমস্ত চিত্ত দিয়ে, আমাদের প্রতিবেশীদের নিজের মতোই ভালোবাসতে হবে। এ দুটি অনুজ্ঞা আমাদের রাখতেই হবে, এবং এগুলি যদি পালন করি, এগুলির প্রতি যদি আমাদের নিষ্ঠা থাকে, তবে আমরা নিঃসঙ্গ নই, কারণ আমাদের স্বর্গীয় পিতা আমাদের সঙ্গে আছেন, তিনি আমাদের সাহায্য করেন, পথনির্দেশ দেন, প্রতিদিন আমাদের শক্তি জোগান; কাজেই যে খ্রীস্ট আমাদের শক্তি দেন তাঁর সাহায্যে আমরা সব কিছুই করতে পারি। এ পৃথিবীতে আমরা বিদেশী, তোমার আজ্ঞাগুলি আমাদের কাছ থেকে আবৃত রেখো না। আমাদের দৃষ্টি উন্মুক্ত করো যেন তোমার আজ্ঞাবলীতে আমরা বিস্ময়কর বিষয়গুলি প্রত্যক্ষ করি। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করতে শিক্ষা দাও, আমাদের হৃদয়কে প্রভাবিত করো যেন খ্রীস্টের প্রেম আমাদের সংযত করে, এবং পরিত্রাণ পাবার জন্য যা করণীয় তা যেন আমরা করতে পারি।

পৃথিবী থেকে স্বর্গের পথে
তোমার নেত্র আমাদের পথ দেখাক;
আমরা দুর্বল, কিন্তু তুমি তো শক্তিমান্
তোমার দৃঢ় হাতে আমাদের ধরে রাখো।

আমাদের জীবনকে আমরা একটি যাত্রার সঙ্গে তুলনা করতে পারি, আমরা যেখানে ছিলাম যেখানে জন্মেছিলাম সেখান থেকে বহুদূরের স্বর্গের অভিমুখে এ যাত্রা। আমাদের প্রথম জীবন নদীতে নৌকা বাওয়ার সঙ্গে তুলনীয়, দেখতে দেখতে ঢেউগুলো উঁচু হয়ে ওঠে, বুঝতে পারবার আগেই আমরা সমুদ্রে গিয়ে পড়েছি— হৃদয় থেকে ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রার্থনা উত্থিত হয়: 'রক্ষা করো, ঈশ্বর, নৌকা আমার বড়ো ছোটো, তোমার সমুদ্র বিপুল।' মানুষের হৃদয়ও সমুদ্রেরই মতো, সেখানেও ঝড় আছে, জোয়ারভাঁটা আছে গভীর স্থান আছে, মুক্তাও আছে। যে হৃদয় ঈশ্বরের সন্ধান করে, ধার্মিক জীবনের সন্ধান করে তার ভাগ্যে অন্যের চেয়ে বেশি ঝঞ্ঝা। গীতসংহিতাকার

কেমন করে সমুদ্রে ঝড়ের বর্ণনা করেন দেখা যাক। এ ঝঞ্ঝাকে তিনি নিশ্চয়ই জীবনে উপলব্ধি করেছিলেন তাই এমন করে বর্ণনা করতে পেরেছেন। ১০৭নং গীতে দেখি: যারা অর্ণবপোতে সমুদ্রযাত্রা করে, বিপুল জলসম্ভারের মধ্যে দিয়ে যারা বাণিজ্য করে তারা ঈশ্বরের কৃতি দর্শন করে, অতলান্তের গভীর রহস্য দেখতে পায়। তিনি আজ্ঞা দিয়ে ঝঞ্ঝাবাত্যাকে ডেকে আনেন, যা তরঙ্গগুলিকে ঊর্ধ্বে উত্থিত করে। তারা স্বর্গ পর্যন্ত ঊর্ধ্বগামী হয় আবার গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করে এইসব ক্লেশে তাদের চিত্ত ভিতরে ভিতরে যেন বিগলিত হয়। তখন ক্লেশের মধ্যে তারা ঈশ্বরের উদ্দেশে আর্তরব জানায় এবং তিনি তাদের সংকট থেকে ত্রাণ করে আনেন।

তিনি তাদের ঈপ্সিত স্বর্গে নিয়ে আসেন।

আপনাদের মধ্যে প্রত্যেকেই কি আমারই সঙ্গে জীবনের ঝঞ্ঝা অনুভব করেন না কিংবা সে সবের পূর্বাভাস বা স্মৃতি ?

এখন আসুন আমরা 'নববিধানের' আর একটি ঝটিকার বর্ণনা পড়ি, সন্ত যোহন রচিত সুসমাচারের ষষ্ঠ অধ্যায়ের সপ্তদশ থেকে একবিংশ চরণে যেটিকে পাওয়া যায়: 'শিষ্যরা একটি জাহাজে করে কেপারনাউমের অভিমুখে যাত্রা করলেন। প্রবল এক বাত্যায় সমুদ্র উদ্বেলিত হল। তাই তাঁরা পঁচিশ-ত্রিশ ফার্লং অতিক্রম করে দেখলেন যীশু সমুদ্রের ওপরে হেঁটে তাঁদের দিকে আসছেন; তাঁরা আতঙ্কিত হলেন। তখন তাঁরা সাগ্রহে তাঁকে জাহাজে নিলেন এবং তৎক্ষণাৎ জাহাজটি তাঁদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেল। আপনারা, যাঁদের জীবনে প্রবল ঝঞ্ঝার অভিজ্ঞতা আছে, আপনারা, যাঁদের ওপর দিয়ে ঈশ্বরের সব তরঙ্গ ও ঢেউ বয়ে গেছে— যখন ভয়ে আপনাদের ভেতরে হৃৎস্পন্দন স্তব্ধ প্রায় তখন কি আপনারা সেই প্রিয় পরিচিত স্বরটি শোনেননি যা বাল্যে আপনাদের মুগ্ধ করেছে— যাঁর নাম পরিত্রাতা, শান্তির রাজকুমার, তাঁর সেই স্বর বলছে, "এ আমিই, ভয় পেয়ো না। ভিড় করো না, তোমাদের চিত্ত যেন বিচলিত না হয়।" আমরা, যাদের জীবন এখন পর্যন্ত শান্ত, অন্যদের অভিজ্ঞতার তুলনায় শান্ত, আমরা যেন জীবনের ঝঞ্ঝায় শঙ্কিত না হই, সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে আকাশের ধূসর মেঘাড়ম্বরের নিচে আমরা তাঁকে এগিয়ে আসতে দেখতে পাব, বা তাঁকে যাঁর জন্যে আমরা এই দীর্ঘকাল প্রতীক্ষা করে পথ চেয়ে আছি। তাঁকে আমাদের একান্ত প্রয়োজন, আমরা তাঁর স্বর শুনতে পাব: এ আমি, ভয় পেয়ো না। যন্ত্রণার, দুঃখের, মহাক্লেশের কিংবা বেদনা বা বিষাদের এক প্রহর বা এক ঋতুর পরে যদি শুনি তিনি প্রশ্ন করেছেন, "তুমি কি আমাকে ভালোবাস ?" তাহলে তখন যেন বলি, "প্রভু, আপনি তো সকলই জানেন, আমি যে আপনাকে ভালোবাসি তা আপনি জানেন।" এবং আমরা যেন হৃদয়কে তাঁর প্রেমে পূর্ণ রাখি, সেখান থেকে যেন একটি জীবন উৎসারিত হয় যাকে খ্রীস্টের প্রেম নিয়ন্ত্রিত করে। প্রভু, আপনি সকলই জানেন, আপনি জানেন যে আমি আপনাকে ভালোবাসি; যখন আমরা আমাদের অতীতের দিকে পিছন ফিরে তাকাই তখন কখনো-বা মনে হয় যে সত্যিই আপনাকে ভালোবাসব, কারণ যা-কিছু আমরা ভালোবেসেছি আপনার নামেই ভালোবেসেছি।"

আমরা কি মধ্যে মধ্যে— আনন্দ বা সমৃদ্ধিতে এবং আরও বেশি করে দুঃখে— নিজেদের বিধবা বা পিতৃমাতৃহীনের মতো মনে করিনি শুধু আপনার কথা চিন্তা করেই ?

আমাদের চিত্ত প্রভাতের জন্যে যেমন উৎসুকভাবে অপেক্ষা করে তেমন করেই আপনার

জন্যে প্রতীক্ষা করে আছে, আমাদের উন্মুখ দৃষ্টি স্বর্গনিবাসী আপনার অভিমুখেই। আমাদের যুগেরও ঈশ্বরের সন্ধান থাকতে পারে।

ঈশ্বরের কাছে আমরা কী প্রার্থনা করি—বেশি কিছু কি? হ্যাঁ, বড়ো কিছুই, আমাদের চিত্ততলের জন্য শান্তি, আমাদের আত্মার জন্যে বিশ্রাম—এই একটা বস্তু আমাদের দান করুন, তাহলে আর বেশি কিছু আমরা চাইব না, তখন আমরা অনেক কিছু বাদ দিয়েই চালাতে পারব, তখন আপনার নামের জন্যে অনেক কিছুই সহ্য করতে পারব। আমরা জানতে চাই যে আপনারাই এবং আপনি আমাদেরই, আমরা আপনার হতে চাই—খ্রীস্টিয়ান হতে চাই— আমাদের পিতার প্রয়োজন, পিতৃস্নেহের, প্রয়োজন পিতার অনুমোদনের। জীবনের অভিজ্ঞতা যেন আমাদের দৃষ্টিকে একাগ্র করে, আপনার ওপরে বিদ্ধ করে। জীবনের যাত্রাপথে আমরা যেন ক্রমশ উন্নততর হই। কিন্তু এখন আমরা বলব, খ্রীস্টীয় জীবনে হর্ষ ও প্রশান্তির কথা। কিন্তু তবুও, প্রিয় বন্ধুগণ, আমরা যেন জীবনের কষ্ট, শ্রম ও দুঃখের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট থাকি কারণ প্রশান্তি ও আনন্দ প্রায়ই প্রতারণা করে। হৃদয়ের নিজস্ব ঝড়ঝঞ্ঝা থাকে, বিষাদ-কাতর হওয়ার ঋতুও থাকে, কিন্তু তার স্থৈর্য এমন কী উল্লাসের কালও থাকে। দীর্ঘশ্বাসের ও প্রার্থনার কাল থাকে এবং প্রার্থনার উত্তরলাভের কালও থাকে। রোদন চলতে পারে সারা রাত্রি ধরে, কিন্তু প্রভাত নিয়ে আসে আনন্দ।

যে-হৃদয় মূর্ছাতুর
সে-ও আনন্দে কূলপ্লাবী হতে পারে
যারা তা দেখে
তারা বিস্মিত হবে, জানবে না যে
ঈশ্বরই এর সুদূর উৎসমূলে
বারিবর্ষণ করে চলেছেন।

"আমার শান্তি আমি তোমাদের কাছে রেখে গেলাম"— আমরা দেখেছি ঝটিকার মধ্যেও কেমন করে শান্তি থাকে। ঈশ্বকে ধন্যবাদ যিনি আমাদের একটি খ্রীস্টিয়ান দেশে জন্মাতে ও জীবনযাপন করতে দিয়েছেন। আমাদের মধ্যে কেউ কি ভুলে গেছেন জীবনের ঊষালগ্নে গৃহের মধ্যে যাপিত সেই স্বর্ণময় প্রহরগুলি, এবং গৃহ ত্যাগ করার পরে, কারণ আমাদের অনেককেই গৃহ ত্যাগ করে জীবিকা অর্জন করতে এবং পৃথিবীতে স্থান করে নিতে হয়েছে। এতদূর পর্যন্ত তিনি কি আমাদের নিয়ে আসেন নি, এবং কিছুরই কি অভাব থেকেছে আমাদের ? ঈশ্বর, আপনাকে আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের অবিশ্বাসের প্রতিকারে সাহায্য করুন। যখন প্রথম আমার পিতামাতার জীবনের প্রতি আমি দৃষ্টিপাত করি সে-সময়কার তীব্র আনন্দ, হর্ষের রোমাঞ্চ আমার এখনও মনে পড়ে, যখন অবচেতনে অনুভব করেছিলাম তাঁরা কতটাই খ্রীস্টিয়ান ছিলেন। এখনও সেই চিরতারুণ্যের অনুভূতি ও উৎসাহ আমি বোধ করি যার প্রেরণায় আমি ঈশ্বরের কাছে বলেছিলাম, "আমিও একজন খ্রীস্টিয়ান হব।" আমরা যা হবার স্বপ্ন দেখেছিলাম তা কি হতে পেরেছি ? না, কিন্তু এখনও জীবনের দুঃখগুলি, জীবনের সহস্র প্রাত্যহিক ব্যাপার এবং দৈনন্দিন কর্তব্য—যা ভেবেছিলাম তার বহুগুণ বেশি—জীবনের দোদুল্যমানতা এগুলি সেই স্বপ্নকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে, কিন্তু তার মৃত্যু

ভিনসেন্ট-লিখিত উপদেশের প্রথম পৃষ্ঠা, ৩১.১০.১৮৭৬
অ্যামস্টার্ডাম, ভ্যান গঘ মিউজিয়াম (ভিনসেন্ট-ভ্যান গঘ ফাউন্ডেশন)

ঘটেনি, সে প্রসুপ্ত আছে মাত্র। সেই প্রাচীন চিরন্তন বিশ্বাস এবং খ্রীস্ট প্রেম আমাদের মধ্যে সুপ্ত থাকতে পারে কিন্তু মরে যায় নি এবং ঈশ্বর তাকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারেন। কিন্তু যদিও অনন্তজীবনে পুনর্জাত হওয়া, খ্রীস্টিয়ানের বিশ্বাস, আশা ও করুণায়— চিরহরিৎ এক জীবনে, খ্রীস্টিয়ানের এবং খ্রীস্টিয়ান কর্মীর জীবনে (জাত হওয়া) ঈশ্বরের দান, ঈশ্বরের কৃতি, কেবলমাত্র ঈশ্বরেরই, তবুও আমাদের হৃদয়নিহিত ক্ষেত্রে আসুন আমরা হলকর্ষণে হাত লাগাই, আরও একবার আমাদের জাল নিক্ষেপ করি, আরও একবার চেষ্টা করি। চিত্তের সীমাবদ্ধতা ঈশ্বর আমাদের চেয়ে বেশি করেই জানেন, কারণ তিনিই আমাদের সৃষ্টি করেছেন। আমরা তো নিজেদের সৃষ্টি করিনি। আমাদের কোন কোন বস্তুর প্রয়োজন তা তিনি জানেন। আমাদের কিসে মঙ্গল তা তিনি জানেন। তাঁর বাক্যের বীজ যা তিনি আমাদের অন্তরে বপন করেছেন তাতে তিনি আশীর্বাদ করুন। ঈশ্বর সাহায্য করলে আমরা জীবনে উত্তীর্ণ হব। প্রত্যেক প্রলোভন থেকে মুক্তির জন্যে তিনিই উপায় বিধান করবেন।

"পিতঃ, আপনি আমাদের এ জীবন থেকে সরিয়ে নিন," এ প্রার্থনা করি না কিন্তু মন্দ থেকে আমাদের রক্ষা করুন। আমাদের দারিদ্র্যও দেবেন না, ঐশ্বর্যও নয়, যে অন্নে আমাদের মঙ্গল তাই দিয়ে আমাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি বিধান করুন। আমাদের তীর্থপথের আশ্রয়শালাগুলিতে আপনার সংগীতগুলি আমাদের আনন্দ দিক। আমাদের পিতৃকুলের ঈশ্বর আমাদের ঈশ্বর হন; আপনার সন্তানরা আমাদের আপনজন হোক, তাঁদের বিশ্বাস হোক আমাদের বিশ্বাস। এ পৃথিবীতে আমরা বিদেশী, আমাদের কাছ থেকে আপনার অনুজ্ঞাগুলি অপাবৃত রাখবেন না, কিন্তু খ্রীস্টের প্রেম আমাদের নিয়ন্ত্রণ করুক। আপনাকে পরিত্যাগ করতে কিংবা আপনার অনুগমন করা থেকে নিবৃত্ত হতে কখনো আদেশ দেবেন না। আপনার লোকেরা হোক আমাদের আপন লোক, আপনি হন আমাদের ঈশ্বর।

আমাদের জীবন তীর্থঙ্করের যাত্রা। একবার আমি অতি সুন্দর একটি চিত্র দেখেছিলাম: সন্ধ্যাকালের একটি নিসর্গদৃশ্য। ডান দিকে দূরে, এক সারি পাহাড় সন্ধ্যার কুয়াশাতে নীল দেখাচ্ছে। ঐ পাহাড়গুলির ঊর্ধ্বে সূর্যাস্তের ঐশ্বর্যময় শোভা, ধূসর মেঘমালার হিরণ্যরজত নীললোহিত প্রান্তদেশ। ভূদৃশ্য হল একটি সমভূমি কিংবা তৃণভূমি, তৃণাচ্ছন্ন এবং পীত পল্লবচয়ে আচ্ছন্ন কারণ তখন হেমন্ত ঋতু। ঐ নিসর্গদৃশ্যের মাঝখান দিয়ে একটি পথ চলে গেছে দূরের পর্বতে বহু দূরে যে পর্বতের শীর্ষদেশে অবস্থিত একটি নগরী যার ওপরে অস্তসূর্য এক ঐশ্বর্যসম্ভার ঢেলে দিচ্ছে। পথে হাঁটছে একটি তীর্থযাত্রী, হাতে দণ্ড নিয়ে। সে পূর্বেই বহুক্ষণ ধরে হেঁটে এসেছে এবং ভীষণ ক্লান্ত। এখন তার সঙ্গে দেখা হল একটি নারীর কিংবা কৃষ্ণবেশ কারও সঙ্গে, যাকে দেখে মনে পড়ে সন্ত পলের উক্তি, যেন দুঃখার্ত কিন্তু সর্বদাই হৃষ্ট। ঐ দেবদূতটিকে ঐখানে স্থাপন করা হয়েছে তীর্থযাত্রীদের সাহস দেবার জন্যে, তাদের প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্যে। তীর্থযাত্রীরা তাকে প্রশ্ন করে, "এ পথ কি শেষপর্যন্তই পাহাড়ের ওপর দিয়ে খাড়া উঠে গেছে ?"

উত্তর হল, "হ্যাঁ শেষ পর্যন্তই।"

সে আবার প্রশ্ন করে, "যাত্রাটা কি সারাদিনব্যাপী ?"

উত্তর হল, "প্রভাত থেকে রাত্রি পর্যন্ত, বন্ধু।"

তীর্থযাত্রী বিষণ্ণ কিন্তু আনন্দিত হয়ে অগ্রসর হয়—বিষণ্ণ, কারণ গন্তব্য এত দূরে এবং পথ এত দীর্ঘ। আশান্বিত, কারণ সে অস্তসূর্যের আভায় আলোকিত ঐ সুদূর চিরস্থায়ী নগরটির দিকে তাকিয়ে বহু পূর্বে শোনা দুটি প্রাচীন উক্তির কথা ভাবে, যার একটি হল:

বহু সংগ্রামে যুঝতে হবে
বহু যন্ত্রণা বইতে হবে
বহু প্রার্থনা চাইতে হবে
তবে, তার পরে, আসবে শান্তি।

অন্যটা হল:

জল ওষ্ঠাধরের কাছে পর্যন্ত আসে
কিন্তু তার ওপরে আর ওঠে না।

তখন সে বলে: আমি ক্লান্ত থেকে ক্লান্ততর হব কিন্তু আপনার নিকট থেকে নিকটতর হব। পৃথিবীতে কি মানুষের কোনো সংগ্রাম নেই? কিন্তু এ জীবনে ঈশ্বরের কাছ থেকে সান্ত্বনাও আসে। এক দেবদূত মানুষের শুশ্রূষা করে, করুণার দেবদূত। তাকে যেন না ভুলে যাই। যখন আমরা প্রত্যেকে দৈনন্দিন জীবন ও কর্তব্যে ফিরে যাব তখন যেন ভুলে না যাই যে যা দেখা যায়, তার সবটা সত্য নয়। ঈশ্বর দৈনন্দিন জীবনের বিষয়গুলির দ্বারা আমাদের উচ্চতর বিষয়ে শিক্ষা দেন, আমাদের জীবন তীর্থঙ্করের পথপরিক্রমা, আর এ পৃথিবীতে আমরা বিদেশী আগন্তুক, কিন্তু আমাদের এক ঈশ্বরপিতা আছেন যিনি বিদেশীকে রক্ষা করেন—আমরা সকলেই ভ্রাতা।

আমেন।

এখন প্রভু যীশু খ্রীস্টের করুণা, পিতা ঈশ্বরের প্রেম ও পবিত্র আত্মার সহযোগিতা আমাদের সঙ্গে এখন ও নিত্যকাল থাকুক।

আমেন।

অনুবাদ : সুকুমারী ভট্টাচার্য

[একটি পত্রপ্রতিবেদন]

ভিনসেন্ট ভ্যান গঘ

জুইলু গ্রামের প্রমোদভ্রমণের ঠিক বিবরণ তোকে জানাচ্ছি। ঐ গ্রামেই লাইবারমান দীর্ঘদিন বাস করেছিলেন। গতবছর পারির যত জীবিত চিত্রশিল্পীদের অঙ্কিত চিত্রপ্রদর্শনী হয়েছিল তিনি সেখানে তাঁর ছবির নানা ধরনের পরীক্ষার অনুশীলনে নিজেকে মগ্ন রেখেছিলেন। এর মধ্যে একটি ছিল দরিদ্র এক রজাকিনী। তার ম্যুলেঁ এবং জুলে বাখুইজেঁও এখানে বহুদিন কাটিয়েছেন। তুই কল্পনা কর সেই ভোর তিনটেয় ঊষর এক প্রান্তর দিয়ে আমাদের প্রমোদভ্রমণ শুরু। খোলা গোরুর গাড়িতে (আমি হোটেলওয়ালার সঙ্গেই ছিলাম যিনি আসেঁর বাজারে গিয়েছিলেন) একটানা রাস্তায়—বলা যেতে পারে এখানে যাকে বলে ডাইক—বালির পরিবর্তে কাদামাটি দিয়ে আলবাঁধানো সেই পথ। অধিক কৌতূহলের ব্যাপার কি জানিস—পালতোলা নৌকো বা বজরাতে না যাওয়া। ভোরের আলো ফুটতেই মুরগীর ডাক শুরু হল। ঊষর প্রান্তর জুড়ে যে সব কুঁড়েঘর ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে তার মধ্যে কয়েকটির পাশ কাটিয়ে আমরা এগিয়ে এসেছি। চারদিকে ফাঁকা ফাঁকা ঝাউজাতীয় পপলারের গাছ ঘিরে রেখেছে। সেইসব গাছ থেকে হলদে পাতা টুপটাপ করে নিচে পড়ছে। যে কেউই তার শব্দ শুনতে পাবে। একটি গির্জার নিকটেই সমাধিভূমি; সেখানে দাঁড়িয়ে আছে ঈষৎ খাটো ও বেশ প্রশস্ত এক দুর্গ। দেয়াল মাটির তৈরী। ফণীমনসা ও বনবৃক্ষ এই ঊষর প্রান্তর অথবা শস্যখেত নিয়ে তৈরী হয়েছে এক অনুভূমিক ভূচিত্র। সবকিছু বিচার করে কী আশ্চর্য রমণীয় মনটাকে ভরে রেখেছে। মনে হয় খুব সুন্দর কোরো (Corots)। সর্বত্র এক ধরনের প্রশান্তি বিরাজ করছে। মানুষের জ্ঞানের অতীত রহস্য, নীরবতা সেখানে অঙ্কিত হয়ে রয়েছে।

কিন্তু যখন আমরা জুইলুতে এসে পৌঁছলাম তখন ভোর ছটা। অন্ধকার পুরো কাটেনি। সুতরাং ঊষার পূর্ব মুহূর্তেই কোরো-র দর্শন পেলাম।

গ্রামে প্রবেশ করার পথটি ছিল এক কথায় দারুণ। বাড়িগুলোর আস্তাবল, ভেড়ার খোঁয়াড়, গোলাবাড়ির ছাদ দেখে মনে হল সেখানে শেওলার প্রকাণ্ড সব স্তর বসানো।

সদরের সব বড়ো বড়ো বাড়িগুলো দাঁড়িয়ে রয়েছে চমৎকার তামাটে রঙের ওক বৃক্ষের মধ্যে। সেখানে শেওলার উপর সোনালি রঙের আভা। জমির উপর রক্তাভ রঙ, কোথাও নীলাভ বা ঈষৎ হরিদ্রাভ। আবার বিষণ্ণ লাইলাক ধূসরও। শস্যখেতের শ্যামলরূপে ফুটে উঠেছে এক অবর্ণনীয় বিশুদ্ধতা যা পবিত্র হতে পারে। ভিজে ভিজে কৃষ্ণাভ বৃক্ষকাণ্ডের সঙ্গে উজ্জ্বল বর্ষণের কি বৈসাদৃশ্য। শরতের পত্রগুচ্ছ দেখে মনে হয় শিথিল স্তবকে ঝুলে পড়েছে, এবং সেখান থেকেই যতসব মুকুলের সমারোহ। আকাশের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষীণ আলোর রেখায় ভেসে উঠেছে পপলার, বার্চ, লাইম এবং আপেল বৃক্ষের সারি।

আকাশ খুবই স্বচ্ছ—মসৃণও বলা যায়। উজ্জ্বল তবে শুভ্র নয়। কিন্তু একটি লাইলাককে

এখানে কষ্টসহকারে উদ্ধার করতে হয়। লালের সঙ্গে উজ্জ্বল সাদা, নীল এবং হলদে যা সবকিছুর মধ্যে প্রতিফলিত হচ্ছে না। যে কেউই এখানে এলে সর্বত্র যে রঙের বিচিত্র খেলা চলেছে তা উপলব্ধি করতে পারবে। আবার অন্যদিকে নিচে বিরাজ করছে বাষ্পবৎ সূক্ষ্ম কুয়াসার স্তর—একই সঙ্গে কোমল ধূসর বর্ণের বিরাট যে ব্যাপ্তি ছড়িয়ে তার মধ্যে রচনা করেছে অপূর্ব এক ঐকতান। আমি জুইলুতে একজন চিত্রশিল্পীরও দেখা পাইনি। যাই হোক এখানের মানুষরা বলে—শীতের সময় কোনোদিন কেউই এ পথ মাড়ায়নি।

আমি শীতকালে যেখানে বাস করছি সতত বিপরীত ধারণাই পোষণ করে চলেছি। যেহেতু কোনো চিত্রশিল্পীই এখানে নেই তাই সিদ্ধান্ত আমাকেই গ্রহণ করতে হয়। সুতরাং হোটেলওয়ালার আগমনের জন্যে অপেক্ষারও প্রয়োজন মনে হয় না। বরং একটু হেঁটে এগোলে কেমন হয়। মাঝপথে না হয় কিছু স্কেচ তুলে নেওয়া যাবে। এই ধারণা নিয়েই আমি অ্যাপেল বাগানের রেখাচিত্র ধরে রাখতে চেষ্টা করি। উল্লেখ করা প্রয়োজন লাইবারমান এই বিষয় নিয়ে এক মহৎ সৃষ্টি রচনা করেছেন। এবং তারপরই সেই একই পথ ধরে ফিরে চলি যে পথে খুব ভোরে আমরা ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েছিলাম।

মুহূর্তের জন্যে হলেও জুইলুকে ঘিরে যে জগৎ তা সম্পূর্ণভাবে অন্তর্ভূত হয়েছে সেখানে। দৃষ্টি যতদূর যায় শুধু কচি শস্যখেত, কোমল পরশ ছোঁয়া শ্যামল এক ভুবন যা আমার কাছে খুবই পরিচিত মনে হল।

মনকে স্বাভাবিকভাবেই স্পর্শ করে লাইলাক শুভ্র রঙ। তার উপর রয়েছে সীমাহীন আকাশ। যার জন্যে অপূর্ব এক মেজাজ তৈরি হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল যে চিত্রপটে সেই মুহূর্তকে রঙে রেখায় ধরে রাখা সত্যিই সম্ভব নয়। তা সত্ত্বেও আমার কাছে প্রধান হয়ে ওঠে কি সেই মর্মের সুর তা একজনকে জানতেই হবে। হয়তো সেখানে বিরাজ করছে অন্যান্য আরোপিত প্রভাবের মূল সুর।

একঘেয়ে ধরনের এক টুকরো জমির উপর বিস্তীর্ণ সীমাহীন অতি মনোরম লাইলাক শুভ্র স্বচ্ছ আকাশ। সেই জমির বুক থেকে শস্যের কচিপল্লব মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে যা দেখতে অনেকটা শ্যামলভূমির মতো। সমগ্র অঞ্চল জুড়ে যে কুয়াসা নেমেছে সেখানেই ড্রেনথের পর্যাপ্ত উর্বরা অংশ। ভেবে দেখ ল্য দ্যরনিয়ের জুর দ্য লা ক্রেয়াশিয়ঁ সৃষ্টির উপর ছড়িয়ে আছে দিনের শেষ আলোর রেখা। গতকাল আমার কাছে যা দাগ কেটেছে আমি এখন সেই ছবির তাৎপর্য কী তা বুঝতে পেরেছি।

ড্রেনথের ঊষর জমি যেন একই রকমের। অথচ কালো জমি এমন বিবর্ণ ভুসায় ঢেকে রেখেছে যে লাইলাক বলে মনে হয় না। অনেকটা খাঁজের মতো দেখতে। সবসময় ক্ষয়ে যাওয়া ভেজা মাটির উপর ছড়িয়ে আছে গুল্ম ও ছোটো ছোটো সব গাছ। আমার চোখের তারায় যেন সব প্রতিফলিত। তারই পটভূমি অসীম এক দিগন্তরেখা : এরই মধ্যে বিস্তীর্ণ পতিত জমি, জলে ভেজা বিকৃত সব চেহারা নিয়ে বেড়ে উঠেছে উদ্ভিদের ছাউনি, তারই পাশাপাশি উর্বরা জায়গা জুড়ে সেকেলে পুরনো ঢঙের ভেড়ার খোঁয়াড়, খামারের বিশাল কাঠামো, নিচু বলতে খুবই নিচু ছোটো দেয়াল, আর শেওলায় ঢাকা প্রকাণ্ড সব ছাদ। সেসব বাড়ি-ঘরকে ঘিরে রেখেছে প্রচুর ওক গাছ।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে যখন কেউ ঐ গ্রামাঞ্চলের মধ্য দিয়ে হেঁটে যায় তখন তার অনুভবের সর্বত্র যা বিরাজ করবে তা হল জমির কোনো সীমারেখা নেই। সেই সঙ্গে চোখে পড়বে শস্যের সবুজ শোভা, গুল্ম আর অনন্ত আকাশ। মনে হবে ঘোড়া ও মানুষ যেন পক্ষহীন মাছির চেয়েও ছোটো। একটা কথা মনে রাখা উচিত যে কোনো জিনিস সম্বন্ধে কেউই সচেতন থাকতে পারে না, এমন কি বিশাল দেখালেও নয়। একজন শুধু জানে—একমাত্র পৃথিবী সেই সঙ্গে আকাশ। যাই হোক একটি ক্ষুদ্র কণিকার সহজাত অভিব্যক্তি পর্যবেক্ষণ চলছে অন্য এক ক্ষুদ্র কণিকার অসীম অস্তিত্ব নিয়ে। হয়তো এর ফলে সেই বিশেষ একজন এসব পৃথক রেখে প্রতিটি ক্ষুদ্র কণিকার মধ্যে প্রত্যক্ষ করে চলেছে এক একটি জোয়ার।

আমি এইমাত্র পুরনো ছোটো একটি গীর্জাকে পাশে রেখে এগিয়ে চলেছি। ঠিক যেন লুক্সেমবুর্গে মিইয়ের সেই ছোটো ছবি 'দ্য চার্চ অ্যাট গ্র্যাভিল'। ঐ ছবির মধ্যে কোদাল সহ ছোটো ছোটো চাষীর পরিবর্তে ছিল ভেড়ার পাল নিয়ে চলেছে মেষপালক। পাশে ছড়িয়ে রয়েছে ফণিমনসার ঝোপ অথচ সেই পটভূমির কোথাও সমুদ্রের কোনো রেখা বা আভাস ছিল না। পক্ষান্তরে ভেসে উঠেছিল কচি শস্যের বিরাট তরঙ্গ, মনে হচ্ছিল বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের তরঙ্গের পরিবর্তে শ্যামলরেখার বিস্তার। একই ধরনের প্রভাব বা আভাস আজ আমার চোখের সামনে। তাকাতেই দেখতে পেলাম হাল নিয়ে চাষী, একটি ব্যস্ত স্যাণ্ড কার্ট (বালির গাড়ি), জনৈক মেষপালক, রাস্তামেরামত করতে আসা এক শ্রমিক আর গোবরবহন করার জন্য একটি গাড়ি। পথের পাশে একটি সরাইখানায় বসে চরকা হাতে এক বৃদ্ধার ছবি এঁকেছি, এখানে রূপকথার কাহিনীর এক আশ্চর্য ছোটো মসীবর্ণের ছায়া পরিলেখের খেলা চলেছে। উজ্জ্বল সাদা রঙের জানালার বিপরীত দিকে তাকালে খোলা নিঃসীম আকাশ দেখতে পাওয়া যায়। কেমন স্বচ্ছ। আর নিচে ছোটো পথ দিয়ে প্রসারিত মনোরম শ্যামল প্রান্তর। অবশ্য সবুজ ঘাসে ইতস্তত ছড়িয়ে কিছু হাঁস চঞ্চু দিয়ে খুঁটে খুঁটে খেয়ে চলেছে।

কল্পনা করতে পারিস! এর উপর যখন গোধূলির আলো ছড়াতে থাকে, কী শান্ত! সর্বত্র নেমে আসে প্রশান্তির অনির্বচনীয় ছোঁয়া। তুই অনুমান করতে পারিস উঁচু পপলার বৃক্ষের বীথিকা জুড়ে শরতের পাতার কী বিচিত্র সমারোহ। সেই সঙ্গে ভাবতে পারিস—এর মধ্যে এক প্রশস্ত কাদামাটির তৈরী পথ এগিয়ে চলেছে, মাটির রঙ এখানে কালো। ডান দিকে তাকালে চোখে পড়বে গুল্মে আচ্ছাদিত এক বিশাল ঊষর প্রান্তর। বাঁ দিকে গুল্মের আবরণ। তাছাড়া ছোটো ছোটো কুঁড়ে ঘর তৈরী হয়েছে ঘাসের চাপড়া দিয়ে। এবং সেইসব কুটীরের ত্রিভুজাকৃতি কালো ছায়া এক অপূর্ব চিত্র সৃষ্টি করেছে। ছোটো ছোটো জানালার ফাঁক দিয়ে চোখের তারায় এসে লাগছে আগুনের লাল রঙ। অন্যদিকে ডোবার অপরিচ্ছন্ন অথচ হলদে রঙের জলের মধ্যে প্রতিফলিত খোলা আকাশ, সেই জলেই একদিকে গাছের গোড়ায় পচন ধরেছে। একবার ভেবে দেখতে পারিস গোধূলির আলো নিয়ে সাদাটে আকাশ পড়েছে সেই জলাভূমির উপর। মোটকথা সর্বত্র তৈরী হয়েছে সাদা কালোর এক অদ্ভুত বৈসাদৃশ্য। অথচ একই জায়গায় দেখা যাচ্ছে একটি লোমশা প্রতিকৃতি—মেষপালক, বৃত্তাকার ভিড় বলে মনে হয়। জেগে উঠেছে অর্ধেক পশম অর্ধেক কাদা (মানুষের মাথায় পশমের মতো কুঞ্চিত ও কর্কশ চুল—সেখানে কোনো শৃঙ্খলার বালাই নেই) মাখামাখি যেন। একজন অন্যের উপর ঠেলে উঠেছে। এই ধরনের ভিড়ের মধ্যে তুই

তাদের আসতে দেখেছিস। নিজেকে দেখতে পাচ্ছিস এর মধ্যে। হয়তো এর ফলে তুই ইতস্তত পাক খেতে খেতে তাদের অনুসরণ করছিস। এখন তারা সবাই ধীরে ও অনিচ্ছাসত্ত্বেও ক্লান্তি নিয়ে এই কাদাপথ দিয়েই হেঁটে চলেছে। যাই হোক দূরে দেখা যাচ্ছে খামার বাড়ি, কয়েকটি শেওলায় ঢাকা ছাদ, খড়ের গাদা এবং পপলারের মধ্যে জলে ভেজা উদ্ভিদের আবরণ।

ভেড়ার খোঁয়াড় দেখলে মনে হবে ছোটো কালোছায়ার এক ত্রিভুজাকৃতি ছবি। অন্ধকার নেমেছে। হাট করে খোলা প্রশস্ত দরজা। এ যেন কোনো এক অন্ধকার গুহার প্রবেশ পথ। তক্তার পেছন থেকে ফাঁক দিয়ে আকাশের মৃদু আলোর রেখা এখনো দীপ্তি ছড়াচ্ছে। ক্রমে সমগ্র কুঞ্চিত কেশ যা পশমের স্তূপ বলে মনে হয় এবং অগোছালো ভিড় সেই গুহার মধ্যে হারিয়ে গেল। মেষপালকও তখন এক রমণীর হাতে লণ্ঠন নিয়ে তাদের পেছন থেকে দরজা বন্ধ করে দিল।

গোধূলির ফিকে আলোয় সেই ঝাঁকে ফিরে আসা ছিল প্রকৃত অর্থে সিম্ফনির শেষ সুরের মূর্চ্ছনা যা আমি কাল শুনতে পেয়েছিলাম।

সেই দিনটি প্রায় স্বপ্নের মতোই কেটে গেল। বস্তুত সারাটি দিনই এক অপূর্ব সংগীতের সুরের জগতে নিমগ্ন ছিলাম যে আক্ষরিক অর্থে আমি এমন কি আহার করা পান করা সব ভুলেই গিয়েছিলাম। সেই ছোট্ট সরাইখানায় এক টুকরো লাল আটার পাউরুটি ও এক কাপ কফি নিয়ে বসলাম। এখানেই সেই চরকা কাটা ছবি এঁকে রেখেছি। ধীরে ধীরে দিনও শেষ হয়ে এল। ভোর থেকে গোধূলি অথবা বলা যেতে পারে একটি রাত থেকে অন্য একটি রাত পর্যন্ত আমি যেন দিব্য এক সিম্ফনির সুরের জগতে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম।

বাড়ি ফিরে এসে এখন আগুনের পাশে বসে আছি। খুব খিদে পেয়েছে। হ্যাঁ নিজেকে ক্ষুধার্ত মনে হচ্ছে। কিন্তু তুই তো দেখতেই পাচ্ছিস কেমন আছি। ঠিকভাবে অন্তত একজন অনুভব করতে সক্ষম যেন সে সেন্ট শেপ দ্যোভার্স প্রদর্শনী ঘুরে যায়, তাহলে মনে হবে এই ধরনের একটি দিন থেকে সেই একজন বাড়ি ফিরবে কী নিয়ে? কেবলমাত্র কিছু খসড়া স্কেচ বা রেখাচিত্র! তবুও সেখানে ছড়িয়ে রয়েছে অন্য কোনো জিনিস। বস্তুত সেই একজন বাড়ি ফেরে কাজের উপযোগী এক ধরনের প্রশান্ত কামনার গভীরতা নিয়ে।

খুব শিগগির লিখিস। আজ শুক্রবার অথচ তোর কোনো চিঠি এখনো এল না। আমার আকুল আকাঙ্ক্ষা সেই চিঠির জন্যে। ভাব পরিবর্তন করতে আরও হয়তো কিছুটা সময় লাগতে পারে এবং এর জন্যে আমাকে ছুটে যেতে হবে হুজেবীন। আবার সেখান থেকে ফিরে আসতে হবে। আমাদের জানা নেই কেমন করে ঘটনা ঘটে। নয়তো আমার পক্ষে বলা ঠিক হবে—সম্ভবত এখন সবচেয়ে সহজ কাজ হবে মাঝে অন্তত পক্ষে একবার টাকা পাঠানো। যাই ঘটুক না কেন তুই খুব তাড়াতাড়ি লিখিস।

অনুবাদ : বিজয় দেব

[এই যে আমি]

ভিনসেন্ট ভ্যান গঘ

শিল্প

'লার্ত, সে ল'ম আজুতে আ লা নাচ্যুর' (L'art c'est l'homme ajoute à la nature) বা শিল্প হল প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত মানুষ। শিল্প কথাটার এর থেকে ভালো সংজ্ঞা আমি এখনও পর্যন্ত খুঁজে পেলাম না। ১৩০

সেই গভীর দুর্দশার মধ্যেও আমি অনুভব করলাম আমার শক্তি পুনর্জীবিত। নিজেকে বললাম, সব কিছু সত্ত্বেও আমি আবার উঠে দাঁড়াব, চরম নিরাশ হয়ে যে-পেনসিল ফেলে দিয়েছিলাম, তা আবার হাতে তুলে নেব, আমার ড্রয়িং চালিয়ে যাব। ১৩৬

এই মুহূর্ত পর্যন্ত সারাটা শীত জুড়ে ড্রয়িং করেছি, পড়েছিও প্রচুর। পরোক্ষভাবে আমার পক্ষে সেটা খুব প্রয়োজনীয় বটে। ১৩৯

আমার ড্রয়িঙের উন্নতি হচ্ছে, ড্রয়িং আমাকে সাহস দিচ্ছে এটা অনুভব করে আমি খুব খুশি। তারা যাই বলুক-না কেন, ড্রয়িং হল আসল ব্যাপার এবং সবচেয়ে শক্তও বটে। ১৭৬

সেঁসিয়ের লেখা *মিইয়ের জীবনীর* এই কথাগুলো আমাকে ভাবিয়েছে, খুব নাড়া দিয়েছে : 'শিল্প হল সংগ্রাম—শিল্পে তোমাকে প্রাণ পর্যন্ত বাজি ধরতে হবে'। 'পুরো একদল কৃষ্ণকায়দের মতো কাজ করো : দুর্বলভাবে প্রকাশ করা ছাড়া আমি আর কিছুই বলব না।' ১৮০

ছবি-আঁকা একটা পেশা যাতে যে-কেউ কামার বা ডাক্তারের মতো উপার্জন করতে পারে। সর্ব অবস্থায় শিল্পী হল সেই মানুষটার বিপরীত যে তার আয়ের উপর বেঁচে থাকে, আমি আবারও বলছি, কেউ যদি সহানুভূতি সৃষ্টি করতে চায়, তবে শিল্পী এবং কামার বা ডাক্তারের সঙ্গে অনেক সাদৃশ্য। ১৮৪

'আমি একজন শিল্পী', এ কথা বলেছি বলে মাউভ অসন্তুষ্ট হয়েছেন, কথাটা আমি ফিরিয়ে নেব না, কারণ, অবশ্যই, এই কথাগুলোর গূঢ় অর্থ হল, 'পরমকে না পেয়ে যে সব সময় খুঁজে চলেছে।' 'আমি জানি, এই আমি খুঁজে পেয়েছি', এই কথার ঠিক উল্টো কথাই হল এই কথা।

যতদূর জানি, সে কথার অর্থ, 'খুঁজে বেড়াই, সংগ্রাম করি, সমস্ত হৃদয় দিয়ে আছি এরই ভেতরে।' ১৯২

তোকে এই-মাত্র বলার যে ছবি-আঁকাটা আমার কাছে কী যে আনন্দের। ২২৫

ছবিতে একটা অনন্ত-কিছু আছে— তোকে ঠিক বলে বোঝাতে পারব না। এর ভেতর দিয়ে অনুভূতি প্রকাশ করাটা কী যে আনন্দের। রঙের মধ্যে একটা সুপ্ত সংগতি অথবা বৈপরীত্য আছে কাজের জন্য যারা অনিচ্ছায় মিলিত হয় এবং যা সম্ভবত অন্য কোনোভাবে ব্যবহার করা যেত না। ২২৬

মনুষ্যমূর্তি আঁকার ব্যাপারটা আমার কাছে ভারি চিত্তাকর্ষক, তবে সেটা পরিপক্কতা পাওয়া দরকার—এর করণকৌশলটা আমাকে আরও ভালো করে জানতেই হবে—যেটাকে কখনো কখনো 'শিল্পের রান্নাঘর' বা লা কুইজিন দ্য লার্ত (La cuisine de l'art) বলা হয়ে থাকে। শুরুতে আমাকে অনেক মাজা-ঘষা করতে হবে, প্রায়ই হয়তো নতুন করে শুরু করতে হবে, তবে আমার মনে হচ্ছে তা থেকে আমি শিখতে পারছি, আর বস্তুব্যাপার সম্পর্কে একটা নতুন, সজীবতর দৃষ্টি তা থেকে আমি পাচ্ছি। ২২৬

নিশ্চিত জানি রঙের প্রতি আমার একটা সহজ প্রবৃত্তি আছে, এবং তা আমার কাছে আরো বেশি বেশি আসবে, জানি যে ছবি হল আমার হাড়ের মজ্জা। ২২৮

অনুশীলনীকে আমার মনে হয় বীজবপন, ছবি আঁকাটাকে বীজ রোপণ। ২৩৩

ছবি আঁকতে আঁকতে নিজের মধ্যে রঙের একটা ক্ষমতা আমি অনুভব করি যা আমার আগে ছিল না, উদারতা ও শক্তির সামগ্রী সে-সব!

দেখছিস তো আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে ছবি আঁকায় আমি মগ্ন আছি; রঙের মধ্যে আমি মগ্ন হয়ে আছি—এতদিন পর্যন্ত নিজেকে সংযত রেখেছিলাম এবং সে জন্য দুঃখিত নই। এত যদি না আঁকতাম তাহলে যে মনুষ্যমূর্তিকে (figure) অসমাপ্ত কোনো পোড়ামাটির কাজের মতো দেখায় তার অনুভূতিকে ধরতে পারতাম না, তাকে আমি হাতের মুঠোয় আনতে পারতাম না। ২৩৫

Vincent

Vincent Vincent

Vincent Vincent W. Van Gogh

V. W. van Gogh Vincent van Gogh

Vincent Vincent

Vincent

ভিনসেন্টের নানা সময়ের স্বাক্ষর

সাদা-কালো যাকে বলে তা হল আসলে কালো রঙে ছবি আঁকা, যার অর্থ হল কোনো বর্ণচিত্রে যে ভাবসঞ্চারের গভীরতা, টোনের মূল্যের প্রাচুর্য দেওয়ার কথা রেখাচিত্রেও সেই একই সামগ্রী দান করা। ২৫৬

শিল্পের উপর আমার গভীর বিশ্বাস আছে। তার শক্তিশালী স্রোতের প্রতি আছে প্রগাঢ় আস্থা। এই স্রোত মানুষকে এক বন্দরাভিমুখে নিয়ে যায় বটে তবে মানুষকেও চেষ্টা চালাতে হবে। ২৭৪

আমার কাজের মধ্যে যদি প্রাণের উষ্ণতা আর ভালোবাসা ভরে দেওয়ায় সফল হই, তবে সে তার বন্ধুদের খুঁজে পাবে। ২৭৮

ভালো আঁকিয়ে হতে গেলে অনেক অবস্থার ভেতর দিয়ে যেতে হবে... ৩০২

তুলনামূলকভাবে আমি যে শুধু বেশি বয়সে ড্রয়িং শুরু করেছিলাম তা-ই নয়, আবার এটাও হতে পারে যে আমি খুব বেশি বছর আর বাঁচব না। ৩০৯

তুই জানিস না শূন্য ক্যানভাসের সেই চেয়ে থাকা কেমন পঙ্গু করে দেয়; শিল্পীকে সে বলে, তুমি কিছুই করতে পার না। নির্বোধের মতো ক্যানভাস তোমার দিকে তাকিয়ে থাকে, আর কিছু শিল্পীকে সে এমন সম্মোহিত করে দেয় যে তারা বোকা বনে যায়। অনেক শিল্পী শূন্য ক্যানভাসকে ভয় পায়, কিন্তু সত্যিকার আবেগপ্রবণ ডাকাবুকো শিল্পী যে একদা সকলের জন্য এই ঘোর কাটাতে পেরেছে "তুমি পার না"—শূন্য ক্যানভাস তাকে ভয় পায়। ৩৭৮

শারীরসংস্থান বিষয়ক একটা ভারি সুন্দর বই কিনেছি, জন মার্শাল-এর শিল্পীদের জন্য শারীরসংস্থান। সত্যি কথা বলতে কি বইটা খুব দামী হলেও সারাজীবন আমার কাজে লাগবে কারণ বইটা খুব ভালো। ৩৮১

আইন্ডহোভেনে তিনজনকে পেয়েছি যারা আমার কাছে রঙ চাপানো শিখতে চায়। তাদের আমি স্টিল লাইফ আঁকা শেখাচ্ছি। ৩৮৫

চাষী, কাগজকুড়ুনী, সব ধরনের শ্রমিক—এদের আঁকার চেয়ে সোজা আর কিছু নেই তবে এইসব সাধারণ চরিত্রের চেয়ে কঠিন বিষয়ও আর কিছু নেই ছবি আঁকায়। ৪১৮

রুবেন্সকে ভালো লাগে তাঁর সরল আঁকার ধরনের জন্য, সোজাসরল মাধ্যমে কাজের জন্য। ৪৩৯

ভবিষ্যতে ক্যাটালগে আমার নাম সেভাবে যাওয়া উচিত যে-ভাবে আমি ক্যানভাসে সই করি অর্থাৎ ভিনসেন্ট, ভ্যান গঘ নয়। কারণটা সোজা, শেষের নামটা কীভাবে উচ্চারণ করতে হবে তা তারা জানে না। ৪৭১

আমার উচিত প্রতিদিন ড্রয়িং করা, সেইসঙ্গে মাসে দু-তিনটে ছবি-আঁকা। ৪৮১

ক্যানভাসে সই করা শুরু করেছিলাম তবে কিছুদিনের মধ্যে ছেড়ে দিয়েছিলাম, কেমন যেন বোকা-বোকা মনে হয়েছিল ব্যাপারটা। ৫২৪

সংগীত যেমন আনন্দ দেয়, ছবিতে আমি সেরকম আনন্দের কথা বলতে চাই। নারী-পুরুষের ভেতর শাশ্বত সেই যাকে দিব্যজ্যোতি প্রতীক করতে চায়, আমরা যাকে আমাদের রঙের বিকিরণ আর কম্পন দিয়ে প্রকাশ করতে চাই, তাকে আমি আঁকতে চাই। ৫৩১

মানুষের তীব্র আবেগগুলোকে লাল-সবুজের ভেতর দিয়ে রূপ দিতে চেষ্টা করেছি। ৫৩৩

কাজ করার পরিকল্পনাগুলো মনে আসছে ঝাঁক বেঁধে। কিছু ভাববার বা বোঝবার ফুরসত নেই। ছবি এঁকে চলেছি স্টীম এঞ্জিনের মতো। ৫৩৫

ওঃ! আঙুরখেতের স্টাডির জন্য ক্রীতদাসের মতো খেটেছিলাম... ৫৪৪

তোকে আমি লম্বা চিঠি লিখছি না কারণ কাল খুব তাড়াতাড়ি ভোরের নরম আলোয় শুরু করে আমার ক্যানভাস শেষ করতে হবে। ৫৫৪

বিশ্বাস করি একটা সময় আসবে যখন আমিও বিক্রি হব... ৫৫৭

কোনো ছবি যদি আমার আগ্রহ জাগায় তাহলে সেটি দেখার সময় নিজেকে এই প্রশ্ন না করে আমি থাকতে পারি না 'কোন বাড়িতে, বা ঘরে বা ঘরের কোণে, বা কার বাড়িতে এটি বেশ মানাত, ঠিকমত জায়গাটিতে থাকত?' ৫৯৪

আমার ব্রাশের কাজে আদৌ কোনো রীতিনীতি নেই। বি ৩

ছবি-আঁকা ব্যাপারটা যতই ঘৃণার ব্যাপার হোক, আর আমরা যে যুগে বাস করি সেই যুগে তা যতই বিব্রতকর হোক না কেন, কেউ যদি এই হস্তশিল্পটি বেছে

নিয়ে থাকে, উৎসাহের সঙ্গে তার চর্চা করতে থাকে, তাহলে সেই মানুষ কর্তব্যপরায়ণ, সুস্থ এবং বিশ্বস্ত। বি ৩১

আমার বিশ্বাস টমাস আ কেম্পিস কোথায় যেন বলেছেন, "মানুষের সঙ্গে যখনই মিশেছি তখনই আমার নিজেকে মনুষ্যেতর বলে মনে না হয়ে পারে নি।" ঠিক একই রকমভাবে আমার মনে হয় শিল্পীদের সঙ্গে যতই মেলামেশা করা যায় ততই শিল্পী হিসাবে নিজেকে দুর্বলতর বলে মনে হয় (আর সেটা ঠিকভাবেও বটে)। আর ১৬

একটা ছবি—সে তুমি-আমি যে-ই আঁকুক-না কেন—*একটা* জিনিসকেই প্রকাশ করতে এবং খুব *স্পষ্টভাবে*। আর ৪৬

কোনো কোনো সময় মেজাজ যখন শরীফ থাকে, ভাবি যে শিল্পে যা প্রাণবান, শাশ্বতভাবে প্রাণবান তা হল প্রথমত শিল্পী দ্বিতীয়ত ছবি। ডবলু ৮

প্রকৃতি

যতটা পারি হাঁটি তবে খুব ব্যস্ত আছি। এখানটা খুব সুন্দর (যদিও শহরের ভেতরে)। লাইলাক, হথর্ন আর ল্যাবার্নাম ফুটে আছে প্রতিটি বাগানে। চেস্টনাট গাছগুলো সুন্দর। যদি কেউ সত্যি-সত্যি প্রকৃতিকে ভালোবাসে তবে সে সব জায়গায় সুন্দরকে খুঁজে পাবে। ১৬

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতি আবেগ, একটা তীক্ষ্ণ আবেগ, ধর্মীয় আবেগের মতো নয় যদিও আমি মনে করি এই দুয়ের ভেতর একটা নিকট সম্পর্ক আছে। ৩৮

ভোর সাড়ে তিনটেয় ঊষার দেখা পেতে পাখিরা গান গাইতে শুরু করে দিল। আমি আবারও বেরিয়ে পড়লাম। হাঁটতে ভালো লাগছিল তখন। ৬৯

আজ সন্ধ্যায় অস্তসূর্য যখন জলে আর জানালায় প্রতিফলিত হচ্ছিল, আর সমস্ত কিছুর উপর উজ্জ্বল সোনালি দীপ্তি ছড়িয়ে দিচ্ছিল তখন সেটা কুইপের আঁকা একটা ছবি বলে মনে হচ্ছিল। ৮৪

ফরাসী উপকূলে দিয়েপে দেখলাম সবুজ ঘাসে ঢাকা টিলা পাহাড়। আকাশ আর সমুদ্র, পুরানো নৌকায় ভর্তি পোতাশ্রয়, দোবিনির আঁকা ছবির মতো : পাঁশুটে রঙের জাল আর নৌকার পাল; ছোটো ছোটো বাড়ি, মাঝে মাঝে ছড়ানো ছিটানো রেস্তোরাঁ, তার জানালায় সাদা পর্দা আর সবুজ পাইনের ডালপালা টাঙানো; বড়ো বড়ো নীল রঙের লাগাম পরানো আর লাল ঝুমকা বাঁধা সাদা রঙের ঘোড়ায়

গাড়ি টানছে; গাড়োয়ানদের গায়ে নীল জামা; জেলেদের মুখে দাড়ি; তেলা কাপড়ের তৈরি পোশাক তাদের গায়ে; ফরাসী মেয়েদের ফ্যাকাসে মুখ, কালো চোখ, প্রায়ই তা কোটরে ঢোকা, কালো পোশাক আর সাদা টুপি পরা। ৮৫

গত সপ্তাহে আমাদের এখানে বন্যা হয়েছিল। রাত্রে দোকান থেকে ফেরার পথে, বারোটা থেকে একটার মধ্যে, ক্যাথিড্রালটার চার পাশে পায়চারি করলাম ; তার চারপাশের এল্‌ম্‌ গাছগুলোর ভিতর দিয়ে বাতাস গজরাচ্ছিল, জলভরা মেঘের ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো দেখা যাচ্ছে, আর খালের জলে তা প্রতিফলিত হচ্ছে, খালগুলো এর মধ্যেই উপচে পড়ার মতো কানায় কানায় ভরে গেছে। ৮৫

কাল শেষ রাতে লেখার জন্য বসেছিলাম। আজ সকাল সকাল উঠে পড়েছি লিখব বলে। কী চমৎকার আবহাওয়া। রাতের উঠোনের দৃশ্য চমৎকার। সব কেমন মড়ার মতো শান্ত, আলোগুলো জ্বলছে, তাদের মাথার উপর তারাভরা আকাশ। 'সমস্ত নিঃশব্দ হলে নক্ষত্রের নীচে শোনা যায় ঈশ্বরের কথা।' ১০০

চাঁদ এখনো ঝিকমিক করছে। সূর্য, সন্ধ্যাতারা ভালো জিনিস, তারা প্রায়ই ঈশ্বর-প্রেমের কথা বলে, এই কথাগুলো সম্পর্কে ভাবায় : দেখো, সর্বদা আমি তোমার সঙ্গে আছি, এমন কি পৃথিবীর শেষ দিন অবধি। ১০১ক

গোধূলি নামছে—ডিকেন্‌স্‌ একে বলেছিলেন 'আনন্দময় গোধূলি' (blessed twilight), বাস্তবিকই কথাটা তিনি ঠিকই বলেছিলেন। আনন্দময় গোধূলি, বিশেষ করে যখন দুজন বা তিনজন একত্রে বসে থাকে মন তাদের এক সুরে বাজে এবং লিপিকরদের মতো, তাদের সম্পদের ভাণ্ডার থেকে নতুন পুরানো নানা জিনিস বার করে ধরেন। আনন্দময় গোধূলি, যখন ঈশ্বরের নামে দুজন বা তিনজন এক জায়গায় জড়ো হয়, আর ঈশ্বর থাকেন তাদের মাঝখানে, এ-সব কথা যে জেনেছে, এসব কথা যে মেনে চলে সে-ও আনন্দময়। ১১০

এক এক সময় নিসর্গদৃশ্য আঁকার এমন প্রবল ইচ্ছা হয় যে কী বলব, ঠিক যেমন নিজেকে সঞ্জীবিত করে তোলার জন্য অনেক দূর হেঁটে বেড়াতে খুব ইচ্ছা করে, আর প্রকৃতির মধ্যে সর্বত্র, যেমন ধর, গাছপালার মধ্যে একটা অভিব্যক্তি ও আত্মা যেন আমি দেখতে পাই। ছিন্নাগ্র উইলো গাছের একটা সারিকে যেন অনাথ আশ্রমের মানুষদের মিছিলের মতো দেখায়। নতুন শস্যের চারপাশে এমন একটা অবর্ণনীয় বিশুদ্ধতা ও কোমলতার ভাব আছে যে তা দেখে, যেমন ধর, ঘুমন্ত শিশুর অভিব্যক্তি মনে যে আবেগ জাগায় ঠিক সেই আবেগ জাগিয়ে তোলে। পথের ধারের মাড়িয়ে যাওয়া ঘাসগুলোকে বস্তির মানুষদের মতো ক্লান্ত ও ধুলোবালিমাখা দেখায়। ২৪২

আজ সকালে চারটে বাজবার আগেই আমি বাইরে বেরিয়ে পড়েছিলাম। আমার ইচ্ছা ঝাড়ুদারকে ধরি, বা বলা যায় তাকে ধরার ব্যাপারটা শুরুই হয়ে গেছে। এই রেখাচিত্রের জন্য ঘোড়ার স্টাডি করা দরকার, আজ তাদের দুটো স্টাডি করেছি, রাইন রেলস্টেশনের আস্তাবলে। ২৮৯

গ্রামের ভেতর অনেক দূর চলে গিয়েছিলাম প্রকৃতির সঙ্গে কথা বলব বলে। ৩১৯

জলাজমিতে ছোটো ছোটো বার্চ গাছের মাঝখানে লাল সূর্য, সেখানে মাথা তুলছে আবছায়া সন্ধ্যা, তার পেছনে দেখা যায় নীলচে ধূসর গাছের সারি, কয়েকটা চালা —এই বিষয়ে আর একখানা ছবি আঁকছি। ৩২৫

আমাদের এখানে বিষণ্ণ বর্ষণঘন দিন, আর এই যে চিলেকোঠায় আস্তানা পেতেছি এর কোণে এসে যখন বসি এখানটা আশ্চর্যরকমের বিষাদময় লাগে। একটিমাত্র কাচের শার্সি, তার ভিতর দিয়ে আলো এসে পড়ে একটা খালি রঙের বাক্সের উপর, এক গোছা ক্ষয়ে-যাওয়া তুলির উপর, এক কথায় বলতে গেলে ব্যাপারটা এমন আশ্চর্যরকমের বিষাদময় যে ভাগ্যিস এর একটা হাস্যকর দিকও আছে, বেশ যথেষ্ট পরিমাণেই তা আছে যাতে কেউ না কাঁদতে বসে সেই জন্য, বরং খুশি মনেই সেটাকে সে মেনে নেয়। ৩২৮

প্রকৃতি বিষয়ে অনেক কিছু শেখবার আছে। ৩৭০

গ্রীষ্মকে প্রকাশ করাটা আমার মনে হয় সহজ কাজ নয়; সাধারণত, অন্তত প্রায়শই, গ্রীষ্মের প্রভাবটা হয় অসম্ভব, না হয় কুশ্রী, অন্তত আমার তাই মনে হয়; তবে হ্যাঁ, বৈপরীত্য হিসাবে গোধূলিটাও রয়েছে।

তবে আমি বলতে চাই সে গ্রীষ্মের রোদের ভাবসঞ্চার ফোটানো সহজ নয়, মানে যাতে করে সেটা অন্যান্য ঋতুর বৈশিষ্ট্যসূচক ভাবসঞ্চারের মতো সমৃদ্ধ, সাদাসিধা এবং সুন্দর দেখতে হয়।

বসন্ত কোমল, সবুজ কাঁচা শস্য আর নীলাভ লাল আপেল ফুল।

হেমন্ত হল হলুদ পাতার সঙ্গে বেগুনি টোনের বৈপরীত্য; শীত হল কালো সিল্যুয়েটের সঙ্গে তুষারের বৈপরীত্য। কিন্তু গ্রীষ্ম যদি নীলের সঙ্গে শস্যের সোনালি ব্রোঞ্জের ভিতরকার কমলার একটা উপাদানের বৈপরীত্য হয়, তাহলে এমন একটা বর্ণচিত্র কেউ আঁকতে পারে যা পূরক বর্ণগুলির (লাল ও সবুজ, নীল ও কমলা, হলুদ ও বেগুনি, সাদা ও কালো) প্রতিটি বৈপরীত্য দিয়ে ঋতুগুলির মেজাজকে প্রকাশ করবে। ৩৭২

প্রতিদিন এ বিশ্বাস আমার দৃঢ় হচ্ছে যে প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই না করলে সফল হওয়া যায় না। ৩৯৩

অনেক সময় ভাবি দিনের তুলনায় রাত্রি অনেক বেশি প্রাণবন্ত আর অনেক বেশি বর্ণময়। ৫৩৩

নিসর্গপ্রকৃতির সামনে আবেগ এমন জড়িয়ে ধরে যে চেতনা হারিয়ে ফেলি, তারপর দিন পনেরো কোনো কাজ করতে পারি না। ৬২৬ক

ব্যর্থতা

তোকে আমি বলছি, কেউ যদি সক্রিয় হতে চায়, ব্যর্থতাকে ভয় পেলে চলবে না তার, কিছু ভুল করাকে ভয় করলে তার চলবে না। ৩৭৮

অনুভূতি

অনুভূতি একটা মস্ত ব্যাপার। একে বাদ দিয়ে কারো পক্ষে কোনো কিছু করাই অসম্ভব। ২৩৩

আবেগ

আমরা যেন ভুলে না যাই যে ছোটো ছোটো আবেগগুলি আমাদের জীবনের জাঁদরেল ক্যাপটেন, আর না জেনে তাদেরই হুকুম আমরা তামিল করি... এখন থেকে একথা ভুলিস না যে আমাদের তিক্ততা ও বিষাদ, বা আমাদের সৎ প্রকৃতি ও সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান কোনোটাই আমাদের একমাত্র পথপ্রদর্শক নয়, এবং সব থেকে বড়ো কথা আমাদের চূড়ান্ত অভিভাবক তারা নয়; ৬০৩

খিচুড়ি-চাটনি

এক বিকেলবেলা স্ট্রিকার কাকার ওখানে খিচুড়ি খেলাম...কাকার অতি প্রিয় সেই চাটনিগুলোর কথা মনে পড়ল যেগুলো আমিও শিখেছি পছন্দ করতে। ১১২

কাজ

কাজই একমাত্র প্রতিকার ৩০২

টিঁকে যদি থাকতে হয় তাহলে কৃষকরা যত কাজ করে এবং যত কম ভড়ং ক'রে কাজ করে আমাদেরও তাই করতে হবে। ৬১৫

ভাবনা

বেশি করে ভাব, সর্বক্ষণ ভাব। সাধারণ স্তর ছাড়িয়ে এই ভাবনা তোকে কোথায় কত উঁচুতে নিয়ে যাবে টেরও পাবি না। ১৩৩

সংগীত

দুঃখ এই যে তার সঙ্গে আগে, ধর, দশ বছর আগে আমার দেখা হয়নি। তাকে দেখে মনে হয় যেন এক ক্রেমোনা বেহালা, যে বাজে হাতুড়ে মেরামতওয়ালার হাতে পড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। ৩৭৭

একবার সংগীতবিদ্যা শেখার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলাম। আমাদের বর্ণ আর হ্বাগনারের সংগীতের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে অনেকটা ভেবেছিলাম। ৫৩৯

হ্বাগনার সম্পর্কে আর-একটা প্রবন্ধ পড়লাম—'সংগীতে ভালোবাসা'। হ্বাগনারের বিষয়ে যিনি বই লিখেছেন মনে হয় এটা তাঁর লেখা। ছবিতেও এই জিনিসটার বড়ো প্রয়োজন। ৫৪২

কবিতা

আমাদের চারপাশে সর্বত্র কবিতা ঘিরে রয়েছে। তাকে কাগজে-কলমে ধরা, ওফ্, দেখে যেমন মনে হয় তত সহজ নয়। ২৭৬

সবসময় আমি ভাবি যে ছবির চেয়ে কবিতা অনেক বেশি সাংঘাতিক... ৫৩৯

অসুস্থতা

"আমার অসুস্থতা কোনো দুর্ভাগ্য নয়।" নয়, কারণ "হাসির চেয়ে দুঃখ

ভালো।" না, ঈশ্বর সহায় হলে অসুস্থতা দুর্ভাগ্য নয় কেননা অসুস্থতার দিনগুলোতে নতুন পরিকল্পনা, নতুন ইচ্ছার সাধ জাগে। অসুস্থ না হলে এসব আসতই না...। অসুস্থতা শরীর পবিত্র করে, আমাদের ভালো থাকতে শেখায়। ৭৮

শিশু

দোলনার কাছে সূর্য ঝলমল করছে সকালবেলা জেগে উঠে তা দেখে ছোটো বাচ্চা যখন কলকল করে, হাসে তখন তার চোখের অভিব্যক্তিতে দেখতে পাই সমুদ্রের চেয়ে গভীরতর, অনন্ত, আরো শাশ্বত অন্য কিছু। ২৪২

প্রশংসা

যখন কেউ প্রশংসিত হয়, প্রশংসা পান করে। তখন প্রশংসাও, পানীয়ের মতো, উত্তেজক। প্রশংসা মানুষকে দুখী করে—কীভাবে কথাটা বলব জানি না—অনুভব করি আমি—তবে আমার মনে হয় বাড়িতে নিভৃতে বসে প্রশংসার সঙ্গে মানুষ শ্রেষ্ঠ কর্ম করতে পারে। ডবলু ২০

ক্যানসার

ক্যানসার নিশ্চিতভাবে একটা সাংঘাতিক ব্যাধি—আমি তো, এরকম দেখলে ভয়ে কাঁপতে থাকি—আর দক্ষিণে এটা কোনো বিরল ঘটনা নয়, যদিও এটা প্রায়ই সত্যি নয়, আরোগ্যজনক এবং পার্থিব ক্যানসার তবে ক্যানসারাস টিউমার থেকে মানুষ মাঝে মধ্যে সেরে ওঠে।... স্মৃতি যদি আমার সঙ্গে ছলনা না করে, আমাদের ডাচ ভাষায় একটা প্রবাদ আছে—বোলতারা যে ফলগুলো কুরে কুরে খায় তারা নিকৃষ্টতম নয়... ডবলু ১১

তেও

সত্যি বলতে, তুই ছাড়া আমার সত্যিকার বন্ধু কেউ নেই। মন যখন খারাপ থাকে, তখন সবসময় তোর কথা মনে হয়। কেবল ইচ্ছে করে তুই এখানে থাকলে দেশের কথা দুজনে মিলে আলোচনা করতাম। ৩০২

আমার যদি তেও না থাকত, তাহলে আমার যা পাওয়ার অধিকার আছে তা পাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হত না ; তবে সে যে আমার বন্ধু এটা দেখে আমার বিশ্বাস আমি আরও অগ্রসর হতে পারব এবং এই ব্যাপারে রাশ ছেড়ে দিতে পারব। ডবলু ১

ভালোবাসা

যথার্থই যা ভালোবাসার যোগ্য তাকে যদি কেউ আন্তরিকভাবে ভালোবেসে যায়, এবং তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর ও অর্থহীন সামগ্রীতে তার ভালোবাসার অপচয় না ঘটায় তাহলে সে ক্রমেই আরও বেশি করে আলোর সন্ধান পাবে এবং উত্তরোত্তর দৃঢ়তর হয়ে উঠবে। ১২১

সবসময় এটা বলা যায় না কিসে আমাদের অবরুদ্ধ করে রাখে, বন্দী করে রাখে, চাপা দিয়ে রাখে। যাই হোক, কেউ কেউ অনুভব করে কিছু বাধা, কিছু দরজা, কিছু প্রাচীর আছে। এ সব কি কল্পনা, রূপকথা? আমার তা মনে হয় না। প্রশ্ন হল, 'হে ঈশ্বর! এ কি সুদীর্ঘকালের, চিরকালের, শাশ্বতকালের?'

তুই কি জানিস এই বন্দীত্ব থেকে কিসে আমাদের মুক্তি দেয়? প্রতিটি গভীর, আন্তরিক ভালোবাসা। বন্ধু হয়ে, ভাই হয়ে, ভালোবাসো যা এক সর্বোচ্চ ক্ষমতায়, জাদু শক্তিতে বন্দীশালা খুলে দেয়। ভালোবাসা বিনা মানুষ বন্দীশালায় থেকে যায়।

এই কারাগারকে বলা যায় কুসংস্কার, ভুল বোঝাবুঝি, কোনো বিষয় সম্পর্কে সাংঘাতিক অজ্ঞতা, অবিশ্বাস, মিথ্যে লজ্জা। ১৩৩

সবসময় ভাবি ঈশ্বরকে জানবার সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে বহু কিছুকে ভালোবাসা। বন্ধুকে ভালোবাসা, সহধর্মিণীকে ভালোবাসা, যা-কিছু তুমি পছন্দ কর, তাকেই ভালোবাসা—ঈশ্বর জানার পথে অনেকটা এগিয়ে যাবে তুমি। নিজেকেও আমি সেই কথাই বলি। তবে ভালো যে-ই বাসুক-না কেন, সে যেন উঁচু খাঁটি আন্তরিক সমবেদনার সঙ্গে ভালোবাসে, তাতে যেন শক্তি এবং বুদ্ধি থাকে। সে যেন সবসময় আরো গভীরভাবে, ভালোভাবে, আরো বেশি চেষ্টা করে। এ চেষ্টা তাকে নিয়ে যাবে ঈশ্বরের পথে, নিয়ে যাবে স্থির বিশ্বাসের দিকে। ১৩৩

ভালোবাসায় জোর খাটানোটা অবিশ্বাস্য... ১৫৩

ভালোবাসা এত স্পষ্ট, এত শক্তিমান, এত সত্য যে ভালো যে বাসে তার পক্ষে এই অনুভূতি ফিরিয়ে নেওয়া, তার নিজের জীবন নষ্ট করার মতোই অসম্ভব।

...জীবন আমার কাছে ভীষণ প্রিয় হয়ে উঠেছে। আমি খুব খুশি যে আমি ভালোবাসি। আমার জীবন আর ভালোবাসা আমার কাছে এক। ১৫৪

সত্যিকার ভালোবাসা যেমন করে জীবনের সত্যকে জাগিয়ে দেয় এমন আর কিছুতে পারে না। ১৫৪

সত্যি-সত্যি আমি ভালোবাসি, সেইজন্য আমার ড্রয়িং-এ অনেক বেশি বাস্তবতা... ১৫৫

কাজ করার জন্য, শিল্পী হওয়ার জন্য ভালোবাসা প্রয়োজন। কাজের মধ্যে যে আবেগ চায় তাকে অন্তত এটা প্রথমে অনুভব করতে হবে এবং পূর্ণ প্রাণে বাঁচতে হবে। ১৫৯

ভালোবাসার ভেতর দিয়ে আমাদের দায়িত্ববোধ তীক্ষ্ণ হয়, আমাদের কাজগুলো একটা স্পষ্ট চেহারা পায়। ভালোবাসায় এবং ভালোবাসার কাজগুলো করার ভেতর দিয়ে আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করি। ১৬১

জীবন যে কী এক রহস্য, আর রহস্যের রহস্য হল ভালোবাসা। ২৬৫

ভালোবাসা আর বন্ধুতা আমার কাছে কেবলমাত্র কোনো আবেগ নয়, একটা ইতিবাচক ক্রিয়া... ২৬৬

গমের দানার মধ্যে যেমন থাকে অঙ্কুরোদ্‌গমের শক্তি তেমনই প্রতিটি স্বাস্থ্যবান স্বাভাবিক মানুষের ভেতরে থাকে উন্মেষক-শক্তি। আর সেজন্য স্বাভাবিক জীবন হল এই উন্মেষ। গমের দানার ক্ষেত্রে যা উন্মেষক শক্তি, আমাদের ভেতরে ভালোবাসা হল তা-ই। ডবলু ১

বন্ধুত্ব

যে জিনিসটা আমাদের দিয়ে কাজ করিয়ে নিচ্ছে তা হল পরস্পরের মধ্যকার বন্ধুত্ব; প্রকৃতি প্রেম, আর শেষ কথা হল, কেউ যদি তুলি-চালানো আয়ত্ত করার জন্য যাবতীয় কষ্ট স্বীকার করে থাকে তাহলে ছবি না এঁকে সে থাকতে পারে না। অন্যদের সঙ্গে তুলনায়, আমি এখনও সৌভাগ্যবানদের দলেই রয়েছি, কিন্তু কেউ যদি এই পেশা গ্রহণ করে থাকে অথচ কিছু করার আগেই তাকে সেটা ছেড়ে দিতে হয় তাহলে ব্যাপারটা কি রকম দাঁড়াবে একবার ভেবে দেখ, আর

সে-রকম লোক তো অনেক আছে। ৬১২

আমি মনে করি বন্ধুত্ব হবে মূলত ক্রিয়া শুধুমাত্র অনুভূতি নয়। আর ২৮

হেঁচড়ানো বন্ধুত্ব আমি চাই না। আর ৫৪

জীবন

বাইরে থেকে যন্ত্রণা পাই ঠিকই তবে জীবন কি অন্তরের দিকে সমৃদ্ধতর হওয়ার জন্যই নয়? ১১৭

কোনো একটা অনন্ত গভীর সত্য ছাড়া জীবন আমার কাছে অর্থহীন। ১৬৪

জীবনও খুব সম্ভব গোল, এবং যে গোলার্ধ বর্তমানে আমরা চিনি প্রসার ও ধারণ ক্ষমতার দিক থেকে তার থেকেও সেটা খুবই উন্নত। বি ৮

বিশ্বাস

কাজের উন্মাদনার মধ্যে আছি, যদিও এই মুহূর্তে খুব একটা আহা-মরি ফল তার কিছু তৈরি হয় নি। তবে আশা করছি সকল কাঁটা ধন্য করে শুভ্র কুসুম ফুটবে যথাকালে, আর এই আপাত-বন্ধ্যা সংগ্রাম সন্তানজন্মের প্রসব বেদনা ছাড়া অন্য কিছুই নয়। প্রথমে কষ্ট, পরে আনন্দ। ১৩৬

আমার বিশ্বাস প্রতিটি মানুষের ভেতরে একটা বিচিত্র বিশাল শক্তি লুকিয়ে আছে গভীরভাবে। এ বিষয়ে সে অচেতন। আজ হোক, কাল হোক কোনো একজনের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর সে জেগে উঠে বলে, 'সে ছাড়া আর কেউ নয়।' ১৫৭

আমি সবসময় বিশ্বাস করেছি যে 'প্রতিবেশীকে নিজের মতো ভালোবাসো' কোনো অত্যুক্তি নয়, একটা স্বাভাবিক কথা। ২১৯

নিজের ভেতর এমন একটা সৃষ্টিশক্তি অনুভব করছি যে নিশ্চিত জানি একটা সময় আসবে যখন প্রতিদিন নিয়মিতভাবে ভালো কিছু করতে পারব। ২২৯

শেষ সন্ধ্যায় তোকে আরো একবার আন্তরিকভাবে বলতে ইচ্ছে করে যে আমি আশা করি আগামী দিনে আমাদের চিঠিপত্র, সম্প্রতি এই যে জীবন্ত হয়ে

উঠেছে তার চেয়ে অনেক বেশি জীবন্ত হয়ে উঠবে। ৩৯৯

নিজের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কেউ এই দুনিয়ায় আসেনি, প্রতিবেশীর তুলনায় কারো আরো-ভালো হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। ৪৩৩

সভ্যতা

দুর্বল নিপীড়িত কত-যে মানুষ দেখতে পাই। আমার খুব সন্দেহ হয় ওই যাকে অগ্রগতি, সভ্যতা বলা হয় তার যাথার্থ্য কতটুকু। সভ্যতায় আমার আস্থা আছে বিশেষত এইরকম এক সময়ে তবে সেই সভ্যতায় যার ভিত্তি প্রকৃত মানবিকতায়। যা-কিছু মানবজীবন ধ্বংস করে তা-ই বর্বর, তাকে আমি শ্রদ্ধা করি না। ১৯৭

গণিকা

খোলাখুলি বলতে গেলে একথা আমি পুরোপুরিই জানি যে গণিকারা মন্দ, কিন্তু তাদের মধ্যে এমন একটা মানবিক ব্যাপার অনুভব করি যা তাদের সঙ্গে মেলামেশার ব্যাপারে সামান্যতম নৈতিক সঙ্কোচ অনুভব করতেও আমাকে নিরস্ত করে। ভীষণ খারাপ কিছু তাদের মধ্যে আমি দেখি না। তাদের সঙ্গে অতীতে বা বর্তমানে মেলামেশার ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্রও অনুশোচনা নেই। আমার সমাজ যদি পবিত্র এবং সুনিয়ন্ত্রিত হত, হ্যাঁ তা হলে তাদের বিপথে প্রলুব্ধকারী বলা যেতে পারত ; তবে এখন, আমার মতে, লোকে তাদের করুণাময়ী ভগিনী হিসাবেই বরং বেশি করে প্রায়শ দেখতে পারে। ৩২৬

লটারি

স্পুই স্ট্রীটের শুরুতে সুরমানের রাজ্য লটারি দপ্তরের কথা বোধহয় তোর মনে আছে। এক বৃষ্টির সকালে সেখান দিয়ে যাচ্ছিলাম। সেখানে তখন একদল লোক ভিড় করে দাঁড়িয়ে ছিল লটারির টিকিটের জন্য। তাদের বেশির ভাগই বৃদ্ধ—মহিলা এবং আর যারা দাঁড়িয়ে ছিল তাদের সম্পর্কে বলা শক্ত তারা কী করছিল অথবা কীভাবে জীবনধারণ করে তারা। তবে তারা যে কঠিন পরিশ্রম করেছে, কষ্ট ভোগ করেছে সেটা স্পষ্ট।

অবশ্য উপর উপর দেখতে গেলে এই লোকগুলো আপাতদৃষ্টিতে কেন যে 'আজকের খেলা'য় এতটা আগ্রহী তোর-আমার কাছে হেঁয়ালি ঠেকবে কেন না তোর বা আমার কারোরই লটারিতে কোনোরকম আগ্রহ নেই। ২৩৫

লটারি ব্যাপারে কৌতূহল আর মোহ আমার কাছে ছেলেমানুষী মনে হয়— ২৩৫

বই

তুই জানিস না বাইবেল আমাকে কেমন করে টানছে। প্রতিদিন আমি এই বই পড়ি বটে তবে একে আমি কণ্ঠস্থ করতে চাই। 'তোমার কথা আমার পথের আলো, আমার পাদপ্রদীপ' এই কথার আলোয় জীবনকে দেখতে চাই। আমার আশা, আমার বিশ্বাস যে ভাবেই হোক আমার জীবন একদিন বদলে যাবে আর তাঁর জন্য এই আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হবে। কখনো কখনো আমিও নিঃসঙ্গ, দুঃখী বিশেষ করে যখন কোনো চার্চ বা পাদ্রীর বাড়ির কাছাকাছি হই। ৮৮

টমাস আ কেমপিসের বইটি বিশেষ ধরনের; এর কথাগুলো এত গভীর ও গাম্ভীর্যপূর্ণ যে সেগুলো পড়লে আবেগতাড়িত, প্রায় ভীতিগ্রস্ত না হয়ে পারা যায় না— অন্তত কেউ যদি আলোক ও সত্যের সন্ধান পাওয়ার জন্য আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা নিয়ে পড়েন তাহলে এর ভাষাতে এমন এক ভাবোদ্দীপকতার গুণ বর্তমান যা হৃদয় জয় করে নেয়, কারণ হৃদয় থেকেই সেটি উৎসারিত। ১০৮

অতীতেও, প্রায়ই বইয়ের দোকানে যাওয়া আমাকে প্রফুল্ল করেছে এবং মনে করিয়ে দিয়েছে দুনিয়ায় এইরকম ভালো বস্তু আছে। ১১২

আজকাল আমি প্রায়ই *আঙ্কল টমস কেবিন* বইটি পড়ি। পৃথিবীতে এখনও এত দাসত্ব রয়েছে, আর এই দারুণ আশ্চর্য বইটিতে সেই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি এত প্রজ্ঞা, এত ভালোবাসা এবং দরিদ্র নিপীড়িতদের প্রকৃত মঙ্গল সম্পর্কে এমন উৎসাহ ও আগ্রহ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যে বার বার বইটি পড়তে হয়, আর প্রত্যেকবারেই কিছু-না-কিছু নতুন জিনিস তাতে পাওয়া যায়। ১৩০

আমার সব বইপত্তর আবার সাজাতে-গোছাতে ব্যস্ত আছি। আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কে...একটা ধারণা পেতে প্রচুর পড়েছি। এক-একসময় খুব খারাপ লাগে যে ইতিহাস, বিশেষ করে আধুনিক ইতিহাস সম্পর্কে বেশি কিছু জানি না। ১৪৮

যেটা আমি একটু একটু করে আয়ত্ত করছি ইচ্ছে করি অন্যদের যদি সেটা থাকত : বিনা আয়াসে অল্প সময়ের ভেতরে একটা বই পড়ে ফেলা আর এ বিষয়ে একটা জোরালো ধারণা রাখা। বই-পড়াতে, ছবি-দেখার মতো, সুন্দর পাঠক তার প্রশংসা করবে আস্থার সঙ্গে, নিঃসন্দেহে, নির্দ্বিধায়। ১৪৮

আঙ্কল টমস কেবিন-এর সবচেয়ে সুন্দর অনুচ্ছেদ সম্ভবত সেইটা যেখানে

হতভাগ্য ক্রীতদাসটি, মরে যাবে জেনেও স্ত্রীর সঙ্গে শেষবার বসে বসে মনে করছে এই কথাগুলো, 'ভাবনা আসুক পাগলা ঝোরার মতো,/পড়ুক দুখের ঝড়,/ বিঘ্নহীন আমি যেন ফিরতে পারি বাড়ি,/হে ঈশ্বর, স্বর্গ আমার, স্বর্গ আমার, সর্বস্ব আমার।' ২৪৮

বই বল, বাস্তবতা বল, শিল্প বল—সব আমার কাছে সমান। ২৬৬

এখনো মনের মধ্যে একটা স্বপ্ন আছে একটা বইয়ের দোকানের ছবি আঁকব সামনেটা হলুদ আর গোলাপী। সন্ধেবেলা, কালো পথিকের দল—এটা এমন একটা আধুনিক বিষয় অবশ্যই। ৬১৫

কোথায় যেন পড়েছি বই লেখা বা ছবি আঁকা প্রজননের মতোই। আমার কিন্তু সেটা মনে হয় না। শেষ ব্যাপারটা আরো অনেক স্বাভাবিক ও ভালোতর। ৬৪১ক

আমি নিজে সবসময় খুশি যে আজকালকার অনেকের তুলনায় বাইবেল গভীর মন দিয়ে পড়েছি, তার কারণ এ আমার মনকে শান্তি দেয় যে এককালে এইরকম উচ্চ ধারণা তাহলে ছিল। ডবলু ১

লেখক

বালজাকের লেখা *ইল্যুজিয়ঁ প্যারদ্যু* বা 'হারিয়ে যাওয়া মোহগুলি' বইটি যদি তোর বড্ড বড়ো বলে মনে হয় (দুখণ্ডে সমাপ্ত) তাহলে না হয় *ল্য প্যার গরিঅ* চেষ্টা করে দেখ, মাত্র একখণ্ডে লেখা; বালজাক পড়ার চেষ্টা একবার যদি করিস তাহলে দেখবি যে অন্য অনেকের থেকে তাঁকে তোর বেশি পছন্দ হবে। বালজাকের উপনামটার কথা মনে করে দেখ একবার : 'দুরারোগ্য পশুরোগের চিকিৎসক'। ১৪৮

আমি তোকে বলছি, জোলা হলেন সত্যি-সত্যি দ্বিতীয় বালজাক। প্রথম বালজাক ১৮১৫ থেকে ১৮৪৮ পর্যন্ত সমাজ বর্ণনা দিয়েছেন। বালজাক যেখানে ছেড়েছেন, তার পর থেকে শুরু করেছেন জোলা এবং চলেছেন সোভান না-আসা পর্যন্ত... ২১৯

ভিক্তর হুগোর *লে মিজারেবল* পড়ছি। এ কেতাব কখনো পুরনো হওয়ার নয়। ইচ্ছে করে এ বই বার বার পড়ি লোকে যেমন কোনো ছবি বার বার দেখতে চায়...এ সব বই বার বার পড়া ভালো, আমার তো তাই মনে হয়, অন্তত কিছু

আবেগকে বাঁচিয়ে রাখতে বিশেষ করে মানবিকতার প্রতি ভালোবাসার জন্য... ২৭৭

তুর্গেনেফের বইয়ের সঙ্গে আমার এখনও পরিচয় হয় নি, তবে কিছুদিন আগে তাঁর জীবনী পড়লাম। বেশ আগ্রহজনক, দোদের মতো তাঁর ভিতরেও ছিল মডেল দেখে আঁকার, পাঁচ ছটা মডেলকে মিশ্রিত করে একটিমাত্র টাইপের সৃষ্টি করে কাজ করার প্রবল আকাঙ্ক্ষা। আমি ওহ্‌নেতের লেখাও পড়িনি, শুনেছি তাঁর লেখাও নাকি খুব আগ্রহজনক। ৪৪৮

বিশেষ করে তুর্গেনেফ পড়ার জন্য খুব ব্যগ্র হয়ে পড়েছি। কারণ তাঁর সম্পর্কে দোদের একটা প্রবন্ধ পড়লাম, সেখানে তাঁর চরিত্র ও সাহিত্যকর্ম দুটিরই বিশ্লেষণ করা হয়েছে—খুব সুন্দর করে।

কারণ মানুষ হিসাবে তিনি দৃষ্টান্তস্বরূপ, এবং বৃদ্ধবয়সেও কাজ করার ব্যাপারে তিনি যুবকদের মতোই, যতদূর সম্ভব, তরুণ ছিলেন। কারণ, নিজেকে নিয়ে তাঁর অতৃপ্তির অবধি ছিল না, সর্বদাই চেষ্টা করতেন কী করে উত্তরোত্তর আরও ভালো করা যায়। ৪৫৭

রেভ্যু দে দ্যো মঁদ (Revue des deux Mondes) পত্রিকায় তলস্তয়ের উপর একটা নিবন্ধ পড়ছি। মনে হয় ইংলণ্ডের জর্জ এলিয়টের মতো তলস্তয়ও তাঁর জাতির ধর্মের ব্যাপারে খুবই আগ্রহী।

ধর্ম সম্বন্ধে তলস্তয়ের লেখা একটা বই নিশ্চয়ই আছে। আমার ধারণা সেটার নাম 'আমার ধর্ম' ; সেটা নিশ্চয়ই খুব চমৎকার হবে। এই নিবন্ধটি পড়ে আমার যা মনে হয়েছে তা এই যে গ্রন্থটিতে খ্রীস্ট ধর্মের বহিরাংশে কী সত্য আছে এবং সমস্ত ধর্মের ভিতরে সাধারণ সত্য কী আছে সেই জিনিসটি সন্ধানের তিনি চেষ্টা করেছেন। দেখে মনে হচ্ছে, শরীরের পুনরুত্থানের ব্যাপারটা তিনি স্বীকার করেন না, এমনকি আত্মারও নয় ; বরং নিহিলিস্টদের মতোই, তিনি বলেন যে মৃত্যুর পরে আর কিছু নেই, অথচ ব্যক্তিমানুষ মারা গেলেও, পুরোপুরি মারা গেলেও মানবজাতির, জীবিত মানবজাতির অস্তিত্ব থেকে যায়। যাই হোক, বইটা পড়িনি বলে তাঁর ধারণাটা যে ঠিক কী তা আমি বলতে পারব না, তবে আমার মনে হয় আমাদের দুঃখভোগ বেড়ে যায় যাতে এমন কোনো নিষ্ঠুর ধর্ম তাঁর ধর্ম হতে পারে না। বরং বিপরীতভাবে, সেটা নিশ্চয়ই খুবই সান্ত্বনাদায়ক হবে এবং সৌম্যতা, শক্তি, বাঁচার মতো সাহস আর আরও অনেক জিনিসকেই তা জাগিয়ে তুলবে। ৫৪২

শেকসপীয়রের জন্যও তোকে খুব আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। যে সামান্য ইংরেজিটুকু জানি তা-ও ভুলে না যেতে এটি আমায় সাহায্য করবে, আর সব

থেকে বড়ো কথা হল বইটা এত চমৎকার। যে সিরিজটা সম্পর্কে সব থেকে কম জানতাম সেটাই পড়তে শুরু করেছি; আগে অন্যান্য ব্যাপারে ব্যস্ত থাকায় বা সময় না থাকায়, সেগুলি আমি পড়তে পারিনি; রাজকাহিনীর সিরিজটা : এর মধ্যেই আমি *দ্বিতীয় রিচার্ড, চতুর্থ হেনরি* আর *পঞ্চম হেনরির* অর্ধেকটা পড়ে ফেলেছি। ৫৯৭

আমার মতে এমন কোনো লেখক নেই যিনি ডিকেন্সের মতো এমন একজন ছবি-আঁকিয়ে এবং সাদা-কালোর শিল্পী। আর ৩০

কলম

অত্যন্ত সূক্ষ্ম কলমগুলোও অত্যন্ত সুমার্জিত মানুষদেরই মতো এক এক সময় আশ্চর্যরকমের অকার্যকর বলে মনে হয় ; আর আমি দেখছি, প্রায়ই সেগুলোর মধ্যে স্থিতিস্থাপকতার গুণ থাকে না যা অত্যন্ত সাধারণ কলমগুলোতে খুব স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা পরিমাণে থাকে। আর ৩০

পেনসিল

আমার একটা উপকার করবি—কয়েকটা সেই পেন্সিল পাঠিয়ে দিবি ডাকে? পেন্সিলগুলোর হৃদয় এবং জীবন আছে। আমার মনে হয় কঁতে (Conté) পেন্সিল মৃত। বাইরে থেকে দুটো বেহালাকে একরকম দেখাতে পারে, বাজালে দেখা যায় একটা থেকে সুন্দর আওয়াজ বেরচ্ছে, আরেকটা থেকে নয়...পেন্সিলের সত্যিকার জিপসি হৃদয় ; ২৭২

পেন্সিল পেয়েছি—অনেক ধন্যবাদ—পেন্সিলটা খুব ভালো। প্রথমবার যেটা দিয়েছিলি তার থেকে নরম আর প্রায় অর্ধেক। সেই শক্ত ধরনের বড়ো বড়ো টুকরো পেতে এখনো উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি... ২৭৭

কুঁড়েমি

আমি খুব খুশি হব আমার ভেতরে যদি তুই কুঁড়ের চেয়ে বেশি কিছু দেখতে পাস। কারণ দু ধরনের কুঁড়েমি আছে যারা ভীষণরকম পরস্পরের বিপরীত। এক-একজন মানুষ থাকে যে তার আলসেমির জন্য, চরিত্রহীনতার জন্য, তার মৌল স্বভাবের জন্যই কুঁড়ে। ইচ্ছে করলে, আমাকে এইরকম একজন মনে করতে

পারিস।

অন্যদিকে, এইরকম কুঁড়ে মানুষও আছে যে তার নিজের অনিচ্ছায় কুঁড়ে, ভীষণভাবে কিছু একটা করতে চায় কিন্তু কিছুই করে না মনে মনে এই ভাবনায় বিভোর হয়ে আছে, কারণ তার পক্ষে কিছু করা অসম্ভব, কারণ সে মনে করে কোনো একটা খাঁচায় সে বন্দী হয়ে আছে, কারণ যা-দিয়ে সে কিছু করতে পারে এমন কিছু তার নেই, কারণ পরিস্থিতি তাকে অনিবার্যভাবে সেই জায়গায় নিয়ে গেছে। এইরকম মানুষ সব সময় জানতে পারে না কী সে করতে পারত, কিন্তু ভেতর থেকে সে অনুভব করে, কিছু-একটা আমি করতে পারি, তা সে যাই হোক আমার জীবনের একটা উদ্দেশ্য আছে, আমি জানি যে সম্পূর্ণ অন্যরকম একজন মানুষ আমি হতে পারতাম! কীভাবে আমি প্রয়োজনীয় হয়ে উঠতে পারি, কোনো সেবার যোগ্য? আমার ভেতরে কিছু-একটা আছে, কী সেটা? এ হল সম্পূর্ণ অন্য একরকমের কুঁড়ে লোক ; ইচ্ছে করলে, এরকম একজন বলে আমাকে মনে করতে পারিস!... ১৩৩

আমি

"সমস্ত কাজের ভেতর কিছু-না-কিছু ভালো থাকে।" অনেক রাত পর্যন্ত কাজে ব্যস্ত থাকি। এতে আমি খুশি। ৮৮

অন্য সব লোকের মতো আমিও পরিবার ও বন্ধুত্ব, স্নেহ, বন্ধুত্বপূর্ণ ভাববিনিময়ের প্রয়োজন অনুভব করি; রাস্তার জলের কলের চওড়া নল বা ল্যাম্পপোস্টের মতো পাথর বা লোহার তৈরি নই আমি। ১৩২

আমি প্রচণ্ড ভাবাবেগসম্পন্ন মানুষ, আবেগতাড়িত হয়ে কমবেশি বোকামির কাজ করতে সক্ষম এবং তা করেও ফেলি, পরে আবার তার জন্য কমবেশি অনুশোচনাও হয়। মধ্যে মাঝে আমি খুব তাড়াহুড়ো করে কথা বলি এবং কাজ করে ফেলি; অথচ ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করলেই সেটা ভালো হত। আমার মনে হয় অন্য লোকেরাও কখনো কখনো সেই একই ভুল করে ফেলে। তা ব্যাপারটা যখন এই, কী করা যায় বল তো? তবে কি নিজেকে কেবল একটা বিপজ্জনক লোক হিসাবেই আমি দেখব যে কোনও কাজই করতে সক্ষম নয়? আমার তো তা মনে হয় না। কিন্তু সমস্যাটা হল এইসব প্রচণ্ড আবেগকে ভালো কাজে লাগানোর যত রকমের উপায় আছে তার চেষ্টা করা যায় কী করে। যেমন ধর, একটা তীব্র আবেগের কথা বলি, বইয়ের প্রতি আমার কমবেশি অপ্রতিরোধ্য একটা আকর্ষণ আছে, আর আমি যেরকম নিজেকে প্রশিক্ষিত করতে চাই,

পর্যালোচনা করতে চাই যদি বলতে চাস তাই, ঠিক যেমন আমার খাবারটা খেতে চাই। তুই নিশ্চয়ই এটা বুঝতে পারবি। অন্য পরিবেশে যখন ছিলাম, ছবি ও শিল্পসামগ্রীর পরিবেশে যখন ছিলাম তোর জানা আছে সেগুলো সম্বন্ধে আমার কিরকম প্রচণ্ড আবেগ ছিল, যা উৎসাহের সর্বোচ্চ বিন্দুতে গিয়ে পৌঁছেছিল। আর তার জন্য আমি দুঃখিতও নই, কারণ এমন কি আজও, সেই দেশ থেকে অনেক দূরে থেকেও, ছবির দেশের জন্য আমার মন কেমন করে... তা, সে সব পরিবেশ আর আমার নেই— কিন্তু তবু আত্মা বলে একটা ব্যাপার আছে, লোকে বলে সেটা নাকি কখনও মরে না, কেবল বেঁচেই থাকে এবং চিরকাল ধরে কেবল খুঁজে খুঁজে খুঁজেই চলে। তাই, এই মন-কেমন-করার কাছে আত্মসমর্পণ করার বদলে নিজেকে আমি বলি সেই দেশ, বা পিতৃভূমি তো সর্বত্রই রয়েছে। অতএব হতাশার কাছে নত হওয়ার বদলে, সক্রিয় বিষাদের ভূমিকাটাই আমি বেছে নিলাম—যেহেতু সক্রিয়তার ক্ষমতা আমার ছিল—অন্যভাবে বলতে গেলে, যে বিষাদ কূপমণ্ডূকতা ও যন্ত্রণায় হতাশ হয়ে পড়ে, তার থেকে যে বিষাদ আশা করে, আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে এবং সন্ধান করে চলে তাকেই বেশি পছন্দ করলাম। আমি তাই আমার হাতের নাগালে যেসব বইগুলো রয়েছে, যেমন বাইবেল, আর মিশেলেতের ফরাসী বিপ্লব সেই বইগুলোকেই কিছুটা গুরুত্বের সঙ্গে পড়তে থাকলাম। ১৩৩

তেও, আমি অনুভব করি আমার ভেতরে একটা শক্তি আছে। তাকে প্রকাশ করতে, মুক্তি দিতে আমার যা-কিছু করা। ১৭১

ভাবিস না যেন নিজেকে আমি নিখুঁত ভাবি অথবা মতে মিলবে না এরকম একজন চরিত্র হিসেবে অনেকে আমাকে ভেবে নেয় সে আমার দোষে। মাঝে মাঝেই আমি সাংঘাতিক বিষণ্ন, খিটখিটে, ক্ষুধার্ত, পিয়াসী যেন বা সহানুভূতির জন্য; যখন তা পাই না, তখন চেষ্টা করি উদাসীন হয়ে কাজ করতে, কথা বলি ধারালো, এবং এমন কি প্রায়ই আগুনে ঘি দিই। দঙ্গলে থাকতে ভালো লাগে না, প্রায়ই মনে হয় থাকাটা কষ্টকর এবং লোকের সঙ্গে মেশা শক্ত, তাদের সঙ্গে কথা বলা কঠিন। কিন্তু তুই কি জানিস কী এর কারণ...? সোজা কথায় নার্ভাসনেস; আমি হলাম সাংঘাতিক রকম সংবেদনশীল, দৈহিক এমন কি মানসিকভাবে, সেই অবর্ণনীয় বছরগুলোয় নার্ভাসনেস বেড়ে যাওয়ায় শরীর আমার শেষ হয়ে গেছে। ২১২

আমার ভিতরে একটা ক্ষমতা আছে বলে আমি অনুভব করি, সেটার বিকাশ ঘটাতে হবে আমার, এ একটা আগুন যেটাকে আমি যেন নিভিয়ে না ফেলি, বরং প্রজ্জ্বলিত রাখতেই হবে সেটাকে, যদিও আমি জানি না সেটা কোন পরিণতিতে আমায় নিয়ে যাবে, সেটা যদি একটা বিষাদময় পরিণতি হয় তাহলেও

তাতে অবাক হলে চলবে না। যা দিনকাল পড়েছে এখন সেখানে চাইবার জিনিস কি আছে? অপেক্ষাকৃত আনন্দজনক পরিণতি বলে কিছু কি আছে? ২৪২

তিরিশ বছর ধরে আমি পথ হেটেছি পৃথিবীর বুকে। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ ড্রয়িং বা ছবির আকারে কিছু স্মারক রেখে যেতে চাই—শিল্পের কোনো রুচিকে খুশি করতে নয়, চাই আন্তরিক মানবানুভূতি প্রকাশ করতে। ৩০৯

আমার মধ্যে চিন্তা করার যে একটা শক্তি আছে তা আমি নিশ্চয়ই অনুভব করি, তবে সেই শক্তিটা আমার মধ্যে বিশেষভাব সংগঠিত হয়নি বলে আমার মনে হয়। বিশেষভাবে চিন্তাবিদ নয়, বরং অন্য কিছু বলে নিজেকে আমার মনে হয়। ৩৩৮

মানচিত্রের উপর শহর গ্রাম বোঝানো কালো কালো ফুটকিগুলো দেখে যেমন স্বপ্ন দেখি তারাদের দিকে তাকিয়ে থাকাও তেমনি সব সময় আমাকে স্বপ্ন দেখায়। নিজের মনেই প্রশ্ন করি, ফ্রান্সের মানচিত্রের উপরকার কালো ফুটকিগুলোর মতো আকাশের ওই ঝকঝকে ফুটকিগুলোতেও কি পৌঁছনো যায় না? তারাস্কঁ বা রুয়েঁতে যেতে হলে যেমন আমাদের ট্রেন ধরতে হয় তারায় পৌঁছতেও ঠিক সেই রকম মরণ ধরতে হয়। এই যুক্তির মধ্যে একটা জিনিস নিঃসন্দেহে সত্য, তা হল *বেঁচে থাকতে* আমরা তারায় পৌঁছতে *পারি না*, ঠিক যেমন মরে গেলে আমরা ট্রেন ধরতে পারি না।

আমার কাছে তাই কলেরা, পাথুরি, যক্ষা, ক্যানসার এগুলো স্বর্গীয় যানবাহন ঠিক যেমন স্টীমার, বাস আর রেলগাড়ি হল মর্ত্যের যানবাহন। আর ধীরে সুস্থে বুড়ো বয়সে মারা যাওয়া হল পায়ে হেঁটে সেখানে পৌঁছনো। ৫০৬

আত্মপ্রতিকৃতি

আমার নিজের ছবি আজ তোকে পাঠাচ্ছি; এদিকে বেশ কিছুক্ষণ অবশ্যই তাকিয়ে থাকবি; আশা করি, [তাহলে] তুই দেখতে পাবি যে আমার মুখটা আরও শান্ত হয়ে উঠেছে, যদিও আমার মনে হয়েছে আমার দৃষ্টিটা আগেকার থেকে আরও অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আর একটা ছবি আছে, সেটা আমি যখন অসুস্থ ছিলাম সেই সময়ের প্রচেষ্টা, তবে আমার মনে হয় এইটাই তোকে বেশি আনন্দ দেবে, আর এটাকে আমি খুব সাদাসিধা করার চেষ্টা করেছি। ৬০৭

আমার আত্মপ্রতিকৃতিটা থেকে দেখতেই পাবি, তবু বলে রাখি যদিও অনেক বছর

ধরে আমি পারি এবং অন্যান্য বড়ো বড়ো শহর দেখেছি, তবু আমি যেমন ধর ৎসুন্দের্ত, তুন বা পিয়েত প্রিনসের আঁকা কৃষকের মতো দেখতেই মোটামুটি থেকে গেছি। কখনো কখনো কল্পনা করি আমিও যেন তাদেরই মতো অনুভব করি, চিন্তা করি, শুধু কৃষকরা পৃথিবীতে আরও অনেক বেশি কাজ দেয় এই যা। অন্য সব জিনিস যখন তারা পায় কেবল তখনই ছবি বা বই ইত্যাদির জন্য একটা অনুভূতি, একটা আকাঙ্ক্ষা তাদের মধ্যে দেখা দেয়। আমার নিজের হিসাব মতে নিজেকে আমি অবশ্যই কৃষকদের থেকে নীচে বলে বিবেচনা করি। তা, তারা যেমন তাদের জমিতে লাঙল চালায় আমিও তেমনি আমার ক্যানভাসের উপর লাঙল চালাচ্ছি। ৬১২

বিশ্বনাগরিক

কোনো কোনো সময় বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে যে ধীরে ধীরে আমি হয়ে উঠছি একজন বিশ্বনাগরিক; অর্থাৎ আমি আর ওলন্দাজ বা ইংরেজ বা ফরাসি নই, কেবল একজন মানুষ। ১৩ক

অনুবাদ : অনির্বাণ রায়

[প্রিয় মি. ওরিয়ের]

ভিনসেন্ট ভ্যান গঘ

মার্কার দ্য ফ্রাঁস পত্রিকায় লেখা আপনার প্রবন্ধটির জন্য অনেক ধন্যবাদ। লেখাটি আমায় খুবই অবাক করে দিয়েছে। রচনাটি নিজেই একটি শিল্পকর্ম, সেই হিসাবে সেটি আমার খুবই ভালো লেগেছে। আমার মতে আপনার শব্দগুলি বর্ণ সৃষ্টি করে, সংক্ষেপে বলতে গেলে, আপনার প্রবন্ধটিতে আমার নিজের আঁকা চিত্রগুলিকে আমি নতুন করে আবিষ্কার করলাম, আর সেগুলি যা তার থেকে অনেক বেশি ভালো, অনেক সমৃদ্ধতর ও অর্থপূর্ণ হয়ে উঠেছে আপনার প্রবন্ধটির মধ্যে। যাই হোক যখন ভাবি যে আপনি যেসব কথা বলেছেন তা আমার পক্ষে যতটা প্রযোজ্য তার থেকে অন্যের প্রতি, যেমন ধরুন, বিশেষ করে মন্তিচেল্লির প্রতিই বেশি প্রযোজ্য তখন মনে মনে ভারি অস্বস্তি বোধ করি আমি। যেমন আপনি বলেছেন, "আমি যতদূর জানি, বস্তুর বর্ণধর্মিতাকে (chromatism) এমন নিবিড়ভাবে, এমন ধাতুধর্মী, রত্নসম দীপ্তির সঙ্গে উপলব্ধি করেছেন একমাত্র এই চিত্রকরই।" অনুগ্রহ করে আপনি যদি আমার ভাইয়ের ওখানে গিয়ে মন্তিচেল্লির একটি বিশেষ পুষ্পস্তবক দেখে আসেন—সাদা, ফরগেট মি নট ফুলের নীল আর কমলা রঙের পুষ্পস্তবক—তাহলে আমি যা বলতে চাইছি তা অনুভব করতে পারবেন। কিন্তু মন্তিচেল্লির শ্রেষ্ঠ ও সব থেকে বিস্ময়কর চিত্রগুলি অনেকদিন ধরেই স্কটল্যান্ড ও ইংলন্ডে রয়েছে। উত্তরাঞ্চলের এক সংগ্রহশালায়—আমার বিশ্বাস লিল্-এ, এক অত্যন্ত বিস্ময়কর, আবার অন্য দিক থেকে সমৃদ্ধ এবং অবশ্যই ওয়াত্তোর (Watteau) 'সিথের যাত্রী' (Départ pour Cythére) চিত্রের থেকে কোনো অংশে কম ফরাসিয়ানা যুক্ত নয় এমন এক চিত্র রয়েছে বলে লোকে বলে। বর্তমানে মি. লোজে (Lauzet) মন্তিচেল্লির খান ত্রিশেক চিত্রর নকল করার কাজে ব্যস্ত আছেন।

পথ একটাই; এবং আমি যতদূর জানি, দ্যলাক্রোয়ার (Delacroix) থেকে সরাসরি এবং প্রত্যক্ষভাবে তাঁর ধারা অনুসরণ করেছেন এমন কোন বর্ণশিল্পী (colorist) নেই; তা সত্ত্বেও কিন্তু আমার ধারণা সম্ভবত অন্য কারও কাছ থেকে মন্তিচেল্লি দ্যলাক্রোয়ার বর্ণতত্ত্বগুলি পেয়েছিলেন। অর্থাৎ, আরও বিশেষ করে বলতে গেলে দিয়াজ (Diaz)-এর কাছ থেকেই তিনি এগুলি পেয়েছিলেন। আমার মনে হয় মন্তিচেল্লির শিল্পী মেজাজ দেকামেরন রচয়িতা বোক্কাচ্চিয়োর সঙ্গে হুবহু এক।—বিষণ্ণ প্রকৃতির, কিছুটা হালছাড়া ভাবের এক অসুখী মানুষ, যিনি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতেন সংসারের যত বিবাহের শোভাযাত্রা চলেছে সামনে দিয়ে, তাঁর কালের প্রেমিকদের চিত্র আঁকতেন, তাদের বিশ্লেষণ করতেন—আর উনি নিজে বাদ পড়ে গেছেন সেইসব কিছু থেকে। ওহো! আঁরি লেজ (Henri Leys) যেরকম আদিম মানুষদের অনুকরণ করতেন তার থেকে বেশি বোক্কাচ্চিয়োর অনুসরণ উনি করেন নি। বুঝতেই পারছেন, আমি যে কথাটা বলতে চাইছি তা এই যে, মনে হয় এমন অনেক জিনিস আছে যা আমার নামের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। সেসব কথা কিন্তু আপনি মন্তিচেল্লির সম্বন্ধেই আরও বেশি করে বলতে পারতেন; তাঁর কাছে আমার

অনেক ঋণ। আরও বলি, পল গোগ্যাঁর কাছেও আমি অনেক ঋণী। আর্লে কয়েক মাস তাঁর সঙ্গে এক সাথে আমি কাজ করেছি, আর সেই ব্যাপারে ইতোপূর্বে পারিতে থাকতেই আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল।

গোগ্যাঁ সেই কৌতূহলোদ্দীপক শিল্পী, সেই ভিন্নধর্ম মানুষ যাঁর আচার আচরণ ও চোখের দৃষ্টি গালেরি লাকাজে (Galerie Lacaze) রেমব্রান্টের Portrait of a man বা জনৈক ব্যক্তির চিত্র ছবিটির কথা অস্পষ্টভাবে মনে পড়িয়ে দেয়। আমার এই বন্ধুটি মানুষকে এই কথাটাই অনুভব করাতে চেয়েছেন যে একটা ভালো ছবি একটা সৎকর্মের সমতুল্য, উনি যে এই কথা মুখে বলেছেন তা নয়, কিন্তু এক ধরনের নৈতিক দায়িত্ববোধ সম্পর্কে সজাগ না হলে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ গড়ে ওঠা খুবই শক্ত। বিদায় নেবার কয়েকদিন আগে, আমার অসুখটা যখন উন্মাদ আশ্রমে যেতে আমাকে বাধ্য করল তার কয়েকদিন আগে, আমি "তাঁর শূন্য আসন" ছবিটা আঁকার চেষ্টা করি।

ছবিটি তাঁর বিষণ্ন লালচেবাদামী কাঠের তৈরি আরামকেদারার একটি স্টাডি, বসার জায়গাটা সবুজাভ খড়ের তৈরি, আর অনুপস্থিত মানুষটির জায়গায় একটা জ্বলন্ত মশাল আর কয়েকটা আধুনিক উপন্যাস।

সুযোগ যদি পান, তাঁর স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে এই স্টাডিটা একবার অনুগ্রহ করে দেখে আসবেন। এটি পুরোপুরি সবুজ আর লালের ভাঙা বর্ণমাত্রায় (broken tones) আঁকা। গেলেই দেখতে পাবেন ক্রান্তীয় অঞ্চলের চিত্রাঙ্কন (Tropical painting) এবং বর্ণের ভবিষ্যৎ সংক্রান্ত প্রশ্নটি আলোচনা করার সময় আমার কথা বলার আগে গোগ্যাঁ ও মন্তিচেল্লির কথা বললেই, আমার মনে হয়, আপনার প্রবন্ধটি যে আরও সুন্দর এবং ফলে আরও সার্থক হত এবং আমার মনে হয়, তাঁদের প্রতি আপনার সুবিচার করা হত সে কথা আপনি হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন। কারণ, আমার জন্য যে ভূমিকা নির্দিষ্ট করা হয়েছে সেটা যে খুবই গৌণ হয়ে থাকবে এই আশ্বাস আপনাকে আমি দিতে পারি।

এছাড়া, আরও একটা প্রশ্ন আপনার কাছে আমি রাখতে চাই। মনে করুন, সূর্যমুখী ফুলের যে চিত্র দুটি এখন ভ্যাঁতিস্তদের (Vingtistes) প্রদর্শনীতে রয়েছে বর্ণের কিছু গুণ তার মধ্যে বর্তমান এবং সেগুলি 'কৃতজ্ঞতার' প্রতীক এই রকমের একটা ধারণাও প্রকাশ করছে। আরও দক্ষতার সঙ্গে আঁকা এত যে ফুলের ছবি রয়েছে, অথচ এখনও যথেষ্টমাত্রায় তাদের কদর হয়নি, যেমন ফাদার কোয়েস্তের (Quost) আঁকা 'হলিহক', 'হলুদ আইরিস ফুল' ছবিগুলির থেকে তা কি ভিন্নতর? পিওনিফুলের যে সব চমৎকার পুষ্পস্তবকগুলি জিন্যাঁ (Jeanin) প্রচুর পরিমাণে এঁকেছেন তার থেকে ভিন্নতর? দেখতেই তো পাচ্ছেন, ইম্প্রেশনিজম ও অন্যান্য ব্যাপারের মধ্যে পার্থক্য টানা আমার পক্ষে কত কঠিন কাজ বলে মনে হয়। গত কয়েক বছর ধরে এতো বেশি গোষ্ঠীভিত্তিক মনোভাব যে গড়ে উঠেছে তার কোনো প্রয়োজন আমি দেখতে পাচ্ছি না, তবে এর অযৌক্তিকতা দেখে আমি ভীত হয়ে পড়েছি।

পরিশেষে বলি যে মেইসনিয়েরের (Meissonier) 'অ্যাঁফামিজ' (Infamies) ছবির কথা আপনি কেন যে বলছেন আমি তা বুঝতে পারছি না। হতে পারে মেইসনিয়েরের প্রতি একান্ত সীমাহীন শ্রদ্ধা আমি মহান মাউভের কাছ থেকে পেয়েছি; ত্রয়িঅঁ (Troyon) আর

মেইসনিয়ের সম্বন্ধে মাউভ তো প্রশংসায় পঞ্চমুখ—আশ্চর্য এই শিল্পীযুগল।

কথাটা আমি বলছি আপনার দৃষ্টি এই দিকে টানবার জন্যই যে ভিন্ন দেশের মানুষ ফ্রান্সের শিল্পীদের যখন প্রশংসা করেন তখন তাদের মধ্যকার পার্থক্যগুলি নিয়ে যা কিনা প্রায়শই খুবই দুর্ভাগ্যজনক, বিন্দুমাত্র মাথা ঘামান না। মাউভ যে কথাটা বারেবারেই উচ্চারণ করেছেন, তা অনেকটা এই ধরনের: "কেউ যদি নানা রঙ দিয়ে ছবি আঁকতে চান তাহলে তাঁকে মেইসনিয়ের যে রকম ঘরের ভিতরের অগ্নিকুণ্ডের বা ঘরের ভিতরের ছবি আঁকতেন সেইরকম ছবি আঁকতে সক্ষম হতে হবে।"

ভাইয়ের কাছে পরের কিস্তিতে যে ছবিগুলো পাঠাচ্ছি তার মধ্যে আপনার জন্য সাইপ্রেস গাছের একটা স্টাডি থাকবে, আপনার প্রবন্ধর স্মারক হিসাবে আপনি যদি সেটি অনুগ্রহ করে গ্রহণ করেন তবে বাধিত হই। এই মুহূর্তে সেটির উপর এখনও আমি কাজ করছি। কারণ একটি ছোটো মানুষের মূর্তি তাতে জুড়ে দিতে চাই। প্রভ্যাঁসের প্রাকৃতিক দৃশ্যের বৈশিষ্ট্য হল এই সাইপ্রেস গাছ; আপনি সেটা অনুভব করতে পারবেন এবং বলবেন: "এমন কি রঙটাও কালো।" সেগুলিকে যেভাবে আমি অনুভব করি এখনও সেইভাবে সেগুলিকে আঁকতে পারি নি আমি; প্রকৃতির সামনে দাঁড়ালে যেসব আবেগ আমাকে পেয়ে বসে তা আমাকে সংজ্ঞা হারাতে বাধ্য করে। আর তারপর এক পক্ষকাল আমি আর কাজ করতে পারি না। তা সত্ত্বেও এখান থেকে চলে যাওয়ার আগে আমি যে আবার কাজটাতে ফিরে যাব আর সাইপ্রেস গাছগুলোকে নিয়ে লড়ব সে ব্যাপারে আমি সুনিশ্চিত। আপনার জন্য যে স্টাডিটা আলাদা করে রেখেছি তাতে আছে গ্রীষ্মকালের মিস্ত্রাল ঝড়ের সময়ে গম খেতের এক কোণে এক ঝাঁক সেই গাছ। সুতরাং এটা হল বিস্তীর্ণ আকাশের অশান্ত উদ্দাম নীলের মাঝে এক ধরনের নামহীন কালো রঙের সুর আর এই আঁধার সুরের বিপরীতে থাকবে পপিফুলের সিঁদুরের রঙ।

আপনি দেখতে পাবেন যে আপনার এবং আমার দুজনের কাছেই একদিন সেই সুন্দর সবুজ, নীল, লাল, হলুদ, কালো রঙের চৌখপ্পি স্কচ টার্টান কাপড় যে রকম চমৎকার মনে হয়েছিল, আর হায় যা আজকাল কেউ আর সহজে দেখতে পায় না, এই ছবিটা অনেকটা সেই স্কচ টার্টান কাপড়ের বর্ণসমন্বয়ের (Combination of tones) সংযোগের মতো হয়েছে।

ইতোমধ্যে প্রিয় মহাশয়, আপনার প্রবন্ধটির জন্য আমার কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করবেন। বসন্তকালে আমি যখন পারিতে যাব আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নিশ্চয়ই আপনাকে সশরীরে ধন্যবাদ জানিয়ে আসব—

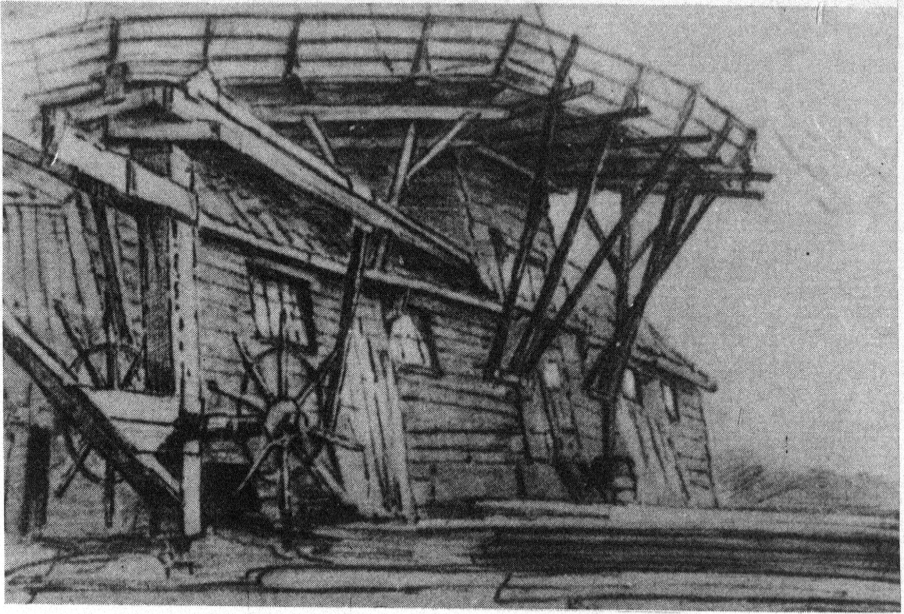
আপনাকে যে স্টাডিটা পাঠাব এক বছরের আগে সেটা পুরোপুরি শুকাবে না, আমার মনে হয় বেশ পুরু এক পরত বার্নিশ যদি তাতে লাগিয়ে নেন তাহলে ভালোই হবে।

ইতোমধ্যে তেলটা দূর করার জন্য বেশ বারেবাবে প্রচুর জল দিয়ে সেটা ধোয়া দরকার হবে। স্টাডিটা আঁকা হয়েছে সাদামাটা প্রুশিয়ান ব্লু রঙ দিয়ে, সেই বহুনিন্দিত রঙ দ্যলাক্রোয়া প্রায়ই যা ব্যবহার করতেন। আমার বিশ্বাস, এই প্রুশিয়ান ব্লুর টোনগুলো রীতিমত শুকিয়ে যাওয়ার

পর বার্নিশ করলেই আপনি বিভিন্ন বিষণ্ণ সবুজ রঙগুলো স্পষ্ট করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় কালো, খুব কালো টোনগুলো পেয়ে যাবেন।

স্টাডিটা কি ভাবে যে বাঁধানো উচিত হবে সেই বিষয়ে আমি সুনিশ্চিত নই; তবে স্টাডিটা সেই সুন্দর স্কচ সামগ্রীগুলোর কথা মনে পড়িয়ে দেয় দেখে আমি বলি যে উজ্জ্বল কমলা রঙের সীসার খুব সাদাসিধা ধরনের চ্যাপ্টা ফ্রেম হলেই পটভূমির নীল আর গাছগুলির কৃষ্ণাভ সবুজের সঙ্গে মিলে কাঙ্ক্ষিত ফলটি পাওয়া যাবে। তা না হলে ছবিতে যথেষ্ট লাল রঙ থাকবে না, আর ছবির উপরের দিকটা তাহলে কিছুটা নিরুত্তাপ মনে হবে।

অনুবাদ : রণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়



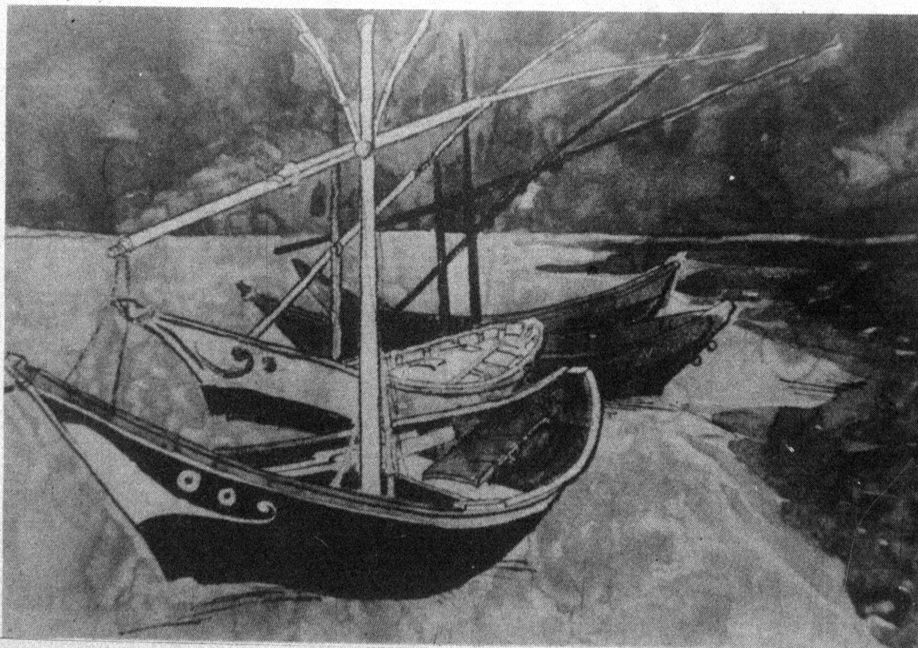
কাঠচেরাই কল, এপ্রিল ১৮৮২



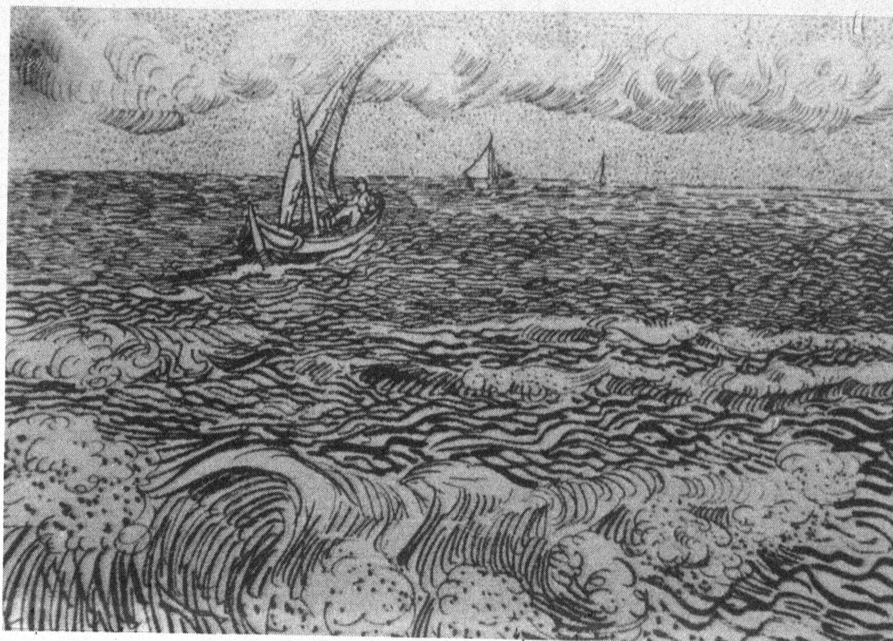
ঝোড়ো গাছ, অগাস্ট-সেপ্টেম্বর ১৮৮৩



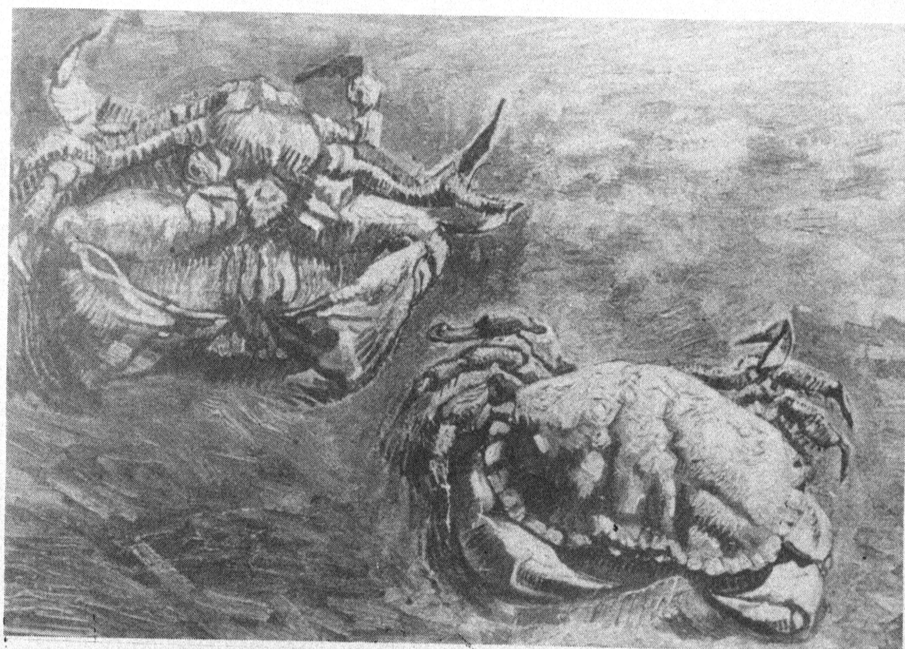
পার্কে ভ্রমণরত মানুষ, শরৎ ১৮৮৬



সমুদ্রতীরে মাছ-ধরা নৌকো, ৫ জুন ১৮৮৮



সমুদ্রে মাছ-ধরা নৌকো, ৬-৮ অগাস্ট ১৮৮৮



দুটি কাঁকড়া, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৮৮৯



আহাররত পাঁচজন মানুষ, ১৩ এপ্রিল ১৮৮৯



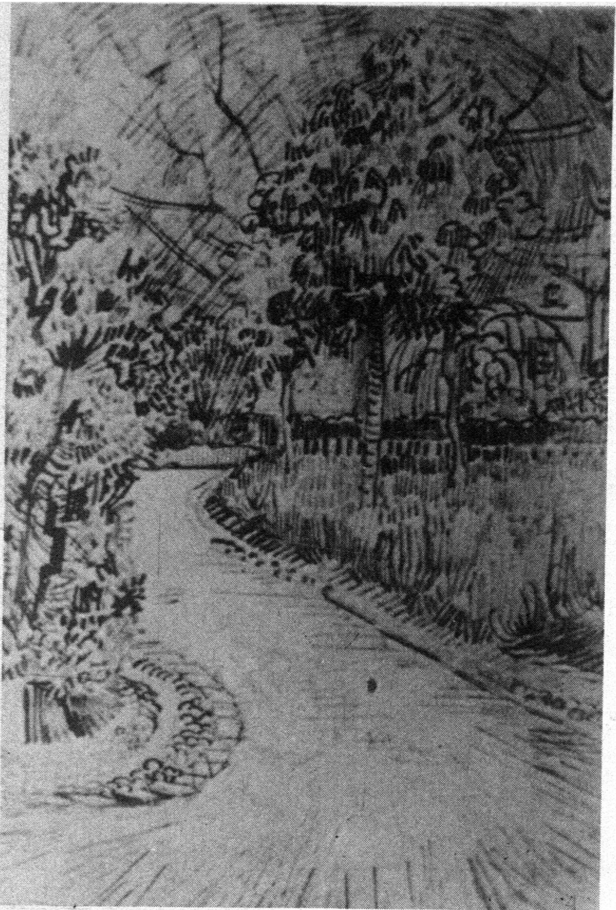
বৃক্ষ ও গুল্ম, মে ১৮৮৯



সকালে কাজের পথে (মিইয়ে অনুসরণে), ১২-১৫ জানুয়ারি ১৮৯০



আহাররত কৃষকরা ও অন্যান্য মূর্তি, মার্চ-এপ্রিল ১৮৯০



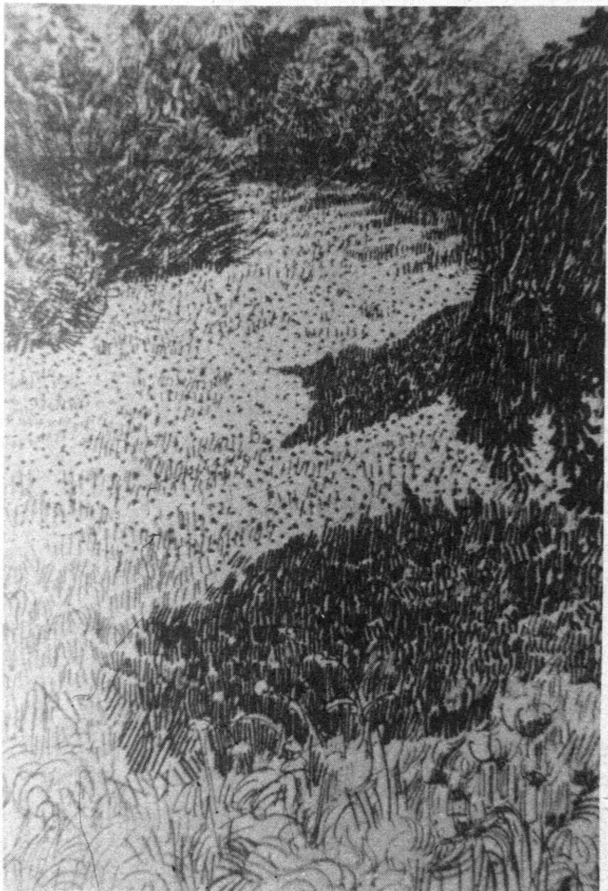
হলুদ বাড়ির একাংশ সহ জনসাধারণের উদ্যান, এপ্রিল ১৮৮৮



টুপি মাথায় মানুষ, গ্রীষ্ম ১৮৮৬



ফুলন্ত গুল্মলতা, মে ১৮৮৯



উইপিং গাছ সহ প্রাঙ্গণ, ৩১ জুলাই- ৬ অগাস্ট ১৮৮৮



ডবল-বাস বাদক, ১৮৮৬
অ্যামস্টার্ডাম, ভ্যান গঘ মিউজিয়াম (ভিনসেন্ট ভ্যান গঘ ফাউন্ডেশন)

۲

বিচ্ছিন্ন মানুষেরা : ভিনসেন্ট

গুস্তাভ আলবেয়র ওরিয়ের

এখন এই কদর্য কর্দমাক্ত নোংরা রাস্তায় ঝলমলানি আর কুশ্রী বাস্তব জীবনে ফিরে আসার পর, কবিতার এইসব বিচ্ছিন্ন টুকরোটাকরাগুলো হঠাৎ আমার স্মৃতিতে ভেসে উঠল, যেন নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই:

ধাতু, মার্বেল পাথর, আর জলের
সেই নেশাধরানো অভিন্নতা.
সব কিছু, এমন কি কালো রঙটাও
মনে হয় যেন পালিশ-করা, পরিষ্কার দ্যুতিময়;
গাঢ়তর হয়ে ওঠে তরলের মহিমা
স্ফটিকের মতো আলোর...

আর গুরুভার জলপ্রপাত
স্ফটিকের পর্দার মতো
চোখ-ঝলসানো উজ্জ্বল, ঝুলন্ত
ধাতুময় প্রকার থেকে...

এমন এক আকাশের নীচে যা কখনও ঝকমক করে ওঠে পলকাটা নীলা বা ফিরোজা পাথরের মতো, কখনও বা নারকীয় তপ্ত অস্বাস্থ্যকর ও চোখ ঝলসিয়ে দেওয়া গন্ধকের ছাঁচে ঢালা; গলিত ধাতুও স্ফটিকের স্রোতের মতো সেই আকাশের নীচে যা কখনও বা আগুন ঢেলে জ্বালিয়ে খাক করে দেওয়া সূর্যের চক্রটিকে মেলে ধরে চোখের সামনে, কল্পনীয় যাবতীয় প্রভাবসম্পন্ন আলোকের ধারা অবিরাম ও প্রচণ্ড বেগে ঝরে পড়ে এক গাঢ় লেলিহান জ্বলন্ত বায়ুমণ্ডলে যা বুঝি এমন কোনো বিপুলাকার চুল্লি থেকে যেখানে সোনা হীরা আর আশ্চর্য সব রত্নপ্রস্তর বাষ্পীভূত হয়ে নিষ্ক্রান্ত হতে থাকে—সেই পরিবেশে দেখা যায় অদ্ভুত এক প্রকৃতির অস্বস্তিকর ও বিক্ষোভ সঞ্চারী প্রকাশ যা একই সঙ্গে পুরোপুরি বাস্তবধর্মী অথচ প্রায় অতিপ্রাকৃত, অমিতাচারী সে এক প্রকৃতি যেখানে জীব ও জড়, আলো ও ছায়া, রূপ ও রঙ সব কিছুই লালিত হয়, বৃদ্ধিলাভ করে নিবিড়তম ও প্রচণ্ড তীব্র নিখাদে তার আপন সত্তার সংগীত চীৎকার করে প্রকাশ করার এক উন্মত্ত বাসনা নিয়ে। রণক্লান্ত দৈত্যের মতো বেঁকেচুরে যাওয়া গাছগুলো যেন তাদের গ্রন্থিল, ভীতিপ্রদ বাহুর নানা ভঙ্গিমা দিয়ে আর সকরুণভাবে তাদের সবুজ কেশর রাশি আন্দোলিত করে ঘোষণা করেছে তাদের অদম্য শক্তি, তাদের মাংশপেশীর গরিমা, উষ্ণশোণিতের মতো তাদের প্রাণরস, ঝঞ্ঝনা বিদ্যুৎ ও অমঙ্গলকামী প্রকৃতিকে অগ্রাহ্য করার চিরস্পর্ধা; সাইপ্রেসগাছগুলো

মেলে ধরে তাদের দুঃস্বপ্নের মতো, অগ্নিশিখার মতো কৃষ্ণকায় ছায়াচিত্র; পাহাড়গুলো অতিকায় হস্তি বা গণ্ডারের মতো ন্যুব্জপৃষ্ঠ; কুমারী মেয়েদের বাস্তবের সংস্পর্শমুক্ত স্বপ্নরাজির মতো সাদা, গোলাপী আর সোনালী ফলবাগিচা; হ্রস্বকায়, কামনায় মুচড়িয়ে যাওয়া সব গৃহ যেন সেইসব মানুষের মতো আনন্দে যারা উদ্‌বেলিত হয়ে ওঠে। যারা যন্ত্রণাভোগ করে। যারা চিন্তা করে; কত না প্রস্তররাশি, বিস্তীর্ণ সব ভূখণ্ড, নিবিড় গুল্মরাজি, তৃণভূমি, উদ্যান, আর নদী, নাম-না-জানা সব ধাতু দিয়ে যেন সেসব খোদাই করা হয়েছে, পালিশ করা, দীপ্তিমান, দ্যুতিময়, জাদুভরা; লেলিহান শিখার মতো স্থানচিত্র, যেন কিমিয়াবিদ্যাসিদ্ধ কোনো পুরুষের ভৌতিক ধাতুগল পাত্রের বহুবর্ণরঞ্জিত মিনাকারির ফেনিলতা; পল্লবসম্ভার দেখে মনে হয় বুঝি তারা অনেক কালের পুরানো ব্রোঞ্জ, কি সদ্যপ্রস্তুত তামা বা কাচতন্তু দিয়ে গড়া; কত না ফুলবাগিচা যাতে ফুলের থেকে বেশি সাদৃশ্য পাওয়া যায় চুনী, গোমেদ, সুলেমানি পাথর, পান্না, হরিদ্রাভ কুরুবিন্দ, নারাঙ্গা, রাজাবর্তমণি আর সীসমণি দিয়ে গড়া জড়োয়া গহনার সুপ্রতুল সম্ভারের সঙ্গে; এ হল নানা রঙের এক বিশ্বব্যাপী উন্মাদ ও চোখ ঝলসানো রূপ; জড়বস্তু আর প্রকৃতির যাবতীয় সামগ্রীকে কে যেন পাগলের মতো দুমড়িয়ে মুচড়িয়ে বিকৃত করে চরম যন্ত্রণায় পর্যবসিত করে দিয়েছে; রূপ যেন দুঃস্বপ্নের আকৃতি গ্রহণ করছে, রঙ যেন হয়ে উঠছে অগ্নিশিখা, গলন্ত লাভা আর বহুমূল্য রত্নপ্রস্তর; আলো হয়ে উঠছে বহুদূরব্যাপী অগ্নিকাণ্ড, জীবন হয়ে উঠছে প্রচণ্ড জ্বর।

প্রখ্যাত প্রাচীন ডাচ চিত্রকরদের সহধর্মী এবং তাঁদেরই যোগ্য উত্তসূরী ভিনসেন্ট-এর আশ্চর্য, আবেগঘন, ও প্রচণ্ড জ্বালাময়ী শিল্পকর্মগুলি প্রথম দর্শনে অক্ষিপটের উপর এই ছাপই রেখে যায়।

হায়, প্রাচীন ডাচদের সে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ও অতীব সুষ্ঠু ভারসাম্যযুক্ত সুন্দর মহান ঐতিহ্যানুসারী শিল্প থেকে কত দূরেই না চলে এসেছি আমরা আজ। তাই নয়? সেই ডে হুঘেস, ভান ডার মেয়ার, ভান গর হেয়ডেন্স আর তাঁদের সেই অপূর্ব সুন্দর সব চিত্রসম্ভার থেকে, ঈষৎ বুর্জোয়াধর্মী কিন্তু কত ধৈর্যের সঙ্গে চিত্রিত সেইসব অনুপুঙ্খ, কী ধীরস্থিরভাবে অতি পরিমার্জিত, কী পরিপাটিভাবে নিখুঁত সেইসব চিত্র! সেইসব সুন্দর স্থানচিত্র, কী সংযত, কী সুষম, কী কোমল বর্ণমাত্রা (tone) আর ধূসর ও অস্পষ্ট কুয়াশা ঘেরা ভাবযুক্ত ওস্টাড, পটার, ভান গোইয়েম, রুইসডায়েলস, হবেমান্দের আঁকা সেইসব চিত্র থেকে কতদূরে আজ আমরা...উত্তরাঞ্চলের সেই সূক্ষ্ম, সর্বদা মেঘমেদুর, তমসাবৃত বর্ণশোভা থেকে কত দূরে!...

কিন্তু তাই বলে ভুল করে ভাববেন না যেন ভিনসেন্ট তাঁর পরম্পরাকে অতিক্রম করে গেছেন। অলঙ্ঘনীয় কৌলিক নিয়মগুলির প্রভাবের অধীন তিনি। ফ্রান্স হালসের সুমহান পরম্পরাবাহী এবং সুন্দর ও রীতিমত ডাচ শিল্পী তিনি।

আর সর্বোপরি, তাঁর প্রখ্যাত সমস্ত সহধর্মীদের মতো তিনিও প্রকৃতই এক বাস্তবপন্থী, যাবতীয় অর্থেই তিনি পুরোপুরি বাস্তবপন্থী। চ্যান্সেলর বেকন বলেছিলেন, Ars est homo additus naturae (অর্থাৎ, শিল্প হল প্রকৃতিসমৃদ্ধ মানুষ)। আর মঁসিয়ু এমিল জোলা তো স্বাভাবিকতাবাদের (Naturalism) এই বলে সংজ্ঞা দিয়েছেন যে তা হল, 'ব্যক্তির আপন মানসিক প্রকৃতির (temperament) মধ্য দিয়ে দেখা বহিঃপ্রকৃতি।' বেশ, এই হোমো আদিতুস, এই 'আপন মানসিক প্রকৃতির মধ্য দিয়ে দেখা' বিষয়গত ঐক্যকে বিষয়ীগত ঐক্যের ছাঁচে ঢালার ব্যাপারটি প্রশ্নটিকে



গুস্তাভ আলবেয়ার ওরিয়ের

LES ISOLÉS

VINCENT VAN GOGH

Et voilà que, tout à coup, dès la rentrée dans l'ignoble tohu-bohu boueux de la rue sale et de la laide vie réelle, éparpillées, chantèrent, malgré moi, ces bribes de vers en ma mémoire :

'L'enivrante monotonie
Du métal, du marbre et de l'eau...
Et tout, même la couleur noire,
Semblait fourbi, clair, irisé;
Le liquide enchâssait sa gloire
Dans le rayon cristallisé.....
Et des cataractes pesantes
Comme des rideaux de cristal
Se suspendaient, éblouissantes,
A des murailles de métal....

Sous des ciels, tantôt taillés dans l'éblouissement des saphirs ou des turquoises, tantôt pétris de je ne sais quels soufres infernaux, chauds, délétères et aveuglants; sous des ciels pareils à des coulées de métaux et de cristaux en fusion, où, parfois, s'étalent, irradiés, de torrides disques solaires; sous l'incessant et formidable ruissellement de toutes les lumières possibles; dans des atmosphères lourdes, flambantes, cuisantes qui semblent s'exhaler de fantastiques fournaises où se volatiliseraient des ors et des diamants et des gemmes singulières c'est l'étalement inquiétant, troublant, d'une étrange nature, à la fois vraiment vraie et quasiment supranaturelle, d'une nature excessive où tout, êtres et choses, ombres et lumières, formes et couleurs, se cabre, se dresse en une volonté rageuse de hurler son essentielle et propre chanson, sur le timbre le plus intense, le plus farouchement suraigu; ce sont des arbres, tordus ainsi que des géants en bataille, proclamant du geste de leurs noueux bras qui menacent et du tragique envolement de leurs vertes crinières, leur puissance indomptable, l'orgueil de leur musculature, leur sève chaude comme du sang, leur éternel défi à l'ouragan, à la foudre, à la nature méchante; ce sont des cyprès dressant leurs cauchemardantes silhouettes de flammes, qui seraient noires; des

'মার্কার দ্য ফ্রাঁস' পত্রিকায় প্রকাশিত
ওরিয়েরের প্রবন্ধের প্রথম পৃষ্ঠা

জটিল করে তোলে এবং শিল্পীর নিষ্ঠার মাত্রাকে পরিমাপ করার কোনো চূড়ান্ত পরিমাপক মান (absolute criterion) নির্ধারণ করার সম্ভাবনাকে বাতিল করে দেয়। সেটি নির্ধারণ করতে হলে সমালোচককে অপরিহার্যভাবে কমবেশি অনুমান ভিত্তিক কিন্তু সদাবিতর্কমূলক সব সিদ্ধান্তে গিয়ে পৌঁছতে হয়। যাইহোক, আমার মতে, ভিনসেন্ট-এর ক্ষেত্রে তাঁর শিল্পকর্মের কখনো কখনো ভ্রান্তি সৃষ্টিকারী বৈচিত্র্য সত্ত্বেও পক্ষপাতহীন ও প্রাজ্ঞ দর্শকের পক্ষে তাঁর শিল্পকলার অকৃত্রিম সত্যধর্মিতা, তাঁর দৃষ্টির নিপুণতাকে অস্বীকার করা বা তাঁর সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা কঠিন। বাস্তবিকই, তাঁর যাবতীয় চিত্র থেকে যে নিটোল বিশ্বাসের অবর্ণনীয় সৌগন্ধ ও যথার্থ দৃষ্ট সামগ্রীর পরিমণ্ডল সৃষ্ট হয় সেগুলির অনপেক্ষভাবে তাঁর বিষয় নির্বাচন, বর্ণের মাত্রাগুলির প্রচণ্ড আধিক্যের মধ্যে নিয়ত যে সুসামঞ্জস্য বর্তমান, ব্যক্তিচরিত্রের বিবেকবান পর্যবেক্ষণ, প্রতিটি সামগ্রীর মৌল লক্ষণগুলির অবিরাম সন্ধান, এবং অসংখ্য তাৎপর্যপূর্ণ অনুপুঙ্খরাশি অনস্বীকার্যভাবে তাঁর প্রগাঢ় ও প্রায় শিশুসুলভ ঐকান্তিকতাকে, বহিঃপ্রকৃতি ও সত্যের প্রতি তাঁর নিজস্ব সত্যের প্রতি বিপুল ভালোবাসাকেই প্রকাশ করে।

প্রদত্ত তথ্যানুসারে, ভিনসেন্ট-এর শিল্পকর্মগুলি থেকে ব্যক্তি-মানুষ হিসাবে বা বলা যেতে পারে শিল্পী হিসাবে তাঁর প্রকৃতি সম্বন্ধে আমরা বৈধভাবে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি। আর যদি চাইতাম তাহলে এই সিদ্ধান্তটিকে আমি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের তথ্যাদির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বলেই দেখাতে পারতাম। সামগ্রিকভাবে তার শিল্পকর্মগুলিকে যা বৈশিষ্ট্য দিয়েছে তা হল তাদের আধিক্য—শক্তির আধিক্য, তার স্নায়বিক দৌর্বল্য ও তার প্রকাশের প্রচণ্ডতার আধিক্য। বস্তুর চরিত্র সম্পর্কে তাঁর নিঃশর্ত ঘোষণার মধ্যে প্রায়শই রূপের স্পর্ধিত সরলীকরণ তিনি ঘটিয়েছেন। তাঁর সূর্যকে মুখোমুখি মোকাবিলা করার স্পর্ধার মধ্যে, তাঁর অঙ্কন ও বর্ণের প্রচণ্ড অতিরাগের মধ্যে, এমন কি তার প্রকরণের ক্ষুদ্রতম অনুপুঙ্খটির মধ্যেও এক শক্তিমান মূর্তিরই প্রকাশ ঘটেছে...পুরুষসুলভ, দুঃসাহসী, প্রায়শই নির্দয় এবং তা সত্ত্বেও কখনো কখনো সারল্যপূর্ণভাবে সুকুমার...

অথচ, বস্তুর বাস্তবতার প্রতি একমাত্র এই শ্রদ্ধা ও ভালোবাসাই ভিনসেন্ট-এর এই প্রগাঢ়, জটিল ও রীতিমত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শিল্পকর্মকে ব্যাখ্যা ও চিহ্নিত করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। তাঁর স্বজাতির সমস্ত চিত্রশিল্পীদের মতোই বস্তুগত বাস্তবতা, তার গুরুত্ব তার সৌন্দর্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে তিনি খুবই সচেতন, কিন্তু তার থেকে বেশি করে যেটা লক্ষ করা যায় তা হল এই মোহিনীকে তিনি ধ্যানধারণাকে রূপান্তরিত করার জন্য কেবলমাত্র অপরিহার্য এক ধরনের অপরূপ ভাষা বলে মনে করেন। প্রায় সর্বদাই তিনি প্রতীকপন্থী...আপন ধ্যানধারণাকে যথাযথ, ভাবগম্ভীর ও ধরাছোঁয়ার যোগ্য রূপ দিয়ে, তীব্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও বস্তুগত বাহ্যরূপ দিয়ে প্রকাশ করার নিয়ত প্রয়োজন অনুভব করেন তিনি। তাঁর প্রায় সমস্ত চিত্রেই এই রূপগত বাহ্য প্রকৃতির অন্তরালে একটা চিন্তা, একটা ধ্যানধারণা বর্তমান, আর একে সন্ধান করার উপায় যাঁর জানা আছে তাঁরই চেতনায় তা ধরা পড়বে; আর এই ধ্যানধারণাটি, তাঁর শিল্পকর্মটির এই মৌল নিম্নস্তরটি একইকালে সেটির নিমিত্ত কারণ এবং তার চূড়ান্ত কারণও বটে। বর্ণ ও রেখার উজ্জ্বল ও দ্যুতিময় সুরসুষমা (symphonies) সম্পর্কে বলা যায় যে শিল্পীর নিজের কাছে এগুলির গুরুত্ব যাইহোক না কেন তাঁর শিল্পকর্মের মধ্যে সেগুলি কেবল বাঙময় উপায়, প্রতীকিকরণের পদ্ধতি (method) মাত্র।

বাস্তবিকই, এই স্বাভাবিকতাধর্মী শিল্পের অন্তরালে এই আদর্শবাদী প্রবণতাগুলির অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিতে আমরা যদি রাজী না হই, তাহলে যে রচনাসম্ভারের পর্যালোচনা আমরা করতে চাই তার একটা বড়ো অংশ নিতান্তই দুর্বোধ্য থেকে যাবে। যেমন ধরুন, দ্য সোওয়ার (The Sower) বা 'বীজবপনকারী' ছবিটি, সেই সুমহান ব্যক্তিত্বপূর্ণ ও অস্বস্তিকর কৃষকটি, রূঢ় ও চমৎকার কপালের গড়নবিশিষ্ট সেই গ্রাম্য মানুষটি (মাঝে মাঝে খুব অস্পষ্ট একটা মিলও যার পাওয়া যায় শিল্পীর নিজের চেহারার সঙ্গেও), যার ছায়াচিত্র, ভঙ্গিমা ও শ্রম সর্বদাই ভ্যান গঘকে পেয়ে বসেছে (আবেশিত করেছে), এবং বারে বারে নতুন করে তার ছবি তিনি এঁকেছেন, কখনো সূর্যাস্তের রক্তিম আকাশের নীচে, কখনো খর মধ্যাহ্নের স্বর্ণাভ ধূলিরাশির মধ্যে আমাদের জরাগ্রস্ত শিল্পে এবং সম্ভবত আমাদের এই মূঢ় ও শিল্পোৎপাদনভিত্তিক সমাজের পুনরুজ্জীবন যিনি ঘটাবেন সেই মহাত্মার আবশ্যকীয় আবির্ভাব, ত্রাণকর্তার, সত্যের বীজবপনকারী মহামানবের আবির্ভাবের যে সর্বগ্রাসী চিন্তা তাঁর মস্তিষ্ককে নিরন্তর তাড়িত করেছে সেই চিন্তাটির কথা বাদ দিয়ে এই 'বীজবপনকারীর' চরিত্রটির ব্যাখ্যা কী করে আমরা করতে পারি ? আর সমুজ্জ্বল বর্ণে দীপ্ত আকাশ থেকে কিরণ-ঢালা সৌরচক্রের প্রতি, আর সেই সঙ্গে সেই অপর সূর্য, উদ্ভিজ্জ সূর্য, সেই মহা ঐশ্বর্যবান সূর্যমুখী ফুলের প্রতি, যে সূর্যমুখীকে বারে বারে, অক্লান্তভাবে, প্রায় বাতিকগ্রস্তের মতো তিনি এঁকেছেন সেই সূর্যমুখী ফুলের প্রতি তাঁর সেই উদ্দাম আবেগকে কি করে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি যদি না অস্পষ্ট ও গৌরবময় সূর্যপুরাণভিত্তিক কোনো রূপক কাহিনীর প্রতি তাঁর অবিচলিত নিবিষ্টতাকে স্বীকার করে নিতে আমরা রাজী না হই?

অনুবাদ: বণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মহান পবিত্র শিল্পী

ওক্তাভ মির্বো

কী অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব, উদ্‌বিগ্ন অথচ শক্তিমান...কী অনুপম এবং উর্বর শৈল্পিক চেতনা, এই ভিনসেন্ট ভ্যান গঘ, যাঁর নির্বাচিত কাজের প্রদর্শনী চলছে ম. বার্নহাইম-এর গ্যালারিতে, কয়েকটি তো নিঃসন্দেহে অতুলনীয়...ভ্যান গঘ নামটি আমাকে সব সময়ই আকর্ষণ করেছে, যেন এমন কেউ আমাকে কাছে টানছে যে অতীব মাত্রায় পৃথক, নিদারুণভাবে দুর্লভ, এবং প্রতিদিন আমার আক্ষেপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় যখন ভাবি তাঁর সঙ্গে আমার আজও পরিচয় হল না। তাঁর জীবন ছিল আর্তিমুখর এবং মোহময়, তাঁর মৃত্যু বেদনাদায়ক এবং শোকাতুর। তিনি মারা গিয়েছিলেন, এক উন্মাদ মানুষ হিসেবে না হলেও, অন্তত এক ব্যথিত প্রাণ হিসেবে তো বটেই। এবং সত্যিই, সেইসব অত্যন্ত আকর্ষণীয় চিঠিগুলি পড়ার সময়, যা কিছুদিন হল *মার্কর দা ফ্রাঁস* প্রকাশ করেছে, একবারও মনে হয় না যে তাঁর চেয়ে অধিক সুস্থির চিত্তের মানুষ আর কেউ থাকতে পারেন। তাঁর মতামত প্রগাঢ়, কোথাও এতটুকু অত্যুক্তি নেই। কোনোভাবেই তাঁকে একজন সাম্প্রদায়িক বলা যায় না। সকলের প্রতিই তিনি ছিলেন পক্ষপাতহীন, তা ক্লদ মোনে-ই হন বা মেইসনিয়েরই হন না কেন। সাহিত্যের ক্ষেত্রে, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী অবশ্য কিঞ্চিদধিক আড়ষ্ট ছিল : গী দ্য মোপাসাঁ ছাড়া আর কারও বই-ই তাঁর মতে উৎকৃষ্ট ছিল না...সত্যিই, শিল্প ও মানব-প্রকৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এমন মানুষ খুব কমই আছেন যাঁরা, যে কোনো বিচারেই, তাঁর মতো আকর্ষণীয় ও কৌতূহল-উদ্দীপক হয়ে উঠতে পারেন।

মাদাম আলবেয়ার রেসনার-এর মতো এক মহান শিল্পী. যিনি ছিলেন এক স্বচ্ছ প্রতিভা এবং গভীর সমালোচকদৃষ্টির অধিকারিণী, একদিন আমাকে বলেন : "তখন আমরা হেগ-এ ছিলাম। সেদিন সারাক্ষণ মিউজিয়ম আর ব্যক্তিগত সংগ্রহশালায় ঘুরে ঘুরে আমরা ভীষণ ক্লান্ত। উদ্যমে যদিও ভাঁটা পড়েনি, কিন্তু ছবি দেখে দেখে আমাদের মন কানায় কানায় ভরে গেছে, পা আর চলতে চাইছে না। কিন্তু হোটেলে ফেরার আগে, এক বন্ধু যিনি এতক্ষণ আমাদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব দেখাচ্ছিলেন, পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন ভ্যান গঘ-এর এক আত্মীয়-আয়োজিত একটি ছোট্ট প্রদর্শনীতে নিয়ে যাওয়ার জন্য। প্রায় একশোটি ছবি স্থান পেয়েছে সেখানে...তিনি এতই পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন যে আমি আর তাঁকে বারণ করতে পারলাম না পাছে তিনি আহত হন...যাবার পর মনে হল যেন এক মনোরম বিশ্রাম উপভোগ করছি...আমি কোনোদিনই ভুলব না সেই সতেজতার, সেই শৈথিল্যের, সেই স্বকীয়তার অনুভূতি যা ছোটো হলটিতে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল...সারাদিন যত ছবি দেখেছিলাম, তাদের সকলের চেয়ে এরা যেন একেবারেই আলাদা। সত্যি কথা বলতে কি, শুধুমাত্র এই ছবিগুলোই যেন এক বিধ্বংসী তুলনার পরেও দাঁড়িয়ে থাকে অবিচলিতভাবে, এতটুকু খর্ব না হয়ে...এবং যদিও নির্মাণকৌশল অনেক সময়ই গুরুভার, কখনো বা অদ্ভুত...কিংবা মোটের উপর ভীষণ আলাদা

মনে হয়, গঠনভঙ্গীর বিসদৃশ প্রকরণের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, তবু মনের ভেতর এক সুদূর সাজাত্যবোধ জেগে ওঠে...বুঝতে পারি এক বিরল প্রতিভা ছবিগুলির মধ্যে সুপ্ত...যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তনশীল...একই সঙ্গে এক বিশেষ ব্যক্তিসত্তাও নিহিত সেখানে..."

কী অপরিসীম শক্তিশালী এই স্বাতন্ত্র্যবোধ... এই আবেগ... আন্তরিক ও আর্তিময় এক জীবনচর্যার নিশ্বাসপ্রশ্বাসে জাগ্রত এক শিল্পর কী অপরিমেয়রূপে পরাক্রম!...

অতীন্দ্রিয়বাদী বা প্রতীকিবাদী, জলরঙের চিত্রকর বা জাদুবিদ্যায় পারদর্শী, হৃদয়ের ছবি-আঁকিয়ে...এইসব মূর্খের দল কিংবা যত রাজ্যের ভাঁড়েরা, যখনই কোনো ছবিতে দেখে কোনো রেখার গভীর চ্যুতি অথবা কোনো ভ্রূণাকার, কিংবা সবুজ মাংস...এবং ক্রুশবিদ্ধ জননেন্দ্রিয়... ছবিটিকে এক মহান কীর্তি বলে ঘোষণা করে, আর সেইসঙ্গে প্রশংসায় আর আদেখলেপনায় অজ্ঞান হয়ে যায় আর কি...এরা সকলেই, পালা করে ভ্যান গঘকে নিজেদের একজন বলে দেখানোর চেষ্টা করে থাকে...কী আশ্চর্যরকমের চালিয়াতি...কতটা অবুঝ হলে এতখানি মূর্খামি করতে পারে...কিন্তু কেনই বা ভ্যান গঘ, কেন মোনে বা সেজান নয়?

সত্যি কথাটা এই যে, ভ্যান গঘ-এর শিল্পের চেয়ে অধিকতর স্বাস্থ্যকর শিল্প...কিংবা অধিকতর আন্তরিক এবং বাস্তব এক শিল্পীমানস আর নেই...ভ্যান গঘ-এর দয়িতা একজনই, সে হল প্রকৃতি। এর বাইরে তিনি আর কোনোদিকে তাকান না, কারণ তিনি মনে করেন এর বাইরে আর কিছুই নেই...এমন কি দার্শনিক, ধর্মীয় কিংবা সাহিত্য-সংক্রান্ত হেঁয়ালিপূর্ণ চিত্রকলার প্রতি তাঁর এক সহজাত ভীতি আছে, এবং সেইসব ঝাপসা বুদ্ধিসর্বস্ব আন্দোলনসমূহ, যা নির্বীর্য শিল্পীবা খুবই মর্মস্পর্শী মনে করেন। তাও ভ্যান গঘ-এর কাছে চূড়ান্তরকমের ভীতিপ্রদ, কারণ তিনি এ কথা ভালো করেই জানেন যে যা-কিছু সুন্দর... নির্বোধের মতো সুন্দর, তা সবই বুদ্ধিগ্রাহ্য!... এমন কি যখন তিনি আকাশের ছবি আঁকেন, ফুটিয়ে তোলেন তার গতি, বিভিন্ন রূপের পরিবর্তন...আধশোয়া নারী, বিশৃঙ্খল পাখির ঝাঁক, স্বপ্নিল মাছ... দানব কিংবা পুরাণকথা সবই কেমন যেন নভোমণ্ডলে হারিয়ে যায়, নবরূপে সজ্জিত হবে বলে... এমন কি যখন তিনি আঁকেন গ্রীষ্মের আকাশ, সেই সঙ্গে উন্মাদ নক্ষত্রপুঞ্জ, খসে-পড়া কোনো তারা কিংবা ঘূর্ণায়মান আলোকরশ্মি... সবসময়ই তিনি থাকেন প্রকৃতির সীমারেখার মধ্যে এবং একান্তভাবে প্রকৃতি ও চিত্রকলার মধ্যেই...এ ক্ষেত্রে তাঁর চিঠিপত্র আমাদের জানায় অসংখ্য মূল্যবান তথ্যের হদিস। তারা আমাদের চালনা করে তাঁর কার্যপ্রক্রিয়া অনুধাবন করতে, যা প্রায় বিশিষ্টরূপে বৈজ্ঞানিক... তারা আমাদের জানায় কিভাবে চিত্রাঙ্কনকালে একজন চিত্রকর নিজের শিল্পচেতনা ছাড়া আর কোনো কিছুতেই আচ্ছন্ন থাকেন না...এবং এই আচ্ছন্নতা ততক্ষণই সেই শিল্পীকে অধিকার করে থাকে যতক্ষণ তিনি কোনো ভূদৃশ্য রচনায় ব্যাপৃত, কিংবা স্বপ্ন দেখছেন ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার, তিনি একবারও বলেন না এখানে মাঠ, গাছ, বাড়ি বা পাহাড় রয়েছে...তাঁর চোখে তখন শুধুই হলুদ, নীল, লাল, সবুজের সমাহার এবং সেইসব বর্ণের পারস্পরিক সম্পর্কের নাটকীয়তা কেবল...

এইভাবেই ভ্যান গঘ, আমাদের আনন্দের জন্যে, আমাদের আবেগের জন্যে, পুনর্নির্মাণ করেছেন প্রকৃতির রূপকথা, তার সুবিশাল এবং ঐশ্বর্যমণ্ডিত আনন্দবার্তা, জীবনের ঐন্দ্রজালিক মহাভোজ...

হায়, ছবি-আঁকার জন্যে খুব বেশি সময় তিনি পাননি!...এক গভীর উৎকণ্ঠা—যাকে কখনোই

অতীন্দ্রিয়বাদী বলা যায় না, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে ব্যবসায়িক—তাঁর ভেতরে ছিল...সর্বক্ষণ তাঁকে কুরে কুরে খেয়েছে, টেনে নিয়ে গেছে ধ্বংসের পথে। নিজের সম্পূর্ণ সত্তাকে টুকরো টুকরো করে তিনি সঁপেছিলেন এর জন্যে এবং ক্রমশ নিঃশেষিত করেছেন নিজেকে...নিজের কাজ নিয়ে তিনি কখনোই সন্তুষ্ট হতেন না... সবসময়ই স্বপ্ন দেখতেন যে-কাজ তিনি সম্পাদনা করেছেন, তার পরে আরো কতখানি অপেক্ষা করছে, তা নিয়ে... তিনি স্বপ্ন দেখতেন অসম্ভবের জন্যে... উন্মাদ আক্রোশে তিনি চালনা করতেন তাঁর হাত, তাঁর ক্ষীণ, দুর্বল হাত, যা অসমর্থ ছিল তাঁর মস্তিষ্কের সমস্ত দক্ষতা ও প্রতিভাকে ক্যানভাসে ফুটিয়ে তুলতে... এইজন্যেই তাঁকে মরতে হল একদিন!...

সকলেরই উচিত ভিনসেন্ট ভ্যান গঘকে ভালোবাসা, তাঁর স্মৃতিকে সম্মান করা, কারণ প্রকৃত অর্থেই তিনি ছিলেন এক মহান ও পবিত্র শিল্পী।

অনুবাদ : শান্তনু গঙ্গোপাধ্যায়

সবকিছুর উপরে—একজন চিত্রকর

এমিল বার্নার্দ

চিত্রকর তিনি, চিত্রকরই আছেন, থাকবেন। তা সে তরুণ বয়সে হল্যান্ডের বাদামী ভাষ্যরচনাই করুন, বা আর একটু বয়স হলে অসংযুক্ত বর্ণবিন্দুর মাধ্যমে মঁমার্ত্র ও তার উদ্যানশ্রেণীর ছবিই আঁকুন, অথবা সবশেষে রঙের পর রঙের পুরু প্রলেপের উদ্দাম প্রক্ষেপে দক্ষিণ ফ্রান্স ও ওভার-স্যুরোয়াজকেই রূপায়িত করুন। তিনি আঁকুন বা নাই আঁকুন, রঙের টুকরো টুকরো ছোপ বা বিকৃতির মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলুন বা না-ই ফেলুন, তিনি সবসময়ে চিত্রকরই আছেন, থাকবেন। এইটি এবং এই সঙ্গে বিশেষ কতকগুলি বর্ণগ্রামের সমাহারে যে বিরল সমতান তিনি খুঁজে পান তা তাঁর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তাঁকে মেজাজী মানুষদের পুরোভাগে এনে দেয়। এই 'ছোট্ট গুণটি' তাঁর আছে। সে গুণ তিনি ক্রমশ বড়ো করে তুলেছেন, অনেক সময় তাঁর অন্য সব কিছুর ক্ষতি করেও, এবং শেষ পর্যন্ত তা যে সম্পৃক্ত অন্বেষণের দায় নিজের উপর বৃথাই গ্রহণ করেছিলেন তাকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছে। সব সময়েই যে স্টাইলিস্ট তা তিনি নন, বস্তুত প্রায়শই তিনি এর থেকে অনেক দূরে থাকেন। নকশা-আঁকিয়ে হিসেবে তাঁকে একটা হাতে আঙুল যোগ করতে কষ্ট করতে হয়। অথচ যে সন্দংশ-দৃষ্টির দিকে তাঁর স্বাভাবিক গতি তার থেকে নিজেকে মুক্ত করে উঠতে পারেন নি। রঙের ব্যবহারে তিনি সবসময় বর্ণকল্পের সমতা রক্ষায় সক্ষম হননি, কখনো কখনো তা তীব্র উগ্রতায় পীড়াদায়ক। আবার কখনো তা এতই কোমল যে নিষ্প্রভ মনে হয়। কিন্তু সবসময়েই আছে সেই ঘনবিন্যস্ত রঙের বৈভব —দৃঢ়, স্থায়ী প্রকাশের প্রচণ্ড উত্তেজনায় যা শিল্পিত এবং ভবিষ্যতের সমৃদ্ধ কালান্তরণ গ্রহণে প্রস্তুত। অথচ নিজের দৃষ্টি সব জিনিসের বাস্তবতা অনুযায়ী আঁকবার জন্যে তাঁর অঙ্কনকৃতি নিখুঁত করতে সব-কিছুই করেছিলেন। এখনো দেখতে পাই তাঁকে বিকেলবেলায় করমঁতে। আর-সকলে তখন চলে গেছে, আর নির্জন স্টুডিওটা তাঁর কাছে একটা ধ্যানপ্রকোষ্ঠের রূপ নিয়েছে। ধ্রুপদী কোনো ভাস্কর্যের প্লাস্টার-প্রতিরূপের সামনে বসে তার সুন্দর আকৃতি নকল করে চলেছেন দেবদূতসুলভ ধৈর্যে। উদগ্রীব তিনি সেইসব দেহরেখা, সেইসব অঙ্গসংস্থান, সেইসব ঈষদুন্নত বহিঃপৃষ্ঠ আয়ত্ত করতে। হাতের কাজটা তিনি একবার শুধরে নিচ্ছেন, আবার পুনরুদ্যমে শুরু করছেন, পুনরায় মুছে দিচ্ছেন, শেষ পর্যন্ত ইরেজারের চাপে কাগজ ফুটো করে ফেলছেন। সেই ভূমধ্যসাগরীয় বিস্ময়ের মুখোমুখি তিনি বুঝতে পারেন নি যে, যে-বিজয়ের জন্যে তাঁর এই প্রয়াস ওলন্দাজ হিসেবে তাঁর সব-কিছুই এর পরিপন্থী। প্রকৃতি ও যুক্তির ঘনিষ্ঠতর সব সভ্যতার মাঝে প্রশান্ততর মানুষের সামনে প্রতিভাত হয়েছিল যে-শান্ত সম্পূর্ণতা তার চেয়ে আরও দ্রুত আরও ভালো পথ ইম্প্রেশনিস্টদের নির্বাক কল্পনা ও নিরুদ্‌বেগ গীতিময়তার মাধ্যমে নিজের জন্যে খুঁজে পাবেন।

কত শীঘ্রই ভিনসেন্ট বুঝতে পারলেন! সুতরাং করমঁর স্টুডিও তিনি ত্যাগ করলেন এবং

নিজেকে একেবারেই ছেড়ে দিলেন। প্রাচীনদের মতো আঁকবেন—এ স্বপ্ন তিনি আর দেখেন নি। স্বপ্ন দেখেন নি— সাময়িক গুরুর অধীনে যেমন দেখতেন— পানোন্মত্ত উদ্ভট কল্পনার তুর্কী-হারেমের বাঁদীদের মতো অলীক কার্পেটে বেষ্টিত নগ্নিকামূর্তি আঁকবেন। কিন্তু 'প্রাচীন' হতে না পারলেও তাঁর বিশ্বাস তিনি ফরাসী হয়ে উঠছেন। ইম্প্রেশনিস্টদের অনুসরণ এবং তাদের উজ্জ্বল রঙের স্কুলে পাঠ নেওয়ার অবকাশে ভাই তেও-কে (যিনি তাঁরই তাগিদে বুসো-ভালাদোঁ গ্যালারিতে মোনের প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন) লিখলেন, 'আমরা ফরাসী রেনেসাঁর উদ্দেশ্যে কাজ করে চলেছি, এবং এ-কাজে নিজেকে আরও ফরাসী বলে মনে হচ্ছে। এখানে আমরা এক মাতৃভূমিতে আছি।' আর এটা সত্যি, ভিনসেন্ট ফরাসী হয়ে উঠেছিলেন : তিনি আঁকতে লাগলেন মঁমার্ত্র, তার খর্বীকৃত ছোটো ছোটো উদ্যান, মুল্যাঁ দ্য লা গালেৎ, তার পানশালাগুলি ; এমন-কি ভ্রমণের পরিধি তিনি দূর আসনি-এ পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। লা গ্রাঁদ জাৎ দ্বীপও দেখে এলেন—স্যরা-র পরিকাল্পনিক গবেষণার সুবাদে যা ইতিমধ্যেই পরিচিত লাভ করেছে। পিঠে প্রকাণ্ড একটা ক্যানভাস ঝুলিয়ে তিান বেরিয়ে পড়তেন। খোপে খোপে ভাগ করে নিতেন সেটি নজরে-আসা বিষয়বস্তুর অনুপাতে। দিনের শেষে সেটি ভর্তি করে ফিরতেন —যেন এক ভ্রাম্যমাণ মিউজিয়ম যাতে সারাদিনের সব আবেগ-অনুভূতি ধরা আছে। ছোটো ছোটো কত দৃশ্য—নৌকোয় নৌকোয় ভরা স্যেন নদী, ছোটো ছোটো দ্বীপ— নীল রঙের ঢেঁকিকল—করবীকুঞ্জের মাঝে পরিপাটি ছোট্ট সব রেস্তোরাঁ, জানলায় তাদেব বহুবর্ণের পর্দা, বাগানের অবহেলিত অংশ, বিক্রির বিজ্ঞাপন লাগানো বাড়ি।

অনুবাদ : কৃষ্ণগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

‘লাস্ট ফর লাইফ’ : পূর্বকথা

আর্ভিং স্টোন

১৯২৬ এর বসন্ত। আমি তখন ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি পড়াচ্ছি। ভালো/মন্দ জানি না। কপালে জুটে গেল লিটল থিয়েটার প্রতিযোগিতার পুরস্কার। সে সময় আমেরিকান বুদ্ধিজীবী আর কলেজ-ছাত্রদের উপর মিথ্যে দাদাগিরি ফলাচ্ছে মেঙ্কেন আর নাথান। বোঝাচ্ছে, আমেরিকা আবার একটা জাত নাকি—আদিম বর্বর মানুষে ভরা ; না আছে তার সংস্কৃতি। শিল্প তো আছে শুধু ইয়োরোপে। তখন অল্প বয়স। গোগ্রাসে গিলছি দর্শন। এক সেমেস্টার শেষে পড়ানোর কাজ ছেড়ে পা বাড়ালাম ইয়োরোপের দিকে, উদ্দেশ্য : নাটক-লেখার চর্চা করা। ইয়োরোপবাসের প্রথম বছরে বোধহয় একটা বিশ্বরেকর্ড করেছিলাম : সাত-সাতটা পূর্ণ-দৈর্ঘ্য নাটক লিখেছিলাম, একবারে নয়, চার-পাঁচ-ছ বারের চেষ্টায়। সন্ধে পাঁচটায় নাটক লেখা শেষ করে রাতের খাবার খেতে বেরিয়ে পড়তাম। একটু গানটান শুনে, দু-চার পাত্তর পান করে বাড়ি ফিরে ঘুম। পরদিন সকাল আটটায় নতুন নাটক লিখতে বসা। বছর তেইশ বয়স তখন আমার। তখনও জানতাম না যে এ সব নাটকের একটাও লোকে নেবে না।

প্যারিসের রুক্ষ শীতে ক্লান্ত হয়ে ইতালি চলে গেলাম। সেখানে বিকেলগুলো কাটাতে লাগলাম ছবির গ্যালারি দেখে। কিছু-না-হোক তিন/চার হাজার মাইল হেঁটেছি তখন। চার্চ বিষয়ক ছবি দেখেছি তা প্রায় লাখ খানেক। বিপর্যস্ত, অখুশি আমি নিজেকেই বললাম, ‘হতে পারে মাধ্যম হিসেবে চিত্রকলা অতি উত্তম, তবে আমাকে তার বলবার কিছু নেই। বললেও আমার মাথায় কিছু ঢুকবে না।’

প্যারিতে ফিরে এলাম বসন্তে। সেখানে সোরবোনের এক ছাত্রকে ইংরেজি শেখানোর পরিবর্তে শিখতাম ফরাসী। একদিন সে বলল, ‘চলো, রোসেনবার্গ গ্যালারি দেখে আসি। ভ্যান গঘের এক দারুণ প্রদর্শনী হচ্ছে।’ ভ্যান গঘের নাম আমি কস্মিনকালেও শুনিনি। ‘না। ঠিক আছে,’ বললাম আমি। ‘যা ছবি দেখেছি তাতে বাকি জীবনটা চলে যাবে।’ বন্ধু বলল, ‘আঃ, একবার ভ্যান গঘের ছবি দেখোই না, দেখবে তোমার চোখের সামনে পৃথিবীটা কেমন বদলে যাবে। তুমি আর আগের মানুষটি রইবে না।’ ‘বেশ কাব্যি-কাব্যি শোনাচ্ছে,’ স্বীকার করলাম, ‘এখানেই তো বেশ ভালো আছি, থাকবও।’ ‘ঠিক আছে,’ বলল সেই ফরাসী যুবক, ‘শুনেছি আমেরিকানরা খেলোয়াড় মেজাজের হয়। তোমাকে বলছি, এসো আমার সঙ্গে। ভালো না লাগলে আশ মিটিয়ে তোমাকে সব সেরা ফরাসী মদ খাওয়াব।’

জানি না এ আমার জাতকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেওয়া কি না। তবে গেলাম তার সঙ্গে। রোসেনবার্গ প্রদর্শনীতে ঢুকে দেয়ালে ঝোলানো ভিনসেন্টের পঞ্চাশটা ঝকঝকে আর্লেসিয়ান ক্যানভাস দেখলাম। কী যেন একটা ঘটে গেল আমার ভেতরে যা আগে কখনো ঘটেনি আর সেই থেকে আর ঘটেও নি। পা দুটোতে যেন কেউ পেরেক পুঁতে দিয়েছে। নড়তে পারি না, দম নিতে

পারি না, ভাবতেও পারি না। কে জানে সে অবস্থায় কতক্ষণ ছিলাম। দু মিনিট, কুড়ি মিনিটও হতে পারে, লাগল সম্বিত ফিরে পেতে। ছবিগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করলাম। শেষ কালে চলে আসবার সময় নিজেকেই প্রশ্ন করলাম, 'কে এই মানুষ যিনি এমন গভীরভাবে আমাকে আলোড়িত করতে পারেন, দেখিয়ে দিতে পারেন যে সারাজীবন আমি ছিলাম অন্ধ?'

খুঁজে পেতে দেখলাম আটাশ বছর আগে ভ্যান গঘের একটা জীবনী লিখেছিলেন মায়ার-গ্রাফে। সুন্দর কাব্যিক জীবনী তবে অসম্পূর্ণ। দু-তিনটে ফরাসী পুস্তিকার সন্ধান পেলাম, দু-তিনটে জার্মান অংশবিশেষ। কেউই কিন্তু সব কাহিনীটা এক জাগয়ায় ধরে দেয়নি। নিউ ইয়র্কে ফিরে গিয়ে নাটক লেখা চালিয়ে গেলাম। ফিফ্‌থ অ্যাভিনিউতে নিউ ইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরিতে গিয়ে ভাই তেও-কে লেখা ভিনসেন্টের তিন খণ্ড চিঠিপত্র পড়তে শুরু করলাম। আমার মতে পৃথিবীর শিল্পে যেমন তাঁর ছবি, পৃথিবীর সাহিত্যে তেমনি তাঁর চিঠিপত্র এক অসাধারণ সংযোজন।

চিঠিপত্র পড়তে গিয়ে আবিষ্কার করি ভিনসেন্টের সমৃদ্ধ, নাটকীয় জীবন। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যেত। দেখতাম, ভিনসেন্ট আর তেওর মধ্যে কথোপকথন রচনা করছি। আবার ঘুমের কোলে ফিরে যেতাম। সকালে উঠে টাইপরাইটারে বসি। যে-নাটকটা লিখছি সেটা লিখতে চেষ্টা করি। একটাও শব্দ লিখতে পারি না। লিখব কী করে! দেখি নিজেকে বর্ণনা দিচ্ছি ভিনসেন্ট যে-সব স্থানে থাকতেন, কাজ করতেন। ভিনসেন্ট...ভিনসেন্ট...ভিনসেন্ট—ভিনসেন্ট ছাড়া আর কোনো ভাবনা নেই। কখনো উপন্যাস লিখিনি। এ রকম কাহিনী সামলাবার পক্ষে বয়েসটাও নেহাৎ কম। ভাবলাম থেওডোর ড্রেইসার বা টোমাস মান ছাড়া এ গল্প কারো পক্ষে লেখা সম্ভব নয়। কয়েক মাস কাটবার পর বুঝতে পারলাম গল্পটা না লিখে ফেলা পর্যন্ত একটা ছত্রও লিখতে পারব না। যা লিখতে চাইছিলাম তা যদি চালিয়ে যেতে হয় তবে আমার সামনেকার ভ্যান গঘ কাহিনী নামক পাথর-প্রাচীর পেরোতেই হবে। এটা আন্দাজ করে বুঝলাম, 'বোধহয় ভিনসেন্ট-প্রেম আমাকে অন্য কোনো কঠিন জায়গায় নিয়ে ফেলবে। বোধহয় আঙ্গিকের স্থান নেবে প্রেম আর আবেগ।'

ভ্যান গঘকে অনুসরণ করবার জন্য যখন ইয়োরোপে ফিরে যেতে চাইছি তখন আমার জীবিকা হত্যা-কাহিনী লেখা। পর পর ছদিনে ছটা গল্প লিখে ফেললাম। প্রত্যেকটা গল্প পাঁচ থেকে দশ হাজার শব্দের। প্রভু যীশু আমার সহায় ছিলেন কারণ ছটার ভেতর পাঁচটা গল্প বেচতে পেরেছিলাম। চেক পেতে দেখলাম তাতে ইয়োরোপে থাকাটা চলে যাবে অবশ্য যদি গাড়িভাড়া নিয়ে দিন প্রতি দু ডলার খরচ করি।

সে বছরের শেষে আমার ভ্যান গঘ মালমশলা সুটকেসে ভরে মার্সাই এসে পৌছলাম। পকেটে তখন চার ডলার পঁয়ত্রিশ সেন্ট। না কোনো বন্ধু, না কোনো আত্মীয়। কার কাছে খবর পাঠাব সাহায্য চেয়ে। আমাকে দেখলে মনে হবে চলেছি সমুদ্রতীরের আমেরিকান যুবকদের দলে ভিড়তে। মাসখানেক আগে নিজের দুর্দশা বর্ণনা করে সান ফ্রানসিসকোয় ডলার স্টীমশিপ লাইনের প্রচার-অধিকর্তাকে লিখেছিলাম। তাঁর লেখা একটা পত্র আমার জন্য মার্সাইতে অপেক্ষা করছিল। সে পত্রটা ছিল এইরকম : 'চার জাহাজের ক্যাপটেনকে লিখেছি। তুমি মার্সাইতে থাকার সময় তাঁদের জাহাজ ওখানে নোঙর করবে। পারলে তাঁরা তোমাকে সাহায্য করবেন। তুমি তো জান

আমেরিকান আইনানুযায়ী কোনো জাহাজে একুশজনের একজন বেশি বা কম নাবিক তোলা যায় না।'

চতুর্থ দিনে একটা ডলার জাহাজ আসার কথা...আমার পকেটে মাত্র ষাট সেন্ট পড়ে আছে। লেখবার আগে বসে আছি সারারাত। আজও মনে হয় এটাই আমার শ্রেষ্ঠ কাজ : জাহাজের ক্যাপটেনের মন-গলানো একটা বক্তিমে ভাঁজছি মনে-মনে। সকালবেলা দেখলাম বন্দরে ঢুকছে এস. এস. প্রেসিডেন্ট উইলসন। ডেকে উঠে দেখি ক্যাপটেন রেলিঙে ঝুঁকে পড়ে দেখছেন জাহাজ ঠিকমত বাঁধা হল কি না। 'ক্যাপটেন অ্যান্ডারসন,' বললাম আমি, 'বিলের বন্ধু, আসছি সান ফ্রানসিসকো থেকে—,' জানি 'কমা'টা পার হতে পারলে আর তিনি আমাকে থামাতে পারবেন না।

তা সে যাই হোক। ক্যাপটেন আমাকে আর বেশি এগোতে দিলেন না। 'হ্যাঁ, হ্যাঁ। তোমার কথা সব শুনেছি। ঠিক আছে...।'

পরদিন সকাল সাড়ে পাঁচটায় জাহাজের ডেক, বিলাস শ্রেণীর জানলা পরিষ্কার করতে করতে প্রাতরাশের আগে নিউ ইয়র্কে এসে পৌঁছলাম।

শরীর আর চলছে না। আরও দুই নিরীহকে হত্যা করলাম। কপাল ভালো বলতে হবে : দুটো গল্পই বেচতে পারলাম। একটা নিল 'আন্ডারওয়ার্লড', অন্যটা 'ডিটেকটিভ ড্রাগনেট'। দেখলাম বাকি ছ মাস চলে যাওয়ার মতো রেস্ত আছে। ছ মাসের মধ্যে লিখে ফেললাম 'লাস্ট ফর লাইফ'। সেপ্টেম্বর ১৯৩৪-এ বই প্রকাশ করল লংম্যান, গ্রীন অ্যান্ড কোং।

নিউ ইয়র্কের মিউজিয়ম অব মডার্ন আর্ট ভিনসেন্টের মৃত্যুর পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করছে। মিউজিয়মের পরিচালক পরে আমাকে বলেছিলেন যে পরামর্শ পরিষদের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে। তাঁদের তিনি বলেছেন ভ্যান গঘ সম্পর্কে একটা জনপ্রিয় আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। আগামী শীতে তাঁরা ভ্যান গঘ প্রদর্শনী করবেন। এখানে উল্লেখ থাকা দরকার যে নিউ ইয়র্ক, বোস্টন, ফিলাডেলফিয়া, সান ফ্রানসিসকো, কানসাস সিটি, মিনিয়াপোলিসে এই প্রদর্শনী অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছিল যেমনটি আমেরিকায় আর হয়নি। দু লক্ষ মানুষ এই প্রদর্শনী দেখে। মিউজিয়মের বাইরে সারিবদ্ধ জনতাকে সামলানোর জন্য পুলিস ডাকতে হয়েছিল। ফিফ্‌থ অ্যাভিনিউর চতুর দোকানগুলো তাদের জানলায় টাঙিয়ে দিয়েছিল সুন্দর করে বাঁধানো ভ্যান গঘের প্রিন্ট। জানলায় সাজানো গাউন, মহিলাদের টুপি, স্নানের পোশাক, খেলার পোশাক, বটুয়া, দস্তানা সবতাতেই ভ্যান গঘের রঙ।

১৯৩৫এ ক্যালিফোর্নিয়ায় ফিরে একটা টেলিগ্রাম পেলাম। নিউ ইয়র্কের একজন প্রস্তুতকারক আমার অনুমতি চেয়েছে 'লাস্ট ফর লাইফ নেগ্লিজে' তৈরি করার জন্য টাকা ঢালতে চায়।

এর চেয়ে বড়ো সম্মান আর কী হতে পারে!

অনুবাদ : অনির্বাণ রায়

ভ্যান গঘ : কবি হিসাবে চিত্রকর

স্টিফেন স্পেন্ডার

ভিনসেন্ট ভ্যান গঘের কাছে তাঁর শিল্প ছিল তাঁর দর্শনেরই একটি প্রকাশ, সেই দর্শনেরই বিকাশের পথ ; এটি এমন এক স্তরে তাঁর নিজের অস্তিত্বেরই সন্ধান যেখানে তিনি এক জবড়জঙ্গ ও খ্যাপা প্রকৃতির মানুষ নয়, বরং বিপরীতভাবে, সূক্ষ্ম ও যুক্তিপরায়ণ প্রকৃতির একজন মানুষ। জীবনের রূপকথার একটি আবিষ্কার, মানবজাতিকে দেওয়ার মতো বার্তা আছে যাঁদের এমন সব লেখক ও চিত্রকরদের এক মিলনস্থান; এবং এক ধর্ম যা থেকে গোটা বাইবেলই প্রায় বিবেচিত।

শিল্পের মধ্যে নিজেকে তিনি এক অসাধারণ মাত্রায় সমর্পণ করেছিলেন, যাকে বলে গাঢ় রঙের স্নানের জলের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিলেন আর সেখান থেকে যখন উঠে এলেন তাঁর চিন্তাগুলি তখন সূর্যের রঙে রঞ্জিত ছবিতে রূপান্তরিত।

অনেক বছর ধরে স্কুল-শিক্ষকতা, পুস্তকবিক্রেতা, ধর্মশাস্ত্র প্রচার ও মানবপ্রেমের কাজ করে হতাশ হয়ে অনেক দেরীতে সাতাশ বছর বয়সে নিজের জন্য যে আবেগোচ্ছল কাজ তিনি আবিষ্কার করলেন তা হল চিত্রাঙ্কন। এটা দেখে খুবই অবিশ্বাস্য মনে হয় যে তাঁর চরিত্রের যেসব বিভিন্ন দিকগুলিকে শিল্পের বিরোধী বলে মনে হয় তার একটিকেও না পরিত্যাগ করে এমন সব অজানা রূপ সৃষ্টি করতে তিনি সক্ষম হয়েছেন যা ক্যানভাসের উপর তাঁর তেজস্বিতাকে দৃঢ়ভাবে ধরে রেখেছে। গোটা শিল্পজীবন ধরে তিনি তাঁর ছবিগুলির মধ্যেই একান্তধর্মী, খ্যাপাটে, জেদী, ধর্মোপদেশ-প্রচারক এবং এমন কি উন্মাদের মতোই থেকেছেন। এসব সত্ত্বেও তাঁর বিদ্রোহী মেজাজের উপরে বিরাজ করছে রূপ ও রঙের এক আশ্চর্য নিয়মনিষ্ঠা এবং ভাবপ্রকাশের ভঙ্গীর উপর এক বিরাট দখল যাতে করে প্রতিটি ছবির স্টাইলের মধ্যে, তা সে যতই রুক্ষ বা মোটা দাগের হোক না কেন, তাদের সম্ভাবনাগুলি সম্পন্ন করার ব্যাপারে এক বিরাট সুসঙ্গতি বর্তমান। স্টাইল তাঁর কাছে বাস্তবিকই প্রতিটি ছবি গড়ে তোলার বিভিন্ন মৌল উপাদানগুলিকে মিশ্রিত করে তৈরি এক ধরনের নিয়ন্ত্রিত বিস্ফোরণ। বন্ধু এমিল বার্নার্দকে তিনি লিখেছিলেন : "ব্যাপারটা *কালো* আর *সাদা* সম্বন্ধে। রঙওয়ালার কাছ থেকে পাওয়ামাত্রই সেগুলো বেপরোয়াভাবে আমার প্যালেটে আমি রাখতে চলেছি, আর সেইভাবেই সেগুলিকে আমি ব্যবহার করতে চাই। যখন—মনে রাখবেন জাপানী পদ্ধতিতে রঙের সরলীকরণ সম্বন্ধে আমি কথা বলছি—একটা সবুজ পার্ক, নীলাভ লাল রঙের পথ তাতে, সেখানে যখন দেখি কালো পোশাক-পরা একজন মানুষ, পেশায় তিনি বিচারক, *ল্যাঁত্রঁসিজ্যাঁ* (L'Intransigeant) বইটি পড়ছেন, আর তাঁর মাথার উপরে এবং পার্কটির বিশুদ্ধ কোবাল্ট রঙের আকাশ, তখন উল্লেখিত কালো পোশাক-পরা ন্যায়বিচারক মশাইকে (Zonge de paix) বিশুদ্ধ কালো রঙ আর *'ল্যাঁত্রঁসিজ্যাঁ'* বইটিকে আমি বিশুদ্ধ অবিমিশ্র সাদা রঙে আঁকব না?

কারণ জাপানীরা প্রতিফলনগুলিকে বিমূর্ত করে তুলেছেন, ফ্ল্যাট টোনগুলিকে পরপর

পাশাপাশি রেখেছেন, রূপের চলনগুলিকে সুস্পষ্ট করে তোলা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রেখার সাহায্যে।

"অন্য আর এক বর্গীয় ধ্যানধারণাতে, কেউ যখন প্রকাশধর্মী করে কোনো রঙীন মোটিফ আঁকেন, যেমন ধরুন, হলুদ রঙের সন্ধ্যার আকাশ, আকাশের পটভূমিতে একটি সাদা রঙের কঠিন অবিমিশ্র শুভ্রত্বকে প্রয়োজন সাপেক্ষে বিশুদ্ধ সাদা রঙটিকে কোনো নিরপেক্ষ টোনের সাহায্যে ফ্ল্যাট করে বিস্ময়জনকভাবে স্পষ্ট করে দেখানো যেতে পারে, কারণ আকাশটা নিজেই তাকে একটা বিবর্ণ লাইলাক রঙের আভা দেয়। সেই সঙ্গে এই সরল কিন্তু কাল্পনিক ভূদৃশ্যটি কল্পনা করে নিন—একটা কুটীর আগাগোড়া চুনকাম করা (ছাদ সমেত), চারপাশের মাটি কমলা রঙের, সেটাই স্বাভাবিক, কারণ দক্ষিণাঞ্চলের আকাশ আর ভূমধ্যসাগরের নীলিমা একটা কমলা রঙ সৃষ্টি করে যা নীলের মাত্রার ঔজ্জ্বল্যের অনুপাতে তীব্রতায় বাড়তে থাকে, দরজা জানালাগুলি এবং ছাদের উপরের ছোট্ট ক্রুশের চিহ্নটি তখন কালো ও সাদা রঙের তাৎক্ষণিক বৈপরীত্য সৃষ্টি করে যা নীল আর কমলা রঙের বৈপরীত্যের মতোই চোখকে তৃপ্তি দেয়।"

এই অনুচ্ছেদটি ভ্যান গঘের কল্পনাশক্তির ধর্মটিকে প্রকাশ করেছে। পড়লে যেটিকে এক বিশেষ ধরনের স্টাইলে কোনো একটা বিশেষ ছবি আঁকার করণকৌশলগত বর্ণনা বলে মনে হয় তার মধ্যে এমন এক বল রয়েছে যে সেটি শব্দ দিয়ে গড়া একটি ছবি সৃষ্টি করেছে। এটা যদি কোনো চিত্রকর সম্বন্ধে লেখা কোনো উপন্যাসের হত লোকে তাহলে বলত উপন্যাসটির লেখক চিত্রকরের করণকৌশলের পরিভাষায় বর্ণনা করার ছলে শব্দের সাহায্যে কোনো ছবিকে বর্ণনা করার সমস্যাটির সমাধান করেছেন।

চৈতন্যের বিকাশসাধনের উপায় হিসাবে শিল্পকলাকে ব্যবহার করার এক আবেগদীপ্ত প্রয়োজন ভ্যান গঘের ছবিকে তার বিপুল প্রাণধর্মিতা দান করেছে। বিকাশকে প্রকাশ করার, ছবির ভিতর দিয়ে তাঁর আত্মাকে উন্নীত করার প্রয়োজনটাই সব কিছু। তাঁর শিল্প তাঁর মাধ্যমকে বাঁকিয়ে চুরিয়ে নেওয়ার প্রায় কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়িয়েছে, কারণ প্রতিটি ছবিই হল মাধ্যমের উপর চৈতন্যের এক-একটি বিজয়। তাঁর পরিণত জীবনের গোটা অংশ জুড়ে, এমন কি ছবি আঁকা যখন শুরু করেন নি তারও আগে থেকে, আত্মপ্রকাশের অন্য একটি মাধ্যম তাঁর হাতে থেকেছে, সেটি হল পত্রলেখা। পরবর্তীকালে রঙ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে যেমন পেরেছিলেন প্রায় সেই একইরকম কার্যকরভাবে এই ক্ষেত্রে তিনি শব্দকে দিয়ে তাঁর চৈতন্যের অবস্থা প্রকাশ করিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর ছবিগুলি হল একটি প্রাণের আত্মজীবনীমূলক প্রকাশ যে-কাহিনী ছবিরই পাশাপাশি শব্দের সাহায্যেও কথিত।

ছবির মতো, তাঁর লেখার মধ্যেও ভ্যান গঘ মূলত একজন আদিমধর্মী। প্রকৃতপক্ষে পারির ইম্প্রেশনিস্টদের থেকে দুয়ানিয়ের রুসোর (Douanier Rousseau) তিনি বেশি কাছের লোক। কিন্তু তাঁর আদিমধর্মী প্রতীক, পর্যবেক্ষণ ও করণকৌশলগুলি এমন এক সংগীতধর্মী ক্ষমতা ও বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে ঐকতানযুক্ত হয়েছে যে তাঁর কল্পনার মহান যাত্রাপথে তিনি তাঁর আদিমধর্মী উৎসবিন্দুগুলিকে অনেক পিছনে ফেলে এসেছেন। বেলজিয়ামের খনিশ্রমিকদের মধ্যে যখন তিনি বাস করতেন তাঁর তখনকার চিঠিগুলির মধ্যে একটা নিরানন্দ, সাদামাটা, হাতড়ানোর মতো গুণ রয়েছে এবং তা সত্ত্বেও যার মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষমতা রয়েছে যা ঈষৎ পরবর্তীকালে কাঠকয়লায় আঁকা তাঁর রেখাচিত্রগুলিরই (drawing) মতো। এই গুণের দৃষ্টান্ত দিতে হলে তাঁর ফরাসী রচনার

উদ্ধৃতি আমাকে দিতেই হবে :

"মোটের উপর আমি এমন একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁছতে চাই যেখানে আমার কাজ দেখে মানুষ বলবে : এই মানুষটি গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন, সূক্ষ্মভাবে অনুভব করেছিলেন। আমার তথাকথিত ধরন সত্ত্বেও, তুমি বুঝতে পারছ, বা ঠিক সেইটি থাকার কারণেই একথা তারা বলবে।

"বেশির ভাগ লোকের চোখে আমি কী? একটা অকিঞ্চিৎকরতা বা একজন খ্যাপাটে কি একজন বিশ্রী ধরনের লোক—সমাজে যার কোনো স্থান নেই বা কোনো দিন সে তা পাবে না, বা পেলেও খুবই সামান্য।

"ভালো কথা, ধরা যাক সে তা পেল, তখনও হৃদয়ের মধ্যে এই যে খ্যাপামি, এই যে অকিঞ্চিৎকরতা রয়েছে তা আমার ছবির মধ্যে আমি দিয়ে রাখতে চাইব।

"আমার এই অভিলাষ, 'সব কিছু সত্ত্বেও' অনুরাগের থেকে তিক্ততার উপরেই যে বেশি প্রতিষ্ঠিত তা নয়, অতিরাগের থেকে বরং এক প্রশান্ত মনোভাবের উপরেই যে বেশি প্রতিষ্ঠিত তা নয়, অতিরাগের থেকে বরং এক প্রশান্ত মনোভাবের উপরেই তা বেশি প্রতিষ্ঠিত।

"আবার দুঃখকষ্টের ভিতর দিয়ে জেনেছি যে আমার মধ্যে একটা সুরসঙ্গতি আছে, শান্ত ও বিশুদ্ধ এক সংগীত আছে। গরীবের ছোট্ট বাড়িতে, অত্যন্ত নোংরা এক ক্ষুদ্র কোণে আমি ছবি বা ডিজাইন দেখতে পাই। আর আমার মন ছুটে চলে সেইদিকে অদম্য এক তাড়নায়।"

এই ধরনের কোনো অনুচ্ছেদ একটি কবিতা। যে দরিদ্র অবস্থার মধ্যে তিনি বাস করতেন তা থেকে আহৃত মূর্ত প্রতিরূপের আকারে তাঁর চৈতন্যগত যন্ত্রণা আপনাকে প্রকাশ করেছে তার মধ্যে। এটা সুস্পষ্ট যে সাহিত্যের প্রতিরূপগুলি ভ্যান গঘ এই সময় ছবির প্রতিরূপের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছেন, সেগুলি যেন একই ফলাফল তৈরি করে বলে তিনি মনে করেন। তিনি লিখেছেন :

"শেকসপীয়রের মধ্যে রেমব্র্যান্ট এবং মিশেলেতের মধ্যে কররেজ্জিও এবং ভিক্তর উগোর মধ্যে দ্যলাক্রোয়া আছেন আবার নিউ টেস্টামেন্টের মধ্যেও রেমব্রান্ট রয়েছেন এবং রেমব্রান্টের মধ্যে নিউ টেস্টামেন্ট, তোমার যা খুশি ভাবতে পার, ব্যাপারটা প্রায় একই জিনিসে গিয়ে দাঁড়ায়।"

ভ্যান গঘের মতো অন্য কোনো চিত্রকর এত সুপ্রতুলভাবে তাঁর নিজের ছবির বর্ণনা দেন নি। আর্ল, স্যাঁত-রেমি এবং ওভারে থাকতে আঁকা তাঁর ছবিগুলির 'ভিনসেন্ট ভ্যান গঘের মহান অধ্যায়' শীর্ষক একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ করেছেন শেরয়ন ও দ্য গ্রুইতার (Schjon and De Gruyter)। চিঠিতে উল্লেখিত কয়েক শ ছবির উদাহরণ তাতে ছাপানো হয়েছে, আর তাদের অনেকগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা তাতে দেওয়া হয়েছে। এই বর্ণনাগুলি আসলে এক-একটি গদ্যকবিতা, ছবিগুলির পরিপূরক। প্রায়ই সেগুলি ছবিতে একটা বর্ণনামূলক মন্তব্য যোগ করেছে যা তার আবেগটির উপর জোর দেয় এবং একটা নীতি উপদেশ তা থেকে টেনে বার করে ছবিতে যা ক্বচিৎ উচ্চারিত, যদিও নিঃসন্দেহে তা সুপ্রকাশিত। ১৮৮৯ সালে স্যাঁত-রেমির উন্মাদাশ্রম থেকে এমিল বার্নার্দকে তিনি লিখছেন :

"এই মুহূর্তে আমার সামনে রয়েছে এমন একটা ক্যানভাসের বর্ণনা আমি দিচ্ছি। যে

উন্মাদাশ্রমে আমি রয়েছি সেখানকার পার্কের একটি দৃশ্য; ডানদিকে একটি ধূসর চাতাল, আর একটা বাড়ির পাশের দিকের দেওয়াল। ফুল-ঝরে-যাওয়া কয়েকটা গোলাপের ঝাড়, বাঁ দিকে পার্কের খানিকটা চলে এসেছে—গেরিমাটি—রোদে ঝলসে যাওয়া মাটি, পাইন গাছের ঝরা পাতায় ঢেকে গেছে। পার্কের এই কিনারাটাতে বড়ো বড়ো পাইন গাছ লাগানো হয়েছে, তাদের গুঁড়ি আর শাখাপ্রশাখাগুলো গেরিমাটি রঙের, পাতার রঙ সবুজ, তাতে কালোর মিশেল থাকায় আঁধার ঘনিয়ে এসেছে। সন্ধ্যার আকাশে হলুদের পটভূমিতে বেগুনি ডোরা, উপরের দিকে তা নীলাভ লাল হয়ে সবুজ রঙের হয়ে গেছে। এই আকাশের পশ্চাৎপটে এই সব উঁচু গাছগুলো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। একটা দেওয়াল—সেটাও গেরিমাটি রঙের—দৃষ্টিকে বাধা দিচ্ছে আর তার উপর দিয়ে কেবল একটা বেগুনি ও হলুদে-গেরিমাটি রঙের পাহাড় দেখা যাচ্ছে। এখন হয়েছে কি সব থেকে কাছের গাছটা একটা প্রকাণ্ড গুঁড়ি, বাজ পড়ার ফলে ডালগুলো কেটে ফেলা হয়েছে করাত দিয়ে। কিন্তু পাশের দিকের একটা শাখা খুব উঁচুর দিকে উঠে গেছে, আর তা থেকে গাঢ় সবুজ রঙের পাইনপাতা পড়ছে ঝর ঝর করে। এই বিষাদমলিন দৈত্যটা—পরাজিত দর্পিত মানুষের মতো—জীবন্ত প্রাণীর প্রকৃতির দিক থেকে বিবেচনা করলে, তার সামনে দাঁড়িয়ে ক্রমবিলীয়মান গোলাপ ঝাড়ের গায়ে একটি শেষ-ফোটা গোলাপের ম্লান হাসির সঙ্গে বৈপরীত্য গড়ে তুলেছে। গাছগুলোর নীচে পাথরের শূন্য বেঞ্চি কয়েকটি, ম্রিয়মাণ বক্স্ গাছের সারি; বৃষ্টির জল জমেছে এক জায়গায়—তাতে হলুদ রঙের প্রতিফলন পড়েছে আকাশের। রোদের একটি রশ্মিরেখা, দিনের আলোর শেষ কিরণ বিষাদমলিন গেরিমাটির রঙকে প্রায় কমলা রঙের করে তুলেছে। এখানে ওখানে গাছের গুঁড়িগুলোর ফাঁকে ছোটো ছোটো কালো কালো মূর্তি ঘোরাফেরা করছে।

"আপনি উপলব্ধি করতে পারবেন যে এই গেরিমাটি, ধূসর রঙে আঁধার-হয়ে-ওঠা সবুজ, প্রান্তরেখাকে ঘিরে এই কালো ডোরাগুলো মিলে এক ধরনের মানসিক যন্ত্রণার অনুভূতি গড়ে তোলে যাকে বলে 'লাল-কালো', আমারই মতো দুর্দশায় পড়া আমার কোনো কোনো সঙ্গী প্রায়ই যে যন্ত্রণা ভোগ করে থাকেন। তাছাড়া, বাজপড়া বিশাল গাছের গুঁড়ির প্রধান চিত্রউপাদান বা মোটিফটি, হেমন্তের শেষ কুসুমটির রুগ্ন সবুজ-নীলাভ লালে মেশা হাসিটি, সব কিছু মনের উপর এই ছাপ দৃঢ় করে তুলতে সাহায্য করে।"

ছবিটি যে এখানে কবিতা হয়ে উঠেছে কেবল তাই নয় : এটিকে কথা বলানো হয়েছে। বেটোফেন তাঁর শেষ কোয়ার্টেটের স্বরলিপির উপর 'এটিকে অস্তিত্ব হতে হবে, অস্তিত্ব হতে হবে এটিকে' (Muss es sein : es muss sein) এই কথাগুলি হিজিবিজি করে লিখে রাখার সময় যা অনুভব করেছিলেন ভ্যান গঘও সেই কথাগুলি ব্যবহার করে তাঁর শিল্পকলার আবশ্যিকতাকে অনুভব করেছেন বলে মনে হয়। কোনো কোনো শিল্পী আছেন যাঁরা তাঁদের কাজের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধতাবাদী। এর সাহায্যে এই কথাই বোঝাতে চাইছি যে মানব-অভিজ্ঞতার মধ্য থেকে তাঁদের শিল্প উদ্ভূত হয় তা কাজটির মধ্যেই পুরোপুরি রূপান্তরিত হয়ে যায়, কেবলমাত্র তার মাধ্যম, রঙ বা স্বর বা শব্দগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত হয়েই (in terms of), কাজটিতে যে বাস্তবকে রূপ দেওয়া হয়েছে তা থেকে যতদূর সম্ভব বিচ্ছিন্ন হয়ে তা বর্তমান থাকে। বিশুদ্ধ শিল্পীর লক্ষ্য হল তাঁর শিল্পগত বস্তু-উপাদানগুলি থেকেই একটা জিনিস সৃষ্টি করা এবং যেসব ধ্যানধারণা, বাণী ও

ভাবাবেগ কাজটির জন্ম দিয়েছে সেগুলি থেকে সেটিকে পৃথক করে রাখা। কিন্তু আর এক ধরনের শিল্পী আছেন যাঁরা যে জিনিসটি সৃষ্টি করছেন তার থেকে বেশি করে যে কথাটি বলতে চাইছেন, যে জিনিসটি অনুভব করেছেন বা যার অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন সেটি নিয়েই বেশি চিন্তিত এবং নিজের কাজটিকে একটি মানবিক অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করার উপায় হিসাবেই শুধু গণ্য করেন। তাঁর ধারণা শিল্পকর্ম এবং অভিজ্ঞতার মধ্যে এক ধরনের বৈদ্যুতিক স্রোত চলাচল করে এবং যে বাস্তবটি তাঁর কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ সেটি থেকে কাজটিকে সম্পর্ক ছিন্ন করত তিনি চান না। কাজটি সেটির সংযোগসূত্রটিকে তিনি আবারও জোর দিয়ে দেখাতে চান। অর্থাৎ, এমন সব পথে এটিকে তিনি আবার বর্ণনা করতে চান যা সেটিকে কেবলমাত্র তার নিজের মাধ্যমের মধ্যেই অস্তিত্বশীল থাকার থেকে মুক্তি দেয়। ভ্যান গঘের কাছে 'এই গেরিমাটি রঙ, ধূসর বিষাদময় হয়ে ওঠা সবুজ' গেরিমাটির থেকে বেশি একটা কিছু। এ হল সেই 'লাল-কালো' বিষাদ হাসপাতালের রোগীরা যাতে ভোগে।

ভ্যান গঘের ইচ্ছা ছিল তাঁর ছবিগুলি, প্রকৃতি থেকে আহৃত তাঁর ছবিগুলি তাদের প্রতিরূপগুলি, মানবিক এক বাণী সেগুলির সঙ্গে যোগ করে প্রকৃতিকেই আবার যেন ফিরিয়ে দেয়। যে সূর্যমুখী ফুলের ছবি প্রায় তিনি আঁকতেন সেই সূর্যমুখীগুলি তাঁর এই মনোভাবেরই প্রতীক : এরা সেই ফুল সূর্যের দিকে মুখ করে সূর্যকেই যারা অনুসরণ করে; এমন কি যে সূর্যের ছবি তিনি আঁকতেন সেই সূর্যও এই মনোভাবের প্রতীক।

কবিতা সম্পর্কে ভ্যান গঘের মনোভাব খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। কবিতা তিনি আদৌ সমালোচনামূলক দিক থেকে বুঝতেন না ; তিনি নিজে যা প্রকাশ করার চেষ্টা করছেন সেটিকেই প্রকাশ করার একটা পথ হিসাবে কবিতাকে তিনি গণ্য করতেন। বার্নার্দকে লিখছেন :

"কত লোক আছেন, বিশেষ করে আমাদের সাথীদের মধ্যে, যাঁরা মনে করেন শব্দগুলি যেন কিছুই নয়, কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক তার বিপরীত : কোনো জিনিসের ছবি আঁকার মতোই সেই জিনিসকে ভালো করে বলাটাও সমান আগ্রহজনক ও কঠিন কাজ, তাই নয়? রেখা ও রঙের যেমন শিল্প আছে, সেইরকম শব্দেরও শিল্প আছে এবং সেটা কখনোই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।"

ছবি আর কবিতাকে সুনির্মলভাবে গুলিয়ে ফেলে বোদলেয়ারকে তিনি তুচ্ছ করেন, কারণ দোমিয়ের সেই একই কাজ আরও ভালোভাবে করতেন বলে তিনি মনে করেন। বার্নার্দের একটি কবিতার সমালোচনা করে বলেছেন :

"তরদু সুর স্য ক্রোয়া এঁ স্পিরাল' (Tordu sur sa croax en spirale) বা 'ক্রুশের উপর যন্ত্রণায় মুচড়ে যাওয়া খ্রীস্ট' কবিতাটি অতীন্দ্রিয়বাদী দৃষ্টিতে খ্রীস্টের বড়ো করে দেখা কৃশতাকে বেশ ভালোভাবেই প্রকাশ করেছে। কিন্তু এ কথা কেন যোগ করছেন না যে শহীদের বেদনাক্লিষ্ট দৃষ্টির মধ্যে ছ্যাকরা গাড়ির ঘোড়ার চোখেও মানুষ সেই একই নিরাশার কিছুটা দেখতে পায় ; তাহলে এটা আরও বেশি করে পারির জিনিস হয়ে উঠত, কারণ সেখানে চেয়ারে বসে থাকা অথর্ব মানুষ আর কবি বা শিল্পীদের চোখেও এই একই ধরনের দৃষ্টি মানুষের নজরে পড়ে।"

তা সত্ত্বেও, ভাষার সাহায্যে জীবন্ত প্রতিরূপ সৃষ্টি করার যাবতীয় ক্ষমতা তাঁর থাকা সত্ত্বেও ভ্যান গঘের কবি হওয়া উচিত ছিল এ কথা ভাবাই যায় না। চিত্রকরের মতোই তিনি লেখেন।

তার অর্থ, ভাষার মধ্যে তিনি নিয়ে আসেন দৃশ্যবস্তুকে বর্ণনা করার আশ্চর্য ক্ষমতা এবং তাঁর মনের উপর যেসব ছাপ পড়ে সেগুলি জীবন্ত করে তুলে ও গতি দান করে তিনি নাড়াচাড়া করতে পারতেন। স্বতস্ফূর্ত কবিতার একটি অনুচ্ছেদ তিনি লিখতে পারেন বা কোনো দৃশ্যকে এমনভাবে বর্ণনা করতে পারেন যা কোনো কবি বা ঔপন্যাসিকের হৃদয়কে মথিত করে। সে যাই হোক, অন্যান্য চিত্রকরের মতোই, এক নাগাড় সাহিত্য ধর্মী রূপের (form) ভিত্তিতে তিনি চিন্তা করতে পারেন না। তাঁকে যদি তাঁর নিজের জীবনের কাহিনীটা দেওয়া হয় যা দৈনন্দিন জীবনের ঘটনার সাহায্যেই তাঁর থেকে তৈরি হয়েছে তাহলে শব্দের সাহায্যে ভালোই তিনি লিখতে পারেন। চিত্রকররা সুন্দর সুন্দর দিনলিপি লিখেছেন, চিঠি লিখেছেন—দ্যলাক্রোয়া বা গোগ্যাঁর জুর্নালের মতো--এবং কখনো কখনো ছিন্নাংশের মতো হলেও ভালো আত্মজীবনী লিখেছেন —বেঞ্জামিন হেয়ডন (Benjamin Haydon) বা অগাস্তাস জনের (Augustus John) মতো।

ভ্যান গঘের চিঠিগুলির চমৎকারিত্ব এখানেই যে সেগুলির মধ্যে সাহিত্যিক ভান প্রায় কিছুই নেই। প্রথম যুগের চিঠিগুলিতে মাঝে মাঝে একটা কাব্যালঙ্কারধর্মী ছন্দে গিয়ে পৌঁছেছে বটে যা থেকে শাস্ত্রোপদেশ প্রচারকদের কথা মনে পড়ে যায়। তবে এই ধরনের ধর্মোপদেশগুলি কদাচিৎ দেখা গেছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেগুলি হল ভাইকে বা খুব কাছের লোক বলে মনে হয় এমন কোনো বন্ধুকে লেখা অভিজ্ঞতার কথা, যে সব অভিজ্ঞতার মধ্যে তিনি পুরোপুরি ডুবে আছেন এমন সব অভিজ্ঞতার কথা। কোনো একটা ক্যানভাসের বর্ণনা থেকে ঘরের মধ্যে তাঁর চারপাশের বর্ণনায় তিনি চলে যান; তাঁর মডেল হয়ে কাজ করছে যে স্ত্রীলোকটি তার কোনো দয়াদাক্ষিণ্যপূর্ণ কাজের কথা উল্লেখ করেন; প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা করছেন, তেও-র যে টাকাপয়সা নেই বা বার্নার্দের ডাক পড়েছে সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার জন্য সহানুভূতির সঙ্গে এইসব কথা মনে করেছেন, পারির বাজে খাদ্যবস্তু ও দুর্নীতি সম্বন্ধে মন্তব্য করছেন, খরচ আর ঋণের হিসাব করে তার ফর্দ করছেন। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার এই পুরু, অস্বচ্ছ উপাদান তা সত্ত্বেও জ্বলে উঠছে এক উদ্দেশ্যপূর্ণতার অসাধারণবোধে, আপন বৃত্তি সম্বন্ধে এক সগর্ব বোধে, এবং একই সঙ্গে রয়েছে এক গভীর নম্রতা যা তাঁকে এক কর্মব্যস্ত জীবনকে স্বীকার করে নিতে বাধ্য করেছে, যার শুরু বেলজিয়ামের দরিদ্রতম খনিশ্রমিকদের মধ্যে এবং সমাপ্তি উন্মাদাশ্রমের রোগীদের মধ্যে, এবং এই কর্মব্যস্ত জীবনের সঙ্গে সেটি যে অসঙ্গতিপূর্ণ সেই সম্পর্কে তাঁর কোনো বোধও নেই। নিজের বৃত্তি এবং সঙ্গী মানুষদের প্রতি তাঁর মনোভাবটি ভাইকে লেখা তাঁর প্রথমদিকের একটি চিঠিতে সংক্ষেপে ফুটে উঠেছে :

"যথার্থই যা ভালোবাসার যোগ্য তাকে যদি কেউ আন্তরিকভাবে ভালোবেসে যায় এবং তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর ও অর্থহীন সামগ্রীতে তার ভালোবাসার অপচয় না ঘটায় তাহলে সে ক্রমেই আরো বেশি বেশি করে আলোর সন্ধান পাবে এবং উত্তরোত্তর দৃঢ়তর হয়ে উঠবে।"

কিন্তু নিজের বলে চিত্রাঙ্কনের যে বিশেষ বৃত্তিটির সন্ধান তিনি পেলেন সেটি সর্বদাই তাঁর কাছে সত্তার ও জীবনধারণের একটি পথ হিসাবে থেকে গেল। যত প্রবল অনুরাগই সেটির উপরে তাঁর থাকে এই বৃত্তিটি অন্যরকমও হতে পারত। পরহিতব্রতের কাজ, শিক্ষকতা, প্রেমে পড়া, দারিদ্র্য, পত্রলেখা, এগুলি সবই একই জিনিসের অংশবিশেষ, আর সেই জিনিসটি হল বেঁচে থাকার পথের সন্ধান। সাফল্যলাভ তাঁর হয় নি, কিন্তু তা সত্ত্বেও পারির কোনো স্টুডিওতে সমাপ্তি ঘটার

থেকে উন্মাদাশ্রমে তাঁর সমাপ্তি ঘটাই সম্ভবত বেশি ভালো হয়েছে। পথে ছেলেরা তাঁকে তাড়া করত। ফলে দিনদুপুরে বাইরে যাওয়ার সাহস তাঁর হত না, ভোর চারটের সময় বাড়ি থেকে তিনি বেরিয়ে পড়তেন : কিন্তু উন্মাদাশ্রমের চিকিৎসক ছবি আঁকানোর জন্য তাঁর সামনে বসেছেন এবং বড়ো চিত্রকর বলে তাঁকে যাঁরা চিনতে পেরেছিলেন ইনি ছিলেন তাঁদেরই একজন। আত্মহত্যা করার পর তাঁর পকেটে যে চিঠিটা পাওয়া গিয়েছিল তাতে তাঁর ভাই আর্ট ডিলার তেও-কে তিনি লিখছেন :

"ভালো, প্রকৃতপক্ষে, একমাত্র ছবির কথাই আমরা আলোচনা করতে পারি। কিন্তু তবু, প্রিয় ভাই আমার, যে কথা সব সময়েই তোমাকে আমি বলেছি এবং আমার পক্ষে যতটা গুরুত্ব দিয়ে বলা সম্ভব ততটা গুরুত্ব দিয়েই আবারও এই কথাই বলছি....আবারও তোমায় বলছি যে একজন সাদামাটা কোরো (Corot)-ব্যবসায়ীর থেকে বেশি কিছু বলে তোমাকে আমি সব সময়েই মনে করব, মনে করব যে আমার মধ্যবর্তিতার ভিতর দিয়ে কোনো কোনো ক্যানভাসের প্রকৃত সৃষ্টির মধ্যে তোমার নিজের ভূমিকা থেকে গেছে, যেগুলি চূড়ান্ত বিপর্যয়ের মধ্যেও তাদের প্রশান্তি বজায় রাখবে।"

অনুবাদ : রণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিয়োগান্ত ঘটনাটির রোগনির্ণয়

ডা. জোয়াকিম বেয়ার

অনেক মনোব্যাধি-চিকিৎসক (alienists) চেষ্টা করেছেন ভ্যান গঘের উন্মাদরোগের প্রকৃতি নির্ধারণ করতে। পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় পার হয়ে যাওয়ার ফলে এই ধরনের মনোরোগ আরোগ্য-বিষয়ক বিশ্লেষণ (psychiatric analysis) ক্রমেই আরও বেশি কঠিন হয়ে পড়েছে, বিশেষ করে শিল্পী যে-সব চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়েছিলেন তাঁদের সিদ্ধান্তমূলক পর্যবেক্ষণগুলির অভাবের কারণে। ভ্যান গঘের জীবৎকালে আর্ল হাসপাতালের ডাক্তার উরপার (Urpar) নির্ণয় করেছিলেন "তীব্র খেদোন্মত্ততা তার সঙ্গে সাধারণীকৃত প্রলাপ" ("acute mania with generalized delirium") ; স্যাঁ-রেমির উন্মাদাশ্রমের ডা. পেইর ও ডা. রেই উল্লেখ করেছেন "মৃগীরোগজাতীয় সংকট, তীব্র পশ্যেন্দ্রিয়গত ও শ্রবণেন্দ্রিয়গত অমূলপ্রত্যয়ের আক্রমণ ; ওভার-স্যুরোয়াজ-এর ডা. গাসে মনে করেছেন তার্পিণ তেলের বিষক্রিয়া এবং নর্ডিক মস্তিষ্কের উপর অতি প্রখর সূর্যালোকের প্রভাব।

গ্রে'র মরণোত্তর রোগনির্ণয় আরও একটি তত্ত্ব তুলে ধরেছে; সেটি হল এই যে দীর্ঘদিনব্যাপী সূর্যালোক-ঘটিত আঘাতের ফলে যুগপৎ জ্যান্থোপিয়া (এক ধরনের দৃষ্টিবিষয়ক ব্যাঘাত যাতে দৃষ্ট বস্তু হলুদ রঙের দেখায়) ও প্রলাপ দেখা দিতে পারে। ভিনসেন্টের অত্যুৎসাহী জীবনীকার গুস্তাভ ককিয়ো (Gustave Coquiot) যে-চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়েছেন তিনি সুনিশ্চিত যে ভ্যান গঘের সিফিলিস হয়েছিল—ব্যাপারটা কোনো সময়েই অবশ্য প্রমাণিত হয়নি—এবং তাঁর নিদান হল "ছদ্মরূপধারী এবং কিছুটা বৈশিষ্ট্যহীন অস্পষ্ট মেনিনগো-এনকেফ্যালাইটিস" ("diffuse meningo-encephalitis of a masked form and somewhat uncharacteristic") কিন্তু তা সাধারণ স্নায়ু-বৈকল্য (general paralysis) বলে প্রতীয়মান হত না যা কিনা মূলত ক্রমবর্ধমান ও সীমায়িত বৌদ্ধিকবৃত্তির বিলোপ (progressive and definitive dementia)। ভ্যান গঘের মধ্যে কোনো দিনই বৌদ্ধিক বৃত্তিবিলোপের লক্ষণ দেখা যায় নি।

গণিকাদের কাছ থেকে ভ্যান গঘের সিফিলিস রোগ সংক্রমিত হওয়ার ভিত্তিতে একটা স্নায়ুবৈকল্যমূলক প্রক্রিয়ার সিদ্ধান্ত করেছেন কার্ল জ্যাসপার্স, যদিও তিনি তা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করতে পারেন নি, জীবনের শেষদিকে ভ্যান গঘ নিজেই বলেছেন যে কখনো কখনো তাঁর হাত কাজ করতে চাইত না। জ্যাসপার্স স্কিৎসোফ্রেনিয়ার কথাও আলোচনা করেছেন : নিজের পরিবেশের সঙ্গে যোগসূত্র হারিয়ে ফেলার সূত্রপাত যা ১৮৮৭ সাল নাগাদ দেখা দিয়েছিল ; এই সময় নাগাদ তাঁর শিল্পশৈলীর পরিবর্তন তাঁর ব্যক্তিত্বের বিয়োজনের (dissociation of his personality) সাক্ষ্য দেয় ; তাঁর অসামাজিকতা এক ধরনের সাতিশয় আত্মকেন্দ্রিক ব্যবহার (autism) হয়ে ওঠে। যাবতীয় জার্মান মনোরোগবিদের মতোই জ্যাসপার্সের ধারণাগুলিতে ব্লয়েলারের (Bleuler) প্রামাণিকতার প্রাধান্য পেত। ভিনসেন্টের মধ্যে তিনি সহজেই ধরতে

পেরেছিলেন আবেগোদ্দীপকতার (আবেগগত সাড়া) হ্রাসপাপ্তি, বাস্তবের জায়গায় অলীককল্পনা বসানোর, এবং শেষোক্তটি থেকে পিছিয়ে এসে নিজের মধ্যে আশ্রয় নেওয়ার একটা প্রবণতা। ভিনসেন্ট ছিলেন কদাচিৎ সন্তুষ্ট, পারিবারিক পরিস্থিতির সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত, এবং ভীরু ও সাতিশয় অনুভূতিপরায়ণ মানুষদের আহত করে যে-সব মানুষের সংস্পর্শ সে-সব সংস্পর্শ থেকে পালিয়ে যেতেন, এবং আপন কল্পনার জগতে আশ্রয় নিতেন। কিন্তু উনি ভুলে গেছেন যে ভ্যান গঘের মধ্যে স্কিৎসোফ্রেনিয়ারোগীসুলভ ভাবনার অনুষঙ্গের ক্ষেত্রে ব্যাঘাত কখনও দেখা যায় নি, অথবা যাবতীয় বুদ্ধিবৃত্তির ক্রমবর্ধমান সংহতিচ্যুতি (disorganization) যা অবধারিতভাবে বুদ্ধিবৃত্তি বিলোপে পর্যবসিত হয় তাও কখনও দেখা যায় নি। শেষ অবধি তিনি ছিলেন স্বচ্ছ এবং সমন্বয়পূর্ণ, আনন্দে উদ্‌বেলিত হওয়ার কালে এবং দুঃখদুর্দশার দিনে লেখা তাঁর পত্রাবলীর মধ্যে তার যথেষ্ট প্রত্যয়জনক সাক্ষ্য রেখে গেছেন তিনি।

ওয়াল্টার রীজ (Riese) স্কিৎসোফ্রেনিয়া নিদানটি স্বীকার করেন না। ভ্যান গঘের মানসিক গঠনের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতার অভাব, অমিশুক প্রকৃতি, ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার অক্ষমতা প্রভৃতি—স্কিৎসোফ্রেনিয়ার উপাদানগুলি এমন যথেষ্ট পরিমাণে নেই যে তাঁকে পর্যায়ক্রমে উল্লসিত ও নিরানন্দ হয়ে পড়া একজন খেদোন্মত্ত (manic depressive) আবশ্যকীয়ভাবে যে-বিষাদবায়ু (melancholia) রোগ গড়ে তোলে তার থেকে বেশি রকমের কোনও স্কিৎসোফ্রনিয়া রোগী বলে গণ্য করা যেতে পারে।

ভেস্টারমান হোলস্টিইন (Westermann Holstijn) জ্যাসপার্সের তত্ত্বটি গ্রহণ করেছেন এবং একথাও তিনি মনে করেন যে কেবল জীবনের শেষ দিকেই নয়, মৃত্যুর দশ বছর আগেও ভিনসেন্টের মধ্যে ডেমেন্সিয়া প্রেকক্সের (অমূলপ্রত্যক্ষ শারীরিক অবস্থার অবনতি) অত্যন্ত সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখা যেত। এই মনোসমীক্ষণবিদের দৃষ্টিকোণ থেকে ভিনসেন্টের উন্মাদরোগের সমস্যাটিকে শিশুসুলভ যৌনতা এবং ওয়েদিপাস কমপ্লেক্সের সনাক্তকরণে পর্যবসিত করা হয়েছে। হলুদ রঙের প্রতি ভ্যান গঘের লক্ষণীয় পক্ষপাতকে তাঁর কামশক্তি (libido) প্রতীকায়িত করেছে। সূর্যের আলোর জন্য, এবং তাঁর দুরারোগ্য বিষাদবায়ুর ক্ষতিপূরণ করার পক্ষে উপযুক্ত আবেগের দিক থেকে উপবাসক্লিষ্ট ভিনসেন্ট যে-সূর্যের সন্ধান করতেন এই সূর্য তাঁর ভেঙে পড়া শরীরের মধ্যে প্রবেশ ক'রে তাঁর ছবিগুলির সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ত। তাঁর আবেগগত জীবন, তাঁর আকাঙ্ক্ষা, তাঁর যৌনতাকে অবদমিত করে রাখা রেখা ও রঙের তীব্রভাবে প্রগাঢ় করে তোলার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। প্রকৃতিকে ভিনসেন্ট মনুষ্যধর্মী সত্তায় রূপান্তরিত করেছেন, বিশ্বকে কামাভিষিক্ত করেছেন। তাঁর পীড়নমূলক প্রেমের অংশীদার হতে অক্ষম ছোট্ট উরসুলার সঙ্গে প্রেমে ব্যর্থতার পর ধর্মীয় অতীন্দ্রিয়তায় (mysticism) ঝাঁপ দেওয়ার ফলে তাঁর মধ্যে যে আত্মকামিতা (narcissism) দেখা দিয়েছিল তা তাঁর বাবার প্রতি ভালোবাসাকে আরও বাড়িয়ে দিল, বাবার সঙ্গেই তিনি যেন নিজেকে অভিন্নরূপে গণ্য করতে (identify) চাইতেন। তাঁরই মতো, ভিনসেন্ট চাইতেন ঈশ্বরের বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে, এবং ধর্মোপদেশ লিখতে শুরু করে দিলেন। এইভাবে শুরু হল তাঁর স্নায়ুরোগের, তাঁর কামশক্তির। এইসব মনঃসমীক্ষণমূলক ব্যাখ্যাগুলিকে সংক্ষিপ্ত করে আমরা শুধু সিদ্ধান্তগুলির উল্লেখ করছি :

"...প্রথমে ভিন্ন-কামাত্মক (hetero-erotic) এবং তারপর সম-কামাত্মক পাত্রান্তরের

(transfer) সম্ভাবনাবঞ্চিত হয়, তাঁর কামশক্তিকে অবরুদ্ধ করার পর মানসিক বিকৃতির দিকে তিনি মোড় ফিরেছিলেন।"

ভ্যান গঘ সংক্রান্ত চিকিৎসাবিষয়ক ঘটনাসন্নিবেশের (documentation) উৎসগুলিতে ফিরে গিয়ে ডা. এভারসেন বিশ্বাস করেন যে হল মদ বা সিফিলিসের দ্বারা কুপিত মৃগীরোগ, ডা. দোয়াতো (Doiteau) এবং ড. ল্যরয় ভ্যান গঘের অসুখটা মরেলের (Morel) প্রচ্ছন্ন মানসগত মৃগীরোগের (masked psychic epilepsy) শ্রেণীভুক্ত করেছেন, যাবতীয় ক্ল্যাসিক মৃগীরোগের আক্রমণের অনুপস্থিতির দ্বারা প্রকৃত মৃগীরোগসুলভ মানসিক বিকৃতি (epileplic psychoses) থেকে পার্থক্যসূচকভাবে বিশিষ্ট প্রায়-মৃগীরোগসুলভ মানসিক বিকৃতির (epileptoid psychoses) শ্রেণীভুক্ত করেছেন। মৃগীরোগ-সুলভ সংকটের মানসগত সমতুলগুলির দ্বারা এগুলি বিশিষ্টতাপ্রাপ্ত 'ও পলায়ন' O fugues (কোনো কোনো অভিজ্ঞতার ব্যাপার পূর্ণ বা আংশিক স্মৃতিভ্রংশতা), চেতনালোপ, ইচ্ছা-অনিচ্ছা ব্যতিরেকে ক্রমাগত ভ্রমণ (ambulatory automatism), বিভিন্ন ধরনের উত্তেজন (impulsions)—যা বিষণ্নতা, খেদোন্মত্ততা বা বিভ্রান্তিমূলক মৃগীরোগের আক্রমণকে তাদের প্রকৃত তাৎপর্য দান করে।

যাঁরা ভিনসেন্টের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট আক্ষেপধর্মী আক্রমণ না থাকলেও, অনেক বিশিষ্ট সমতুল লক্ষণসহ মৃগীরোগ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সেইসব মনোব্যাধি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের দলে থুরলের (জেনেভা থিসিস, ১৯২৭/ Thurler) নিজেকে জড়িত করেছেন। আবেগগত দিক থেকে অত্যধিক মাত্রায় মানসিক অস্থিরতা ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিরা যে-সব রোগীর মধ্যে প্রচণ্ড মানসগত ধাক্কা পাওয়ার পর মৃগীরোগের প্রক্রিয়া বা তার সমতুল প্রক্রিয়া দেখা দেয় তাদের মধ্যে এই যে আবেগোদ্দীপকগত মৃগীরোগ [ব্রাৎস ও ফর্ম (Bratz O form) যার বিশিষ্ট লক্ষণ হল অতিরঞ্জিত আবেগগত প্রতিক্রিয়া] দেখা যায় তার সাহায্যে ভিনসেন্টের অসুস্থতার নিদানতত্ত্বটি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। লেওঁ দোদের 'বংশগতি' এবং 'কল্পিত চিত্রের জগৎ' (déon Daudet's L'Hérédo and Monde des Images) গ্রন্থধৃত ধারণাগুলির অনুসরণে থুরলের মনে করেন যে "আমি"র ("myself") শেষবারের বিজয়ের কাছে যদি ভ্যান গঘ পরাস্ত না হতেন তাহলে নিজের কাজের সাহায্যে তিনি নিজের মধ্যকার যে-সব দানবরা তাঁকে উন্মাদ করে তুলত তাদের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারতেন। "আমি"র বিজয় হল শক্তিবিলয়নের প্রবণতা, যাকে বলা হয় আত্মহত্যা। ভ্যান গঘের চিত্রকর্ম হল প্রলাপ দ্বারা সূচিত "আমি"র প্রচণ্ড বহিঃপ্রকাশের (outbreaks) বিরুদ্ধে "তার" ("himself") আংশিক জয়লাভের প্রকাশ। তাঁর কোনো কোনো ছবিতে যে-বন্য দৃষ্টি দেখা যায় সেটা তাঁর পরিব্যাপ্ত বংশগতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের পথে ভিনসেন্টের যন্ত্রণাকেই প্রকাশ করে। বংশগতির বিরুদ্ধে এই সংগ্রামই নিজেকে হত্যা করার দ্বারা তিনি শেষ অবধি আত্মসমর্পণ করেন।

ভ্যান গঘ যেসব মানসিক ব্যাঘাতে ভুগতেন সেগুলি তাঁর শৈশবাবস্থা থেকে আত্মহত্যার দ্বারা মৃত্যু পর্যন্ত নিয়ত বৃদ্ধিলাভ করেছিল। আক্ষেপবিহীন মৃগীরোগ বলে রোগটিকে চিহ্নিত করা হয়েছে, কিন্তু এই রোগনির্ণয় পুরোপুরি সন্তোষজনক নয়, যেহেতু একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং অন্যান্য কতকগুলি লক্ষণাত্মক চিহ্ন-ও পাওয়া যায় নি, যথা স্মৃতিলোপ (amnesia) এবং সম্পূর্ণ চেতনালোপ। যাই হোক, একান্তরভাবে উল্লাস (elation) ও অবসাদ (depression), বিশেষত

মদের প্রভাবে, এবং সেই সঙ্গে চেষ্টীয় বিক্ষোপের আকস্মিক প্রবল আক্রমণের (paroxysms of motor agitation) যে-সব লক্ষণ ভিনসেন্টের মধ্যে আমরা লক্ষ্য করি তা থেকে এটাই সূচিত হয় যে রোগনির্ণয়টি খুব একটা ভুল নয়।

ক্যাটাটোনিয়ার (catatonia। ক্যাটালেপ্সিযুক্ত মানসিক অব্যবস্থা। ক্যাটালেপ্সি হল প্রাণচঞ্চলতাস্থগিত এবং ঐচ্ছিক অঙ্গসঞ্চালনক্ষমতালুপ্ত এক অবস্থা যখন রোগীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি যেভাবে রাখা যায় সেইভাবেই থাকে।—র.না.ব) [অক্রিয়তা অথবা অতিক্রিয়তার দ্বারা বিশিষ্টতাপ্রাপ্ত চাপের (tension) হ্রাস] পর্যায়সহ স্কিৎসোফ্রেনিয়ার নিদানটি সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করতে পারি। আচ্ছন্নাবস্থাপ্রাপ্তি (obnubilation) (মৃগীরোগের আক্রমণের আগে সচরাচর যে আচ্ছন্ন-ভাবযুক্ত মানসিক অবস্থা দেখা যায়), স্মৃতির ক্ষেত্রে ত্রুটি, –কিন্তু স্মৃতিলোপ নয়—এবং কান কেটে ফেলার মতো পাশবিক ও উদ্ভট প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত তথ্যের ভিত্তিতে ক্যাটাটোনিয়াকে পুরোপুরি বাদ দেওয়া সম্ভব। মানসিক বিক্ষেপের এইসব উদ্ভট কাহিনীগুলি ছাড়াও ক্যাটাটোনিয়ার সমর্থক আরও ঘটনা হল আবেগোদ্দীপকগত ব্যাঘ্যাতগুলি এবং ভিনসেন্টের শেষ পর্যায়ে আঁকা ছবিগুলির বিশিষ্ট নূতনত্বহীন পুনরাবৃত্তি (stereotypes) যা ক্যাটাটোনিয়া রোগীদের ধরনধারণের কথাই মনে করিয়ে দেয়।

যে মানসিক রূপটি আমাদের কাছে সব থেকে কম তর্কসাপেক্ষ বলে মনে হয় তা হল মানসগত ভারসাম্যহীনতা (psychic imbalance) [constitutional psychopathy বা ধাতুগত মানসব্যাধি], যার সমর্থনে কয়েকটি দিকে জোর দেওয়া যেতে পারে : বংশগতিক্রমে প্রাপ্ত উন্মাদরোগ, আচরণের সুস্থিরতার অভাব, অকার্যকরতা এবং একান্তরভাবে উত্তেজনা ও বিষণ্ণতার, যা কখনও খেদোন্মত্ততার মতো রূপ নেয়, কখনও মিশ্র রূপ নেয়—ক্রোধ খেদোন্মত্ততা—কখনও আক্রমণাত্মক ভাবের, হিংসাত্মক ভাবের ও আত্মঘাতী প্রচেষ্টার আকস্মিক প্রচণ্ড আক্রমণের রূপ নেয়।

ভ্যান গঘ ছিলেন এক ভারসাম্যহীন ব্যক্তি, তার সঙ্গে ছিল খেদোন্মত্ত প্রকৃতির প্রচণ্ড বিস্ফোরণ, বর্বর বহিঃপ্রকাশ, ক্রোধ খেদোন্মত্ততার সঙ্গে যার সাদৃশ্য [ক্রায়েপেলিনের (Kraepolin) মিশ্র রূপ]। বাবার দিকে তাঁর বংশগতি খুব সম্ভব ছিল মন্দ (বাবা মারা গিয়েছিলেন সন্ন্যাসজাতীয় আক্রমণে/স্ট্রোকে) ; বড়ো ভাই মৃতজাত, ছোটোভাই মারা যায় উন্মাদ হয়ে। মাতৃকুলে, তিনি নিজেই বলেছেন, একটা মৃগীরোগজাতীয় ছোঁয়া ছিল। বাল্যকাল থেকেই তিনি আত্মীয়দের মনোযোগ আকর্ষণ করতেন তাঁর খেয়ালিপনা দিয়ে, তাঁর একগুঁয়েমি দিয়ে, তাঁর ক্রোধের প্রচণ্ড ও আক্ষেপধর্মী আক্রমণের সাহায্যে।

তাঁর বয়ঃপ্রাপ্তি কালটি নানারকমের স্নায়ুরোগজাতীয় সমস্যার দ্বারা চিহ্নিত। এই পর্যায়ে তাঁর প্রথম মাথাধরা ও পাকস্থলীর বেদনা দেখা দেয় যা পরবর্তীকালে আর কোনোদিন তাঁকে ছেড়ে যায় নি। প্রেমের ব্যাপারে প্রথমবার ব্যর্থতার পর তাঁর আবেগগত জীবন ভিন্নমুখী হয়ে গিয়েছিল ; তাঁর মানসগত ও অতিরাগগত প্রবণতাগুলিতে ব্যাধিগ্রস্তের অতিরঞ্জন ঘটে; হতভাগ্য মানুষদের জন্য তাঁর সমবেদনার অনুভূতি বরিনাজে বসবাসের সময় এক অস্বাস্থ্যকর আত্মবঞ্চনায় পর্যবসিত হয়েছিল, বরিনাজে থাকতে ধর্মপ্রচারক হিসাবে অতীন্দ্রিয়বাদী বাড়াবাড়ি ও কৃচ্ছ্রসাধনমার্গী অভ্যাসের আশ্রয় নেন তিনি। তাঁর সুস্থিরতার অভাব, তাঁর ভ্রমণ বাতিক (ভ্রমণের অস্বাভাবিক

নোদনা) এই অল্পবয়সেই শুরু হয়। ষোল বছর বয়সে বাবার বাড়ি ত্যাগ করে চার বছর দি হেগে কাটান, দু' বছর লন্ডনে, পারিতে দশ মাস, লণ্ডনে আট মাস সহকারী যাজক হিসাবে, ডরড্রেন্টে তিন মাস একটা বইয়ের দোকানের কেরানি হিসাবে, চোদ্দ মাস আমস্টার্ডামে ঈশ্বরতত্ত্বের ছাত্র হিসাবে, চার মাস ব্রাসেলসে ধর্মপ্রচারকদের স্কুলে, বরিনাজে বাইশ মাস। তাঁর ভিতরে চিত্রাঙ্কন ক্ষমতার জন্ম হওয়ার পর ছ'মাস তিনি কাটান ব্রাসেলসে অঙ্কনবিদ্যা শিক্ষা করে, এত্তেনে (Etten) থাকেন আটমাস বাবার কাছে। বাইশ মাস দি হেগে, দু'মাস ড্রেন্থে ভ্রমণ করে, আবার দু'বছর ন্যুয়েনেনে দেশের বাড়িতে, তারপর তিন মাস আন্তোয়ার্পে, দু' বছর পারিতে, পনেরো মাস আর্লে, এক বছর স্যাঁ-রেমিতে আটক অবস্থায়, এবং শেষ অবধি ওভারে দু'মাস থাকার পর আত্মহত্যা করেন সেই শহরেই।

এক জটিল ব্যক্তিত্ব, বিপরীতধর্মী এবং অসম দোষে গুণে গড়া মানুষ, কল্পনাশক্তি, উদ্ভাবনক্ষমতা ও প্রতিভার লক্ষণযুক্ত মানুষটির মধ্যে মানসগত উপাদানের অভাব অথবা আধিক্যের উপস্থিতি পাওয়া যায়। জীবনের ক্রিয়াগুলিতে মানসিক ধারাবাহিকতা ও একীভূত গতিমুখের অভাব দেখা যায়, আপন স্বার্থের সন্ধান করা এবং উদ্যোগে সাফল্যলাভের ব্যাপারে তিনি অক্ষম ছিলেন। তাঁর জীবনের যারা অংশীদার ছিলেন তাঁদের পক্ষে তাঁর ত্রুটিগুলি, তাঁর অযোগ্যতাগুলি বড়ো বেশি রকমের হয়ে পড়ত। কিন্তু প্রতিভাহীন ভারসাম্যবিহীন ব্যক্তিদের থেকে তিনি ভিন্ন ধরনের ছিলেন, তাঁদের আপাতদৃষ্টিতে সম্পদের প্রাচুর্যের সঙ্গে আনুপাতিক ফলাফল কখনই দেখা যেত না। তাঁর ভিতরে সেই জিনিসটি ছিল, সেটা যাই হোক না কেন, যেটা উজ্জ্বল কিন্তু বন্ধ্যা ভারসাম্যবিহীন ব্যক্তির থেকে ভারসাম্যবিহীন প্রতিভাবানকে স্বতন্ত্র করে দেখায়। যাবতীয় নিয়মানুবর্তিতার ব্যাপারে বিদ্রোহী, সুস্থির কাজের পক্ষে অক্ষম, সমালোচনা সহ্য করতে অপারগ, উপদেশ দিলে বিরক্ত, গালিগালাজের তোড়ে সবকিছু পরিত্যাগ করতে তিনি পারদর্শী ছিলেন। গোগ্যাঁর সঙ্গে আলোচনা করতেন "স্নায়ুকে কীভাবে চাপযুক্ত করা যায়, এমন কি যাতে যাবতীয় প্রাণধর্মী উত্তাপটুকুও শেষ হয়ে যায়"; দুজনে তর্ক করতেন যতক্ষণ পর্যন্ত না "অতিরিক্ত উত্তেজনার ফলে তাঁরা একেবারে অবসন্ন হয়ে পড়তেন"।

তাঁর মানসিক সুস্থিরতার (stability) অভাব দেখা যায় তাঁর উৎকেন্দ্রিকতার মধ্যে : রঙ খেয়ে ফেলতেন, গোগ্যাঁ এবং ডা. গাসেকে (Gachet) ভয় দেখাতেন, রাত্রে বাইরে বেরিয়ে পড়তেন টুপির উপর গোল করে মোমবাতি বসিয়ে তার আলোয় ছবি আঁকবেন বলে ; আত্ম অঙ্গছেদনের অভিপ্রায়ে তাড়িত হয়ে একটা কানের লতি কেটে ফেলেছিলেন ; তাঁর নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ কাজের ফলে লোকে ভাবত লোকটা পাগল, রাস্তার চ্যাংড়া ছোকরারা তাঁর পিছু ধাওয়া করত ; তাঁর গোটা পারিপার্শ্বিক তাঁকে আরও বেশি বেশি করে উত্যক্ত করত। "এইসব নানা ধরনের নররাক্ষসদের" (anthropophagi) হাত এড়ানোর জন্য তিনি নিজেই চেয়েছিলেন স্যাঁ-রেমিতে তাকে আটকে রাখা হোক। প্রায়ই অস্থিরসংকল্প এবং সহজেই অপরের দ্বারা প্রভাবিত, বিশেষত পুস্তকপাঠের ফলে, তাঁর যাজক হাওয়া, খনিশ্রমিকদের জীবনের অংশীদার হওয়া, এক গণিকার সঙ্গে সংসার পাতার সিদ্ধান্তগুলির অধিকাংশই এলোমেলো এবং পরিচালনাহীন পাঠের দ্বারা অনুপ্রাণিত। তাঁর আবেগতাড়িত ভঙ্গীগুলি থেকে চিন্তন এবং ইচ্ছাশক্তি অপেক্ষা স্বতঃস্ফূর্ততারই একধরনের প্রাধান্য প্রকাশ পায়। এক ধরনের সুস্থিরতার অভাব, একান্তরভাবে উত্তেজনা ও বিষাদ,

বিশেষত অ্যালকোহল, তামাক ও কফির প্রভাবে, অঙ্গসঞ্চালন শক্তি আলোড়নের প্রচণ্ড আকস্মিক আক্রমণ, (ক্রোধে) সহিংসভাবে আত্মহারা হওয়া, তুচ্ছ কারণে কথার ছলে মর্যাদাহানিসূচক অপবাদের, যেমন মুখমণ্ডলের সুষমতাহীনতা এবং ঘাড়ের পেশীর লক্ষণীয় বিকৃতির সামান্যতম উল্লেখেই হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়া দিয়েই ভ্যান গঘের ধাতুগত মানসিকব্যাধির লক্ষণাত্মক চিত্রটি সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে। উত্তেজনা, বিকারগ্রস্ত ও শান্ত অবস্থার অধ্যায়ের অধীন ভ্যান গঘ ছিলেন মাগনান (Magnan) টাইপের অধঃপতিত সত্তা। ক্রায়েপেলিন ও ব্লয়েলার -অনুসারী জার্মনা-সুইস মনোরোগবিদ্‌রা একে বলবেন স্কিৎসোফ্রেনিয়া যে যথাযথ অর্থে মিস্কৌস্কি (Minkowski) তাঁর 'স্কিৎসোফ্রেনিয়া ও মানসিক ব্যাধির ধারণা' (Schizophrenie et Notion de Maladie Mentale) গ্রন্থে রোগটির সংজ্ঞা দিয়েছেন।

একথা বলা যায় না যে উন্মাদরোগ প্রতিভার জন্ম দেয়। যাই হোক, কোনো কোনো পরিস্থিতিতে মানসিক ব্যাঘাত অনুষঙ্গ-প্রতিভাস (association phenomenon) জাগিয়ে তুলতে পারে যার ফলে শিল্পধর্মী উৎপাদনের ক্ষেত্রে অতি সৌভাগ্যজনক ফলাফল দেখা দেয়। ভ্যান গঘের ক্ষেত্রে একথা বলা যাবে না যে তাঁর শৈল্পিক ক্রিয়াকর্ম সেই মানসিক ব্যাঘাতেরই ফল যার পরিণতিতে উন্মাদ আশ্রমে তাঁকে আবদ্ধ থাকতে হয়েছিল এবং তাঁর দুঃখজনক পরিণতিটি ঘটেছিল।

ভ্যান গঘের অসুস্থতার রোগনির্ণয় নিয়ে যে-সব অসংখ্য লেখক পর্যালোচনা করেছেন এবং যাঁরা প্রায়শই আরোগ্যশালার (clinical) সাক্ষ্যের থেকে তত্ত্বগত পূর্বচিন্তিত ধারণাকেই অনুসরণ করেছেন তাঁদের রোগ নির্ণয়ে নানা মতভেদ দেখা যায়। এটা অসম্ভব নয় যে ভ্যান গঘের এপিলেপটিক বা এপিলেপটয়েড অবস্থা দেখা দেয় নি, কিন্তু স্কিৎসোফ্রেনিয়ার শ্রেণীবিভাজন প্রসঙ্গটি অসঙ্গতভাবে না বাড়িয়ে আমরা ঝুঁকি নিয়ে এই মতামত পেশ করতে পারি যে এই প্রতিভাবান চিত্রকর ধাতুগত মানসিকব্যাধিতে ভুগতেন এবং সারাজীবন ধরে তাঁর মধ্যে এই রোগের আক্রমণ ক্রমেই ভীষণতর হয়ে উঠেছিল। ভিনসেন্টের ভাইয়ের ক্ষেত্রে যে অস্বাস্থ্যকর (morbid) বংশগতি প্রকাশ পেয়েছিল তা থেকে এই তত্ত্বের সমর্থন মেলে যে আলোচ্য চিত্রকরের অসুস্থতা স্কিৎসোফ্রেনিয়ার মতো কোনো অর্জিত অসুখ ছিল না, তবে তা ছিল একটা অধঃপতনমূলক ব্যাধি।

অনুবাদ : রণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

চূড়ান্ত বিপর্যয়ের মধ্যেও প্রশান্ত

ডবলু এচ অডেন

শিল্প হিসাবে পত্ররচনার ক্ষেত্রে যাঁরা মহৎ শিল্পী তাঁরা খুব সম্ভবত নিজেদের অন্তরতম চিন্তা ও অনুভূতিকে প্রকাশ করার থেকে তাঁদের বন্ধুদের আনন্দদান করার ব্যাপারটিতেই অধিকতর আগ্রহী ; তাঁদের পত্ররচনা-শৈলীর বৈশিষ্ট্য হল গতিবেগ, সুউচ্চ মনোভাব, বাগ্‌বৈদগ্ধ্য ও আজগুবি কল্পনা। ভ্যান গঘের চিঠিগুলি এই অর্থে শিল্প নয়; সেগুলি হল মানবিক দলিল ; যে-কারণে সেগুলি মহান পত্রাবলী হয়ে উঠেছে তা, হল লেখকের পরিপূর্ণ আত্ম-সততা ও মহত্ত্ব।

শিল্পী বীর, উনিশ শতক এই কল্পকথাটি সৃষ্টি করেছে; অর্থাৎ শিল্পী হলেন সেই মানুষ যিনি তাঁর শিল্পের জন্য নিজের স্বাস্থ্য ও সুখকে জলাঞ্জলি দিয়েছেন এবং তার ক্ষতিপূরণ হিসাবে যাবতীয় সামাজিক দায়দায়িত্ব ও আচরণের প্রচলিত বিধি থেকে অব্যাহতি দাবি করেন।

প্রথম নজরে মনে হবে ভ্যান গঘ বুঝি এই কল্পকথার সঙ্গে খাপে খাপে মিলে যান। ভবঘুরের মতো তিনি পোশাক পরেন এবং জীবনযাপন করেন। আশা করেন অন্যে তাঁর সংসারযাত্রা নির্বাহ করার ভার গ্রহণ করবেন, নিজের ছবি আঁকার কাজ তিনি দানবের মতো করে চলেন, উন্মাদ হয়ে যান। তবু যতই তাঁর এই চিঠিগুলি পড়া যায় ততই এই কল্পকথার সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য কমতে থাকে।

তিনি যে দুরারোগ্য স্নায়ুরোগী সেকথা তিনি জানেন কিন্তু সেটাকে তিনি অন্যের থেকে শ্রেষ্ঠত্বের লক্ষণ বলে মনে করেন না, বরং হৃদ্‌রোগের মতো একটা ব্যাধি হিসাবেই সেটাকে দেখেন, এবং আশা করেন ভবিষ্যতের মহান চিত্রকররা প্রাচীন কালের মহৎ শিল্পীদের মতোই স্বাস্থ্যবান হবেন।

"কিন্তু এই যে আগামী দিনের শিল্পী—আমি তো ভাবতে পারি না তিনি ছোটো ছোটো কফিখানায় জীবনযাপন করছেন, একগাদা বাঁধানো দাঁত পরে কাজ করে চলেছেন, আর জুয়াভ পদাতিক বাহিনীর সেনাদের জন্য নির্দিষ্ট গণিকালয়ে যাচ্ছেন, আমি যেরকম যাই।" যে যুগে তিনি বাস করছেন সেটিকে আকাঙ্ক্ষাপূরণের থেকে বরং উত্তরণের যুগ বলেই তিনি মনে করেন এবং নিজের অর্জিত কৃতিত্বের ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত নম্র।

"জিয়োত্তো ও চিমাবাবুর মতো হলবাইন ও ভান ডাইক-ও স্থাপত্যের মতো গঠনযুক্ত এক ক্রমসূক্ষ্মকৃত স্মৃতিফলকের মতো নিরেট চৌহদ্দিতে আঁটা সমাজে বাস করতেন যে সমাজে প্রতিটি ব্যক্তিই এক একটি প্রস্তরখণ্ড এবং সমস্ত প্রস্তরখণ্ডগুলিই পরস্পরকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থেকে এক স্মৃতিস্তম্ভধর্মী সমাজ গড়ে তোলে।... কিন্তু আপনি তো জানেন, আমরা পুরোপুরি যার যেমন খুশি চলুক বা 'লেসে-আলে' ব্যবস্থা ও নৈরাজ্যের মধ্যে রয়েছি। আমরা শিল্পীরা নিয়মশৃঙ্খলা ও প্রতিসাম্য যারা ভালোবাসি নিজেদের আমরা বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে *কেবলমাত্র একটি* জিনিসেরই সংজ্ঞা দেওয়ার জন্য কাজ করে চলেছি... বিশৃঙ্খলার একটি ক্ষুদ্র কণা, একটি ঘোড়া, একটি

মুখচ্ছবি, আপনার ঠাকুমা, আপেল, কি একটা প্রাকৃতিক দৃশ্য আমরা চিত্রিত করতে পারি।...আমরা যে মরতে বসেছি তা আমরা অনুভব করি না, কিন্তু এই সত্যটি আমরা অনুভব করি যে আমরা হিসাবের মধ্যে না পড়ার মতোই নগণ্য, আর শিল্পীদের মালার মধ্যে যোগসূত্র হওয়ার জন্য স্বাস্থ্যের দিক থেকে, স্বাধীনতার দিক থেকে একটা কঠিন মূল্য আমরা দিচ্ছি, ছ্যাকরা গাড়ির ঘোড়া যেমন বসন্ত দিনের আনন্দ দিনের আনন্দ উপভোগের জন্য বেরিয়ে পড়া এক গাড়ি বোঝাই মানুষকে টেনে নিয়ে যায় তার থেকে বেশি এ-সবের কোনোকিছুই আমরা ভোগ করি না।"

শুধু তাই নয়, ছবি আঁকা যে তাঁর পেশা এই বিশ্বাস থেকে যদিও কখনই তিনি নড়েন না এই দাবিও তিনি করেন না সে চিত্রকররা অন্যান্য মানুষের থেকে বড়ো।

"রিশপ্যাঁ (Richepin) কোথায় যেন বলেছিলেন 'শিল্পের প্রতি ভালোবাসা সত্যের প্রতি ভালোবাসাকে কমিয়ে দেয়।' আমার মনে হয় একথা সাংঘাতিকভাবে সত্য, কিন্তু অন্য দিকে প্রকৃত প্রেম মানুষকে শিল্পের প্রতি বিরক্ত করে তোলে...

"ছবি আঁকা সম্বন্ধে যেরকম প্রায় কুসংস্কারগ্রস্ত একটা ধারণা এখানকার মানুষদের আছে সেটা আমাকে কখনও কখনও এত বেশি নিরুদ্যম করে দেয় যে আপনাকে আমি তা বলে বোঝাতে পারব না, কারণ মূলত একথা প্রকৃতই মোটামুটি সত্য যে মানুষ হিসাবে একজন চিত্রকর চোখ দিয়ে সে যা দেখে তাতেই বড়ো বেশি নিবিষ্টচিত্ত, এবং তার জীবনের বাকি ব্যাপার সম্পর্কে যথেষ্ট মাত্রায় কর্তৃত্ব তার নেই।"

একথা সত্য যে ভ্যান গঘ তাঁর জীবিকা অর্জন করতেন না, বরং তাঁর ভাই, কোনো মতেই যাঁকে ধনী বলা চলে না, তিনিই সারাজীবন তাঁর ভরণপোষণ চালিয়েছেন। কিন্তু ধরুন ভাগনার বা বদলেয়ারের মতো অন্য কোনো ব্যক্তির অর্থের প্রতি মনোভাবের সঙ্গে তাঁর মতামতটির তুলনা করলেই ভ্যান গঘের মনোভাব যে তুলনায় কি রকম অপরিমেয়ভাবে বেশি সুমার্জিত ও আত্মসম্ভ্রমপূর্ণ ছিল তা দেখা যাবে।

কোনো শিল্পী কোনো দিন তাঁর পৃষ্ঠপোষকের কাছে এত কম কখনও চান নি—মজুরের মতো জীবনযাত্রা নির্বাহের মান এবং তার থেকে রঙ ও ক্যানভাস কেনার মতো উদ্‌বৃত্ত কিছু হলেই যথেষ্ট, এমন কি রঙ কেনার অধিকারও তাঁর আছে কি না তাই নিয়ে তিনি দুশ্চিন্তা করেন এবং ভেবে পান না রেখাচিত্রণের অপেক্ষাকৃত সস্তা মাধ্যমটাই আঁকড়ে থাকাটাই তাঁর পক্ষে উচিত কি না। মাঝে মধ্যে ভাইয়ের উপর যখন তাঁর রাগ হয় তখন যে তিনি তেও কৃপণ বলে অনুযোগ করেন তা নয়, তেও নিরুত্তাপ বলেই তাঁর অনুযোগ, আরও বেশি ঘনিষ্ঠতাই তাঁর বাঞ্ছনীয়, আরও বেশি টাকা নয়।

"আমার চেহারা, চালচলন, পোশাক, সংসর্গের বিরুদ্ধে অন্য অনেকের মতো তুমিও মনে হয় ভাবছ নানা আপত্তি তোলা দরকার—যথেষ্ট গুরুতর সব আপত্তি অথচ একই সঙ্গে স্পষ্টতই যেসবের কোনো প্রতিকার নেই—ভাবছ যে এগুলো আমাদের ভাই-ভাইয়ের ব্যক্তিগত মেলামেশাটা শুকিয়ে গিয়ে কয়েক বছরের অবকাশে ধীরে ধীরে সরে যাওয়ার কারণ হয়ে উঠেছে।

"এটা তোমার চরিত্রের অন্ধকার দিক—আমার মনে হয় এই ব্যাপারে তুমি সংকীর্ণমনা—তবে আলোর দিকটা হল অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে তোমার নির্ভরযোগ্যতা।

"অতএব সিদ্ধান্ত—তোমার কাছে আমি যে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ এই কথাটা অত্যন্ত আনন্দের

সঙ্গে আমি স্বীকার করি। কেবলমাত্র—তোমার সঙ্গে, টেরস্টেগের সঙ্গে, আগে যাদের যাদের আমি চিনতাম তাদের সকলের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকায়—অন্য কিছু আমি চাই—...

"এমন অনেক লোক আছে, তুমি জান, যারা শিল্পী যতদিন পর্যন্ত কিছু উপার্জন করে উঠতে পারেনি সেই সময়টাতে তাদের ভরণপোষণ করে থাকে। কিন্তু কতবারই না দেখা যায় যে সেটা দু পক্ষের কাছেই দুঃখজনকভাবে, দুর্ভাগ্যজনকভাবে শেষ হয়, অংশত তার কারণ প্রতিপালক তার অর্থের ব্যাপারে বিরক্ত হয়, যেটা জলে গেছে বা অন্তত সেই ধরনেরই বলে মনে হয়, আবার অন্য দিকে, চিত্রকর মনে করে যে তার উপরে যতটা আস্থা, ধৈর্য ও আগ্রহ রাখা হয়েছে তার থেকে আরও বেশিতে তার অধিকার আছে। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ভুল বোঝাবুঝিগুলো দেখা দেয় দু তরফেই সজাগতার অভাবের জন্য।"

কম চিত্রকরই বই পড়েন এবং আরও কম চিত্রকরই তাঁরা কিসের সন্ধান করছেন তা কথায় প্রকাশ করতে পারেন। ভ্যান গঘ এক উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম : তিনি প্রচুর পড়তেন এবং বোধশক্তি প্রয়োগ করে পড়তেন, নিজস্ব সাহিত্যিক গুণ তাঁর যথেষ্ট পরিমাণে ছিল এবং তিনি কি করছেন এবং কেন করছেন সেই বিষয়ে কথাবার্তা বলতে ভালোবাসতেন। চিত্রবিদ্যার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হলে 'সাহিত্যধর্মী' শব্দটির অর্থে আমি যদি অপকর্ষসূচক বিশেষণ হিসাবে দেখি তাহলে বলব যে যাঁরা এই শব্দটি ব্যবহার করেন তাঁরা এই কথাটিকেই জোর দিয়ে বলতে চাইছেন যে চিত্রের জগৎ আর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রকৃতির জগৎ এ-দুটি পুরোপুরি সুনির্দিষ্টভাবে পৃথক। অতএব একটিকে অন্যটির সাপেক্ষে বিচার করা চলবে না। কোনো একটি ছবি কোনো প্রাকৃতিক বস্তুর (object) 'সদৃশ' কি না—'ফটোগ্রাফধর্মী' বা প্লাতনীয় অর্থে 'যথার্থ' (real) সাদৃশ্য বোঝানো হচ্ছে কি না তাতে কোনো পার্থক্য ঘটে না—বা চিত্রের জন্য কোনো 'বিষয়বস্তু' (subject) অন্য কোনো বিষয়বস্তুর থেকে মানবিক দিক থেকে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ এই প্রশ্ন তোলা অপ্রাসঙ্গিক। চিত্রকর তাঁর নিজস্ব চিত্রধর্মী জগৎ সৃষ্টি করে নেন এবং একটি চিত্রের মূল্য অন্যান্য চিত্রের সঙ্গে তুলনার সাহায্যেই মাত্র নিরূপণ করা যায়। সমালোচকরা বাস্তবিকই যদি সেই কথাই বোঝাতে চেয়ে থাকেন তাহলে ভ্যান গঘকে অবশ্যই সাহিত্যধর্মী চিত্রকর হিসাবে বর্গীভূত করতে হবে। মিইয়ের (Millet) মতো, যাঁকে তিনি নিজের গুরু হিসাবে সারা জীবন স্বীকার করবেন, এবং ফ্লবেয়ার, গঁকুর ভায়েরা, জোলা প্রমুখ নিজের সমসাময়িক কোনো কোনো ফরাসী ঔপন্যাসিকের মতো তিনিও বিশ্বাস করতেন যে গরীব মানুষদের জীবনই হল তাঁর কালে শিল্পের পক্ষে যথার্থ মানবিক বিষয়বস্তু। আর এই জন্যই শিল্পশিক্ষায়তনগুলির সঙ্গে তাঁর বিবাদ।

"যতদূর জানি এমন কোনো আকাদেমি নেই যেখানে কোনো খনক, বীজবপনকারী, উনানে কেৎলি বসাচ্ছে এমন রমণী বা সীবনকারিণীকে রেখাঙ্কিত বা চিত্রিত করা কেউ শিখতে পারে। কিন্তু মোটামুটিভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যেক শহরেই একটা আকাদেমি আছে যেখানে ঐতিহাসিক, আরবদেশীয়, পঞ্চদশ লুইয়ের আমলের, সংক্ষেপে বলতে গেলে, যাবতীয় যথার্থভাবে অস্তিত্বহীন মূর্তির নানা মডেল...আকাদেমির যাবতীয় মনুষ্যমূর্তিই (figure) একইভাবে এক জায়গায় জড়ো করে রাখা হয়, যাকে আমরা বলতে পারি *এর থেকে ভালো করে আর কিছু হয় না*। অনিন্দ্যনীয়, ত্রুটিহীন। কোন সিদ্ধান্তে আমি আসতে চাইছি আপনি আন্দাজ করতে পারবেন, ওগুলো নতুন কিছুই উদ্‌ঘাটিত করে না। আমি মনে করি, একটা মূর্তি যত সঠিকভাবেই আকাদেমি-পন্থী হোক

না কেন, অ্যাঁগ্র্-এর সৃষ্টি হলেও, সেটা হবে বাহুল্যমাত্র যদি তার মধ্যে মূলত আধুনিক যে সুরটি সেটি না থাকে, সেটি হল ঘনিষ্ঠ চরিত্র, যথার্থ ক্রিয়া (action)। আপনি হয়তো জানতে চাইবেন : কোন মূর্তি কখন বাহুল্যমাত্র হবে না?...খনক যখন মাটি খোঁড়ে, কৃষক যখন কৃষক হয়, কৃষক রমণী যখন কৃষক রমণী হয়...আমি আপনাকে প্রশ্ন করি, পুরানো ডাচপন্থীদের রচনায় আপনি কি একজনও খনক, একজনও বীজবপনকারী দেখেছেন? তাঁরা কি কখনও একজন মজুরকে আঁকবার চেষ্টা করেছেন? ভেলাসকেথ কি তাঁর জলতোলা 'ভারী' বা সাধারণ মানুষের টাইপগুলি আঁকার সময় সেই চেষ্টা করেছেন? না। পুরানো বড়ো শিল্পীদের ছবিতে যেসব মনুষ্যমূর্তি আছে তারা *কাজ করে না*।"

আদর্শগতভাবে সুন্দরের থেকে স্বভাবত যথার্থের প্রতি এই একই নৈতিক দিক থেকে অধিকতর বাঞ্ছনীয়তার জন্যই *আন্তোয়ার্পের* এক শিল্পবিদ্যালয়ে অল্প কিছুদিন থাকার সময় তাঁকে যখন *ভিনাস দ্য মিলোর* একটি ছাঁচে তৈরি মূর্তি নকল করতে বলা হয়েছিল তখন সেই মূর্তিটিতে তিনি নানা পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন আব স্তম্ভিত অধ্যাপকমশাইকে দাবড়িয়ে বলেছিলেন : "অর্থাৎ, যুবতী নারী কিরকম দেখতে আপনি তা জানেন না, ঈশ্বর আপনাকে যেন নরকে পাঠান। নারীর কাঁকাল, পাছা আর বস্তিদেশ থাকতেই হবে যার মাঝখানে সে সন্তানকে ধারণ করতে পারে।"

তাঁর সমকালীন ফরাসী চিত্রকররা বিশ্বাস করতেন যে শিল্পীকে তার নিজের ভাবাবেগগুলি দমন করতে হবে, আর চিকিৎসকের নিস্পৃহতা দিয়ে তার কাজের সামগ্রীকে দেখতে হবে। তিনি কোনো দিনই তাঁদের এই বিশ্বাসের অংশীদার ছিলেন না, আর এইখানেই তাঁদের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য। বরং বিপরীত। তিনি লিখছেন : "মনুষ্যমূর্তি যিনিই আঁকতে চাইবেন প্রথমেই তাঁর সেই জিনিসটি থাকা চাই যেটি *পাঞ্চ* পত্রিকার বড়োদিন সংখ্যার উপরে মুদ্রিত থাকে : 'সকলের প্রতি শুভেচ্ছা' —আর সেটা বেশি মাত্রাতেই থাকতে হবে। মনের মধ্যে মানুষের প্রতি উষ্ণ সহানুভূতি থাকা চাই আর সেটা বজায় রাখতে হবে, তা নাহলে ছবিগুলো নিরুত্তাপ ও বিস্বাদই থেকে যাবে। আমাদের নিজেদের দিকে নজর রাখাটা খুবই দরকারী বলে আমি মনে করি আর লক্ষ রাখতে হবে যাতে এই ব্যাপারে আমরা নিস্পৃহ হয়ে না পড়ি।"

আর মারা যাওয়ার মাত্র দু মাস আগে লেখা এই মন্তব্যটিই বা যে কোনো 'বিশুদ্ধ' শিল্পের তত্ত্বের কতই না বিরোধী!

"জমকালো প্রদর্শনী করার থেকে জনসাধারণকে উদ্দেশ করে কাজ করাটাই বেশি ভালো যাতে করে প্রত্যেক লোকেই তার বাড়িতে কিছু ছবি বা তার নকল রাখতে পারে যেগুলো হবে শিক্ষার সামগ্রী, মিইয়ের কাজের মতন।"

এখানে ওঁর কথাগুলি তলস্তয়ের মতো লাগছে, ঠিক যেমন তাঁর কথাগুলি দস্তয়েভস্কির মতো শোনায় যখন তিনি বলেন : "...যখনই আমরা অবর্ণনীয় ও অনুচ্চারণীয় পরিত্যক্ততার —নিঃসঙ্গতা, দারিদ্র্য ও দুর্দশার প্রতিচ্ছবি দেখি, সব জিনিসের পরিসমাপ্তি ও চরম পরিণতি দেখি, তখন ঈশ্বর চিন্তা আমাদের মনে আসে। এই ব্যাপারটি সর্বদা আমার মনে লেগেছে এবং খুব অদ্ভুত মনে হয়েছে।"

ভ্যান গঘ গরীবদের কথা যখন বলেন বাস্তবিকই তাঁর কথাগুলি তখন তলস্তয় বা

দস্তয়েভস্কির থেকেও বেশি সততাপূর্ণ ও স্বাভাবিক বলে মনে হয়। দেহধারী ও বুদ্ধিবাদী মানুষ হিসাবে তলস্তয় ছিলেন রাজা, উঁচু স্তরের মানুষ ; তার উপর তিনি ছিলেন কাউন্ট, সামাজিক দিক থেকে উঁচু স্তরের মানুষ। যত চেষ্টাই করুন না কেন একজন কৃষককে তিনি নিজের সমান বলে চিন্তা করতে পারতেন না ; কেবল অংশত নিজের নৈতিক ঘাটতিগুলির জন্য অপরাধবোধের ফলে তাকে তিনি নিজের থেকে উঁচু স্তরের বলে প্রশংসা করতে পারতেন। দস্তয়েভস্কি সম্ভ্রান্ত গোষ্ঠীর মানুষ ছিলেন না, আর দেখতেও তিনি কুশ্রী ছিলেন, তবে নিছক গরীব মানুষদের থেকে অপরাধী গরীবদের প্রতিই ছিল তাঁর সহানুভূতি। কিন্তু ভ্যান গঘ গরীবদের জীবন এবং সঙ্গ বেশি পছন্দ করতেন, তত্ত্বের দিক থেকে নয়, বাস্তব ঘটনার দিক থেকে। তলস্তয় এবং দস্তয়েভস্কি, লেখক হিসাবে, তাঁদের জীবদ্দশাতেই শিক্ষিত মানুষের মন জয় করতে সফল হয়েছিলেন; কৃষকরা তাঁদের মানুষ হিসেবে কী মনে করত তা আমরা জানি না। ভ্যান গঘ তাঁর জীবদ্দশায় শিল্পী হিসাবে স্বীকৃতিলাভ করেন নি; অন্য দিকে, বরিনাজের কয়লাখনি শ্রমিকদের উপর তাঁর ব্যক্তিগত ছাপ কি পড়েছিল তার নথি পাওয়া যায়।

"মারকাস খনিতে দুর্ঘটনার পর যে খনিশ্রমিকটিকে তিনি দেখতে যেতেন তার কথা লোকে এখনও বলাবলি করে। আমাকে যারা এই কাহিনী শুনিয়েছিল তাদের মতে লোকটি ছিল পাঁড় মাতাল, 'ঈশ্বরে অবিশ্বাসী ও ঈশ্বরবিদ্বেষী'। ভিনসেন্ট যখন তাকে সাহায্য করতে ও সান্ত্বনা দিতে তার বাড়িতে ঢোকেন তখন তাঁকে প্রচণ্ড গালিগালাজ করে অভ্যর্থনা জানানো হয়। বিশেষ করে তাঁকে বলা হয় 'মাশো দ্য কাপলো' বা 'মালা জপা' পুরুত, যেন উনি একজন রোমান ক্যাথলিক পাদ্রী। কিন্তু ভ্যান গঘের সাধুসন্তসুলভ কোমলতা মানুষটির হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটায়'... 'তিরাজ ও সরে'র বা যুদ্ধে যাওয়ার জন্য লটারি করে নাম বাছাই হচ্ছিল। সেইসময় এই পবিত্র মানুষটির কাছে মেয়েরা এসে কিভাবে কাকুতিমিনতি করত 'পবিত্র ধর্মগ্রন্থ' থেকে কয়েক ছত্র বাণী তাদের দেখিয়ে দেওয়ার জন্য যাতে তাদের ছেলেদের পক্ষে সেটা রক্ষাকবচের মতো কাজ করতে পারে এবং তারা যাতে ভালো কোনো সংখ্যাযুক্ত কার্ড টানে, আর ব্যারাকে গিয়ে কাজ করার হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার ব্যাপারটা তাতে সুনিশ্চিত হয়।... ধর্মঘট হল, বিদ্রোহী খনিশ্রমিকরা 'ল্য পাস্তোর ভিনসেন্ট' ছাড়া অন্য কারও মুখ থেকে কোনো কথা আর শুনবে না, তাঁকেই ওরা বিশ্বাস করত।"

মানুষ এবং চিত্রকর দুই হিসাবেই অনুভূতির দিক থেকে ভ্যান গঘ প্রচণ্ডভাবে খ্রীস্টান ছিলেন। যদিও মত বিশ্বাসের দিক থেকে কিছুটা প্রচলিত মতবিরোধী ছিলেন। তিনি ঘোষণা করেছিলেন, "আত্মসমর্পণ করা একমাত্র তাদের পক্ষেই সম্ভব যারা আত্মসমর্পণ করতে পারে, আর ধর্মবিশ্বাসও তাদেরই জন্য যারা বিশ্বাস করতে পারে। বন্ধুগণ, আসুন যা আমরা ভালোবাসি সেটাই ভালোবাসা যাক। যে জিনিসকে কোনো মানুষ ভালোবাসে সেই জিনিসটিকে ভালোবাসতেই যদি সেই মানুষ অস্বীকার করে তাহলে নিজেকেই সে জাহান্নামে পাঠায়।" চিত্রকর হিসাবে সব থেকে ভালো যে আখ্যাটি দিয়ে তাঁকে চিহ্নিত করা যায় সম্ভবত তা হল *ধার্মিক বাস্তববাদী*। বাস্তববাদী এই জন্য যে প্রকৃতিকে অবিরাম পর্যালোচনার ব্যাপারটিতে তিনি পরম গুরুত্ব দিতেন এবং কখনও 'মস্তিষ্ক থেকে' তাঁর ছবির বিন্যাস রচনা করতেন না, আর ধার্মিক এই কারণে যে প্রকৃতিকে তিনি আধ্যাত্মিক মহিমার শাস্ত্রানুসারী সংস্কারগত দৃশ্যমান প্রতীক হিসাবে দেখতেন, যেটিকে অন্যের

কাছে উদ্‌ঘাটিত করাই ছিল চিত্রকর হিসাবে তাঁর লক্ষ্য। তিনি একবার বলেছিলেন, "দিব্যচ্ছটা যে চিরন্তনকে প্রতীকায়িত করত এবং আমাদের বর্ণলেপনের প্রকৃত দীপ্তি ও কম্পন দিয়ে যেটাকে আমরা বোঝাতে চেষ্টা করি সেই চিরন্তনের কিছুটা দিয়ে পুরুষ ও নারীকে আমি আঁকতে চাই।" আমি যত দূর জানি তিনিই হলেন প্রথম চিত্রকর যিনি সচেতনভাবে এমন এক চিত্র সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেছেন যা ধর্মাত্মক হবে অথচ কোনো ঐতিহ্যগত ধর্মীয় মূর্তিশিল্পের শাস্ত্রকথাও তাতে থাকবে না, এমন একটা জিনিস যাকে 'চোখ দিয়ে দেখার রূপকাহিনী' বলা যেতে পারে।

"এই মুহূর্তে আমার সামনে রয়েছে এমন একটা ক্যানভাসের বর্ণনা আমি দিচ্ছি। যে উন্মাদাশ্রমে আমি রয়েছি সেখানকার পার্কের একটি দৃশ্য ; ডানদিকে একটা ধূসর চাতাল, আর একটা বাড়ির পাশের দিকের দেয়াল। ফুল-ঝরে-যাওয়া কয়েকটা গোলাপের ঝাড়, বাঁ দিকে পার্কের খানিকটা চলে এসেছে—গেরিমাটি—রোদে ঝলসে যাওয়া মাটি, পাইনগাছের ঝরা পাতায় ঢেকে গেছে। পার্কের এই কিনারাটাতে বড়ো বড়ো পাইন গাছ লাগানো হয়েছে, তাদের গুঁড়ি আর শাখাপ্রশাখাগুলো গেরিমাটি রঙের, পাতার রঙ সবুজ, তাতে কালোর মিশেল থাকায় আঁধার ঘনিয়ে এসেছে। সন্ধ্যার আকাশে হলুদের পটভূমিতে বেগুনি ডোরা, উপরের দিকে তা নীলাভ লাল হয়ে সবুজ রঙের হয়ে গেছে। এই আকাশের পশ্চাৎপটে এইসব উঁচু গাছগুলো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। একটা দেওয়াল—সেটাও গেরিমাটি রঙের—দৃষ্টিকে বাধা দিচ্ছে আর তার উপর দিয়ে কেবল একটা বেগুনি ও হলদে গেরিমাটি রঙের পাহাড় দেখা যাচ্ছে। এখন হয়েছে কি সব থেকে কাছের গাছটা একটা প্রকাণ্ড গুঁড়ি, বাজ পড়ার ফলে ডালগুলো কেটে ফেলা হয়েছে করাত দিয়ে। কিন্তু পাশের দিকের একটা শাখা খুব উঁচুর দিকে উঠে গেছে, আর তা থেকে গাঢ় সবুজ রঙের পাইন পাতা পড়ছে ঝর ঝর করে। এই বিষাদমলিন দৈত্যটা—পরাজিত দর্পিত মানুষের মতো—জীবন্ত প্রাণীর প্রকৃতির দিক থেকে বিবেচনা করলে, তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ক্রমবিলীয়মান গোলাপঝাড়ের গায়ে একটি শেষ-ফোটা গোলাপের ম্লান হাসির সঙ্গে বৈপরীত্য গড়ে তুলেছে। গাছগুলোর নীচে পাথরের শূন্য বেঞ্চি কয়েকটা, ম্রিয়মাণ বক্স গাছের সারি; বৃষ্টির জল জমেছে এক জায়গায়—তাতে হলুদ রঙের প্রতিফলন পড়েছে আকাশের। রোদের একটি রশ্মিরেখা, দিনের আলোর শেষ কিরণ বিষাদমলিন গেরিমাটি রঙকে প্রায় কমলা রঙের করে তুলেছে। এখানে ওখানে গাছের গুঁড়িগুলোর ফাঁকে ফাঁকে ছোটো ছোটো কালো মূর্তি ঘোরাফেরা করছে।

"আপনি উপলব্ধি করতে পারবেন যে এই গেরিমাটি, ধূসর রঙে আঁধার-হয়ে-ওঠা সবুজ, প্রান্তরেখাকে ঘিরে এই কালো ডোরাগুলো মিলে এক ধরনের মানসিক যন্ত্রণার অনুভূতি গড়ে তোলে যাকে বলে 'লাল-কালো', আমারই মতো দুর্দশায় পড়া আমার কোনো কোনো সঙ্গী প্রায়ই যে যন্ত্রণা ভোগ করে থাকেন। তাছাড়া বাজপড়া বিশাল গাছের গুঁড়ি প্রধান চিত্রোপাদান বা মোটিফটি, হেমন্তের শেষ কুসুমটির রুগ্ন সবুজ-নীলাভ লালে মেশা হাসিটি, সব কিছু মনের উপর এই ছাপটিকে দৃঢ় করে তুলতে সাহায্য করে।

"(এই ক্যানভাসটি সম্বন্ধে) এই কথা আপনাকে বলছি এই কথাটিই আপনাকে মনে করিয়ে দিতে যে ঐতিহাসিক গেথসিমানির উদ্যানটির দিকে সরাসরি লক্ষ্য সন্ধান না করেও মানসিক যন্ত্রণার ছাপ তুলে ধরার চেষ্টা কেউ করতে পারেন।"

স্পষ্টতই, ভ্যান গঘ যা করার চেষ্টা করেছেন তা হল ঐতিহাসিক মূর্তিশিল্পশাস্ত্রের জায়গায় বর্ণ ও রূপের সম্পর্কবিষয়ক অন্য একটি মূর্তিশিল্পশাস্ত্র তিনি বসাতে চাইছেন যেটিকে স্বীকৃতি দেওয়ার আগে সেটি শিক্ষা করতে হবে। আর এই শিল্পশাস্ত্রটি ইন্দ্রিয়ের কাছে তৎক্ষণাৎ নিজেকে উদ্‌ঘাটিত করতে এবং সেই কারণে তার অপব্যাখ্যা করাও সম্ভব হবে না। এই ধরনের মূর্তিশিল্পশাস্ত্রের সম্ভাবনা নির্ভর করছে বর্ণ ও রূপের সম্পর্কগুলি এবং মানুষের মনের উপর তাদের অভিঘাতটি বিশ্বজনীন নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় কি হয় না তার উপর। ভ্যান গঘ নিশ্চয়ই বিশ্বাস করতেন যে সেগুলি নিয়ন্ত্রিত হয় এবং পর্যালোচনার দ্বারা যে কোনো চিত্রকরই এই নিয়মগুলি আবিষ্কার করতে পারবেন।

"বর্ণের নিয়মগুলো অবর্ণনীয়ভাবে সুন্দর, আর সেটা এই কারণেই যে সেগুলো আপতিক নয়। আজকাল মানুষ যেমন এক জিনিস থেকে আর এক জিনিসে খামখেয়ালিভাবে ও স্বেচ্ছাচারীভাবে উড়ে বেড়ানো ধরনের কোনো ঈশ্বরে আর বিশ্বাস করে না, বরং প্রকৃতিকে বিশ্বাস করার উপর তার শ্রদ্ধা ও প্রশংসা আরও বাড়ছে—ঠিক সেই একইভাবে এবং একই কারণের জন্য, আমার মনে হয় যে সহজাত প্রতিভা, অনুপ্রেরণা ইত্যাদি সাবেকী ধরনের ধারণাকেও আমি বলছি না পাশে সরিয়ে রাখতে হবে, তবে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নতুন করে বিচার করে দেখতে হবে, যাচাই করে দেখতে হবে—এবং বহুল পরিমাণে তার পরিবর্তন ঘটাতে হবে।"

অন্য একটি চিঠিতে ভবিতব্য বা ফেটালিটিকে ঈশ্বরের অপর একটি নাম হিসাবে তিনি দেখেছেন, এবং এই প্রতিরূপের সাহায্যে ঈশ্বরের সংজ্ঞা দিয়েছেন—"যিনি হলেন সাদা আলোর রশ্মি, ঈশ্বর তিনি যাঁর চোখে এমনকি কালো আলোরও কোনো আপাত যুক্তিযুক্ত অর্থ নেই।"

ভ্যান গঘ তাঁর জীবনে মজা খুব কমই পেয়েছিলেন, কোনো দিন তিনি ভালো খাদ্য, গৌরব বা স্ত্রীলোকের প্রেম পাওয়ার মতো তৃপ্তি পান নি; এবং আবর্জনার পাত্রেই তাঁর পরিসমাপ্তি ঘটেছে; কিন্তু তাঁর চিঠিপত্রগুলি পড়ার পর তাঁকে রোম্যান্টিক অভিশপ্ত শিল্পী (artistic maudit) বা এমন কি ট্র্যাজেডির নায়ক বলে মনে করা অসম্ভব; সব কিছু সত্ত্বেও, শেষ ছাপ যেটা তিনি মনের উপর রেখে যান তা হল বিজয়ের। তেও-র কাছে লেখা তাঁর শেষ চিঠিটিতে, মৃত্যুর পর সেটি তাঁর মৃতদেহের উপরেই পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল, সকৃতজ্ঞ তৃপ্তির সঙ্গেই তিনি যা বলছেন তার মধ্যে অহমিকার এতটুকু চিহ্ন নেই : "আমি আবারও তোমায় বলছি যে একজন সাদামাটা কোরো (Corots)-ব্যবসায়ীর থেকে বেশি কিছু বলে তোমাকে আমি সব সময়েই মনে করব, মনে করব যে আমার মধ্যস্থতার ভিতর দিয়ে কোনো কোনো ক্যানভাসের প্রকৃত সৃষ্টির মধ্যে তোমার নিজের ভূমিকা থেকে গেছে, যেগুলো চূড়ান্ত বিপর্যয়ের মধ্যেও তাদের প্রশান্তি বজায় রাখবে।"

কোনো শিল্পকর্মকে যখন আমরা মহৎ বলি তখন যে কথাটা বলতে চাই সেটা নিশ্চয়ই চিঠিটির শেষাংশের সম্বন্ধসূচক বাক্যাংশটির থেকে আরও বেশি ভালো করে কোনো দিন বোঝানো যায় নি।

অনুবাদ : রণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পাখি নদীর পাড়ে যে নক্ষত্রযাত্রার শুরু

এ এম হামাচার

ফ্রান্সের রাজধানী পারি। একশ কিলোমিটার বায়ুকোণে বহতা এক নদী নাম যার পাখি স্থানীয় মানুষের মুখে। তীরে তার ওভার গ্রাম। মৃত্যুঞ্জয়ী ভ্যান গঘ যাঁদের পরিচিত তাঁদের শ্রবণে নামটি সেই চিত্রশিল্পীর করুণ অকালমৃত্যুর স্মৃতিবহ। মাত্র দুমাসের কিছু বেশি সময় ১৮৯০এর ২১ মে থেকে ২৯ জুলাই এই গ্রামেই এই শিল্পী তাঁর জীবনের শেষ অধ্যায়টুকু কাটিয়েছিলেন।

ভ্যান গঘের চিত্রচর্চা জীবনের সেই পর্যায়ে এই নদীতটবাসী জীবনের সঙ্গে সম্ভবত একমাত্র তুলনীয় বছর দশক আগে বেলজিয়ামের অঙ্গারভূমি বোরিনাজ অঞ্চলে শ্রমজীবী মানুষের জীবনের সুখদুঃখের সাথী হয়ে শিল্পীর সঞ্চিত অভিজ্ঞতা। নিরন্তর স্নায়বিক চাপ। দুঃসহ দ্বন্দ্বে দোলায়িত, অনুভূতিপ্লাবিত ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ অস্তিত্বের অভিঘাতে এক গভীর আধির আবির্ভাব তাঁর মানসে সেই পর্যায়ে লক্ষ করা গেছে। চরম নিঃসঙ্গতা ও প্রচণ্ড সৃজনীশক্তির যৌথ তাড়না একদিকে, অন্যদিকে অন্যতম সুহৃদ ভাই তেও-র সঙ্গে যোগসূত্রটিও সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন। অস্তিত্ব কি আরও গাঢ়তর অন্ধকারে লীন হওয়া সম্ভব, নাকি সেই ক্ষীণ ম্লানিমা থেকেও আরোগ্য সম্ভব এই প্রশ্ন সেদিন দেখা দিয়েছিল তাঁর মনে; আর ঠিক সেই মুহূর্তেই সত্তার গভীরে চকিত বিদ্যুল্লতার মতো উদ্ভাসিত হয়ে উঠল আপনার কাছে আপন প্রকৃত বৃত্তির স্বরূপ। এই জাগরণ, আপনার গভীরে শিল্পীসুলভ সৃজনীক্ষমতার অস্তিত্ব সম্বন্ধে এই সজাগতায় অদম্যের আবির্ভাবে ভাস্বর হয়ে উঠল সেই মুহূর্তটি। পরবর্তীকালে তাঁর এই অফুরান সৃজনীক্ষমতায় যে ভাঁটার টান দেখা গিয়েছিল তার সঙ্গে অন্য এক নতুনতর নিঃসঙ্গতা সংশ্লিষ্ট, যদিও আপন অন্তর্লোকে নিজের শক্তির বিপন্নতা সম্বন্ধে শিল্পী ইতোমধ্যেই অবহিত হয়েছেন। শিল্পী নিরন্তর দুই নির্ধারক মেরুর অন্তর্বর্তীকালীন সংঘাতের শিকার।

চিত্রাঙ্কনকেই বৃত্তি হিসাবে নির্বাচন করার শুরু থেকেই তাঁর রচনাকর্ম কোনো অল্পবয়স্ক যুবকোচিত নয়। বরং তা যেন ছিল এক প্রৌঢ় পূর্বসংকল্পিত কোনো রচনা। ভ্যান গঘের মনে কোনো দ্বিধা ছিল না এই বিষয়ে যেহেতু বৌদ্ধিক ও ব্যক্তিক দিক থেকে পরিচালিত হত তাঁর রচনাকর্ম। রচনাকর্মে পরিপক্ক আত্মবিশ্বাসজনিত এই ক্ষমতা সেই সময়েই তাঁর মধ্যে জন্ম নিয়েছে যদিও ব্যবহারিক দিক থেকে তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল অল্প। যে অবসন্ন চেতনার পরিচয় উনিশ শতকের উপান্তবর্তী প্রজন্মের রচনায় বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ভ্যান গঘের রচনার মধ্যে কিন্তু তার সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। যে তেজ ও সংবেদনশীলতা তাতে বর্তমান তা মূলত এক পুরাতন গ্রামীণ সংস্কৃতির, নারীপ্রাধান্য সমন্বিত এক গার্হস্থ্য জীবনযাত্রার সামগ্রী। নারীর গৃহকর্ম, নারী নিয়ন্ত্রিত সংসারযাত্রা কেন্দ্র করে আছে তৃণাচ্ছাদিত কুটীরের উষ্ণ অগ্নিসেবস্থলীকে। ফসলের খেতে শ্রমজীবী সাধারণের মধ্যেও সেই নারীরই প্রাধান্য, অন্তত ইউরোপের নিম্নভূমি নামে খ্যাত দেশটির ব্রাবান্ট অঞ্চলে। শিল্পচর্চার এই অধ্যায়ে 'আলুভোজী'

নামে সুপরিচিত সেই প্রখ্যাত ছবিটির কম্পোজিশনের মধ্যে তিনটি নারীমূর্তির সাহায্যে ত্রিভুজসৃষ্টি সমালোচক রসবেত্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এদের মধ্যে কনিষ্ঠটি চিত্রের সম্মুখভূমিতে এবং প্রায় মধ্যস্থলে অবস্থিত। বোরিনাজ, দি হেগ বা ব্রাবান্ট। যাবতীয় অধ্যায়েই তাঁর চিত্রের কেন্দ্রস্থলটি নারীমূর্তি অধিকার করে আছে।

সমাজে নারীর অবস্থান ও মূল্য এবং সংসারযাত্রায় মাতৃতান্ত্রিক উপাদানের ওপর ফরাসী ইতিহাসবিদ জুল মিশলের (Jule Michelet) গভীর বিশ্বাস। ভ্যান গঘ নিষ্ঠার সঙ্গে মিশলের রচনা পড়তেন। তাঁর মধ্যেও একই পক্ষপাত, যদিও একথাও ঠিক যে তাঁর আপাতবিড়ম্বিত জীবনে যথার্থ বাউণ্ডুলে প্রকৃতির লক্ষণ ফলত অনুপস্থিত। চিত্রচর্চার এই পর্যায়ে গ্রামীণ সমাজের কঠোর শ্রমজীবী জীবনের সান্দ্র উপস্থিতির সহচর মিইয়ে ও জোলার সৃষ্টিকর্মের প্রতি ভ্যান গঘের প্রগাঢ় অনুরাগ দেখা দেয়। ফলে আকাদেমীয় শ্রদ্ধাপন্থী সুহৃৎ ভান রাপার্ডের সঙ্গে তীব্র মতপার্থক্য ঘটে, অথচ কেবল সুশৃঙ্খল ব্যক্তিগত জীবনেরই নয়, শিল্পগত ও সামাজিক ক্ষেত্রেও অনুরূপ সুশৃঙ্খল ভবিষ্যৎ সংগঠন গড়ে তোলার স্বপ্নও তিনি দেখতেন। সমকালীনতায় শৃঙ্খলা ও অপ্রাপনীয় সুসঙ্গতির প্রেমিক হিসাবেই শিল্পীকে তিনি দেখতেন। মতবিশ্বাসের দিক থেকে নয়, আপন ইচ্ছার বিরুদ্ধেই ভ্যান গঘ হয়ে উঠেছিলেন এক অন্ত্যজ শিল্পী।

ডাচ অধ্যায়ের উপান্তে দুটি স্ববিরোধী প্রবণতা তাঁর মধ্যে দেখা যায়, নিজের শিল্পকর্মে যার মীমাংসা চিরদিনই তাঁর কাছে সোনার রঙের দিগন্তরেখা থেকে গেছে, দক্ষিণাঞ্চলের নীলিমার নীচে যার পুনরাবির্ভাব ভিন্নতর এক রূপের আধারে। যে ডাচ গার্হস্থ্য জীবনযাত্রার শিল্পিত প্রতিফলনের মধ্যে তাঁর চিত্রচর্চার সূত্রপাত সামগ্রিক বিচারে তা ছিল ইম্প্রেশনিস্ট চিন্তাধারায় পুষ্ট এবং তৎকালীন উদারপন্থী বুর্জোয়া ভাবজগতের সম্পৃক্ত—ঘনিষ্ঠ সংযত ও সংবেদনশীল সেই প্রতিবেশ। নিজের মনের মধ্যে বুর্জোয়াপ্রীতি তাঁর ছিল না, তবু প্রিয় শিল্পী ছিলেন শাদ্র্যা (Chadrin)। ফলে এই আঠারো শতকীধারার শিল্প ভ্যান গঘের দৃষ্টিতে যতদূর জনকেন্দ্রিক ও সহজ গ্রামজীবনভিত্তিক রূপলাভ করেছে তা প্রশংসার বিষয়। কিন্তু বর্ণের মাধ্যমে স্বকীয় সত্তাকে প্রকাশের প্রয়োজন এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপন্থী। দ্যলাক্রোয়ার অনুসরণে আকাররেখা বা কণ্টুর পরিত্যাগ করার দিকেই ভ্যান গঘের আকর্ষণ। 'আলুভোজী' ছবিটি এই আপোষেরই এক ভাবদ্যোতনাব্যঞ্জক রূপায়ণ। ফর্ম ভাঙার কোল ঘেঁসা ও মুখ্যত বর্ণভিত্তিক ভাবদ্যোতনাব্যঞ্জক বাস্তবধর্মিতা এই দুই লক্ষণের সঙ্গম ঘটেছে দ্য গ্রুখের (De Groux) শৈলী অনুসারী গৃহাভ্যন্তরের মোটিফ বা চিত্র উপাদানের এক প্রায় আদিম পশুসুলভ অস্তিত্বের চিত্রায়ণে। দি হেগ পরম্পরার কোমলতা এখানে অনুপস্থিত।

ব্রাবান্ট পর্যায়ের প্রতিতুলনায় আন্তোয়ার্প এবং তার পরে পারিতে বসবাসকালে তাঁর চিত্রকর্মে যৌবন ও উজ্জ্বলতার আধিক্য দেখা দিয়েছে। প্রকরণে ঘটেছে গ্রাফিক ও চিত্রধর্মিতার মিলন. শৈলীতে কর্মিষ্ঠতা দেখা দিয়েছে, সেই সঙ্গে আশুবিচলতার বৃদ্ধি এবং ভার হ্রাসের লক্ষণ। পারি পর্যায়ে বিস্তার ঘটেছে তাঁর চিত্রকর্মে বিভিন্ন উৎস থেকে আহরণের কিন্তু স্বকীয়তা রক্ষা করার ব্যাপারে তিনি সচেতন। একক প্রসঙ্গে অটলতা শিথিল হয়েছে। বিপরীত শক্তির সংঘাতে যে বিততি (tenseness) ও আয়াসসাধ্যতা ব্রাবান্ট পর্যায়ে দেখা গিয়েছিল পারিতে তা অনুপস্থিত। বস্তুত বিদ্রোহী প্রতীতি কমেছে; না হয়তো খুবই গৌণ হয়ে পড়েছে।

এখানে প্রশ্ন ওঠা সম্ভব যে মিদি অঞ্চলে বসবাসের আবশ্যিকতা তাহলে কোথায়? অবাচী ভূচিত্রে কিসের সন্ধানে ফিরেছেন শিল্পী, অন্তর্লীন কোন সে প্রত্যাশার তাড়নায়? তেওর দৃষ্টিতে আর্লে-অধ্যায় নিছক এক অস্থির প্রব্রজন মাত্র। দুই আশুক্রোধী মানুষের একত্র বাসের উপকারিতা ও স্থায়িত্ব কদাচিৎ দেখা যায়। একদিকে শারীরিক ও স্নায়বিক শক্তিহ্রাসের আতঙ্ক, অন্যদিকে বিপুলা রাজধানী নগরীর নিত্যসংসর্গ পীড়াদায়ক। দেহে-মনে সূর্য-সন্নিকর্ষের স্বল্পতাও যে জাপানী চিত্রকলার উজ্জ্বল বর্ণসম্ভারের প্রতি প্রবল আকর্ষণের অন্যতম কারণ তা অস্বীকার করা যায় না যদিও সে যুগে জাপানী ও চীনা মৃৎশিল্প ও চিত্রকলার প্রতি ইউরোপে একটা আকর্ষণের প্লাবনও দেখা গিয়েছিল। ব্রাবান্টে যে বর্ণসান্দ্রতা ছিল পরীক্ষা নিরীক্ষার সামগ্রীমাত্র পারি তাতে কেবল সাদা ছায়াহীন বর্ণস্বল্পতা সঞ্চারে সক্ষম। বর্ণসান্দ্রতার বাঞ্ছিত সুব্যবস্থার সন্ধান এই রাজধানী শহরে পাওয়া সম্ভব নয়। তাই অবাচীর নীলিম আহ্বানে দূর দেশে যাত্রা। ক্ষোদন ও চিত্রণধর্মী উপাদানের মিলন ঘটাতে পারিতে বসবাস করার সময় তাঁর আয়ত্তে আসে আর্লে বাসকালে তাতে শীঘ্রই বিচ্ছেদ ঘটে, তবে স্বতন্ত্রভাবে দুটি ক্ষেত্রেই উন্নতি ঘটতে দেখা যায় সেই অধ্যায়ে। অথচ ব্রাবান্ট বা পারিতে বিপরীতমুখী প্রবণতার যে সংশ্লেষণ ব্যর্থতার ভারে ক্লিষ্ট ছিল আর্লেতে গোগ্যাঁর আগমনের আগেই তা তিনি আয়ত্ত করেছেন। বর্ণের গম্ভীর ভাবদ্যোতনা বর্ণভেদের দিকে তাঁকে নিয়ে যায়। পারিতে সে পথ তিনি ত্যাগ করেছিলেন, বর্ণপাত্রে লঘুত্ব ছিল। আর্লের মফঃস্বল শহরে যে গ্রামীণ পরিবেশের সাক্ষাৎ পেলেন তাতে অতীতের অভিজ্ঞতার সৌরভ, রুল্যাঁ (Roulin) পরিবারের সান্নিধ্যে তা পুষ্টিলাভ করে। মাতৃতান্ত্রিক সমাজবিন্যাসে গ্রামীণ সংসারযাত্রার প্রতি পুরাতন শ্রদ্ধাপ্লুত দৃষ্টির পুনরাবির্ভাব ঘটল। স্বল্পকালীন হলেও রূপ ও পরিপ্রেক্ষিতের উপর উন্নততর দখল দেখা দিল। নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে স্থানিক দৃষ্টি সংগঠিত করার ক্ষেত্রে অতীতে স্থায়ী বাধা হিসাবে কাজ করেছিল তাঁর উত্তেজনাপ্রবণ মেজাজ ও ভাবদ্যোতনাব্যঞ্জক বর্ণবোধ। দি হেগের প্রতিবেশে একসময় তা পরিপুষ্ট হয়েছিল। ফলে সেই অধ্যায়ে পরিপ্রেক্ষিতে ভাবদ্যোতনা সঞ্চারের উদ্দেশ্যে নিজেই একটি চৌহদ্দিকাঠামো উদ্ভাবন করেছিলেন ভ্যান গঘ। আর্লেতে থাকার সময় ভাবদ্যোতনাধর্মিতা আপন অন্বিষ্ট ধ্রুববিন্দুটির সন্ধান লাভ করার ফলে এই স্ব-উদ্ভাসিত চৌহদ্দিকাঠামোটিও তিনি সানন্দে বর্জন করেন। হৃষ্ট চিত্তে শিল্পী এখন আত্মআশ্বাস ও ভারসাম্যলাভের ক্ষেত্রে নিজের অগ্রগতি লক্ষ করতে থাকেন।

যথার্থভাবে না হলেও অন্তত আপাতদৃষ্টিতে ভ্যান গঘকে এই সময় কিছুদিনের জন্যে ধ্রুপদীপন্থার চর্চায় ব্যাপৃত হতে দেখা যায়, কারণ যে সহজ প্রকৃতিগত বস্তুধর্মিতা পর্যবেক্ষিত বস্তুটি থেকে শিল্পীকে বিযুক্ত রাখে ভ্যান গঘের প্রকৃতির মধ্যেই তা ছিল না। ধ্রুপদী শিল্পী তাঁর পর্যবেক্ষিত ও পরিমিত সামগ্রীকে সুশৃঙ্খলভাবে বিন্যস্ত করেন। এবং বিষয় ও বিষয়ী যে দুটি ভিন্ন সামগ্রী পর্যাপ্ত যৌক্তিকতার সঙ্গে তা নির্ধারণ করেন। বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যে ভ্যান গঘ কিন্তু কোনো রকম পার্থক্য টানেন না। বর্ণব্যবহারের যাত্রা তীব্র, আভ্যন্তরীণ আততির ফলে রেখা অতিভারে আক্রান্ত; ফলে যাবতীয় দূরত্বের বিলোপ ঘটে। আর্লেতে পঁ দ্য লাংলোয়া কেবল যে দৃষ্টিগোচর তাই নয়। তিনি নিজেই যেন সেই ক্ষুদ্র সেতুটি, পশ্চাৎপটের নীলাকাশ ও নীচের জলরাশিও তদনুরূপ। উত্তরের ব্রাবান্ট অঞ্চলে প্রতিদিন অনেকদূর অবধি পায়ে হেঁটে বেড়াতেন তিনি। সেই সময় দীর্ঘদিন ধরে একটি সেতুর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। তারই সাক্ষ্য হিসাবে

স্মৃতিপটে যেন কোনো এক সেতুর উজ্জ্বল উপস্থিতি। ব্যবধানের যোজক সেই সেতু ভ্যান গঘ স্বয়ং, যদিও শিল্পী নিজেই গভীর বিচ্ছিন্নতাবোধে আচ্ছন্ন তবু গ্রাম ও শহরের সংযুক্তিস্থাপনের স্বপ্ন দেখেন তিনি। ধরিত্রীর সঙ্গে ক্ষেত্রলোকের সেতুবন্ধনের স্বপ্ন দেখেন কিন্তু তা যে একমাত্র মৃত্যুর মধ্য দিয়েই লভ্য। দূরদেশে ভ্রমণ, অবিরাম পদযাত্রা, সেতু অতিক্রম এ সবই গভীর অর্থবহ চিহ্ন।

আর্লেতে বারসোজ (Berceuse) বা হিন্দোলা মোটিফের মধ্যে মাতৃত্বের শান্ত চিত্রকল্পের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। সংবৃত এই চিত্রউপাদানটির দ্বিস্তর প্রয়োগ, উত্তরাঙ্গের সঙ্গে নিম্নাঙ্গের সুস্পষ্টভাবে বৈশিষ্ট্যসূচক পার্থক্য প্রকাশ পেয়েছে তার মধ্যে। কন্টুরের সঙ্গে অনির্দিষ্টকৃত বর্ণময় অংশের পারস্পরিক সংঘাত ঘটেছে। ক্ষুদ্র সেতুটি অপরপক্ষে বিবৃত চিত্রউপাদান, পুরুষাঙ্গ তাতে প্রতীকায়িত, পুরুষালি তার ধরনধারণ; অগ্নিসেবনস্থলী, প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাবিন্যাস, অভ্যস্ত কর্ম, গার্হস্থ্য জীবনযাত্রা, সংক্ষেপে বলতে গেলে 'সুশৃঙ্খলা ও সুসামঞ্জস্য' সেখানে পরিত্যক্ত, অথচ এইসব সামগ্রী ভ্যান গঘের নিতান্ত কাঙ্ক্ষিত। ধ্রুপদী চিত্র থেকে এই প্রত্যয় বহু দূরের সামগ্রী। এই অতিরাগদীপ্ত সহভাগিতা মুখ্যত যুক্তিনির্ভর নয়। পর্যবেক্ষিত জগতের এই প্রত্যয়টি আর্লে অধ্যায়ে নিতান্তই জটিল, জাপানী চিত্রকলার উল্লসিত বিজয় আরব্ধ, যদিও উদীচী ভূদৃশ্যের সাবেকী মোটিফ—যেমন সেতু, লা ক্রাউ সমতটের প্রান্তরভূমি, উইলো গাছের ঝোপ, নিম্নভূমি অঞ্চলের স্মৃতিবাহী যাবতীয় সামগ্রী শিল্পীর স্মরণে তখনও অম্লান।

বিষয়ীধর্মিতায় পরিব্যাপ্তি এই বাস্তবধর্মিতা কি উনিশ শতকী ইউরোপীয় শিল্পে নতুন কোনো ব্যাপার এ প্রশ্ন সঙ্গত ভাবেই উঠতে পারে। কেউ কেউ এই প্রশ্ন তুলে বলেছেন তাই মনে হবে। তা না হলে হলুদ ও নীলরঙের আঁকা পঁ দ্য লাংলোয়া একই কালগণ্ডিতে অন্য কোনো ছবিকে কেন নিজের সমকক্ষ করতে পারল না? বর্ণভঙ্গ কখনই এর বৈশিষ্ট্য নয়; বরং বিপরীতপক্ষে, এর স্পর্শে কোথাও তিলমাত্র ব্যস্ততা লক্ষ করা যাবে না, কোথাও এতটুকু অনাহূত নয় এই স্পর্শ, সরল বর্ণলেপন; পূর্বকল্পিত ভাব এখানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। বন্দী নয়, এ বুঝি এক পোষমানা অবস্থার পরিচয় শিল্পীর চিত্রকর্মে যা পরিস্ফুট।

সব থেকে বেশি যে ব্যাপারটি দুর্বোধ্য তা হল 'আমি' এবং 'জগৎ' এই উভয় মেরুর অন্তর্বর্তী দূরত্বের অবলোপ ঘটেছে। পুস্যাঁ (Poussin) বা কোরো (Corot) বা ধ্রুপদী আদর্শে প্রাণিত অন্য কোনো চিত্রকরই সেই দূরত্ব এমন অমিত সাহসের সঙ্গে অতিক্রম করতে অপারগ। অবেক্ষিত বিষয়ের মর্মভেদ করে শিল্পীর 'স্বয়ং' প্রবেশ করেছে গুহাভ্যন্তরে আর সেই অভ্যন্তরেই 'স্বয়ং' হয়েছে অন্তর্হিত। একমাত্র স্থানিক পরিপ্রেক্ষিতই অবলোকন ব্যবস্থাকে সুনিশ্চয়তা দান করতে সমর্থ। স্থানের এই প্রত্যয়টি অর্জনের সম্ভাব্যতা সাপেক্ষে, অর্থাৎ বিষয় ও বিষয়ীর অন্তর্বর্তী দূরত্বের বিলোপসাধনের সাহায্যেই চিত্রশিল্পী ভ্যান গঘের অন্তর্লীন মৃত্যু-শক্তির উদঘাটনকে সম্ভবপর করে তুলেছে। মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণে প্রাণের বিকিরণকে যাঁরা স্বীকার করে নিয়েছেন তাঁদের প্রশান্তি এখন ভ্যান গঘের আয়ত্তাধীন হয়েছে। আত্মার এই চলন, নক্ষত্রমুখী এই অভিগমনে এখন তিনি পারঙ্গম। দূরত্বকে অতিক্রম করা এবং যুগপৎ নিজেকে তার সঙ্গে একাত্মীভূত করার ক্ষমতা, দেহে মনে নিজেকে সমর্পণ করার ক্ষমতা অভিগমনের বা অভিগত হওয়ার পূর্বশর্ত। কিন্তু তা ধ্রুপদীও নয়, যুক্তিযুক্ততারও তাতে অনটন। আত্মসমর্পণে যাঁর ঐকান্তিক ইচ্ছা গণ্ডীবন্ধনকে

প্রত্যাখ্যান করেন তিনি। বস্তুর অন্তর্নিহিত গোপন রহস্য চকিতে আবিষ্কার ঈপ্সায় বস্তুকে দীর্ণ করেন তিনি, নিজেকে হারিয়ে ফেলার ঝুঁকি নেওয়া তাঁর পক্ষে তাই অবশ্যম্ভাবী। ধ্রুপদী ব্যক্তি অবশ্য প্রাজ্ঞ, বস্তুর পৃষ্ঠবলে, তার সীমানার প্রতি আবদ্ধতায় আচম্বিতে যাত্রা সাঙ্গ তাঁর। বস্তুর অন্তরালবর্তী অভেদ্য অজ্ঞেয় গোপনরহস্যের সঙ্গে মানুষের চিরকালীন বিচ্ছেদ, এ তত্ত্ব তাঁদের পক্ষে স্বীকৃত বা অনুমিত সত্য।

ফলত আর্লে অধ্যায়ে ভ্যান গঘের মধ্যে যে বাস্তবধর্মিতা দেখা যায় তা আপাতধ্রুপদী। তাঁর সৃজনকর্মের বাস্তবতা অবেক্ষিত সামগ্রীর সমাত্মক। এই অনপনেয় প্রত্যয় উনিশ শতকী শিল্পকলায় এমন এক উপাদানের প্রথম পরিচয় গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল যার তুলনা করা যায় একমাত্র, যেমন ধরুন, নিগ্রো শিল্পের জাদু-বাস্তবধর্মিতার সঙ্গে। প্রতিরূপের মধ্যে প্রতিভাসের (appearance) প্রতিনিধিত্ব নয় (যেহেতু গোগ্যাঁ বা বার্নেয়রের প্রতীকধর্মিতার ব্যাপারেও ভ্যান গঘের কোনো উৎসাহ ছিল না), বাস্তবের সারসত্তাই তিনি উপস্থাপন করতে সক্ষম এই অন্ধবিশ্বাস এই সময় ভ্যান গঘের মধ্যে লক্ষণীয়। সেই প্রত্যয়ের প্রকৃতি বর্ণভিত্তিক নয়, তা জাদু-বাস্তবধর্মী ও ভাবদ্যোতনাব্যঞ্জক। (অবশ্য একথা মনে রাখতে হবে যে সচেতনভাবে এই সূত্রায়ণ ঘটেনি, আর এ নিয়ে পীড়াপীড়ি করতেও তাঁর আগ্রহ ছিল না, তবে তাঁর মতামত যে এই সূত্রায়ণের স্বগোত্র ছিল সেকথা বোধহয় অত্যুক্তি হবে না।) গোগ্যাঁর আর্লে ত্যাগের পূর্ববর্তী পর্যায়ে ভ্যান গঘের চিত্রকর্মে যে আপাত ধ্রুপদী ধর্ম লক্ষ করা যায় তা বস্তুত এক ভাবদ্যোতনাব্যঞ্জক সুনির্মলতা, স্বচ্ছতার অতিরিক্ত কোনো সামগ্রী। ব্যতিক্রমী ইন্দ্রিয়বেদিতা ও বিপুল ধীশক্তির কারণে অবেক্ষণ ক্ষমতার সর্বোচ্চ সম্পদে গরীয়ান কোনো কোনো ব্যক্তির মধ্যে এই গুণটি কখনো কখনো দেখা যায়।

স্যাঁ-রেমিতে থাকার সময় ১৮৮৯এর গ্রীষ্মকালে নানারকম গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ভ্যান গঘের মধ্যে দেখা যায়। জুলাই মাসে তেওর যুবতী স্ত্রী জানালেন তিনি অন্তঃসত্ত্বা। ভ্যান গঘের মানসলোকে ঘটনাটির পক্ষে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করা সম্ভব। 'বড়ো খবরের' আশু প্রতিক্রিয়া ভাইয়ের স্ত্রীকে লেখা ভ্যান গঘের পত্রে ব্যক্ত হয়েছে। ভ্রাতৃবধূর প্রত্যুত্তরপত্রে 'সংযম' সম্বন্ধে চিত্তাকর্ষক অনুচ্ছেদটি শিল্পীর স্মরণে আনে আপন তরুণ বয়সের কথা, সেইসময় সমধিক সংযমে তিনি নিজেও ছিলেন অপ্রগল্ভ। একদিন নিজের মধ্যে যে সংহত মানসিক স্থিতি তাঁর ছিল আজ তা অতীতে পরিণত। সেদিন তার ফলেই তাঁর চিত্রকর্মে ঘটেছিল ধূসর বর্ণ প্রলেপণ। 'বস্তুত ধূসরতর চিত্রকর হয়ে উঠছি আজ'—এ সত্য আবিষ্কৃত এখন। নয় নয়, এ শুধু নান্দনিক প্রশ্ন মাত্র নয়। শিল্পীর কাছে এ এক সুনির্দিষ্ট 'মোড়-ফেরা'; শারীরিক পরিবর্তন, পানাভ্যাস ত্যাগের ইঙ্গিতবহ, চিত্রকর্মে যার প্রভাব পর্যাপ্ত। পরবর্তী পর্যায়টি স্বাভাবিকভাবেই তাই প্রতি পদক্ষেপে পরিলক্ষণীয়।

এই একই কালে দেখা যাবে মাকে লিখছেন, "দক্ষিণের তুলনায় উত্তরাঞ্চলে আমাদের কর্ষিত জমিগুলো অনেক বেশি মনোরম, অনেক সৌরভময়। দক্ষিণের শৈল প্রকৃতির কারণে সেখানকার জমি সবরকমের কৃষিকাজের পক্ষে অনুকূল নয়।" ফুলন গম, কপিবীজের চারা বা শণ বুনতে তাঁর আগ্রহ। অনুরূপভাবে ব্রাবান্টের খামারবাড়ির শৈবালাচ্ছাদিত গৃহচূড়ায় অভাবজনিত অনুভূতির সঞ্চার। আপাতদৃষ্টিতে মাকে লেখা চিঠিতে দক্ষিণাঞ্চলে যাত্রার দোষস্খালনের সুর। জাপানী

চিত্রকলার প্রতি অনুরাগ এখনও বর্তমান থাকলেও আর্লেতে বসবাসের সময়ও ডাচ শৈলীসম্মত মোটিফের প্রাধান্য সমানভাবেই বজায় আছে, বর্ণের সান্দ্রতা এবং ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের উষ্ণতায় সঞ্চারিত আনন্দের প্রাধান্যও লক্ষ করা যাবে। কিন্তু স্যাঁ-রেমিতে ১৮৮৯ এর গ্রীষ্মকালে ও হেমন্ত ঋতুতেও উত্তরাঞ্চল ও ব্রাবান্টের স্মৃতি, আন্তোয়ার্প ও কাম্পিনের হীদার ঝোপের সৌরভ। মন দ্বিধাক্লিষ্ট। শস্যক্ষেত্রে চিত্রাঙ্কনরত অবস্থায় নতুন এক সংকটবোধে তিনি আক্রান্ত। খেদ জাগে মনে অতীত উদীচী বাসকালীন বর্ণপাত্রের ব্যবহার আবার যদি তিনি করতে পারতেন। উদীচী-অবাচী সংঘাত অব্যাহত। পূর্ণ সমর্পণে খিন্নচিত্ত শিল্পী এখনও বিমুখ। ১৮৯০ এর অগাস্টে পরিস্থিতি গুরুতর রূপ নেয়। অবাচীর অভিজ্ঞতা যে অপরিহার্য বা একান্ত আবশ্যকীয় নয় চিঠিপত্রে সেই স্বীকারোক্তি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। স্বীয় পরিচিত উত্তরাঞ্চলকে আবেগতাড়িত মনে পরিত্যাগ করে এসেছেন; দক্ষিণাপথ এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় সামগ্রী, এমন কি জাপানী চিত্রকলার প্রতি সবিস্ময় অনুরাগের ক্ষেত্রেও পশ্চাদপসরণের সূত্রপাত।

নিজের ভিতরে নতুনতর এক অনুরাগের আবির্ভাব ক্লিশিত চিত্ত শিল্পী লক্ষ করতে থাকেন; বস্তুসামগ্রীর প্রতি, সর্বোপরি মানুষের প্রতি স্নেহ জাগছে। স্যাঁ-রেমি আরোগ্যনিকেতন থেকে লেখা একটি চিঠিতে অবাচীত্যাগের চিন্তা, উত্তরের সান্নিধ্যলাভের আকাঙ্ক্ষায় কখনও বা বৃতানির পর্ত্যাভ্যাঁ বা পারিতে বসবাসের অভিলাষের কথা প্রকাশিত। অনিশ্চয়তাবোধ এবং দোলাচলচিত্ততার সংকট সমাগত। অবাচীর আকর্ষণ থেকে নিজেকে বিযুক্ত করার তাৎপর্যও মনের মধ্যে স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। গভীর বিষাদময় চিদাকাশে প্রাবৃটান্ধকার ঘনীভূত। মা বাসাবদল করেছেন ইতোমধ্যে বেদনাদায়ক পরিস্থিতির কারণে। ব্রাবান্ট বা কাম্পিনের সঙ্গে সম্পর্কও তাই ছিন্ন। পত্রাবলীতে বার বার ব্যাখ্যা করার প্রয়াস দেখা যায় দক্ষিণাপথকে কেন তাঁর প্রয়োজন রচনাকর্মে। প্রেমের গৌরবগান এক অর্থে প্রেমে দীনতারই লক্ষণ। উত্তরাপথের অধিবাসীর লেখনীতে দক্ষিণাপথের সঙ্গলিপ্সার সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন, প্রযুক্তিগত যুক্তি উত্থাপনের প্রয়াস —অন্তরের গভীরে পরাজিত মানুষের যুক্তিরই প্রকাশ।

বস্তুত উদীচীমুখে প্রত্যাবর্তন কামনা পত্রে বহুলব্যক্ত, অবশ্য তা ক্ষণস্থায়ী। তেওকে চিঠি লেখেন পুরানো স্কেচগুলি পাঠানোর অনুরোধ জানিয়ে, স্মৃতিসূত্রে উত্তরাঞ্চলের ভূদৃশ্য আঁকার বাসনা, এমন কি 'আলুভোজী', 'নুয়েনেনের মিনার' বা 'পুর্ণাচ্ছাদিত কুটীর' চিত্রেও নতুন করে রূপ দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা। বর্ণপাত্রে কখনো কখনো আশ্চর্য রূপালী ও ছাইরঙের ধূসরতা দেখা যায়, সম্ভবত ব্রাবান্ট ও কাম্পিন বাসের স্মৃতির আভা ফুটেছে সেখানে। উদীচী অভিমুখে প্রত্যাবর্তনের চিন্তাকে জয় করার প্রচেষ্টার সুদূরপ্রসারী পরিণামে অবশ্য তাঁর শিল্পগত গতিমুখ পরিবর্তনের প্রবর্তনা দেখা দিয়েছে।

দ্যলাক্রোয়া ছাড়াও অন্য এক শিল্পীর প্রতি একই ধরনের বিস্ময়মিশ্রিত শ্রদ্ধা এইসময় তাঁর মধ্যে দেখা যায়। ইনি হলেন পুভি দ্য শাভান্নে (Puvis de Chavannes)। আধুনিক যেসব সমালোচক ভ্যান গঘকে এক্সপ্রেশনিজম ও ফোভিজমের জনকের মর্যাদা আরোপ করতে প্রয়াসী এই নামটি সহজেই তাঁদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়, যেহেতু বর্তমানকালের সহচর উদ্দাম মানসিকতার পরিপন্থী সেই শিল্পী।

বিবর্ণ ফ্রেস্কো রচনা পুভির বৈশিষ্ট্য। ইম্প্রেশনিজমের যাবতীয় লক্ষণবিবর্জিত তাঁর তুলি;

অবাস্তব ভূদৃশ্য ও চিত্রোপম মনুষ্যমূর্তি, অঙ্কনদক্ষতা, গ্রীক পরিমণ্ডলের স্বপ্নবিলাস ও জিয়োত্তো-বন্দনার সামনে উনিশশতকের দর্শক বিস্ময়স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। গোগ্যাঁর এবং পরবর্তীকালে দেনিস মেইললের শ্রদ্ধার্জনে সমর্থ সেই চিত্রকর।

আর্লে অধ্যায়ের বহুলমিশ্র চারিত্রধর্মের উপলব্ধি ঘটে যখন দেখা যায় ১৮৮৮তে পুভির 'সেন্টজন দি ব্যাপটিস্ট' ছবিটিকে ভ্যান গঘ 'বিস্ময়কর' বলে আখ্যা দিয়েছেন, বলছেন 'দ্যলাক্রোয়ার মতোই তিনি জাদুধর্মী', যদিও পরিণামে পুভির প্রভাবের মাত্রা যে কতদূর পর্যন্ত প্রসারিত হবে তখনও তা অজ্ঞাত। পুভির 'হোপ' ছবিটিও তিনি দেখেছেন। এই ছবিটি দেখে গোগ্যাঁ এতই উচ্ছ্বসিত হন যে নিজের একটি রচনার মধ্যে সেটি অন্তর্ভুক্ত করেছেন। সব থেকে বড়ো কথা সুনির্মলতার এক সুন্দর ও যৌবনোচ্ছল রূপায়ণ হিসাবে ভ্যান গঘ এই ছবিটিকে দেখেছেন। আর্লের মতো গ্রীক চারিত্রধর্মবিশিষ্ট এক শহরেব মধ্যে পুভিকে পুনরাবিষ্কার করেছেন ভ্যান গঘ। মানসিক বিপর্যয় দেখা দেওয়ার পর এই শহরেই এমন এক চিকিৎসকের সন্ধান করার প্রস্তাব তিনি করেছেন দ্যলাক্রোয়া ও পুভি উভয়েই হবেন যাঁর পরিচিত এবং অনতিকাল পরেই উভয়ের উক্তিও নিজের লেখা চিঠিতে তিনি উদ্ধৃত করেছেন।

আর্লে ইতালীয় কল্পজগতের প্রেরণারও উৎস—সেই দেশের সবকিছুই ভ্যান গঘের কাছে কল্পিত সামগ্রী কারণ সেই দেশে কোনো দিনই তাঁর পদার্পণ ঘটেনি বাস্তবে। দান্তে, জিয়োত্তো, বাত্তিচেল্লি, পেত্রার্ক ও বোক্কাচ্চিও স্বপ্নের জনয়িতা। যদিও জিয়োত্তোর প্রভাবই তার মধ্যে সবথেকে বেশি। কল্পনায় শিল্পী স্বয়ং যাঁর সমকালীন সেই জিয়োত্তোকে ভ্যান গঘ তাঁর পরবর্তীকালের চিঠিপত্রে 'মহান যন্ত্রণাভোগকারী' হিসাবে আখ্যা দিয়েছেন। 'যন্ত্রণাভোগকারী' হলেও তিনি 'দয়া ও হার্দিক করোষ্ণতায় পূর্ণ এক মানুষ যিনি বুঝি ইতোমধ্যেই অন্য কোনো জগতের অধিবাসী হতে সক্ষম। জিয়াত্তোর এই চরিত্রায়ণে যিনি পারঙ্গম তাঁর পক্ষেই সম্ভব সুদূরলোকে অভিগমন —পরিচিত জীবন থেকে বহুদূর নক্ষত্রলোকে প্রস্থানের জন্যে তাঁর প্রয়োজন শক্তিশালী প্রসাদগুণের অধিকার অর্জন। আর্লে থেকে কখনো কখনো ভ্যান গঘ যান স্যাঁত-মারি-দ্য-লা-ম্যার। সমুদ্র সৈকতে এই প্রাচীন তীর্থে তরুণীদের দেখে জিয়াত্তো ও সিমাবোর আঁকা ক্ষীণাঙ্গী ঋজু দেহী, ঈষৎ বিষণ্ণ ও রহস্যময়ী তরুণীদের কথা তিনি স্মরণ করেছেন। মঁপেলিয়রের সংগ্রহশালায় গোগ্যাঁর সাহচর্যে এক সন্ত নারীর মৃত্যু দৃশ্যের একটি ক্ষুদ্র চিত্র একদা তাঁর চোখে পড়ে। সুখহীন, তবু উল্লাসপ্রাচুর্যে ভরা ও মানবিক বলে চিত্রধৃত আবেগটিকে মনে হয় ভ্যান গঘের, কারণ রচয়িতার সমকালীন এক ব্যক্তিসত্তা হিসাবে তখন আত্মোপলব্ধি হয়েছে তাঁর।

স্যাঁ-রেমিতে বাস করার সময় জিয়োত্তোপ্রীতির মাত্র বেড়ে যায়। চিঠিতে লিখেছেন, "ভ্রমণের অবকাশ মিললে জিয়োত্তোর কাজের প্রতিলিপি করতাম। অন্য শিল্পীর প্রতিতুলনায় এত ভিন্নধর্মী হলেও আদিমধর্মিতা যদি এঁর মধ্যে না থাকত তাহলে আধুনিকতায় এই চিত্রকর দ্যলাক্রোয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী।"

এমন কি রেমব্রান্টের আঁকা একটি পোর্ট্রেটের আলোচনা প্রসঙ্গেও ভ্যান গঘ বলছেন, "জিয়াত্তো ছিলেন ইতালীয় রেমব্রান্টপন্থীদের মধ্যকার সম্ভাব্য যোগসূত্র।" আর্লেতে জাপানী চিত্রের মহিমার সন্ধানলাভ সত্ত্বেও অবাচীর জ্বলন্ত অগ্নিবর্ণের স্পর্শতেও ধূসরের বিরোধিতা ঘটিয়েছে এই সুচারু সুবিবেচক জিয়োত্তোর মূর্তি। অধিকন্তু, জিয়োত্তোর সঙ্গে এইকালে যোগ দিয়েছে পুভির

মূর্তি। ১৮৮৯ ডিসেম্বরে একটি চিঠিতে লিখছেন, "হলুদ উপন্যাস পাঠরত বৃদ্ধ, পাশে একটি গোলাপ; জল ভরা গ্লাসে জলরঙ ব্যবহার করার তুলি, আর ইতোমধ্যেই বার্ধক্যে উপনীত এক রমণী—ঠিক যেন মিশ্‌লের অনুভূত সেই সত্য—বৃদ্ধা নারী বলে কিছু নেই—ঠিক সেই ভাবটি তাঁর মধ্যে। পুভি দ্য শাভান্নের আঁকা পোর্ট্রেটগুলো—আমার কাছে এরা চিরদিন আদর্শ মনুষ্যমূর্তি। প্রাক্-রাফায়েলপন্থীদের তুলনায় দ্যলাক্রোয়া ও পুভি আরও বেশি স্বাস্থ্যবান। বর্তমানে লিয়ঁতে সংরক্ষিত এই পোর্ট্রেটের নারীমূর্তিটি অবধারিতভাবে পুভির বন্ধু ও পরবর্তীকালে তাঁর স্ত্রী রাজকুমারী কান্তাকুজেনে।"

স্যাঁ-রেমির জলপাই বনের কোলাহলে এক ঘনিষ্ঠ ও সুপ্রাচীন মর্মরধ্বনি তাঁর কানে আসে : পুভির 'ল্য লেসব' ছবিতে করবীকুঞ্জের মাঝখানে বেলাভূমিতে রমণীকুলের স্মৃতি। পুভির 'সান্ত্বনা শান্ততা ও সুনির্মলতা' এখন থেকে উদীচী অভিমুখে পারি এবং ওভার যাত্রা পর্যন্ত চিত্তে বিরাজে নিত্য।

১৮৯০তে ওভার যাত্রার পথে পারি থেকে চিত্রকর ও সমালোচক জে. জে. আইজ্যাকসনের উদ্দেশে লেখা এক আশ্চর্য পত্রে উল্লিখিত বক্তব্যে এবং বোনকে উদ্দেশ করে তৎকালীন অন্য এক পত্রে পুভিকে যে খুবই গুরুত্ব দিতেন, দ্যলাক্রোয়ার সমপর্যায়ের গুরুত্ব দিয়েছেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। অতীত ও বর্তমানের মিলন পুভিতে, চিত্রকর্মেও দেখা যাবে গ্রীক পরিপ্রেক্ষিতের অতীত যা থেকে সংশ্লিষ্ট পাত্রপাত্রীর পোশাকের পরিচয় পাওয়া যায় না, বোঝা যায় না সেগুলো প্রাচীন কালের না বর্তমান কালের। প্রকৃতপক্ষে পারির সাঁ দ্য মার-এর এক সালোঁতে ১৮৯০-এর বসন্তকালে পুভির আঁকা ছবি ভ্যান গঘ দেখেছিলেন। কোনো এক ছবি প্রসঙ্গে যথেচ্ছ মানসবিহার করতে করতে লিখেছেন চিত্রটি সংমিশ্র ও রাজসিক চিন্তায় অনুপ্রাণিত করেছে তাঁকে। নিঃসন্দেহে এটি রুয়েঁ শহরের উদ্দেশ্যে পুভির রচিত 'প্রকৃতি ও শিল্পের অন্তর্বর্তী' নামের সেই বিশাল চিত্রটি। জলপাই গাছ ও ফসলের বিরাট আলোচ্যবিষয়টি ভ্যান গঘের কাছে এক ধর্মীয় সামগ্রী সুদূর অতীত আর আশু বর্তমানকে যা সংযুক্ত করেছে; স্বপ্নময় দৃষ্টিগুণসম্পন্ন চিত্রকর পুভির পক্ষে যা অত্যন্ত উপযুক্ত চিত্রবিষয় হতে পারত বলে ভ্যান গঘের ধারণা। ভ্যান গঘ নিজেও এই সময় অতীত আর বর্তমান এই দুই পরিপন্থী শক্তিদ্বন্দ্বের সমন্বয় সাধন করার জন্যে খুবই সচেষ্ট। পুভি প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে সজ্ঞাগতভাবেই তাঁর মনে জিয়োত্তোর অভিজ্ঞতার পুনরাবির্ভাব ঘটেছে। সেকালে ম্যুরাল চিত্ররীতির পুনর্জাগরণে, বিশেষত 'আর নুভো'-পন্থী চিত্রকরদের ওপর জিয়োত্তোর চিত্ররীতির অভিঘাত পর্যালোচনা করা আবশ্যকীয়ভাবে সঙ্গত ছিল।

স্থাপত্যধর্মী উপাদান স্টাইলের ঐক্য, মানুষ ও মানবিক মর্যাদার বিশ্বজনীনতার সন্ধানরত শিল্পের এই অস্পষ্ট আধুনিকতা পুভির ইম্প্রেশনিজম-বিরোধী শিল্পরীতির মাধ্যমেই ভ্যান গঘের অনুভবে পৌঁছেছিল। গোপগাথাধর্মী এই শিল্প হয়ে ওঠেছিল কখনো কখনো। গভীরতার দিক থেকে সেটি আবার শোকগাথারও সগোত্র। একদিকে বারনেয়ার ও গোগ্যাঁর মতাদর্শ পরিত্যাগ, অন্যদিকে 'আর নুভো' আবিষ্কার এবং সেইসঙ্গে দুটিরই অন্তর্নিহিত গুণগুলোকে কি করে নিজের স্টাইলের সঙ্গে সম্পর্কিত করেছেন তার ব্যাখ্যা এইখানে পাওয়া যেতে পারে। বস্তুত স্যাঁ-রেমি এবং ওভারে আঁকা কোনো কোনো ছবিতে তরঙ্গায়িত রেখার উপস্থিতির মধ্যে সেই প্রভাব সুস্পষ্ট।

সবিচার দৃষ্টিভঙ্গিতে অবনয়ন ঘটেছে একালে। পুভিকে এইসময় দ্যলাক্রোয়ার সমপর্যায়ী

জিয়োত্তোর প্রতিবেশী হিসাবে দেখার ব্যাখ্যা ভ্যান গঘের সমগ্র মানসগত ও শিল্পগত সত্তার বিবর্তনের সাহায্যেই মাত্র সম্ভব। উদীচী প্রত্যাবর্তন পথে আর্লে ও স্যাঁ-রেমিতে যার সূত্রপাত ঘটেছিল এবং ওভারে যা বাস্তবায়িত হওয়ার উপক্রম ঘটেছে সেই পরিবর্তন প্রক্রিয়ারই প্রকাশ এর মধ্যে। অবাচীর আকর্ষণ এখন গেছে সরে; কেবল যৌবনমুখেই নয় স্থিতিহীন পরিপ্রেক্ষিতমুখী পশ্চাদগামিতার মধ্যেও উদীচীরই প্রতিনিধিত্ব।

স্যাঁ-রেমিতে যে প্রত্যাবর্তন অধ্যায়ের প্রস্তুতি চলেছিল ১৮৮৯ এর জুলাই থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে তা নিষ্পন্ন ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই পর্যায়ের ছবির সর্বাঙ্গে অত্যন্ত অসমগুণের পরিচয় লেগে আছে। একথা বলা যদিও অসম্ভব যে সামগ্রিকভাবে রচনাকর্মের গুণধর্মে উন্নতি ঘটেছে, বর্ণের সান্দ্রতায় স্থানিক দৃষ্টিতে ভারসাম্যের ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ অভাব যেমন ধরুন, 'ওভারের গির্জা', স্যাঁ-রেমিতে আঁকা শেষ আত্ম-প্রতিকৃতি ইত্যাদির যাবতীয় অসমতা সত্ত্বেও ড. গাসের প্রতিকৃতি দুটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। 'কুটীরের পটভূমিতে দণ্ডায়মান দুই শিশু' ছবিটিও দ্যলাক্রোয়ার বিপরীতধর্মী রৈখিক আকারচিত্রের করণকৌশলের দৃষ্টান্তে পরিণত। দ্যলাক্রোয়ার অভিমত হল অভ্যন্তরে শুরু করে বহিঃরেখায় সহজ সমাপ্তি। এই ছবিটিতে কিন্তু শিশুদের উপবিষ্ট অবস্থা যদিও প্রতীয়মান, স্থানিক অবস্থানে লুভ্র-এ রক্ষিত ড. গাসের প্রতিকৃতিটিতে অনুরূপ অনির্দিষ্টতার মনোভাব পরিস্ফুট তাদের মুখমণ্ডল ও হাতের দুর্বল মডেলিঙে। 'ফুলদানিতে গোলাপ ও আনিমোনের স্তবক' ছবিটিতেও পরিপ্রেক্ষিতগত অনুরূপ অনিশ্চয়তা। টেবিলের নতির সাপেক্ষে পুষ্পস্তবক ও পুষ্পপাত্রের অবস্থান নির্ধারণ ও ভারসাম্যরক্ষার ব্যাপারটা প্রশংসনীয় হয় নি। 'ড. গাসের উদ্যান' চিত্রণে এবং তাঁর প্রতিকৃতি চিত্রণে একই ক্রমের লাল ও নীল রঙের ব্যবহার চোখে পড়বে। অথচ 'মাদমোয়াজেল গাসের' ছবিটি একটি আশ্চর্য রচনা। এটির উল্লেখেই ভ্যান গঘের সেই বহুলখ্যাত উক্তি : পুভির 'প্রকৃতি ও শিল্পের অন্তর্বর্তী' ছবিটির শ্রী তাঁর আবিষ্কার। দীর্ঘাকৃতি, শ্বেত একবর্ণ (silhouette) 'আর নুভো'-পন্থী অশরীরী অস্তিত্বের চিন্তা জাগিয়ে তোলে, যেন বিবর্ণ পুষ্পরাজির মধ্যেও তা সঞ্চরমান। পথ দৃষ্টি-অগোচর, দূরে ক্ষুদ্র তোরণদ্বারের ইঙ্গিত, কম্বুরেখা ও চোখ-ধাঁধানো বিদ্যুচ্চকিত তুলির টানে 'জোবড়ানো' বর্ণপ্রলেপের নৈরাজ্য তরঙ্গভঙ্গুর কোনো পৃষ্ঠতলের ভাব জাগায়।

অর্থাৎ, ওভার অধ্যায়ে আঁকা একগুচ্ছ রচনার লক্ষণীয় সাধারণ গুণ হল তাদের প্রয়াণ-বিন্দু ও প্রেক্ষণ-বিন্দুর অনিশ্চিত হয়ে ওঠা। পরিপ্রেক্ষিত নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে পূর্বতনকালে ভ্যান গঘ যে সজাগ অবধানতা দেখিয়েছিলেন এখন তা তাঁর ইচ্ছাশক্তির এলাকা লঙ্ঘন করেছে। সেই সান্দ্র বর্ণলেপন এখন কখনো বা রীতিমত নতুন এক সজীবতার সহচর, এবং এখন আর তার এফেক্টসৃষ্টি বা সঞ্জননার কারণে নয়, তার অভিব্যক্তিকতার কারণে তা ব্যবস্থিত হয়েছে। আয়তাকার রূপের আদরণীয়তা এখন বেড়েছে, সেটাও সম্ভবত পুভিরই কারণে। পটের আয়তনের মধ্যে দুটি ভিন্ন স্থানিক কেন্দ্র সংস্থাপনের সম্ভবপর হওয়ায় পরিপ্রেক্ষিত সংক্রান্ত করণকৌশলের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়ত অসঙ্গত নয়।

মানসগত দিক থেকে পুভি ও জিয়োত্তোর প্রতি পক্ষপাতের বিবর্তনটিও সমানভাবেই ব্যাখ্যার যোগ্য। আনন্দ সঞ্জননা দূরে থাক, মুক্ত গ্রামাঞ্চল এখন আতঙ্কের সঞ্চার ঘটায় মনে। মানসিক বিপর্যয়ের কাল থেকেই দেখা গেছে পারিপার্শ্বিক ভূদৃশ্য নিঃসঙ্গতাবোধকেই কেবল স্বরিত করেছে।

একদিন এই শস্যক্ষেত্রই ছিল শান্তির আশ্রয়, সান্ত্বনার আশ্রয়, সান্ত্বনার নীড়, স্ত্রী-পরিবারবর্গের বিকল্প; জীবনের প্রায়শ আবছায়া কোণগুলো তাতে আলোকিত হয়ে উঠেছিল। শস্যক্ষেত্র, শস্য, ফসল পাকা ও ঘরে তোলা, রুটি গড়া ইত্যাদি যাবতীয় ব্যাপার জীবনের অর্থকে মৃত্যুর কাছে পূতপবিত্র করে তুলেছিল, আশ্বাসদায়ক হয়ে উঠেছিল, যেন সুমহান কোনো নিয়ম আবিষ্কার করার ফলে আপন ভাগ্যের সঙ্গে তাঁর আবার সখ্যতা গড়ে তুলেছিল।

সেই অবধি পুরানো শৈবালাচ্ছাদিত কুটীর শীর্ষে তাঁর দৃষ্টি আবদ্ধ, অবাচীতে যা ছিল সচরাচর অগোচর ওভারে তা আবার দৃষ্টিগোচর। কিন্তু কেন? ওভারের প্রাচীন গির্জা নুয়েনেনেরই গির্জা তফাত শুধু এই যে বর্ণাঢ্যতায় তা সমৃদ্ধতর, এবং আরও বেশি ভাবদ্যোতনাব্যঞ্জক। কিন্তু 'প্রাচীন' এই শব্দটির উচ্চারণেই যে যন্ত্রণাভোগ, ব্যাধি, কুশ্রীতা ও দারিদ্র্যের ব্যঞ্জনা। প্রাচীন বস্তু সামগ্রীতেই শৈবাল ও আইভিলতার প্রেম, তাকেই তারা আলিঙ্গনে বাঁধে, সেদিকেই তাদের অমোঘ আকর্ষণ। কর্কট ব্যাধিগ্রস্ত অর্বুদ সপ্রেমে সংলগ্ন মানব শরীরে। নিজেও কর্কটরোগে আক্রান্ত হয়েছেন বলেই তাঁর বিশ্বাস। আপন দেহকন্দরে বিকচমান শক্তির প্রতীক বুঝি এইসব সামগ্রী। প্রাচীন গৃহশীর্ষ যেমন শৈবালপাশে পরাহত, পুরাতন জীবনের কাছে শিল্পীও সেইরকম। স্মৃতিতে বাসা বেঁধেছে উদীচী, যুগপৎ তা মরণেরও বীজ। এ কোনো বিজয়ীর সসমারোহ প্রত্যাবর্তন নয়। আত্মখণ্ডনেচ্ছার সঙ্গে যোঝাযুঝি বহুদিনের। এ সত্য তাঁর কাছে আর অজানা নেই যে তিনি বীর নন, সাহসের অভাব প্রায়শ ঘটেছে তাঁর মধ্যে। কোনো কোনো মুহূর্তে ঘরের বাইরে যেতেও তাঁর আতঙ্ক। ফসলের খেতে নির্জনতায় মগ্ন অবস্থায় আচম্বিতে কিছু যদি সামনে এসে পড়ে সেই আতঙ্ক। পথের বাঁকে অপেক্ষমাণ যন্ত্রণার ভুজপাশে পরাজিতের আত্মসমপর্ণেই তাঁর ভবিতব্য। আর্লে ও স্যাঁ-রেমিতে থাকার সময়েই 'আমি সাহসী নই', 'ধৈর্যের অভাব আছে আমার' এসব স্বগতোক্তির সূত্রপাত। আমাদের থেকে বহুগুণ বেশি অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিটি আপন সত্তার মধ্যে যে গুণের অভাব সম্বন্ধে সচেতন সেই গুণ তবে কেন তাঁতে আরোপ করা? রঙীন রোম্যান্টিকতার আলোয় দেখার প্রবণতার ফলে প্রায়শই আমরা ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হই।

প্রকৃত উদীচীর সঙ্গে সাক্ষাৎ, স্বপ্নের ব্রাবান্ট বা কাম্পিনের সুরভিত হীদার গুল্মের সাক্ষাৎ আর কোনো দিন তাঁর জীবনে ঘটে নি। ওভার শুধু প্রত্যাবর্তনপথে ক্ষণিকের পান্থশালায় বিশ্রাম যেখানে মৃত্যুলোকগামী যান আরোহণে নক্ষত্রলোকে পৌঁছনোর সম্ভাব্যতা এক ভয়ঙ্কর বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে। সংবৃত বৃত্তকে দীর্ণ করতে অবশেষে তিনি সক্ষম, ড্রয়িং ও বর্ণচিত্রে ইতোমধ্যেই যা কম্বুরেখায় রূপলাভ করেছিল। ওভারের চিত্রকর্মে কয়েকটি চূড়ান্ত বিন্দুকে আক্ষরিক অর্থে বলা যায় অর্ঘ্যাঞ্জলি। এই সেই জনস্থান প্রান্তবর্তী শৈলতট যেখানে এসে তাঁর অবসন্ন বিশীর্ণ সমগ্র জীবনের বিলয় ঘটে অশুভতম ও ভয়ালভৈরব নীলবর্ণের মধ্যে, সংবর্তের নীলাঞ্জন নীলিমায় যা বিধৃত।

অনুবাদ : অশেষ মিত্র

খ্যাপা শিল্পী ভিনসেন্ট

কনসটানটিন পাউসটোভস্কি

সৃজনশীলতার জগৎ হল নানা ধ্যানধারণা, প্রতিরূপ, রঙ, আলো, যন্ত্রণাভোগ, প্রেম আর সন্ধানের নিরন্তর আলোড়নের জগৎ। আমাদের এই জগৎ রহস্যময় বলে মনে হয়। সেটা সম্ভবত এই কারণেই যে প্রত্যেক প্রকৃত বড়ো শিল্পীই একদিকে যেমন সৃজনশীলতার নিয়মগুলো মেনে চলেন (আজ পর্যন্ত অবশ্য এই ব্যাপারটা ঠিক বোধগম্য হয়ে ওঠে নি), অন্যান্য বড়ো শিল্পীর জীবনের থেকে তাঁর জীবন যেহেতু ভিন্ন ধরনের, তিনি তাঁর নিজের জন্য অতিরিক্ত নিয়মাবলী সৃষ্টি করেন, নিজের পথ ধরে ক্রমেই তাঁর বিকাশ ঘটতে থাকে, নিজের কাজের উপর তিনি তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা ও আবেগানুভূতির ছাপ রেখে যান, আর সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত এক পথে নিজেকে প্রকাশিত করেন।

ভিনসেন্ট যদি ডাচ না হতেন, নিজেকে মানিয়ে চলতে পারেন না এমন এক কঠোর কল্পনাশক্তিহীন পরিবারে যদি তিনি বড়ো না হতেন; যাবতীয় বৃত্তির মধ্যে সব থেকে অস্পষ্ট ও প্রাণহীন সেই যাজকবৃত্তির মধ্যে প্রশিক্ষণ লাভ যদি না করতেন, বোরিনাজের হতভাগ্য খনিশ্রমিক ও দুঃসাহসী ফরাসী ইম্প্রেশনিস্টদের বন্ধুত্ব যদি তিনি না গড়ে তুলতেন, যদি...

আরও কত না 'যদি' আছে; তবে দরকারী কথাটা হল এই যে : ভ্যান গঘের জীবনের যাবতীয় পূর্ব-প্রবণতা ও পরিস্থিতি অপরিমাপযোগ্য নানা পথ বেয়ে তাঁকে সেই পরিণতিতে নিয়ে গেছে যেটা প্রথম নজরে অপ্রত্যাশিত পরিণতি বলেই মনে হয়—পৃথিবীর মহত্তম শিল্পীদের একজন হয়ে ওঠার দিকেই নিয়ে গেছে তাঁকে।

বিভিন্ন শিল্পকলার জগতে যাঁরা কাজ করেন তাঁদের সকলের জন্যে ভ্যান গঘ এক মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। আত্মত্যাগ, ত্রুটিহীন সততা, এবং চমৎকার আবিষ্টভাব ব্যক্তিগত দুঃখ আর ব্যর্থতাকে অন্তঃসারশূন্য খোলার মতো বাতিল করে দেয়।

ভ্যান গঘের সম্পর্কে লিখতে গিয়ে একদা একজন লেখক একবার তাঁর জীবনকে গলগোথা হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন (জেরুসালেমের কাছে এক বধ্যভূমি যেখানে যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়)। দস্তয়েভস্কিকে যেমন তাঁর গদ্যরচনার ক্রুশে চড়ানো হয়েছিল ভ্যান গঘকেও সেইরকম তাঁর চিত্রাঙ্কনের ক্রুশে চড়ানো হয়েছিল।

তুলনাটা করতে আমাদের ভয় পাওয়া উচিত নয়। এর সরল অর্থ এই যে এই শিল্পীর মনে প্রাণে যা কিছু সূক্ষ্ম ও প্রাণবন্ত ছিল তা জগৎকে উজাড় করে দেওয়ার মতো এমন এক মহানুভব আবেগপ্রবণতা ছিল যে তাঁর গোটা জীবনটা এক কঠিন, যন্ত্রণাদায়ক অথচ আনন্দময় পথ বলে প্রতীয়মান হয়। মানুষের সহ্যশক্তির একেবারে প্রায় শেষ সীমায় এই পথ।

ভ্যান গঘের মৃত্যুরও ব্যাখ্যা করা যায় এর সাহায্যে। তাঁর মৃত্যুকে এক উন্মাদ রোগীর রোগজনিত ক্রিয়া হিসাবে দেখার থেকে বড়ো ভণ্ডামি আর কিছু হতে পারে না। এ কথা

অনেকদিন ধরেই সকলের জানা যে শিল্প শিল্পীর কাছ থেকে নিঃশর্ত, অনুতাপবর্জিত পূর্ণ আত্মত্যাগ দাবি করে। আর মাত্র তখনই সেই ব্যাখ্যার অতীত শক্তি সে অর্জন করে যাকে কখনো কখনো 'জাদু' বলে উল্লেখ করা হয়।

আরও ভালো কোনো প্রতিশব্দের অভাবে যাকে আমরা 'জাদু' বলি সেই শক্তির আরও অনেক উদাহরণ আছে।

তার মধ্যে মাত্র একটার উল্লেখ আমি করছি। কাজানলাকের পুরানো থ্রেসীন শহরে সম্প্রতি এক থ্রেস দেশীয় যোদ্ধার কবর আবিষ্কৃত হয়েছে। তাতে ফ্রেস্কো পদ্ধতির সাহায্যে আঁকা ছবিতে দেখানো হয়েছে মৃত যোদ্ধাটি এক ভোজের টেবিলে বসে আছে। কালো, রোগা চেহারা, মৃত্যু যেন তাকে দগ্ধ করে ফেলেছে।

তার পাশেই বসে তার স্ত্রী, সুন্দরী, বিমর্ষ রমণীটি এখনও বেঁচে।

স্ত্রী স্বামীর কালো হাতটি নিজের হাতে চেপে ধরেছেন। আর এই জীবিত হাতটি তার জোরালো অথচ কমনীয় আঙুলগুলোর সাহায্যে প্রিয় স্বামীর অমরত্ব সম্বন্ধে এমন শান্তি ও বিশ্বাস প্রকাশ করছে যে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সমগ্র ফ্রেস্কোটি জীবন ও প্রেমের এক চমৎকার নিশ্চিতোক্তি হয়ে উঠেছে।

ফ্রেস্কোটি এক জাদুধর্মী ছাপ সৃষ্টি করেছে। মৃত যোদ্ধার পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা তেজোদ্দীপ্ত, আশুবিচলিত চার ঘোড়ার যানটি এই ছাপকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

ভ্যান গঘ প্রবল সামাজিক আবেগানুভূতি সম্পন্ন মানুষ ছিলেন। জগতের এক নতুন, ন্যায়নিষ্ঠ সংগঠনের সন্ধান তিনি করতেন। সরল মানুষদের—কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষের শিল্পী বলে তিনি নিজের পরিচয় দিতেন। আর তিনিই প্রথম এই কথাটি উদ্ভাবন করেন : 'সাধারণ মানুষকে ভালোবাসার থেকে বড়ো শিল্পধর্মী জিনিস আর কিছু হয় না।'

যে 'মিথ্যা জ্ঞান' শিল্পকে বাস্তবের নিছক এক খিদমতগার হিসাবে মাত্র দেখে সেই 'মিথ্যা জ্ঞান' সত্ত্বেও চিত্রশিল্প যে তার নিজস্ব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সমেত বাস্তব জগতের অন্যান্য প্রক্রিয়ার মতোই এক চমৎকার প্রক্রিয়া হিসাবে বর্তমান ভ্যান গঘের গোটা জীবন তারই প্রমাণ।

ইম্প্রেশনিস্টদের প্রতি, ভ্যান গঘের প্রতি যে সন্দেহবাদী ও বিরুদ্ধ মনোভাব আজও বেঁচে আছে, অবশ্য সৌভাগ্যক্রমে এখন তা পড়তির দিকে, তা শিল্প সম্বন্ধে অজ্ঞতা, সুন্দরকে এক প্রাণধর্মী চালিকাশক্তি হিসাবে দেখতে অস্বীকার করা, বা. শেষত, প্রতিষ্ঠিত রুচি ও অনড় ধ্যানধারণার বিরোধী কোনো কিছুর প্রতি ভয়েরই ফল।

শিল্পের জগতে এখনও এমন কিছু কিছু লোক 'বাস করেন' যাঁদের দেখে মস্কোতে লেভিতানের আসবাব সজ্জিত ঘরের এক বাড়িওয়ালির কথা মনে পড়ে যায়। লেভিতানের কাছে তাঁর ঘর ভাড়া পাওনা হয়েছিল, লেভিতান চাইলেন তাঁর ছবি দিয়ে দেনা শোধ করে দেন, কিন্তু স্ত্রীলোকটি তা নিতে অস্বীকার করলেন, কারণ ছবিগুলোতে স্ত্রীলোকটির ভাষায় কোনো 'বিষয়বস্তু' নেই যে।

ছবিতে যদি কোনো লোকজন, গোরুবাছুর বা এমন কি মুরগিও না থাকে তাহলে সেই ছবিতে উত্তরাঞ্চলের নদীর অনন্ত প্রশান্তি বা কুয়াশাঘেরা আকাশের নীচে হেমন্তের সোনালী আলো থাকল কি না থাকল তাতে কার কী আসে যায়।

'বিষয়বস্তু' অবশ্যই একটা ভালো জিনিস, কিন্তু সমস্ত চিত্রকরের (বা সমস্ত লেখকের) কাছ থেকেই একই বিষয় ও আঙ্গিক দাবি করা উচিত নয়। দৃষ্টিভঙ্গি আর রুচির নানা বৈচিত্র্য থাকলে তবেই যথার্থ শিল্পের অস্তিত্ব সম্ভবপর।

আমরা যদি গ্রীক শিল্পকে স্বীকৃতি দিই, নেফেরতিতির মাধুর্য এবং দ্যলাক্রোয়া, নেস্তেরভ বা আরও শত শত ভিন্ন ভিন্ন শিল্পীর ছবির শক্তি উপভোগ করি তাহলে ভ্যান গঘের, তাঁর যথাযথ, দীপ্তিময় রঙের সমারোহ এবং জগৎ সম্বন্ধে তাঁর প্রগাঢ় কল্পদৃষ্টি সমেত ভ্যান গঘের প্রচণ্ড গুরুত্বকে অস্বীকার করি কী করে। তাঁর আঁকা ছবি দেখে আনন্দলাভ করতে মুগ্ধ হতে যে মানুষ অক্ষম তিনি হয় ভণ্ড, না হয় সেই পারস্যের কবি সাদীর ভাষায় বলতে হয় 'শুকনো পুরানো কাঠি'।

ভ্যান গঘ ছাড়া অন্য কারো জীবনে শিল্পের খাতিরে আত্ম-বিসর্জনের এত বড়ো দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া শক্ত। ফ্রান্সে 'শিল্পীদের ভ্রাতৃসঙ্ঘ' গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি, এক ধরনের যৌথজীবন যেখানে কোনো কিছুই এখানকার সভ্যদের শিল্পের সেবা থেকে বিচ্যুত করতে পারবে না।

ভ্যান গঘ নিদারুণ যন্ত্রণাভোগ করেছেন। 'আলুভোজীরা' এবং 'কয়েদীদের ব্যায়াম' ছবিতে মানুষের নৈরাশার চরম গভীরতাকে তিনি স্পর্শ করতে পেরেছিলেন। তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়ে, সমস্ত প্রতিভা দিয়ে যন্ত্রণাভোগের বিরোধিতা করাই শিল্পীর কর্তব্য বলেই তিনি ব্যাপারটিকে দেখেছিলেন।

শিল্পীর কর্তব্য হল আনন্দ সৃষ্টি। আর সে কাজ তিনি করেছেন একটি কৌশলের সাহায্যে যে কৌশলটি তিনি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করেছিলেন—তা হল রঙের প্রয়োগ। ত্রুটিহীন বর্ণসমাবেশ সৃষ্টির কাজে প্রকৃতির পারঙ্গমতা, তাদের বর্ণক্রমের অনন্ত বৈচিত্র্য আর পৃথিবীর বর্ণোদ্ভাসিত হয়ে ওঠা নিরন্তর পরিবর্তিত হয়ে চলেছে, কিন্তু সমস্ত ঋতুকে, সমস্ত আবহাওয়াতেই তা সমান সুন্দর।

প্রভাঁস অঞ্চলের আর্লে শহর ভ্যান গঘের জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। তাঁর আর্লে একটি স্বপ্নের মতো।

আর্লেতে আঁকা তাঁর ছবিতে বিকালের আলো—স্বচ্ছ ও তীক্ষ্ণ সে আলো—এক বিশেষ ত্রিমাত্রিক প্রাধান্য আরোপ করেছে, সেখানকার রোমান মল্লভূমি এখন যেখানে ষাঁড়ের লড়াই চলে, প্রতিবেশী স্পেনের কথা মনে করিয়ে দেওয়া সেই শহরের জলহীন পথের বিরল রেখা, আর ভ্যান গঘের সেই ছোট্ট নির্জন বাড়িটি আজও যা দাঁড়িয়ে আছে বোঝার আঘাতে দীর্ণ এক শূন্য গহ্বরের পাশে, আশেপাশে যে বাড়িগুলো একদিন ছিল বিমান আক্রমণে সব ধ্বংস হয়ে গেছে।

লুভর-এর ইম্প্রেশনিস্ট ছবির গ্যালারিতে ভ্যান গঘ সমেত সমস্ত মহান ফরাসী চিত্রকরের প্যালেট বর্ণপাত্র রক্ষিত আছে। তাঁরটা দেখে মনে হয় আর্লের আঠালো মাটির ডেলা দিয়ে সেটা তৈরি।

গেরিমাটি, মেটে সিঁদুর, লাল মদ, আঙুরলতার পাতায় হেমন্তের রঙ, অনেক কালের মরচে আর স্যাঁতাভাব, সদ্য লাঙল দেওয়া জমির নীলাভ গুরুভারে তা উজ্জ্বল।

তাঁর গাছগুলো, অজানা দৈত্যদের হাতের মোচড়ে তামাটে গিঁট পড়া গাছগুলো নীলাভ ধূসর বল্কলে ঝলমল।

সব কিছুই পুরু আর ঘন। রঙগুলো যেন পরস্পরের প্রতি আতঙ্কে বেড়ে উঠেছে, প্রতিবেশীদের তীব্রতা আর প্রোজ্জ্বলতা সহ্য করতে সক্ষম নয় তারা।

তাঁর ক্যানভাসের উপর মাটির রূপান্তর ঘটিয়েছেন তিনি। অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন জল দিয়ে যেন তাকে তিনি ধুয়েছেন আর তার ফলে এমন জীবন্ত আর গভীর রঙের সম্ভারে তা উজ্জ্বল হয়ে উঠত যে প্রতিটি গ্রন্থিল প্রাচীন বৃক্ষ হয়ে উঠত এক একটি ভাস্কর্যকর্ম, আর প্রতিটি ত্রি-পত্রী পশুভোজ্য গুল্মের মাঠ হয়ে উঠত পুঞ্জ পুঞ্জ বনফুলে বিধৃত সূর্যালোকের প্লাবন।

রঙের নিরন্তর ধারাস্রোতকে তিনি স্তব্ধ করে দিয়েছিলেন যাতে করে তাদের সৌন্দর্য আমরা আত্মস্থ করতে পারি।

এত কিছুর পরেও কেউ কি বলতে পারে যে ভ্যান গঘ মানুষের প্রতি ছিলেন উদাসীন?

মানুষকে তিনি দিয়ে গেছেন যা ছিল তাঁর শ্রেষ্ঠ ধন—ইন্দ্রধনুতে ধরা আছে রঙের যত সূক্ষ্মতম ক্রম তাই দিয়ে উদ্ভাসিত এক পৃথিবীতে বাস করার তাঁর ক্ষমতা।

অনুবাদ : অশেষ মিত্র

ভ্যান গঘ প্রসঙ্গে

পল কক্‌স্‌

আজ একশ বছর হল ভিনসেন্ট ভ্যান গঘ পারি শহরের চল্লিশ কিমি দক্ষিণে ওভার গ্রামের বাহিরে এক খেতে নিজের দেহে গুলি করেন। তারপর কোনোমতে টলতে টলতে যে সরাইখানায় তিনি থাকতেন সেখানে ফিরে এসে সিঁড়ি বেয়ে উঠে দোতলায় নিজের ঘরে গিয়ে পরবর্তী দুদিন মৃত্যুশয্যায় শুয়ে থাকেন। তাঁর ভাই তেও সারাজীবন যিনি তাঁর ভরণ-পোষণ চালাতেন তিনি এসে পৌঁছান মৃত্যুর অল্প কয়েক ঘণ্টা আগে।

পরবর্তীকালে তেও লিখেছেন, 'সে আমার ভারি আপন, আপন ভাই ছিল!' ছ মাস পরে তেও-ও মারা গেলেন। ভিনসেন্টকে ছেড়ে তিনি বাঁচতে পারলেন না। ওভারের গম খেতে ঘেরা ছোট্ট সমাধিক্ষেত্রটিতে তাঁদের পাশাপাশি কবর দেওয়া হয়েছে। এই দুই ভাইকে আলাদা না করাটা খুবই দরকার। তেওর সমর্থন ছাড়া ভিনসেন্টের সঙ্গে কোনোদিনই আমাদের পরিচয় হত না।

আজ সারা পৃথিবীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি দান ও প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হচ্ছে, আর পণ্যভোগকারী সমাজের যা-কিছু দরকার সব তাতেই ভিনসেন্টের আঁকা ছবি ছাপা হচ্ছে। 'যাঁর গা থেকে চাষার মতো গন্ধ বেরুত' আজ তাঁর নামেই একটা সুগন্ধী বাজারে পাওয়া যায়।

বেচারা ভিনসেন্ট—জীবনে একমাত্র তাঁর ভাই দাঁড়িয়েছিল তাঁর পাশে আর তাঁকে টিঁকিয়ে রেখেছিল। মারা গিয়ে সারা পৃথিবীকে তিনি তাড়া করে বেড়াচ্ছেন। শুধু এইটুকুই প্রশ্ন করাই যথাযথ—'কিন্তু কেন?'

তার জবাবও খুব সম্ভবত তাঁর কথাতেই রয়েছে :

'সভ্যতা যাকে প্রগতি বলা হয় তার অনেকটারই অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে আমার খুবই সন্দেহ আছে।'

'সভ্যতায় আমি বিশ্বাস করি না, কেবল একমাত্র প্রকৃত মানবতার উপর যেটুকু প্রতিষ্ঠিত সেটুকুতেই বিশ্বাস করি।'

'আমি কেবল ততটুকুই অগ্রসর হতে চাই যাতে লোকে আমার সম্বন্ধে বলবে—লোকটা গভীরভাবে অনুভব করে—দরদ দিয়ে অনুভব করে। লোকের লক্ষ্য হল মাঝামাঝি ধরনের অবস্থা। তারা আপোস করে, নানান ছাড় দেয়, আজ অমুক ব্যাপারে, কাল তমুক ব্যাপারে, জগৎ সংসারের যখন যেমন দাবি। ওরা জগৎ সংসারের বিরোধিতা করতে ভয় পায়, আর সর্বদাই জনসাধারণের মতামত অনুযায়ী চলে।'

ভিনসেন্ট কেবল বড়ো চিত্রকর আর বড়ো লেখকই ছিলেন না (অনুগ্রহ করে তাঁর পত্রাবলী পড়ে দেখুন), সব থেকে বড়ো কথা হল তিনি এক মহান মানুষ ছিলেন, নিজের সঙ্গে এবং তাঁর পারিপার্শ্বিক জগতের সঙ্গে সর্বদাই পুরোপুরি সৎ ছিলেন।

তাঁর আত্মার পবিত্রতা ও তাঁর আত্মার মহানুভবতা ছিল প্রশ্নাতীত। তাঁর আত্মার আত্মীয় রুশ নর্তক নিজিনস্কির মতো তিনিও চাইতেন সৌন্দর্যের সৃষ্টি করতে, সুন্দর জিনিস সৃষ্টি করতে।

'...কিন্তু সুন্দর জিনিস তৈরি করতে হলে কষ্ট আছে, বিফলতা আছে আর অধ্যবসায়ের দরকার...আর সেই সৌন্দর্য উপাদানসামগ্রী থেকে না এসে আমার ভিতর থেকে আসুক এটাই আমি চাই।'

ওঁরা দুজনেই 'সেই কোমল শুভ্র আলোর কথা বলতেন, যে শুভ্র আলোকরশ্মিতে সত্যকে লোকে দেখতে পায়'।

নিজিনস্কি বলতেন, 'আমার এই উন্মত্ততা হল মানবজাতির প্রতি আমার ভালোবাসা।' আর সত্যিই পাগলও তিনি হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু সাধারণ লোকের সেইরকম বিশ্বাস হলেও ভিনসেন্ট পাগল হননি। নিজের কানের খানিকটা কেটে ফেলা বা যে লোক সেই কাজ করেছে সত্তর মিলিয়ন ডলার দিয়ে তাঁর ছবি কিনে নেওয়ার থেকে বড়ো পাগলামি কী হতে পারে?

সম্পূর্ণ অপরিচিত ও নিঃস্ব অবস্থায় ভিনসেন্ট যখন মারা যান তখন এক দশকেরও কম সময়ের মধ্যে আঁকা তাঁর প্রায় ১৮০০ ছবির মধ্যে মাত্র একখানা তিনি বিক্রি করতে পেরেছিলেন। কিন্তু ভিনসেন্ট কোনোদিন বিশ্বাস হারাননি। তাঁর কাছে সৃষ্টির কাজ হল 'সব থেকে নিঃস্বার্থ ধরনের আনন্দ, ঈশ্বরের সব থেকে কাছাকাছি এই আনন্দ'।

'কিন্তু এই জগতে থেকে (মানুষের লোভ, ঘৃণা ও অজ্ঞতার জগৎ) দেখে ঈশ্বরকে বিচার করলে চলবে। এ শুধু এমন এক ধরনের পর্যালোচনা যা সফল হয়নি। একজন বিরাট শিল্পীই একমাত্র এত বড়ো ভুল করতে পারেন। আর আমাদের এই জীবন, এত যা সমালোচিত, আর তার এত কারণও হয়েছে, এই জীবনকে এর যথাযথ গুরুত্ব সহকারে নেওয়া ছাড়া আমাদের চলবে না। আর সেইজন্যই এই আশাই করতে হবে যে অন্য কোনো জীবনে এর থেকে ভালো কিছু আমরা দেখতে পাব।'

'আমি কিছু জানি না। আর এই না জানার অনুভূতিটাই যে বাস্তব জীবন আমরা যাপন করছি এখন সেটাকে ট্রেনে চেপে একমুখো যাত্রার মতো করে তুলেছে। খুব জোরে চলছ তুমি, কোনো বস্তুকে তাই খুঁটিয়ে আলাদা করে চিনতে পারছ না, আর সব থেকে বড়ো কথা হল, ইঞ্জিনটাকেই তুমি দেখতে পাচ্ছ না।'

'তাই আমার জীবনের শেষে পৌঁছলে দেখা যাবে যে আমি ভুলই করেছি। তাই হোক, তখন দেখব যে কেবল শিল্পকলাই নয় অন্য যাবতীয় জিনিসই নিছক স্বপ্ন। নিজের জন্য কেউ কিছু পায় না। এতই যদি তুচ্ছ আমরা হই...তাহলে কি আর করা, তাই সই। কারণ তাহলে ভবিষ্যৎ অস্তিত্বের সীমাহীন সম্ভাবনার বিরুদ্ধে আর বলার কিছু থাকে না।' এসব যদি কোনো উন্মাদ মানুষের কথা বলে আমরা মনে করি 'আমাদের জন্য ভবিষ্যৎ অস্তিত্বের সীমাহীন সম্ভাবনা' তাহলে থাকছে।

ভাইকে তিনি লিখছেন, '...আমার সূর্যমুখী ফুলের ছবিগুলোর প্রদর্শনী তুমি করতে পার। দেখতে পাবে যে এমন এক ধরনের ছবি যা চোখের সামনে যেন বদলে যায়, আর যত বেশি এর দিকে তাকিয়ে থাকবে ততই বেশি এটা সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে থাকবে।' হ্যাঁ, তাই, তাঁর কাজগুলোকে সযত্নে যেন আমরা দেখি। আধুনিক জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত

আমরা যেভাবে চলতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি সেইরকম ব্যস্তসমস্ত হয়ে যেন সেগুলোকে না দেখি।

ভিনসেন্টের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর তাঁর বন্ধু এমিল বার্নার্দ লিখেছিলেন :

'ফুলের মাঝখানে ভিনসেন্টের দেহটা শুইয়ে দেওয়া হল—রাশি রাশি ফুল, সূর্যমুখী ফুল যা বড়ো ভালোবাসতেন। চারদিকে শুধু হলুদ ফুল আর হলুদ ফুল! এটা ছিল তাঁর প্রিয় রঙ —তাঁর বুকের মধ্যে যে আলো জ্বলত তারই প্রতীক। দেওয়ালে তাঁর আঁকা শেষ ছবিগুলো, তাঁর চার পাশে যেন একটা জ্যোতির্বলয় গড়ে তুলেছে। বাইরে প্রচণ্ড গরম রোদ। যে গির্জাটা প্রচণ্ড আবেগের সঙ্গে উনি এঁকেছিলেন তার পাশ দিয়ে আমরা এগিয়ে চললাম পাহাড়ের উপর ছোটো সমাধিক্ষেত্রটির দিকে। ওঁর ভাই তেও অবিরাম কাঁদছে। আমাদের শিল্পীদের কী দুঃখের দিন সেটা।'

আমাদের সকলের পক্ষেই সেটা বড়ো দুঃখের দিন। ভিনসেন্টের জীবনকে যিনিই খুঁটিয়ে দেখেছেন তিনিই বুঝতে পারবেন তাঁর এই আত্মহত্যার ব্যাপারটা। আমাদের মধ্যে যে-সব ভিনসেন্টরা রয়েছে তাদের প্রতি আমরা যেন আর একটু দরদী, আর একটু সহৃদয় হই। যে মানুষই অনুভব করেন, চিন্তা করেন এবং সংগ্রাম করেন তাঁরই হৃদয় সমগ্র মানবজাতির সঙ্গে এক হয়ে জ্বলতে থাকে।

ভিনসেন্টের কথাতেই বলি : 'ব্যাপারটা যতই ভাবি ততই এই কথাটা আমি অনুভব করি যে মানুষকে ভালোবাসার থেকে বড়ো শিল্পধর্মী ব্যাপার আর কিছুই নেই।'

অনুবাদ : রণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়



‘বিপজ্জনক দুই শিখর, ব্যক্তি ও রচয়িতা’

অরুণ দে-কে লেখা চিঠিপত্র থেকে চয়ন

অলোকরঞ্জন ও ট্রুডবার্টা দাশগুপ্ত

কেন তাঁকে আমরা এখনো এত ভালোবাসি? অথবা এখন, এই মুহূর্তে, আমাদের কাছে তিনি কী করে এমন অনিবারণীয় হয়ে উঠেছেন? পরিগ্রহণের এই মুগ্ধতা তো বিবেকী বিচারযুক্তিকে বরবাদ করে দিয়েই গড়ে ওঠেনি, আমাদের চৈতন্যে তাঁর ব্যক্তিস্বভাব ও শিল্পস্বজ্ঞার দোলাচলের অভিঘাতে তৈরি হয়েছে। জার্মান ভাষায় Rezeptionsasthetik বলে একটি শব্দ অধুনা বারংবার শোনা যাচ্ছে। ‘পরিগ্রহণের নন্দনতত্ত্ব’ বললে বাংলায় এর অনেকটা আদল পাওয়া যায়। ভ্যান গঘ উত্তরকালে আমাদের কাছে কেন প্রবলমাত্রায় পরিগৃহীত হয়ে চলেছেন, সেই নন্দনচর্যায়, ঐ শব্দের দৌলতে, শুধুমাত্র তাঁর শিল্পসাধনাকে ব্যক্তিসামগ্র্য থেকে আলাদা করে দেখলে ভুল হবে।

অথচ তাঁকে নিয়ে বিস্তর ভুল বোঝাবুঝির কারণও নিশ্চয়ই ‘ব্যক্তিমানুষ’ ও রচয়িতাকে একসঙ্গে দেখতে চাওয়ার তাড়না। ভেবে দেখো, ১৮৯২ সালেই, অর্থাৎ শিল্পীর মৃত্যুর বছর দুয়েকের মধ্যেই, নেদারল্যান্ডের শিল্পী রিশার্ড এন রোলান্ড হল্‌স্ট এই মর্মে ভ্যান গঘের ভক্তদের সতর্ক করতে চেয়েছিলেন : ‘এখানে আমরা সেই দুটি বিপজ্জনক শিখর দেখতে পাচ্ছি যাদের কিনারে ঠোক্কর খেয়ে ভ্যান গঘ বিষয়ে যথার্থ মূল্যাঙ্কন বিপন্ন হয়ে পড়তে পারে। আর, সত্যিই তো, এই দুটি শিখর অনেক লেখকের স্বকপোলকল্পনা, যাঁরা তাঁর শিল্পের পরিগ্রহণ তাঁর ব্যক্তিপ্রকৃতির সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেছেন, তাঁর উত্তাল সত্তা ও তজ্জনিত ফলাফলের সঙ্গেই তাঁকে একাকার করেই দেখেছেন। ফলত ভ্যান গঘের প্রণীত শিল্প তাঁর জীবনের বিষাদনাট্যের দৃষ্টান্ত বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। এমন-কি অ-বিশেষজ্ঞের কাছেও পুরো ব্যাপারটা হয়ে উঠেছে অপ্রকৃতিস্থ একজন মানুষের রোগনিদানের অভিজ্ঞান।’

কবিদের কবি হ্যোল্ডারলীনকে নিয়েও আজ অবধি নিয়তিবিধায়ক সমালোচকদের বিচারধারা অনেকটা একইরকম। এখনো ব্যবহারিক নিরিখে তাঁকেও তো উন্মার্গগামী বলে শনাক্ত করা হচ্ছে এবং তাঁর রচিত কবিতাকে সেই উৎকেন্দ্রিকতারই অপরূপ প্রতিন্যাস হিসেবে দেখানোর উৎসাহে এতটুকু ভাঁটা পড়েনি। এভাবেই একালের দুর্জয় দুই স্রষ্টাকে নিয়ে ইতিহাসের এক-একটি বিচ্ছিন্ন মোজেইক জড়ো করে মীথ বা কিংবদন্তী মথিত হয়েছে।

আমাদের কাজ কি তাহলে হবে তাঁর বাঁচার ধরন ও রচনার এই জট খুলে দেওয়া? তার চেয়ে মারাত্মক প্রস্তাব আর কিছুই হতে পারে না। দুর্মর বাঁচার একটি ধাঁচ যদি হয় শিল্পের জন্যে মৃত্যুবরণ, তাহলে ভ্যান গঘের প্রসঙ্গে রোলান্ড হল্‌স্টের বর্ণিত মারাত্মক দুই শিখরের মধ্যেই হয়তো ক্যালাইডোস্কোপের মতো সঞ্চারিত হতে থাকবে মানুষের শিল্প-সংবেদন। ওদের মধ্যে

কোনো একটির উপর পক্ষপাতিত্ব ঘটলে অবিচার হবে। আর যদি একথাটা মেনে নিই যে দ্বৈতচূড় এই পর্বতের অনুপুঙ্খ শিলান্যাস স্রষ্টার নিজের হাতেই সাধিত, তাহলে কিংবদন্তীর ব্যাপারটা যতোখানি কমিয়ে আনা যায় ততোই মঙ্গল। কেননা বাঁচা-মরার পরতে-পরতে ভ্যান গঘ ছিলেন নখাগ্র অবধি চূড়ান্ত সচেতন। তাঁর শিল্পের একটি প্রত্যন্তও আলগা তুলির টানে প্রণীত হয়নি। কেউ খুব ভেবেচিন্তে কোনো কাজ করলে অনেকের মনে হতেই পারে সেই কাজ খুব-একটা শিল্পসুলভ নয়, বরং তার মধ্যে বুঝি বিচক্ষণ বুদ্ধিবৃত্তিই প্রকট। কিন্তু এমন যদি হয় কোনো শিল্পী পণ করেছেন অমোঘ শিল্প সৃজন করতে গিয়ে অথবা করার পরই তাঁর মৃত্যু হবে, তবে তাঁকে এক মুহূর্তও খামখেয়ালি করলে চলে না, অনির্দেশ্য সেই স্বপ্নপ্রয়াণের সাধসিদ্ধির জন্য অত্যন্ত নির্দিষ্ট পরিকল্পনাও করে নিতে হয়। ভ্যান গঘ এই পর্যায়েরই শিল্পী। আঁকবার প্রতিভা ও বীক্ষণ করামলকের মতো তাঁর কাছে একদিনে আসে নি, দিনানুদৈনিক প্রতিচিত্রণ এবং একই মোটিফ —তা সে ফুল বা মানুষের মুখই হোক না কেন—অনবরত মক্শো করার ভিতর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে এসেছে। জগতের আর কোনো শিল্পীই বোধহয় একই বিষয়ের এরকম পুনরাবৃত্তি করেননি। বস্তুত এই অক্লান্ত অনুশীলনই, গানের পরিভাষায় রেওয়াজ, ভিনসেন্টকে নিয়ে গিয়েছে অর্জিত চরিতার্থতার দিকে। তাঁর আরব্ধ দুরূহ ব্রত সম্পন্ন হয়ে যাবার পর তাঁকে ঘিরে যে অধরা মায়া বিচ্ছুরিত হয়েছে, আরোপিত কিংবদন্তীর চেয়ে সেই রহস্যমহিমা আমাদের কাছে অনেক বেশি আদরণীয়।

*

অরুণ, দেয়ালির রাত্তিরে মানবশিল্প সম্পর্কে তোমায় যে কথা লিখেছিলাম, তারই অনুষঙ্গে আরেকটা কথা উঠে এল : মানুষ আর শিল্পীর মাঝখানটায় কি একজন পুরোহিতের অস্বস্তিকর অধিষ্ঠান নেই? কার্ল রুরবের্গ ক্যোল্‌নের নতুন লুভহ্বিগ ম্যুজিয়মের উদ্‌বোধনসূত্রে 'বিশ শতকের শিল্প' বলে যে বইটি লিখেছিলেন তার মধ্যে আমাদের এই অনুমানের সমর্থন আছে। ভ্যান গঘের বাঁচা-মরার অনন্য তাৎপর্য বোঝাতে গিয়ে রুরবের্গ এক জায়গায় লিখছেন, তিনিই আমাদের শতকের নিয়ামক শিল্পীদের মধ্যে উত্তরাপথের প্রথমতম যিনি 'সভ্য' পৃথিবী থেকে (গোগ্যাঁর মতন) না পালিয়ে গিয়ে তাকে বদলে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক চার্চ তাঁকে খারিজ করে দেয়, তাঁকে যাঁরা ভালোবাসতেন তাঁরাও, কেননা অনীশ্বর এই সময়ে তিনি আদি খ্রীস্টধর্ম অঙ্গীকার করে নিয়েছিলেন। রুরবের্গের এর পরের উক্তিটি কিছু গোলমেলে : 'যেহেতু পুরোহিত এবং সংস্কারক হতে গিয়ে তিনি ব্যর্থকাম হলেন, সেই কারণেই তিনি শিল্পী হয়ে উঠলেন। একাই তিনি কাজ করতে থাকলেন, যে-সমাজ তাঁকে পরিত্যাগ করেছে তার এবং যাকে আজকাল বলা হয়ে থাকে বাণিজ্যিক আর্ট সোসাইটি তার বহির্দেশে। তাঁর জীবনের ঐ ওয়ান-ম্যান শো তিক্তভাবেই শিল্পী ও পাবলিকের ভিতরকার স্ফারিত ফাটলটাকে দেখিয়ে দেয়, বুঝিয়ে দেয় রোমান্টিক পর্ব থেকেই প্রথাবাহিত ক্লিশেগুলি ছাড়া সমসাময়িক শিল্পীকে বুঝে ওঠা কীরকম অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্রিটিশ শিল্পী ফ্রান্সিস বেকন সহমর্মীর একাত্মতা নিয়ে ডাচ শিল্পীর বিদারক নিঃসঙ্গতার একটি আলেখ্যসিরিজ এঁকে তুলেছেন : ভিনসেন্টেরই দ্বারা প্রাণিত সেই চিত্রপরম্পরায় আমরা দেখতে পাই ক্রুশবাহী আরেক যীশুর যন্ত্রণাযাত্রার এক-একটি স্টেশন, তফাৎ শুধু ক্রুশের বদলে আঁকার সাজসরঞ্জাম পিঠে বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন এই যীশু, যাঁর নাম ভিনসেন্ট।'

গ্রন্থকারের বর্ণনা মর্মভেদী এবং সঠিক, শুধু তাঁর স্বতঃসিদ্ধ উপপাদ্যটি ভুল। মানুষ ভিনসেন্ট এবং শিল্পরচয়িতা ভ্যান গঘের অন্তর্বর্তী প্রাণপুরুষ, প্রকৃত প্রস্তাবে, একজন নতুন মাত্রার পুরোহিত, যিনি অবান্তর দেবায়তন বরবাদ করে দিয়ে নির্জিত, শরণার্ত মানুষকেই ভুবনেশ্বরের জায়গায় অধিষ্ঠিত করেছিলেন। পুরুতের ছেলে বিধিসম্মত পুরোহিত বনতে পারেননি বলে তাঁকে ছবি আঁকতে হয়েছিল বললে ইতিহাসের অপলাপ ঘটে। একটি কুমারীর অবধারিত মৃত্যু প্রতিহত না করতে পেরে সাহিত্যের কাছে ফিরে গিয়ে যিনি প্রথম *মাদাম বোভারির* নিউরলজিক্যাল উপসর্গকে একটি চিঠিতে [৩৭৫] কবিতার ধ্রুবপদে বাজিয়ে তুলে আচম্বিতে বলে ওঠেন : 'এ সেই কোন ধর্ম যা শুধু ভদ্র এলিটেরই পোষ্যপোষক—আহ্, এ কি উদ্ভট কাণ্ডকারখানা যা পুরো সমাজটাকেই পাগলাগারদে পরিণত করে দেয়, হায়, এ কি মিস্টিকপনা!' তাঁকে পুরোহিত বলব না শিল্পী বলব? নাকি দুয়ের মধ্যে সীমারেখা দেগে দিয়ে অধ্যুষিত রেখে দেব আমাদের বোধশক্তির অসীম সম্ভাবনাময় মহাবিশ্বকে?

অথবা, অরুণ, মনে করে দেখো, অর্থপিশাচ হাড়কঞ্জুষ সেই জুয়েলারের কথা, হেরমান্‌স্ যাঁর নাম, যিনি ভিনসেন্টকে সারা জীবনে একবারের মতো বায়না দিয়ে ঠাউরে নিয়েছিলেন, একই সঙ্গে দুঃস্থ শিল্পী ও বিত্তবান দেবতাত্মার জন্য বেশ-কিছু-একটা করা গেল। তাঁর খাবার ঘরটা তিনি, বলা বাহুল্য, ভুঁইফোঁড় বড়োলোকদের মতোই অলংকৃত করতে চেয়েছিলেন। 'তিনি চেয়েছিলেন অবতারদের কম্পোজিশন দিয়েই ঘরটাকে সাজিয়ে দিই। আমি তাঁকে বললাম, ভেবে দেখুন, চাষীদের জীবনসংস্থানের দৃষ্টি উপস্থাপনা আমি পেশ করব, যার মধ্যে থাকবে চার ঋতুর প্রতীকী পরিচয়। আর সেই দৃশ্যায়ণই খাবার টেবিলে সমবেত লোকজনদের খিদে উশ্‌কে দেবে। সেটাই কি তথাকথিত মিস্টিক গণ্যমান্যদের চেয়ে আরো উদ্দীপক হবে না (ভ্যান গঘের পত্রাবলি/ ৩৪৭)? কী সেই তাঁর উপস্থাপনার বিষয়াবলি? আলু রোয়া, গোরু দিয়ে হলকর্ষণ, শস্যসংকলন, বীজ-বুনে-দেওয়া-চাষী, ঝোড়ো রাখালের দঙ্গল, তুষারের মধ্যিখানে জ্বালানি কাঠজোগানো। ধনাঢ্য স্পন্সরের ভোজনশালায় দীনদুঃখী মানুষজনের জীবনসংগ্রামের এই সমাবেশ ঘটিয়ে তোলা কি একাধারে শিল্পী তথা সংস্কারক তথা পুরোহিতের বৈপ্লবিক প্রবর্তনা নয়? মানুষের জীবনে, বিশেষত আমরা যাকে 'সাধারণ' মানুষ বলে ভুরু বাঁকাই, কি এই দুই অথবা ত্রিসত্তা সমীকৃত হয়ে নেই? যেহেতু একেবারেই মাটি ঘেঁষে শিল্পস্বর্গের দরজা খুলেছিলেন ভিনসেন্ট, এই সমস্ত ভূমিকা তাঁর মধ্যে ওতপ্রোত হয়ে গিয়েছিল। আপাতত, আমাদের প্রদত্ত কনটেক্সটে, তিনি সেই পুরোহিত যিনি বিবেকী চাবুক মেরে একজন অসাড় প্রযোজকের সংবেদনশীলতা জাগিয়ে তুলছেন। এবং সেটা তিনি করছেন ভালোমানুষির অছিলায়, অর্থাৎ স্পন্সরপ্রদত্ত কর্তব্য পালন করেও, উচিত প্রশিক্ষণের প্রচ্ছন্ন সম্পাদনে। যারা দু-বেলা অভুক্ত থাকে তাদের চোখের সামনে মহাভোজ উদ্‌যাপিত হচ্ছে, এর চেয়ে নির্মমতর বিরোধাভাসের পরিহাস আর কী হতে পারে?

'একমাত্র তিনিই শিল্পী, যাঁর আছে একটি নিজস্ব ধর্ম, আর অনন্ত বিষয়ে স্বকীয় ধারণা', ফ্রীডরীশ শ্লেগেলের এই উচ্চারণ ভিনসেন্টের প্রসঙ্গে বারেবারেই আমরা শুনেছি। ধর্মান্ধতার যুগে এই নির্ধারণ, অন্তত প্রথমবার শুনলে, কিছু বিভ্রম জাগাতেই পারে। কিন্তু দ্বিতীয় অভিনিবেশেই নিজস্ব শব্দের রণন আমাদের সমানুভূতি আদায় করে নেয়।

নিতান্তই স্বল্পপরিচয়ের ভিত্তিতে 'অতিশয় বিনয়ী এবং অত্যন্ত লাজুক' ভিনসেন্ট তাঁর বন্ধু

গ্যোরলিৎসের ঘরের দেয়াল জুড়ে একরাশ বাইবেলভিত্তিক ছবি সেঁটে দিয়ে প্রতিবারই চিত্রিত খ্রীস্টের মুখাবয়বের নিচে লিখে রেখেছিলেন : 'সদা বিষণ্ণ, অথচ কেমন সুচির স্মিতোজ্জ্বল'। এই শিল্পঘটনায় যে-ধর্মীয়তা আছে সেটি শিল্পীর একান্ত সহজাত ও মজ্জাগত, স্ববিরোধীর সৌন্দর্যে দীপ্যমান।

স্বভাবের এই চোরাটানেই ভ্যান গঘ ইংল্যাণ্ডের আইলওয়র্থে তাঁর প্রথম ধর্মোপদেশ দিতে চলে গিয়েছিলেন। তার বয়ানটি তোমায় আলাদা ডাকে পাঠাচ্ছি। যাকে বলে দেবায়তনের ভাষণমঞ্চ থেকে প্রদত্ত এই কথকতায় তাঁর শিল্পজীবনের সবগুলি ধ্যানধারণা ও প্রসঙ্গপরিধি আভাসিত হয়ে আছে। ভাষণের শেষ দিকের অংশটিতে ('আমি একবার ভারি সুন্দর একটি ছবি দেখেছিলাম') পাহাড়িয়া সূর্যাস্তের আভায় সমর্পিত তীর্থযাত্রীর যে মুখচ্ছবি আঁকা আছে সেটি ধ্যানীর বীক্ষা না শিল্পীর বীক্ষণ ঠাহর করা ততো সহজ নয়। এই কথিকাতেও দেখি চিরসন্ধানী যাত্রিকের জন্য সেন্ট পলের সঙ্কেতগ্রন্থিল সেই নির্দেশ : 'সদা বিষণ্ণ, অথচ কেমন সুচির স্মিতোজ্জ্বল'। সন্দেহ নেই, তাঁর নিত্যপ্রিয় টমাস এ কেম্পিসের Imitation of Christ বইয়ের মন্ত্রণা ('পৃথিবীতে তুমি প্রবাসী এবং অতিথি হয়েই থেকো') তাঁর এই ধর্মকথার আড়ালে কাজ করেছে। কিন্তু চিত্রকল্পখচিত প্রস্বর তাঁর গহন স্বভাবেরই উপহার।

অরুণ, তুমি কি জানতে, বাইবেলকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নিজের মতো করে বুঝবার নেশায় ভিনসেন্ট কদ্দূর পর্যন্ত গিয়েছিলেন? কাকার উৎসাহে বইয়ের ব্যবসায়ী হবার জন্য যখন শিক্ষানবিশি করছেন, সে সময় বইয়ের দোকানে সেলারে বসে রাত্রিদিন বাইবেলের হল্যান্ডীয় ভাষ্য তিনি ইংরেজি, ফরাসী ও জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেন। এই উচ্চাশী অনুবাদ কাজে তাঁর সাহিত্যস্নায়ুর পরিচয় যতই থাকুক না কেন, বইয়ের দোকান যে উঠে যাবার উপক্রম হয়েছিল, সেটা তো সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আমাদের সান্ত্বনা, এসব অনুবাদ কাজের মধ্যে তিনি বধির শাস্ত্রীয়তার বদলে খুঁজে দিয়েছিলেন তাঁর একরোখা ব্যক্তিধর্মের আস্বাদ যা তাঁর পরবর্তী চিত্রকর্মে প্রবহমান এবং পুনর্নব হয়ে থেকে গিয়েছে। সে কারণেই বলা যায়, তাঁর শিল্পস্বভাব এবং মানবপ্রকৃতির মধ্যে পৌরোহিত্য কোনো বিভাজক নয়, বরং যোজক একটি শর্ত।

*

তোমায় চিঠি লিখতে-লিখতে মনে হচ্ছে, ভ্যান গঘ যদি একটিও ছবি না এঁকে শুধুমাত্র চিঠিই লিখে যেতেন, তাহলেও শিল্পী বা সাহিত্যব্রতী হিসেবে আমাদের মনে তাঁর একটি ভাববিগ্রহ ভাস্বর থাকত। এখন পর্যন্ত সংখ্যায় আটশোর চেয়েও বেশি চিঠিপত্রের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে, যাদের রচয়িতা তিনি। বিশ্ববিদিত কিণ্ডলার সাহিত্যকোষের কাছে এসব চিঠি 'স্বপ্রতিষ্ঠ ভাষাশিল্প'-এর নিদর্শন। ভ্যান গঘে আজন্ম নিমগ্ন ইঙ্গো হুলথার ও রাইনার মেৎসগারের মতো খুঁতখুঁতে সমালোচকদের কাছে এই পত্রাবলি 'অন্য আরেক চিত্রকলা'।

সে কি শুধু এজন্যই যে এসব চিঠির মধ্যে তাঁর কেন্দ্রীয় নন্দনচিন্তা উজাড় করে দেওয়া হয়েছে? নাকি এজন্যেও যে তাঁর এক-একটি ছবির প্রক্রিয়া ও প্রস্তুতি এদের ভিতরে পর্যাপ্ত পরিমাণে অনুস্যূত? সংশয় নেই, এই ভাবাসঙ্গের অজস্র আবহবিভাব এই চিঠিগুলিকে ঋদ্ধ করে তুলেছে। অন্তঃকরণ এবং উপকরণের সম্ভারবৈচিত্র্যে এরা আমাদের এত আ-ঋণী করে রেখেছে যার ফলে তাঁর বিষয়ে লেখা জ্ঞানগর্ভ সন্দর্ভসমূহ না পড়ে শুধু তাদের ভিতরে মজে থাকলেই

আমাদের তাবৎ ঔৎসুক্য পুরস্কৃত হতে পারে।

কিন্তু তত্ত্বগত ও তথ্যগত মূল্য বাদ দিয়েও ভিনসেন্টের লেখা চিঠিগুলির মধ্যে অতিশায়ী এমন এক আত্ম-অতিক্রান্তি ছড়িয়ে আছে যার সাহায্যে তাঁর মনের একেবারে মুখোমুখি হয়ে আমরা দাঁড়াই, নিজেদের সীমাবদ্ধতা বিষয়ে বড়ো অকৃতার্থ বোধ করি।

১৩ ডিসেম্বর ১৮৭২-এ ভাই তেওকে তিনি লেখেন : 'পরস্পরের কাছে আমাদের এক নাগাড়ে চিঠি লিখে যেতে হবে।' এই চ্যালেঞ্জের প্রায় দু-দশকের মধ্যে লেখা হয়েছে তাঁর উদার হৃদয়ের কোরক থেকে উৎসারিত পত্রপুঞ্জ। অধিকাংশ চিঠিরই, এমন কি আসন্ন মৃত্যুর মুখে লেখা চিঠিখানিরও, প্রাপক তাঁর সেই ভাই। এমন নয়, আমাদের কবির প্রস্তুতিকালে রচিত ছিন্নপত্রের প্রাপয়িত্রীর মতো তেও তাঁর ভাইয়ের কাছ থেকে নিংড়ে নিয়েছিলেন এই সমস্ত শিকড়-সমাচার। ভিনসেন্ট নিজেরই অস্তিত্বের গরজে ভাইয়ের কাছে তাঁর অন্তর্জীবন ব্যক্ত করে চলেছিলেন। তাঁর উদ্‌যাপিত পূর্বসূরি দ্যলাক্রোয়াও একই তাড়নায়, নিজের সম্মুখীন হওয়ার চাহিদায় একটানা চিঠি লিখতে-লিখতে নতুন করে আবিষ্কার করেছিলেন Ut pictura poesis বা চিত্রকলা ও কবিতার পরস্পরস্পর্শিতার প্রাচীন সেই সত্য।

মনে রাখতে হবে, নিজের সম্পূরক সত্তার সঙ্গে বিনিময়ের মাধ্যমে নিজেকে পার হয়ে যাবার উদ্‌ঘাটন স্পষ্ট। জার্মান সাহিত্যের রোমান্টিক পর্বে এরই বিভাবনায় পত্রোপন্যাস একটি স্বচিহ্নিত সংঘটন হয়ে উঠেছিল। ক্লেমেন্‌স্ ব্রেন্টানোর রচনায় এই প্রবণতা রোমান্টিকতা ছাপিয়ে গিয়ে বিশ্ববোধের সমার্থক হয়ে উঠেছে। ভিনসেন্টের পত্ররচনায় এই সাহিত্যধারার প্রভাব অলক্ষ্য নয়। কিন্তু একটি এষণা তাঁর ক্ষেত্রে একেবারেই নতুন। নিজেকে এবং নিজের সৃজ্যমান শিল্পকলাকে অন্য-একটি সত্তার উপযোগী করে তোলার এই আর্তি, রবীন্দ্রনাথকে ধরেই বলছি, শিল্পীর বাস্তবতাকে স্বয়ম্পূর্ণ একটি বর্গ হিসেবে দাঁড় করিয়ে দেয় : 'তোমার কাছে যেসব সুযোগ পেয়েছি তার সমতুল্য ততো ভালো ছবি আমি এখনো এঁকে উঠতে পারিনি। কিন্তু বিশ্বাস করো, একদিন যদি সেটা পেরে উঠি, তাহলে জেনো তুমিও তাদের রচনা করেছ, কেন না আমরা দুজনেই সেসব ছবি এঁকে তুলছি (পত্রসংখ্যা ৫৩৮)।'

তেও, এই প্রশংসার উপযুক্ত পাত্র, নিজেকে করে তুলেছিলেন নিমিত্তমাত্র আধার। সেজন্যেই ভাইয়ের শতপ্লাবী সৃষ্টির শরিক হিসেবে কখনোই তিনি দাবি করেন নি। একমাত্র অহংকার ছিল তাঁর, ভিনসেন্টের কাছ থেকে তিনি যত চিঠি পেয়েছেন এমন সৌভাগ্য আর কারো হয়নি। এবং তাঁর সংগতভাবেই মনে হয়েছিল, ভাইয়ের জীবন ও রচনার ভাণ্ডারী হবার অধিকার তাঁরই। ভিনসেন্টের মৃত্যুর পর যখন তিনি একেবারেই নির্জীব হয়ে গিয়েছিলেন, খুঁজে চলেছিলেন এমন-কোনো তৃতীয় ব্যক্তিকে যিনি উষ্ণ দূরত্ব থেকে তাঁর ভাইয়ের জীবনী লিখতে পারেন। পারি থেকে ২৭ অগাস্ট ১৮৯০-এ আলবেয়ার ওরিয়েরকে লেখা তাঁর চিঠিতে তেওর সেই অন্বেষা স্পন্দমান : 'আপনিই প্রথম ওকে বুঝতে পেরেছিলেন, শুধু বড়ো আঁকিয়ে হিসেবে তার ক্ষমতাকে নয়। ওর সৃষ্টিকাজ কী করে পড়তে হয় তার হদিশ পেয়েছিলেন এবং তারই মধ্য থেকে **মানুষটাকে** ধরতে পেরেছিলেন। অসংখ্য লেখক আমাকে জানিয়েছেন, ওর বিষয়ে কিছু লিখবেন। তাঁদের সবাইকে আমি অনুরোধ করেছি, আর একটু তর সইতে। কেননা আপনাকেই আমি এ বিষয়ে প্রথম কথা বলার সুযোগ দিতে চাই। এবং আপনি ইচ্ছে করলে ওর বিষয়ে প্রথম জীবনীর লেখক

আপনিই হতে পারেন। এজন্য যাবতীয় সত্যসহ উপাদান আপনাকে আমি জোগাতে পারি, যেহেতু তার সঙ্গে তেয়াত্তর থেকে পত্রবিনিময় ও আরো বেশ কিছু আকর্ষণীয় দলিল আমার কাছেই আছে।' তেও এবং তাঁর স্ত্রী নিজেদের একেবারে আড়ালে রেখে দিয়ে ভিনসেন্টের জীবনালেখ্য লিখতে আরেকজনকে উদ্‌বুদ্ধ করেছিলেন, এ এক বিস্ময়কর এবং শ্রদ্ধেয় মনস্কতা। এঁরা দুজনেই খুব ভালো লিখতে পারতেন, তবু সামীপ্যের তাগিদে নিরপেক্ষতা পাছে আহত হয়, সেই আশঙ্কায় তাঁরা এ কাজে হাত দেননি।

আলবেয়র ওরিয়ের বুঝতে পেরেছিলেন, এ কাজ কতো কঠিন। ভিনসেন্টের জীবনের খাঁজে-খাঁজে ঐশী ও ঐহিক শক্তির টানাপোড়েন কীভাবে কাজ করছে সেটা ধরবার আশায় শিল্পীর জীবদ্দশার শেষ পর্যায় থেকেই তিনি হন্যে হয়ে এর-ওর কাছে হানা দিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে একজন শিল্পীর বন্ধু এমিল বার্নার্দ। তাঁর একটি চিঠি থেকে আলবেয়ার পথের সন্ধান পেয়েও গিয়েছিলেন : 'তীব্র মরমিয়াবাদে আলোড়িত হয়ে বিচ্ছিরি সব জায়গায় ঘুরে-ঘুরে হতচ্ছাড়া মানুষদের বাইবেল শুনিয়ে আমার এই বন্ধু শেষ পর্যন্ত ভেবে নিয়েছিল, ও নিজেই যীশু খ্রীস্ট, ঈশ্বর।' এমিল বার্নার্দ তুলিকলমের এক আঁচড়ে ভ্যান গঘের শহিদত্বের ইতিহাস, মনুষ্যসমাজ থেকে নির্বাসিত হয়ে সন্তসংস্কারক হয়ে ওঠার বৃত্তান্ত বর্ণনা করে চিঠির শেষে লিখছেন : 'প্যারিসে এসে পৌঁছুনোর আগে এই হল ওর জীবনের কয়েকটা পৃষ্ঠা। আর প্যারিসে পৌঁছে বেশ্যাদের জন্য তার অবর্ণনীয় মনুষ্যত্ব; আমি স্বয়ং তার আত্মোৎসর্গের দিব্য [এখানে মূলে 'সাব্লাইম' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে] দৃশ্যগুলির অন্তরঙ্গ সাক্ষী। পরিশেষে আর্ল-এ ওর হঠাৎ যাত্রা, গোগ্যাঁর নাটুকে পিটটান...আর সেই সংবাদ, ভিনসেন্ট হাসপাতালে...'

ভ্যান গঘকে সমগ্রের প্রেক্ষিতে বুঝতে হলে তাঁর পরিপার্শ্বে লেখা এই টুকরো চিঠিগুলি পড়াও জরুরি। এবং সেই সঙ্গে মনে রাখা দরকার, তাঁর নিজের চিঠি, শতসহস্র উৎসর্জন ও মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বাঁচার ও বাঁচানোর দলিল, নাটকীয়তার উপসর্গ থেকে কতো মুক্ত। সমসাময়িক শিল্পীদের একসঙ্গে বাঁচার আমন্ত্রণ জানিয়ে তিনি যখন লিখছেন, সংঘবদ্ধ হয়ে ছবি বিক্রির ব্যবস্থা না হলে সবাই না খেয়ে মরবে, তখনো তাঁর পত্রের স্বরায়ণ কতো দূরান্বয়ী এবং আত্মবিলোপী। শিল্পীরা তো প্রকৃতপক্ষে দ্রষ্টাই। ভ্যান গঘের মৃত্যু ভাঙিয়ে আজ ব্যাঙ্কের দালালেরা দুনিয়া জুড়ে যে-মাফিয়াতন্ত্রের ফাঁদ পেতেছে, সেদিকে নজর দিলেই আমরা ঠাউরে নিতে পারি, শিল্পীর সেই স্বগত অথচ সমবায়ী আহ্বান আমাদের একতিল স্পর্শ করেনি।

*

ছবি-আঁকার ব্যাপারটাকে ভিনসেন্ট কখনোই স্বয়ংসিদ্ধ কৃতিকর্ম বলে গণ্য করেননি, বরং চারপাশের লেখক ও শিল্পীদের কাছ থেকে সমাহারের আয়োজন তাঁর কাছে যে অপরিহার্য ঠেকেছিল, তাঁর চিঠিপত্রে এর সমাচার জীবন্ত। ভাবতে মজা লাগে, আধুনিক শিল্পের জনক প্রতিভা এই মানুষটি তাঁর সমকালে চলিত আধুনিক চিত্রকলাকে দ্যলাক্রোয়া ও মিলের স্বাস্থ্যকর শিল্পায়ণের সঙ্গে তুলনায় অবক্ষয়ের লক্ষণাক্রান্ত বলে মনে করেছিলেন। তৎসত্ত্বেও সমকালীনের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থেকেই আধুনিকতার সূচনা ঘটানো ছাড়া গত্যন্তর নেই, একথা তিনি মর্মে-মর্মে জানতেন।

কথাপ্রসঙ্গে, অরুণ, তোমায় এই অনুষঙ্গেই লিখেছিলাম তাঁর সমসময়ের লেখক এমিল

জোলার কথা। তাঁর *জার্মিনাল* (১৮৮৫) বেরুনোর চার সপ্তাহের মধ্যেই বইখানি ভিনসেন্টের হাতে পৌঁছে গেছে (পত্রসংখ্যা ৪০৯) এবং অতঃপর তাঁর ছবির ভিতরে ঔপনাসিকের মৃণ্ময় জগৎ সক্রিয় হয়ে উঠেছে, সে বিষয়েও চিঠিতে তোমার সঙ্গে আড্ডা হয়েছে। জোলার *মানুষের ভিতরে জন্তুটা* (La bête humaine/১৮৯০) উপন্যাসে মাটির পৃথিবীটাকে ছাপিয়ে যে-আলোর বন্যা বয়ে গেছে, সেটির পিছনেও তৎকালীন চিত্রচর্যার প্রভাব ছিল দুর্বার। অন্তত এদুয়ার্দ মানে-র প্রত্যক্ষ অনুভাব। তোমার মনে আছে তাঁর আঁকা 'এমিল জোলার আলেখ্য' (১৮৬৭-৬৮)। আর তার দশ বছরের মধ্যেই অঙ্কিত হল তাঁর *নানা*! আর ঠিক তার তিন বছরের মধ্যেই জোলার ক্রান্তিকর উপন্যাস *নানা* প্রকাশিত হল! জোলার ন্যাচারালিজম আর ভ্যান গঘের সমীপকালীন ও অঙ্গীকৃত ইম্প্রেশনিজম কি একই প্রাণপ্রেতির ফল নয়? এই অন্যোন্য প্রাণনের রহস্য বুঝে নিতে গেলে ভিনসেন্টের আয়ুষ্কালে যে-সব প্রতিভা জন্ম নিয়েই একরকম সৃজনযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তাঁদের মধ্যে কয়েকটি নাম এই প্রসঙ্গে এক নিশ্বাসে উচ্চার্য : মাক্স ক্লিঙার, এডোয়ার্ড মুন্‌শ্, তুলুস-লোত্রেক, কাণ্ডিন্‌স্কি, এমিল নোলডে, আঁরি মাতিস, রিলকে, টোমাস মান, কুবিন, পাউল ক্লে, কির্শনার (যাঁর বিষয়ে আরেকটি চিঠিতে কিছু বলতেই হবে), পিকাসো, ওস্কার কোকোশ্‌কা, মার্ক শাগাল। প্রাণপণে তালিকাটিকে সংক্ষিপ্ত করা গেল। সাহিত্যের [এবং সংগীতের] বেলায় আর কোন-কোন প্রাণপুরুষ বিশ্বসংস্কৃতির ইতিহাসের সবচেয়ে প্রাণবন্ত ঐ কালপর্বে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেই নামাবলি এখানে প্রদর্শন করার লোভ সামলে নিচ্ছি। কিন্তু সময়ক্রমিক রেখাচিত্র আঁকার প্রবণতায় তখনকার সৃষ্টিময় নানান দীপনরশ্মির সমাবেশের ব্যাপারটা এখানে উল্লেখ না করে পারছি না : গাঁয়ের ইশকুলে ভিনসেন্ট যখন চলেছে, দ্যলাক্রোয়া সবেমাত্র প্যারিসে তাঁর ফ্রেস্কোগুলির কাজ শেষ করে নতুন আরম্ভের কথা ভাবছেন। ছাত্রাবাসে থাকার সময় হ্বাগনারের *ট্রিস্টান ও ইসোল্ডে* আর ডস্টয়েভ্‌স্কির *পাপ ও প্রতিশোচনা* (Prestuplenie i nakazanie) সমাপ্ত। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়বার সময়েই *দাস কাপিটাল* প্রকাশিত। আর তারপরেই শিক্ষানবিশ হিসেবে গুপিল অ্যান্ড কোম্পানিতে তিনি যখন যোগ দিয়েছেন, তাঁর প্রিয়তম ঔপন্যাসিক টলস্টয়ের *যুদ্ধ ও শান্তি* (Vojna i mir) সদ্যই বেরিয়েছে। যখন ভ্যান গঘের চিত্রাঙ্কন তুঙ্গ চুড়োয়, অর্থাৎ Salon des Indépendants-এ তাঁর নাম আলোচিত হচ্ছে, তারপর থেকে তাঁর জীবনে ছবি-গান-লেখা এককথায় মানুষের সৃজনাত্মক ভাবুকতার এক-একটি অভিজ্ঞতার মধ্যে পরস্পরবিভাজক কোনো সমান্তর কালক্রম নির্ণয় করে দেওয়া শক্ত হয়ে পড়ে। ধরা যাক ১৮৮৬ সালের জড়াপালটা : তুলুস-লোত্রেকের সঙ্গে প্যারিসে মার্চ মাসে দেখা ও ইম্প্রেশনিজম কবুল করে নেওয়া এবং হেমন্তে গোগ্যাঁর সঙ্গে প্রথম আলাপ; দেগার 'স্নানের মায়াজাল' ছবির সঙ্গে পরিচয় এবং টলস্টয়ের *ক্রয়ৎসার সোনাটা* (Krejcerova Sonata/ গ্রন্থাকারে প্রকাশ : ১৮৯১) উপাখ্যান বিষয়ে কানাঘুষো তাঁর কানে পৌঁছে গেছে। Salon des Indépendants-এর তৃতীয় অনুষ্ঠান ঠিক তার পরের বছরের ঘটনা। প্যারিসে তখন সবচেয়ে জবর খবর ভ্যান গঘের অন্যতম পথিকৃৎ মিল্যের ছবির প্রদর্শনী; গোগ্যাঁর ঝোঁক তখন কিন্তু গানের দিকেই, পানামা আর মার্টিনিক থেকে নভেম্বরে ফিরে এসে আবারও ভের্দির সংগীতনাট্য 'ওথেলো' দেখতে ও শুনতে ছুটেছেন ; প্যারিসে হ্বাগনারের 'লোহিনগ্রীন' অনুষ্ঠিত হবার পর ইয়োরোপে কোথাও এমন কোনো শিল্পী নেই যিনি তাঁর সম্মোহ পরিহার করতে ব্যস্ত। ভিনসেন্ট

ভ্যান গঘের জীবন ও শিল্প তাঁর আয়ুষ্কালের এই সব ঘটনার শামিল।

এতক্ষণ এসব আপাত অবান্তর কথা লেখার পরেও মনে হচ্ছে, শিবের গীত গাইতে গেলে ধান ভানার কথাও বলতে হয়। ভ্যান গঘের পরিণত পর্যায়ের ছবিগুলি তলিয়ে দেখলে তাদের মধ্যে তাঁর কালের নানা সৃষ্টিমুখী ব্যক্তিত্ব তথা শিল্পের (অর্থাৎ সাহিত্যেরও) বিভিন্ন শাখাপ্রশাখার অন্তঃশীল যোগাযোগের দ্যোতনা উঠে আসে, যদিও সব সময় চোখে আঙুল দিয়ে সেটা প্রমাণ করা সম্ভব হয় না। তিনি খড়ের টুপির উপর কয়েকটা মোম জ্বেলে তাদের ক্ষীণ রশ্মি ইজেলে প্রতিফলিত হলে সেই বিপুল সংযোগের আভাস পেতেন। তখন যে সব ছবি আঁকা হত সেগুলিকে স্বয়ংস্বাশ্রিত চিত্রচর্চা বলে মনে করার কারণ নেই। বেলজিয়ামের কবি ও চিত্রকর অয়গেন বখ্-এর প্রতিকৃতির মধ্যে এই ধরনের ছবির অন্তিক বিভূতি আমরা দেখতে পাই। এখানে ভিনসেন্ট রাত্রির পটভূমিকায় তাঁর সেই বন্ধুর ছবি এঁকেছেন। ৫৪৩-সংখ্যক চিঠিতে তিনি 'জীবন্ত বন্ধুবান্ধবের আবির্ভাব' ঘিরে তাঁর স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করেছেন। একই স্বপ্নের সৌজন্যে তিনি জানিয়েছেন বিশ্বচরাচরের হার্মনির প্রতিবেদন : 'একটি ছবিতে সংগীতের মতন সান্ত্বনা নিবেদন করতে চাই (পত্রাঙ্ক ৫৩১)।' ছবির মধ্যে সংগীতের ব্যাপ্তি, আততি প্রকাশ করার তিয়াষায়, প্রসঙ্গত, শোপ্যাঁর প্যাটার্নযুক্ত সুরবিহারের (improvisation) কাছেও ছুটে গিয়েছেন।

আঁকার পাঠ নিতে গিয়ে কখনো-কখনো হালকা সাহিত্যের ভিতরেও পর্যটনের ঝুঁকি নিয়েছেন ভিনসেন্ট। উদাহরণ, পিয়ের লোতির (১৮৫০-১৯২৩) *মাদাম ক্রিসানথীম* পড়তে গিয়ে তাঁর কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল 'ঘরগুলি সেখানে নগ্ন এবং রিক্ত, চিত্রহীন এবং নিরলঙ্কার' (পত্রাঙ্ক ৫১১)। জাপানি ছবির কাছ থেকে শিখে-নেওয়া অলঙ্কারহীন সৌন্দর্যের মহিমা তখনই তাঁর মনে ও ছবিতে জায়গা করে নিয়েছে।

বিশেষত সাহিত্যের প্রতি শিক্ষার্থীর ভালোবাসা নিয়েই এগিয়ে এসেছেন তিনি। সেখান থেকে ছবির জন্য শুধু রসদ নয় সাহসিক প্রত্যয় তিনি বারংবার সংগ্রহ করে এনেছেন। তা নইলে জোলার দোহাই দিয়ে একথা বলতে পারতেন না : '...আমরা তো *ধরিত্রী* (La terre) পড়েছি। তাই যখন আমরা চাষীর ছবি আঁকি, তখন এটাই তো দেখাতে চাই, এসব বই পরিণামে আমাদের বাঁচারই অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গিয়েছে (পত্রাঙ্ক ৫২০)।' জানিনা আর কোনো চিত্রকর সমসাময়িক সাহিত্যকে এতখানি স্বীকৃতির মর্যাদা দিয়েছেন কিনা। তবু আধুনিকতার সংজ্ঞায়নে স্বকাল থেকে উৎসে তাঁকে হানা দিতে হয়েছে। অনায়াসেই তিনি চলে গেছেন হোমার পর্যন্ত আদিকবির কাছে, তারপর এক ঝটকায় ফিরে এসেছেন শেক্সপীয়রের রাজবৃত্তের নাটকগুলির কাছে : *রিচার্ড দি সেকেন্ড, হেনরি দি ফোর্থ,* এমন-কি ফিফ্‌থ। কী খুঁজেছেন তিনি আমাদের কাছে তুলনায় অনাকর্ষীয় এসব নাটকে? খুঁজেছেন মানুষের কথা বলার স্পন্দ। খুঁজেছেন মানুষের নিত্যকালীন চিত্তপ্রকৃতির নথিপত্র : 'এ বিষয়ে খুব সচেতন না হয়েই আমি পড়তে থাকি, ঐ সময়ের মানুষজনের আইডিয়া আমাদের সময়ের সঙ্গে সদৃশ কিনা, কিংবা ঐসব মানুষকে রিপাবলিকান, সমাজতাত্ত্বিক অথবা অন্যান্য মতাদর্শের সামনাসামনি এসে দাঁড় করালে কেমনটা হয়? আসলে আমাদের সময়ের কোনো-কোনো লেখকের মতোই যে কয়েক শতাব্দীর ব্যবধান থেকে দূরাগত ঐসব মানুষের কণ্ঠস্বর আমাদের মজ্জায় ঢুকে যায়, তাদের একেবারেই অচেনা ঠেকে না, এই উপলব্ধি আমাকে সচকিত করে তোলে। এতই সজীব লাগে যে মনে হয়, এদের

আমরা জানি এবং স্বচক্ষে তাদের প্রত্যক্ষ করতে পারি (পত্রাঙ্ক ৫৯৭)।'

তখনই আমাদের কাছে ভ্যান গঘের অম্বিষ্ট আধুনিকতার মর্মে স্থাপিত করে দেওয়া তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। 'আধুনিক সংস্কৃতি ও শিক্ষার প্রাণসত্তাটা কী?' সরাসরি এই শায়কসন্ধানী প্রশ্ন উত্থাপন করেই তৎক্ষণাৎ তেওকে তার সমাধান জানিয়েছিলেন : 'সর্বমহোত্তম শাশ্বতগুণ : সরলতা ও সত্য (পত্রাঙ্ক ৩৩৯ক)।' কত সাদামাঠা শোনায় এই বীজমন্ত্র, কিন্তু সেটি কী-পরিমাণে স্তরসংকুল।

প্রাক্তন শিল্পী ও কবিদের চিঠিপত্র পড়ার সময়ও একই ভাবনা তাঁকে প্রাণিত করেছে। কিন্তু বহুমুখী প্রতিভারও লক্ষ্যমাত্রা একমুখী। ছবির ভিতরেই, কবিতায় নয়, ভিনসেন্ট ভ্যান গঘ তাঁর উপপাদ্য আধুনিকতার নাগাল পেয়েছিলেন : 'জিওত্তোর কোনো তুলনাই হয় না, দান্তে, পেত্রার্কা বা বোক্কাচিও-র মতো কবিদের চেয়েও তাঁরই সাহচর্যে আমি স্বাচ্ছন্দ্য পাই। আমার কেমন যেন মনে হতে থাকে, চিত্রকলার চেয়েও কবিতা ঢের বেশি ভয়াবহ, যদিচ চিত্রণের সঙ্গে ময়লা এবং অসংবদ্ধ দাগছোপ জড়িয়ে থাকে। কিন্তু শেষ অবধি চিত্রকর কিছুই বলেন না, তিনি স্তব্ধ হয়ে থাকেন, আর সেটাই আমার কাছে আদরণীয় (পত্রাঙ্ক ৫৩৯)।'

অরুণ, এখানেই ভিনসেন্ট ভ্যান গঘ ও তাঁর মনঃপূত আধুনিকতার জিৎ। মানুষ ভিনসেন্ট এবং রচয়িতা ভ্যান গঘের অন্তঃস্থ যে-পুরোহিতবৃত্তির কথা আমরা আগেই বলেছি, তার অনেক কথা বলার থাকলেও সকল শিল্পীর প্রিয় এই যাজকের ধর্ম তত্ত্বনিরপেক্ষ স্তব্ধতা। আজকের কবিতা কি সেদিকেই ফিরতে চাইছে না?

*

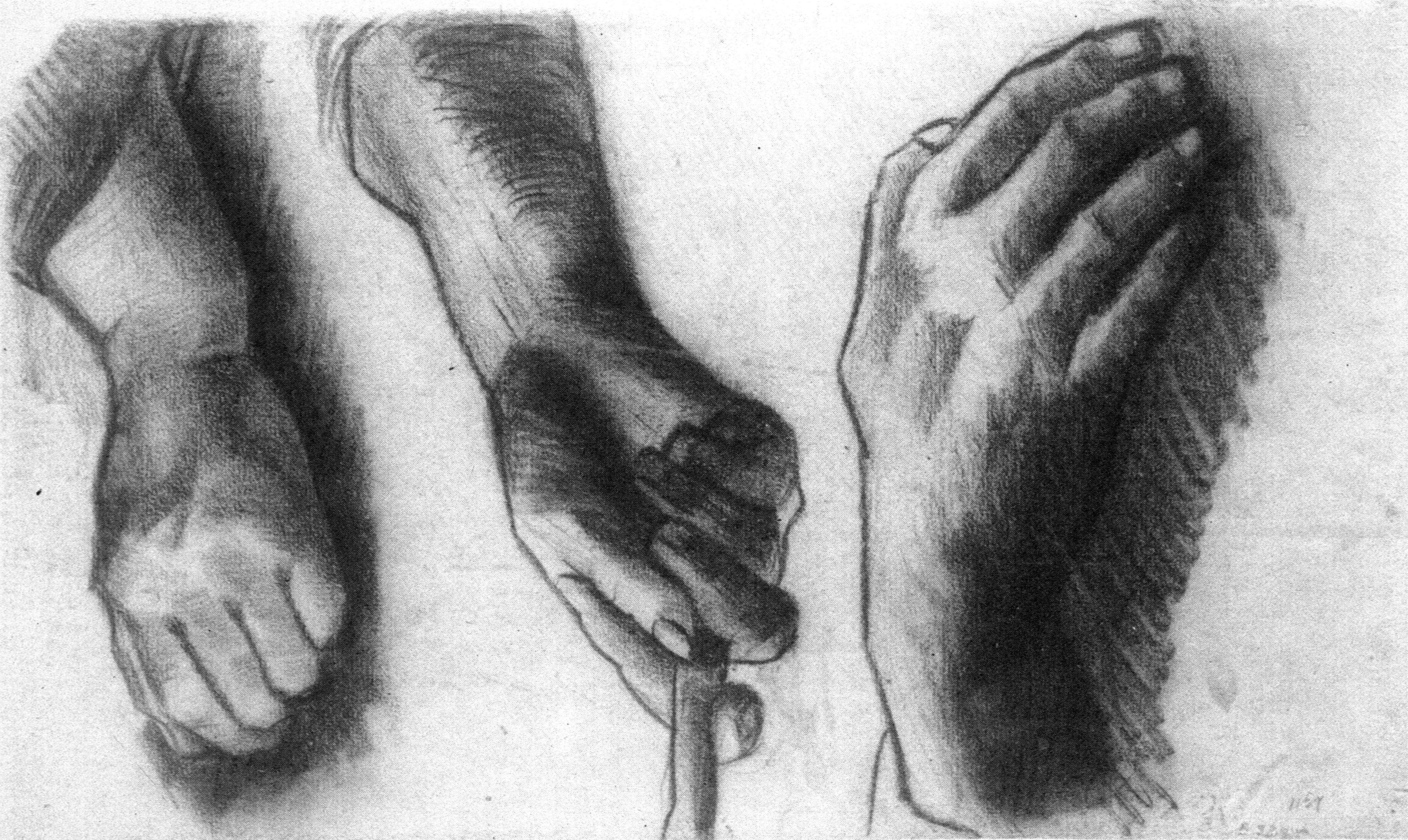
ভ্যান গঘের ভিতরকার এই সর্বাস্বয়ী একাভিমুখিতা একটি ছবিতে নশ্বরের অমরাবতী হয়ে আছে : 'পোটেটো ইটার্স'। এই ছবিটি শুধু তোমার বা আমাদেরই নয়, স্রষ্টার কাছেও তাঁর 'শ্রেষ্ঠ' অভিধা পেয়েছিল। এই নির্বাচনী স্বজ্ঞা থেকে যদি দ্রুত এরকম সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়, সে-ই শ্রেষ্ঠ কবিতা বা ছবি যা একাধারে সর্বজন এবং রচয়িতার অভিনিবেশ কেড়ে নেয়, তাহলে হয়তো একটু বাড়াবাড়িই হয়ে যাবে। আমরা জানি, জনপ্রিয়তম 'বনলতা সেন' জীবনানন্দের কাছে শ্রেষ্ঠ কেন তাঁর একান্ত পছন্দটাই কবিতাবলির অন্তর্গতও ছিল না। কিন্তু ভ্যান গঘের বেলায় বলতে দোষ নেই, তাঁর ও গ্রাহকের রুচিরা যদি কোনো একটি রচনাকে একই মায়াবী আবিষ্টতায় স্পর্শ করে, সেই রচনা অবশ্যই অপ্রতিম। এটাই তো ছিল তাঁর শিল্পচিন্তার অভীষ্ট। কীভাবে পুরো মানুষের সামনে গিয়ে তাকে ও নিজেকে একই সঙ্গে মেলে ধরবেন, সেইটেই কি ছিল না তাঁর আরাধ্য?

অবশ্যই এ ছবির সর্বজনগ্রাহ্যতা নিয়ে তাঁর আত্মবিশ্বাসের একটা বনিয়াদ ছিল। এই ছবিতে দর্শক হিসেবে তিনি দেখেছিলেন মিল্যে অথবা ব্রেতোঁর ঘরানার ধারাবাহিকতা। মনে সাধ জেগেছিল, তাহলে বুঝি এ ছবি চড়া দামে বিক্রি হয়ে যাবে। তোমার মতো এ বিষয়ে কোনো সমালোচকেরই এক কণা সংশয় ছিল না বা নেই, এই চিত্রকর্মে তিনি নিজের সমস্ত-কিছুই উজাড় করে ঢেলে দিয়েছিলেন : দুঃস্থ মানুষের বন্ধু, কৃষাণ হবার স্বপ্ন, সহানুভব সমৃদ্ধ বৈরাগী পুরুষ, শিল্পসাধক, থিয়োরিপ্রণেতা। চিঠিতে-চিঠিতে যতোই এই বিষয়বস্তুর সম্ভাব্য শিল্পরূপ নিয়ে একটি ম্যানিফেস্টো খাড়া করতে চেয়েছেন, ততোই দুরূহ হয়ে উঠেছে তার শ্রীবাস্তব মূর্তন। অথবা বলা যায়, তাঁর লক্ষ্যমান তিনি দিনে-দিনে এতই উন্নীত করেছেন যে তার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া

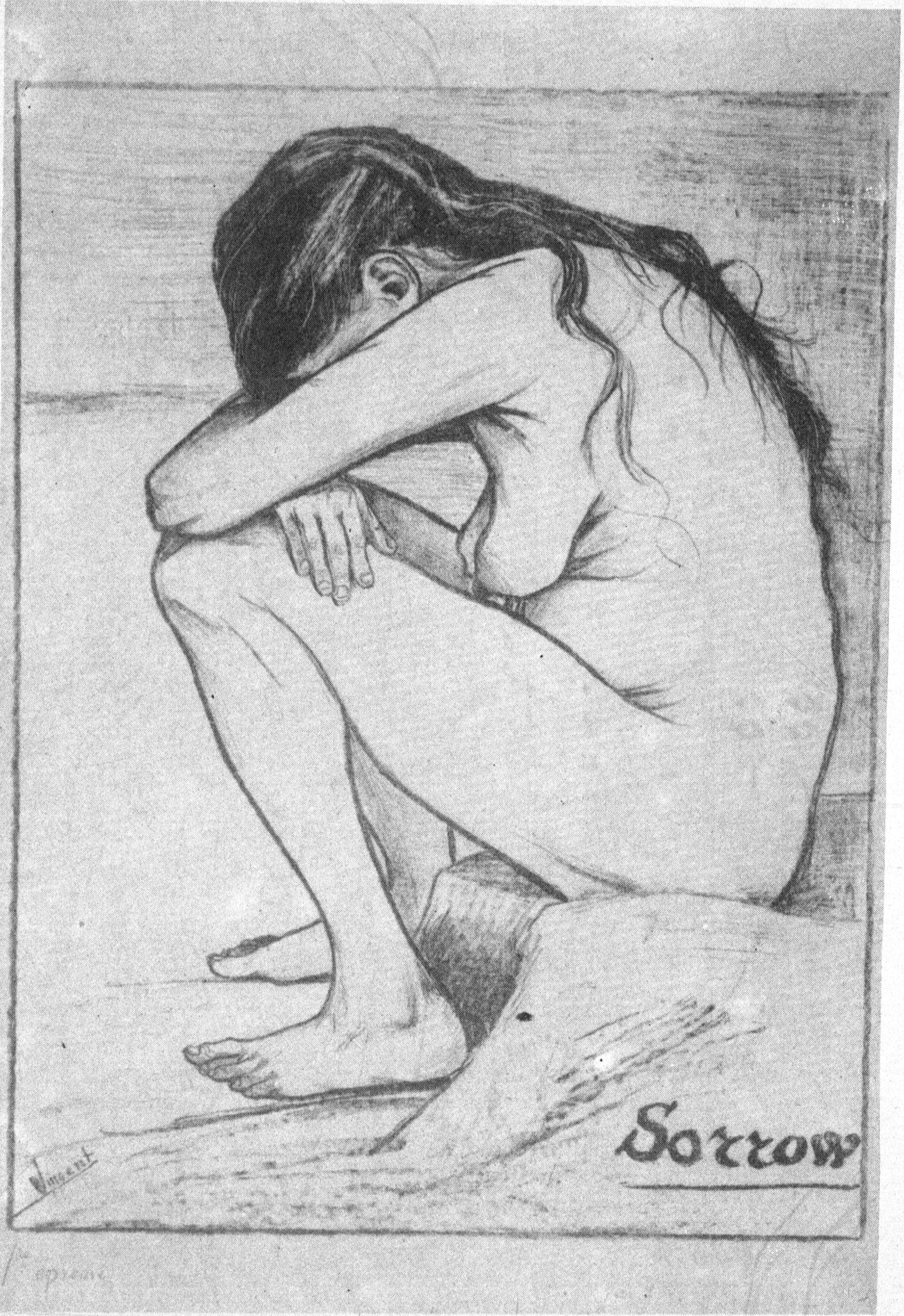
তাঁর পক্ষে কঠিনসাধ্য হয়ে পড়েছে। রদ্যাঁর মতোই খুঁটি-নাটির 'স্টাডি' বা মকশো করেছেন কতো, হাত বা শিরোদেশ বা কফির কেটলির কতো আলেখ্য। শেষ ছবি আঁকতে গিয়ে আরেক বিষম বিড়ম্বনা। তাঁর বরাতে এ যাবৎ কোনো নারী বা পুরুষই শিল্পীর এত অবাধ্য হয় নি, যেমন এই অপ্রতিভ 'প্রাকৃত' মডেলরা। এরা থেকে-থেকেই অস্থিরমতি হয়েছে, নির্ণীত মুদ্রাভঙ্গি থেকে হয়েছে বিচ্যুত। সেজন্যেই, যাকে তাঁর পূর্বাচার্য দ্যলাক্রোয়া বলতেন par coeur, স্মৃতি থেকেই তাদের পুনর্বিন্যাস ঘটিয়েছেন শিল্পী। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, এসব মডেলকে একসঙ্গে হাতের কাছে পাননি ভিনসেন্ট। গ্রুপপ্রতিকৃতি আঁকার সময় সহজেই তিনি তাদের মধ্যে পরস্পরমুখীনতার একটি শস্তা আদল আরোপ করে দিতে পারতেন' সেটা তিনি করেন নি। যেভাবে তাদের মূলত দেখেছেন, সেই ঠামেই বিন্যস্ত করে দিয়েছেন। এরা কেউই কারো মুখের দিকে তাকিয়ে নেই। অনুমেয়, তাদের মধ্যে কোনো শান্ত শীলিত সাধারণীকরণ বা 'কমিউনিকেশন'-এর দায় চাপিয়ে দেওয়া তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। এক, খিদের জ্বালায় যখন তারা চারপাশের ভুবনকে নির্বাপিত করে দিয়ে গোগ্রাসে আলু খাচ্ছে সেই জ্বালামুখী অগ্নিযজ্ঞে বনিবনার কোনো পরোয়া নেই। দ্বিতীয়ত, গণ্ডগ্রামের এই লোকজনও কি শহরমানুষের মতো বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করে দেয়নি? এমন মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়, টেবিলটাকে বেষ্টন করে এই যে একটি সমাজ কিছুক্ষণের জন্য এক জায়গায় মাথা গুঁজেছে, তারা একটু পরেই হয়তো যন্ত্রসভ্যতার চাপে দিগ্বিদিকে উড়ে উড়ে ভেসে যাবে, কোনো একান্নবর্তী পরিবার সংস্থার মুরোদ নেই তাদের আবার ফিরিয়ে আনতে পারে। তিন প্রজন্মের ভুক্তভোগীদের এই ভোজসভায় তাহলে কি, ঐ কিছুক্ষণের জন্যও, সংযোজক শুধু একটি শিশুর পৃষ্ঠদেশ, যার পরিকল্পনা কিংবা রূপায়ণে তেমন কোনো মৌলতা নেই? নাকি, জীবনানন্দের ভাষায়, 'আলোও যেন নিজে কেমন অন্ধকারের মতো'— সেই পেট্রোলিয়াম ল্যাম্প যা নিজেকে প্রাণপণে সংকুচিত করে আঁধারিয়া ফাঁদ পেতে পরস্পরকে এক পরিসরের মধ্যে আটকে রেখেছে। সত্যিই তো, এই পর্যায়ে আঁকা বেশির ভাগ ছবির মতো এখানেও আলোকিত বর্ণালির জায়গা দখল করে নিয়েছে অন্ধকারের পাণ্ডুর বর্ণিমা।

তবু এই ছবিতে শিল্পী কিন্তু মমতার সম্মিতি আনতেই চেয়েছিলেন এবং পেরেছিলেন। পোটেটো ইটার্সের প্রথম খসড়াটি [তৈলচিত্র ৩৩x৪১ সেন্টিমিটার] কম্পোজিশনের দিক থেকে, চারজনার সন্নিবেশে, একাগ্র ছিল আরো। দ্বিতীয় নকশাটিতে [তৈলচিত্র ৮১.৫x১১৪.৫ সেন্টিমিটার] পেট্রোলিয়ামের ক্ষীণ প্রতিশ্রুতি শিশুটির মূর্ধার মধ্য দিয়ে অদৃশ্য রেখা রচনা করে পাঁচজনকে আড়াই-আড়াই চালে দ্বিধাবিভক্ত করে দিয়েছে: একই এপ্রিলে নির্মিত লিথোগ্রাফে [২৬.৫x৩০.৫ সেন্টিমিটার] পরিশীলিত মাধ্যমের দরুণ প্রায়-বৈঠকী যে-পরিবেশ তৈরি হয়েছে সেটি নিশ্চয়ই শিল্পীর পছন্দ হয়নি। সব মিলিয়ে দেখলে আমস্টার্ডামে তৈরি চিত্রভাষ্যেই ক্যানভাসের প্রান্তদেশ ছুঁয়ে বয়েসের ভারে নুয়ে পড়া মহিলার হাতের কেটলি থেকে ছলকে-যাওয়া কফি প্রাণদ স্রোতস্বিনীর মতোই জেগে ওঠে, ভরসা জোগায়, ভবিষ্যতে এই মানুষেরা আবার এ ওর সঙ্গে একাত্ম হতে চাইবে। কফি ঢেলে-দেওয়া জরতীর ঐ হাত পিকাসোর পায়রার মতোই কি ভবিষ্য-বিশ্বের শান্তি ও সংহতির প্রতিশ্রুতি নয়?

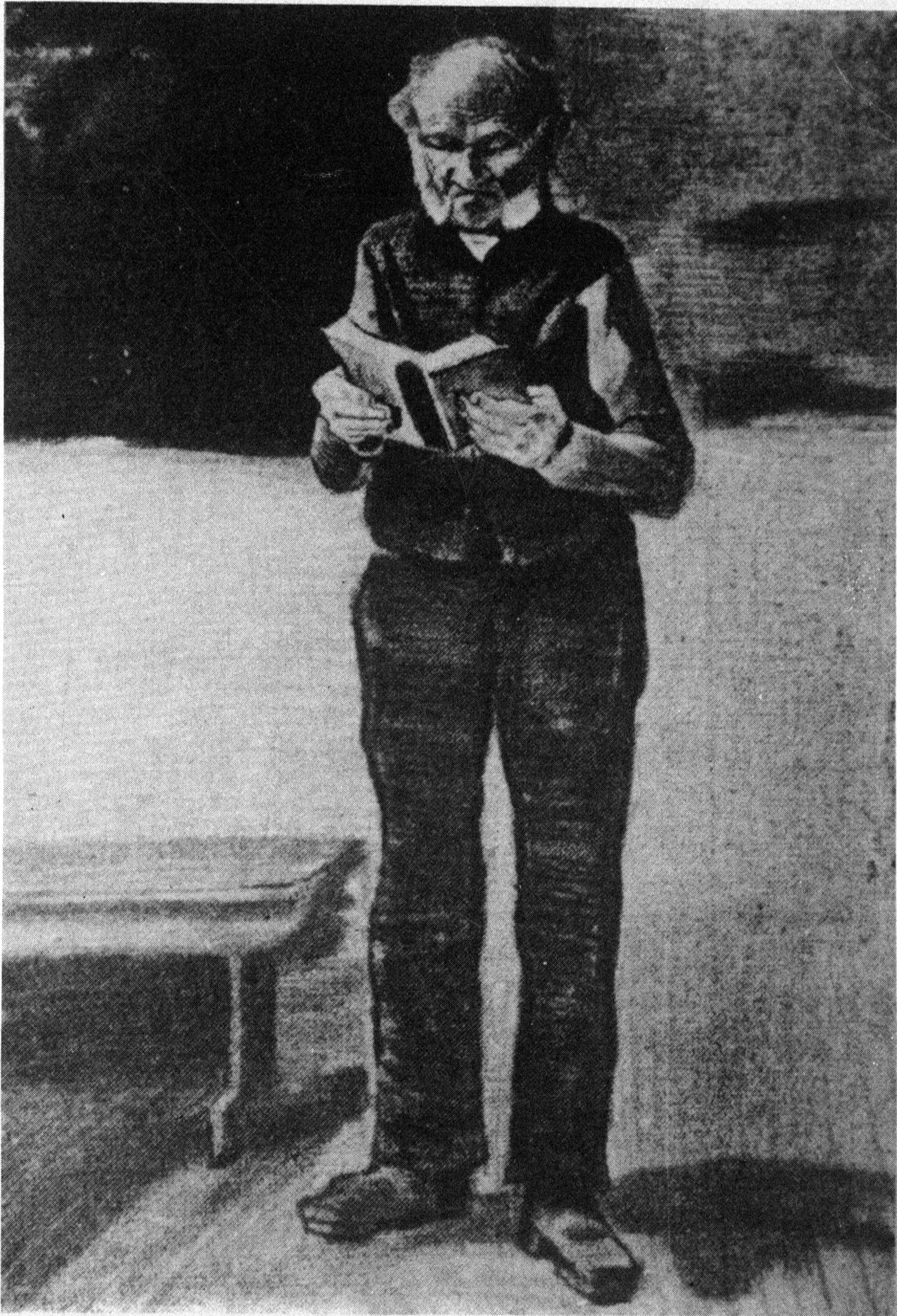
এই আলেখ্যলহরীতে *ধরিত্রী* উপন্যাসের নির্মিতিসূত্রে এমিল জোলার 'মাটির পৃথিবীর সৃষ্টিশক্তির' প্রতি অঙ্গীকার অঙ্কিত হয়ে আছে : 'ঋতুচক্র, মাঠের কাজ, কৃষকের জীবনধারা,



তিনটি হাতের স্টাডি, ১৮৮৫
অ্যামস্টার্ডাম, ভ্যান গঘ মিউজিয়াম (ভিনসেন্ট ভ্যান গঘ ফাউন্ডেশন)



দুঃখ, ১৮৮২
অ্যামস্টার্ডাম, ভ্যান গঘ মিউজিয়াম (ভিনসেন্ট ভ্যান গঘ ফাউন্ডেশন)



পাঠক, মধ্য-ডিসেম্বর ১৮৮২

CHÉRIE

এদমন্দ দ্য গোঁকুর-এর 'চেরি' উপন্যাসের উড়োপত্র, ভিনসেন্ট স্বাক্ষরিত
অ্যামস্টার্ডাম, ভ্যান গঘ মিউজিয়াম (ভিনসেন্ট ভ্যান গঘ ফাউন্ডেশন)

1

Theo,

Dank voor je brief,
het deed mij genoegen dat je
weer goed aangekomen zijt.
Ik heb je de eerste dagen ge-
mist & het was mij vreemd
je niet te vinden als ik 's mid-
dags thuis kwam.
Wij hebben prettige dagen sa-
men gehad, en tusschen de
droppeltjes door toch nog al
eens gewandeld & het een en
ander gezien.
Wat vreeselijk weer, je zult
het wel <u>benauwd</u> hebben
op je wandelingen naar
Oisterwijk. Gisteren is het hard-
draverij geweest ter gelegenheid van
de tentoonstelling, maar de illumi-
natie & het vuurwerk zijn uit-
gesteld, om het slechte weer, het
is dus maar goed dat je niet
gebleven zijt om die te zien. Groeten
van de familie Haanebeek & Roos.
Steeds je liefh. Vincent

ভাই তেওকে লেখা ভিনসেন্টের প্রথম চিঠি : ১৮.০৮.১৮৭২
অ্যামস্টার্ডাম, ভ্যান গঘ মিউজিয়াম (ভিনসেন্ট ভ্যান গঘ ফাউন্ডেশন)

de moeielykheden en 't financieele die
het ongeluk van Moe met zich brengt
zal blyven na zich te slepen voor Pa
meer voelbaar zyn dan nu denk ik
Laat ons in den tusschentyd trachten
iets met myn werk ook te doen
Après tout zyn Pa en Moe persoonlyk
voor hun leven gedekt Pa's pensioen
gelykstaande met zyn tegenwoordig inkomen
Maar bover de arme zusters — zonder
kapitaal in een tyd dat de animo
om meisjes zonder geld te trouwen niet
groot is [illegible] in de maatschappy — voor
hun kan 't leven wel eens graauw en
triest blyven. [illegible] en
hun normale ontwikkeling gedwarsboomd.)
Doch wy willen den tyd niet vooruit loopen
Hoe het altyd stil liggen op Moe's gestel
werken zal is moeielyk vooruit te bepalen
Alle voorzorgen die wy nemen kunnen om
doorliggen te voorkomen zyn natuurlyk van
belang. We hebben een soort draagbaar gemaakt
om Moe te kunnen verbedden als het wenschelyk
is — doch hoe minder dat voorloopig geschiedt
hoe beter. Rustig liggen is nommer 1!
Moe's humeur is gelukkig [illegible] haar moeielyke
positie in aanmerking genomen, zeer gelykmatig
en tevreden. En zy amuseert zich met
kleinigheden. Ik heb het kerkje met de
heg en de boomen geschilderd onlangs voor haar.
[illegible]



তেওকে লেখা পত্র, সঙ্গে ন্যুয়েনেনের চার্চের স্কেচ, ২৪ জানুয়ারি ১৮৮১
অ্যামস্টার্ডাম, ভ্যান গঘ মিউজিয়াম (ভিনসেন্ট ভ্যান গঘ ফাউন্ডেশন)



তেওকে লেখা পত্র, সঙ্গে বারসিউজ এবং সূর্যমুখীর স্কেচ, ২২.০৫.১৮৮৯
অ্যামস্টার্ডাম, ভ্যান গঘ মিউজিয়াম (ভিনসেন্ট ভ্যান গঘ ফাউন্ডেশন)

651 Auvers 23 Juli 1890 13

Mon cher frère, Merci de la lettre d'aujourd'hui et
du billet de 50 fr. qu'elle contenait
Je voudrais peutêtre t'écrire sur bien des chôses
mais d'abord l'envie m'en a tellement passée
puis j'en sens l'inutilité
J'espère que tu auras retrouvé ces messieurs
dans de bonnes dispositions à ton égard
Pour ce qui est de l'état de paix dans
ton ménage je suis autant convaincu
de la possibilité de la conserver que des
orages qui la menacent.
Je préfère ne pas oublier le peu de français
que je sais et certes ne saurais voir
l'utilité d'approfondir le tort ou la raison dans
des discussions éventuelles de part ou autre
Seulement cela m'intéresserait pas
Ici les chôses vont vite — Dries to.
et moi n'en sommes nous pas un
peu plus convaincus le sentons nous
pas un peu davantage que ces dames
Tant mieux pour elles — mais enfin
causer à tête reposée nous n'y
comptons même pas —
En ce qui me regarde je m'applique
sur mes toiles avec toute mon attention
je cherche à faire aussi bien que
de certains peintres que j'ai beaucoup
aimé et admiré —

তেওকে লেখা শেষ পত্রের শেষ পৃষ্ঠা, অস্বাক্ষরিত, ২৪.০৭.১৮৯০
অ্যামস্টার্ডাম, ভ্যান গঘ মিউজিয়াম (ভিনসেন্ট ভ্যান গঘ ফাউন্ডেশন)

সমস্ত অস্তিত্বকে জড়িয়ে-ধরা নিসর্গের' চিত্রকল্প। ঔপন্যাসিক মনে করেছিলেন ঐ বইতে তিনি বিশেষত 'কৃষকের জীবনটাকেই' পুরে দিতে চেয়েছিলেন, তার 'কাজ এবং ভালোবাসা, রাজনীতি আর ধর্ম, অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ'। ভিনসেন্ট তাঁর ভাষ্যে জোলাকীর্তিত বাস্তবতার সীমানা পার হয়ে গিয়েছেন। যদি বলি সেখানে সত্য সুন্দরে নীত হয়েছে, সেইসঙ্গে এই কথাটাও জুড়ে দিতে হবে : শিল্পের ইতিহাসে এই প্রথম প্রথানুগত অর্থে অ-সুন্দর, লৌকিক ভাষায় যাকে বলা হয় 'বিশ্রী', আধুনিক সুন্দরের ধারণা প্রোগ্রামের উগ্রতা পেরিয়ে স্বস্থ নান্দনিকের এলাকায় উঠে এল। আধুনিক কবিতায় এরই প্রবর্তনা বোদলেয়ারে, ভিনসেন্টের ভাই তেওর জন্মবর্ষেই (১৮৫৭) শুরু। একই বছরে ভিনসেন্টের পূর্বাচার্য মিল্যের ফসলের শিস্ জড়ো-করা গ্রাম্য মেয়েদের চিত্রায়ণেও তথাকথিত অসুন্দরকে মদৎ দেওয়া হল। কিন্তু অনপনেয় ভবিষ্যভরসার মানদণ্ড, দার্শনিক এর্নস্ট ব্লখ যাকে Prinzip Hoffnung বলেছেন, যেখানে অন্ধকার দীর্ণ করে প্রায় হেরে-যাওয়া মানুষের সাধ্য গূঢ়তর কমিউনিকেশন বা সাধারণীকরণ, নাকি অ-সাধারণীকরণ, নির্দিষ্ট হয়ে রয়েছে, সেদিকেই কি ভ্যান গঘ আমাদের দৃপ্তভাবে নিয়ে এলেন না?

*

'রঙে এবং রেখায় আমাদের জন্য শক্তিমন্ত্র, মহত্ত্বপূর্ণ জীবন' এঁকে তুলে যিনি 'সংগ্রামী পায়োনিয়ারে'র ভূমিকা নিয়েছেন, যিনি সেই উদ্দিষ্টে 'একা গভীর রাত্রে যুদ্ধ করেন,' ১৮৮৯ সালে, অর্থাৎ শিল্পীর মৃত্যুর বছরখানেক আগে, সেই ভ্যান গঘকে তখনকার বাঘা সমালোচক আইজ্যাকসন 'De Portefeuille' পত্রিকায় (অগাস্ট সংখ্যা) উত্তরকালের জন্য মনোনীত করে গিয়েছিলেন। এই মন্তব্যের পরের মাসেই প্যারানঈয়ার শিকার হয়ে দিগ্বিদিকে পাগলের মতো হাৎড়েও তিনি, উন্মাদাশ্রমের স্বযাচিত এই অতিথি, মনের মতো কেন, একটিও মডেল না পেয়ে, নিজেকেই ছবির প্রধান বিষয় করে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। আগের বছরেই জুন ১৮৮৯, 'আরোগ্য সদনের বেড়া-দেওয়া পুবমুখো শস্যখেত' স্কেচটির (৪৭x৬২ সেন্টিমিটার) আকুতিভরা হলুদ রঙের মর্মভেদী আঁচড়গুলো লক্ষ করলে বোঝা যায়, আঁকবার মতন জনমনিষ্যি হাতের কাছে না পেয়ে নিজের হৃদয়কেই তিনি ক্ষতবিক্ষত করতে শুরু করে দিয়েছেন। বিশেষত আজ ওসলোতে সংরক্ষিত তাঁর উপান্ত্য সেই নির্মম, ধসে-পড়া সবুজের পটে আঁকা ধূসরিম আত্মচিত্রণে [তৈলচিত্র, ৫১x৫৪ সেন্টিমিটার] মানুষের আত্মপরিচয়কে ধরে রাখার প্রয়াস কী অপরিমেয় সৌন্দর্যে বিতত হয়ে আছে। মাকে একটি চিঠিতে (৬১২) তখন লিখছেন : 'তোমাকে পাঠানো এই ছবিতে তুমি দেখতে পাবে, যদিও আমি প্যারিস লন্ডন এবং আরো কতো মহানগরে ঘুরে বেড়িয়েছি, দেখতে এখনো ৎসুণ্ডার্টের এক চাষার মতোই আসলে রয়ে গেছি...আমার বিচারে চাষীদের চেয়ে আমি নিম্নতর বর্গের মানুষ। তফাৎটা হল, ওরা মাঠে হলকর্ষণ করে, আমি ছবিতে।'

হল্যান্ডের আলু-খেতে-বসা চাষীদের সঙ্গে নিজেকে একাকার করে দেবার এই প্রবণতা আমাদের আপ্লুত করে দেয়। তাদের যেমন করে এঁকে তুলেছেন, নিজেকেও সেভাবেই ধরে রাখতে হবে, এই প্রস্থানভূমি আমাদের একথাও মনে করিয়ে দেয়, তিনি বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ীর সেই একাত্মতা খুঁজছেন, যা আধুনিক শিল্পসাহিত্যের একেবারে প্রাথমিক শর্ত।

অরুণ, আগের চিঠিতে তুমি তাঁর আত্মপ্রতিকৃতির ভিতরকার খবরটা জানতে চেয়েছিলে।

সেজন্যেই এই চিঠির সূত্রপাত। কিন্তু এই সঙ্গে কিছু বাইরের খবর না দিলে অন্যায় হবে। ভ্যান গঘ দেখতে কেমন ছিলেন, তাঁরই সৌজন্যে, সেটা সবাই জানে। তাঁর জনকয়েক সতীর্থ এই কাজটিতে হাত দিয়েছিলেন। যেমন ধরো তুলুস-লোত্রেক। তাঁর আঁকা প্যাস্টেল প্রতিকৃতিতে ভিনসেন্টের কম্প্র মুখচ্ছবি আমাদের সবারই মনে আছে। তারই এক বছর পরে আর্ল-এ সূর্যমুখী অঙ্কনরত ভিনসেন্টের সেই ছবিটায় গোগ্যাঁ অন্তত এই সংবাদটুকু আমাদের ক্ষিপ্র হাতে পৌঁছিয়ে দেন, মানুষটা মোটামুটি কেমন দেখতে। কিন্তু এই দুটি ছবিতে কোথাও নেই ভিতরবাহিরে টাল-খাওয়া সেই শিল্পী মানুষের সন্ধিৎসার উৎসার। এর পাশাপাশি তাঁর দুটি ফোটোগ্রাফও সমান ব্যর্থ। প্রথমটি তোলা হল্যান্ডে, যখন তাঁর তেরো বছর বয়েস। দ্বিতীয়টি প্যারিসে তোলা, তাঁর বয়স তখন আঠারো : স্যেইন নদীর তীরে বন্ধু এমিল বার্নার্দের সঙ্গে তিনি বসে আছেন, একটা ছোট্ট টেবিল তাঁদের সামনে। কিন্তু দুর্ভাগ্যত ছবিটা পিছন থেকে নেওয়া। বুঝতেই পারা যায়, কী করে পৃথিবীর তাবৎ ধুরন্ধর রোমহর্ষক সংবাদলিপ্সু ক্যামেরাম্যানের শ্যেনচক্ষু এড়িয়ে যেতে হয়, সেটা তিনি ভালো করেই জানতেন। পরবর্তীকালে বোন উইহেলমিনকে তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন ইম্প্রেশনিজমের এই এক মস্ত সুবিধে, ফোটোগ্রাফির মতন তা 'রম্য অগভীর' নয়, বরং ইম্প্রেশনিস্ট পোর্ট্রেট 'নিবিড়তর সাদৃশ্য' তলিয়ে খুঁজে আনে। একই চিঠিতে তিনি বলেছিলেন পোর্ট্রেট ও আত্মপ্রতিকৃতিতে 'একই মানুষ থেকে অসংখ্য ও বিচিত্র মোটিফের প্রতিফলন' সম্ভব।

*

এই সেপ্টেম্বরে আমস্টার্ডামে ভ্যান গঘ মিউজিয়ামের বিশেষ প্রদর্শনীতে গিয়ে তাই বলতে পারো পরম উদ্যোক্তারা প্রতিটি ছবির জন্য দৃষ্টিক্ষণ বেঁধে দিয়েছিলেন বলে শাপে বরই হল। বুঝতেই পারছ, একটি মুহূর্তেরও অপব্যয় ঘটাইনি।

প্রদর্শনীটিতে প্যারিস-পর্বের (১৮৮৬-৮৭) আঠারোটি আপন প্রতিকৃতিই দারুণ : একই মানুষ অসংখ্য হয়ে উঠছেন, তাঁকে ফ্রেমের খাঁচায় অন্তরীণ করে রাখা যাচ্ছে না। আমরা ভ্যান গঘের সবসুদ্ধু পঁয়ত্রিশটি আত্মপ্রতিকৃতির সন্ধান পেয়েছি, তার মধ্যে উনত্রিশটিই প্যারিসে স্বল্পসময়েই সম্পন্ন হয়েছিল। বেশির ভাগ ছবিই ছোট্ট মাপের, বিচ্ছুরিত নীলের ব্যঞ্জনায় দুটো চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চায়। পটুয়া যেমন সবশেষে চক্ষুদান করেন, এসব ছবিতেও যেন তেমনি চোখগুলি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সংযোজন। কীরকম মনে হতে থাকে, বিশ্বকল্যাণের সুরচিত্রী তাঁর নিজের চোখ দুটো দিয়ে ফতুর হয়ে যাবার জন্য উদ্বাস্তু বড়ো।

নিজেকে নিয়ে বলতে যাঁর এতো সংকোচ ছিল, নিজেকে নিয়ে এতো আঁকতে তাঁর কি অসংগত লাগেনি? 'নিজেকে নিজে আঁকা সহজ নয়, বিশেষ করে ফোটোগ্রাফি থেকে স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে', তাঁর এই নির্ণয়ের নিরিখে দেখলে ছবিগুলির কোথাও কিন্তু ক্যামেরার সঙ্গে প্রতিযোগিতার স্পর্শ পাওয়া যায় না। প্রথম দিকের আত্মচিত্রে মিউজিয়মে-দেখা তৎকালীন পোর্ট্রেটের পরম্পরার অনুসরণ তার একটি কারণ। পরের দিকে অবশ্যই, আঁকতে-আঁকতে, গড়ে উঠল চরিত্রাভিপ্রেত অবধারিত অন্তঃসাক্ষ্য। অথবা ইমেজ, কেউ-কেউ যাকে 'খড়ের টুপিসুদ্ধু আইকন' বলেছেন। সেখানে দেখি নিজেকে তিনি তন্ন-তন্ন করে বিঁধে এনেছেন। আঁকবার গুণেই যে সেসব ক্ষেত্রে এই আত্মন্যাস সম্ভবপর হয়েছে, সেরকম বলা ঠিক হবে না। বরঞ্চ

আত্মঅন্বেষণের হাহাকার তাদের সম্বল। ভ্যান গঘকে নিয়ে যত ফিল্ম তৈরি হয়েছে, যাদের মধ্যে কুরোশোয়ার অবিস্মরণীয় 'স্বপ্ন' পর্যায়ের চলচ্চিত্রণ সবচেয়ে উল্লেখ্য, তাদের ভর শুধু এই সব চরিত্রচিত্রণ।

ভাবতে পারো, নিজেকে যিনি কোনোদিন বিক্রয় করেননি তাঁর সাধ ছিল এসব আলেখ্য যেভাবেই হোক বিক্রি করে আহারসংস্থান। প্রথম পর্বের সব ছবিতেই তাই হল্যান্ডের সেই সতেরো শতকের প্রতিকৃতিপ্রথা অনুযায়ী রীতিমত কায়দা করে দাঁড়ানো! এর পরের পর্বাঙ্গে পশ্‌মি টুপি-পাইপ-গ্লাসের নাগরিক অনুষঙ্গে নিজেকে বৈঠকী খরিদ্দারের জন্য আকর্ষণীয় করে তোলার সকরুণ প্রয়াস। এর পরে, ছবি বিক্রি হোক বা না হোক, পাইপটাকে কিছুতেই সরান নি, কিন্তু লোকায়ত জীবনের স্যাঙাতের খড়ের টুপিটাকে রাজমুকুটের মতো দেখাচ্ছে। এই সময়েই উঠে এসেছে শর্টহ্যান্ড স্বাক্ষর। এমিল বার্নার্দ তাকেই একান্ত ভিনসেন্টের প্রতীক করে মাথায় তুলে নিলেন। এর পরেও ফিরে এসেছে ফেল্ট হ্যাট, কিন্তু খালি মাথায় বা খড়ের টুপিতে উপস্থাপিত আত্মপ্রতিকৃতিগুলিই আমাদের অনর্পিত আটপৌরে মূল্যবোধ উদ্‌বোধিত করে। আর তখনই, অবিক্রীত এবং অবিকৃত এই শিল্পীর প্যারিসে সাতাশি সালের গ্রীষ্মকালে আঁকা ছবিটি আমাদের দিকে তাকিয়ে বলতে চায় : 'কী, এবার আমাকে ঠিক চিনতে পেরেছ তো?' এই ছবির নায়ক ভিনসেন্ট, এক্ষুনি গনগনে গরমে গ্রামদেশ থেকে হাজির হয়ে প্যারিসের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন। ইম্প্রেশনিস্টিক চিত্রধারা এখানে, সকল মলিন বিকিকিনির ঊর্ধ্বে, তার সর্বোচ্চ কল্পস্বর্গে আবির্ভূত। মানুষের সর্বায়ত প্রকাশশক্তি তুলির সাবলীল কাজের প্রক্রিয়াটুকুতেই কেন্দ্রবদ্ধ হয়েছে, চেহারা বা বহির্গঠন যেন একটি মিতাক্ষরে ঝুঁকে পড়ে বলে ওঠে : এখানে ভ্যান গঘ আঁকছেন, ভিনসেন্টকে। ক্লদ এমিল শাউফেনেকার ১৮৮৯তে লাল পটভূমিতে সবুজ জ্যাকেট, ফারটুপি ও পাইপ নিয়ে তাঁর আত্মপ্রতিকৃতির জীবন্ত যে-নকল করেছেন তার মধ্যে রয়ে গেছে আসল এই ভিনসেন্ট ভ্যান গঘের সঘন আবির্ভাব। এই আইকনই আমাদের সময়ে তাঁর পাশপোর্টের ছবি, প্রবেশাধিকারের ভিসা। ছবির পসরার মূল উদ্দেশ্যকে পিছনে ফেলে এসে এই তিনি স্বরাট আত্মশিল্পী হয়ে আমাদের দিকে সহনশ্বরের প্রত্যয়ে তাকালেন।

ঐ বছরেই, সেপ্টেম্বরে, রেমব্রান্ট ও দ্যলাক্রোয়ের দুটি ছবির কপি করতে বসে ভ্যান গঘ সরাসরি নিজের অভিক্ষেপ ঘটিয়েছেন। তবু মনে হয়, রেমব্রান্টের নকলে 'দেবদূতের অর্ধমূর্তি' [তৈলচিত্র, ৫৪x৫৪ সেন্টিমিটার] ছবিটিতে তাঁর এই সচেষ্টতা নীল আকাশের অতীন্দ্রিয়তায় রূপকাশ্রয়ী পণ্ডশ্রমে পর্যুষিত হয়েছে। বরং নিজেকে যীশুখ্রীস্টের জায়গায় প্রক্ষেপ করে সালভাদর দালি, অনেকটা ভ্যান গঘেরই দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে যে-ছবি পরবর্তীকালে এঁকেছেন আত্মনাট্যের বিদ্রূপায়নে সেটি অনেক বেশি উপভোগ্য। অথচ একই সময়ে, স্যাঁ-রেমির উন্মাদ-আলয়ে দ্যলাক্রোয়ের 'পিয়েটা'র (Pietà) অসামান্য প্রতিচিত্রণে [তৈলচিত্র ৭৩ x ৬৩.৫ সেন্টিমিটার] ভিনসেন্ট নিজেকে উজাড় করে দিয়ে আমাদের একেবারে কাছাকাছি চলে এসেছেন। সুকুমারী মেরির ক্রোড়ে অর্ধশায়িত যীশুর শরীর মরণশীল মানুষের কী অনবদ্য প্রতিভাস! সেই শহিদের মুখ ভিনসেন্টেরই : লাল চুলের অকালপ্রৌঢ়ের কাটাছাঁটা দাড়ি গোঁফ, তার মুখের চাহনি ক্রুশকাঠবাহী শিল্পীর, নাকি আমাদেরই?

অবশ্যই তাঁর ও আমাদের শেষতম ব্যবধানটুকু ঘুচিয়ে দিয়ে আন্টওয়েৰ্পেনে ১৮৮৫/৮৬র

শীতকালে আঁকা 'জ্বলন্ত সিগারেট ধরে-রাখা করোটি' [তৈলচিত্র/৩২x২৪.৫ সেন্টিমিটার] শীর্ষক তাঁর ছবিটি বোধহয় একালের আত্মধ্বংসপরায়ণ মানুষের অন্তরীক্ষণের সবচেয়ে অদ্ব্যর্থ উদ্ভাস। কোটরে বসে-যাওয়া ঐ দুটি চক্ষু কি নিজেকে পুঙ্খানুপুঙ্খ দেখার অছিলায় আমাদের সবাইকেই দেখে নিচ্ছে না? 'দেখিবে সে মানুষের মুখ?' এই প্রশ্নের উত্তর পাবার জন্য লাইব্রেরিতে গিয়ে বইপত্র ঘাঁটতে হয় না। ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে কতো মারাত্মক, সেটা বুঝিয়ে দেবার জন্য সম্প্রতি এখানকার একটি কল্যাণসংস্থা এই ছবির কোলাজ যেভাবে ব্যবহার করেছেন, তাতে করে তার প্রাসঙ্গিকতা প্রতিপন্ন হয় না। এর অমোঘতা আরো অতলস্পর্শী। নরকরোটির ঐ স্পর্ধিত ভঙ্গিমায় উৎকীর্ণ হয়ে আছে সভ্যতার প্রান্তিক মুখপাত্রের অভিমান। এক হিসেবে এইখানেই ভ্যান গঘের আত্মপ্রতিকৃতির সার্থকতা, একই সঙ্গে নিজের ও সকলের স্বরূপের সনাক্তকরণ।

*

স্যাঁৎ-এক্সুপ্যেরির (Saint-Exupéry) ভাষা ধার করে বলা যায়, 'বহুবিধ সম্পর্কের একত্রীকরণের' এই রূপকার, এজন্যই উত্তরকালের সতীর্থ হতে পেরেছেন। বছর তিনেক আগে আমস্টার্ডামে ভ্যান গঘ মিউজিয়ামের 'ভ্যান গঘ এবং আধুনিকতা' প্রদর্শনীটিতে (১৬ নভেম্বর ১৯৯০-১৮ই ফেব্রুয়ারি ১৯৯১) গিয়ে এই বোধ আমাদের কাছে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। শিল্পীর স্বদেশ, ফ্রান্স এবং জার্মানির ত্রিমুখী সংবেদনে ভ্যান গঘের জীবন ও কর্মযোগ কী রকম অব্যবহিত ও প্রত্যক্ষ, ঐ প্রদর্শনীতে তীর একটি সজীব ধারাভাষ্য ধরে রাখা হয়েছিল।

প্রদর্শনীর শেষ দিন আমাদের এক শিল্পীবন্ধু আজ পর্যন্ত তাঁর দুর্মর প্রাসঙ্গিকতার সূত্রে জোলার 'শিল্পকর্ম একটি মর্জির মধ্য দিয়ে দেখা সৃষ্টিরই অংশ' ('Une œuvre d'art est un coin de la création vu à travers un tempérament') উক্তিটি আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছিলেন। তোমাকে আগেই বলেছি, এই উক্তিটি ভিনসেন্টের কতো অন্তরঙ্গ ছিল। তাঁর স্বকাল ও উত্তরকালের শিল্পীরা এই শিল্পী ও শিল্পকে তাঁদেরই মর্জির মধ্যবর্তিতায় প্রত্যক্ষ করেছেন, সেটাই তো স্বাভাবিক। আর সেই নিরীক্ষণে কি উঠে আসেনি ব্রহ্মাণ্ডেরই এক-একটি অংশ?

আমাদের এই শিল্পীবন্ধুর কাছেই ভ্যান গঘ সম্পর্কে এই শতাব্দীর সূচনাবর্ষে লেখা, মায়ার-গ্রেফে বলে এক শিল্পসমালোচকের, একটি পুস্তিকা দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। লেখক তখনই প্রতিবেদক-ভাবিকথকের স্বাভাবিকতায় বলতে পেরেছিলেন : 'চষে-ফেলা জমিন অথবা সেখানে কর্ষণরত কারুকে, কিংবা সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিয়ে তন্নিষ্ঠ কর্মীর মেহন্নত যেখানে যা-ই দেখো না কেন, ভিনসেন্টকে টপকে গিয়ে আজ সেসব দেখবার জো আর নেই। এখন যারা আঁকছে, প্রায় প্রত্যেকেই তাঁর কথা মনে পড়িয়ে দিচ্ছে। তরুণ প্রজন্মের প্রতিটি কম্পনেই দেখছি তাঁর অনন্যতার অনপনেয় স্বাক্ষর।'

গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না। পেলেও অন্তত এক যুগ পর। ভিনসেন্টকেও নেদাবল্যান্ডের মানুষ ভিতর-ভিতর গ্রহণ করেছে তাঁর মৃত্যুর বারো বছর পরে। হল্যান্ডের বড়ো মাপের সমঝদার, মারিউস, ১৯০৩ সালে, উনিশ শতকের হল্যান্ডের চিত্রকলার বিবর্তন সূত্রে তাঁকে 'ধূমকেতু' আখ্যা দিয়ে বলেছেন, তিনিই 'নতুন মন্ত্রণা'র (De niewe formule) সেই শিল্পী, 'অভিনব এক রোমাঞ্চ, হল্যান্ডের উনিশ শতকের শিল্প যাঁকে উপহার দিয়েছে।' এর আগেই, শিল্পীর অন্ত্য জীবদ্দশায়, আইজ্যাকসন ভ্যান গঘকে নতুন ধারার পূর্বগামীর কৃতিত্ব অর্পণ করেছিলেন, সেকথা

তোমায় আরেকটি চিঠিতে লিখেছি। আসলে মানুষ ও সৌন্দর্য সম্পর্কে হল্যান্ডে যে-প্রথাসম্মত ধারণা পুনরাবৃত্ত হয়ে চলেছিল, তার পরিসরে এই শিল্পীর বৈপ্লবিক নতুনতা মেনে নেওয়া সমালোচক শিবিরের পক্ষে স্বভাবতই দুরূহ ছিল। আইজ্যাকসনের এই দুঃসাহসিক নিরূপণের আশ্রয় না পেলে আরেকজন অগ্রণী সমালোচক, ইয়ান ভেট, শিল্পীর মৃত্যুর দু বছরের মধ্যেই বলতে পারতেন না : 'প্রথম প্রথম ভ্যান গঘের রুক্ষ শক্তিমত্তার সামনে অস্বস্তি বোধ করতাম, আর সেটাই আমার পক্ষে তাঁর অনেক সৃষ্টিকাজের বৈভব মেনে নেওয়ার পক্ষে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু এখন, তাঁর চিত্রাবলির সৌন্দর্য ঠাহর করার পর, গোটা এই মানুষটাকে—শুধু তাঁর বাইরের আকারপ্রকার নয়—আমি স্বীকরণ করে নিতে পেরেছি।'

*

মাতৃভূমির গোঁড়া আদর্শবাদী তাত্ত্বিকদের কাছে সব মিলিয়ে ভিনসেন্টের বিলম্বিত স্বীকৃতির কারণ, তিনি যতোটা ইয়োরোপীয় ছিলেন সেই পরিমাণে হল্যান্ডের গণ্ডিবদ্ধ থাকতে নারাজ ছিলেন। কিন্তু ঐ আদর্শপরায়ণ ভাবুকদের মধ্যে, ইয়ান ভেটের মতোই আরো কেউ-কেউ, যেমন রোলান্ড হল্স্ট, ক্রমশ নিজেদের অন্তঃস্থ বেড়াজাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন। যাঁরা মতামতের তোয়াক্কা না করে ছবির পর ছবি এঁকে চলেছিলেন, Nieuwe Gids বা নতুন গোষ্ঠীর সেই শিল্পীরাই এঁদের দৃষ্টি উন্মুক্ত করে দিলেন। এই শিল্পীগোষ্ঠীর প্রত্যেকেই ছিলেন মূলত স্বাতন্ত্র্যপন্থী, কিন্তু এক সময়, সবাইকে নিয়ে বাঁচার চাহিদায় তাঁদের 'সমবায়শিল্পের' (Gemeenschapskunst) শরণ নিতে হয়েছিল। এঁদের কাছে প্রথাভাঙা শিল্পিগুরু ভ্যান গঘ সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা। তাই কট্টর সমালোচকেরা যতোই তাঁকে 'উৎকেন্দ্রিক দিয়নুসাস' বা 'অবক্ষয়গ্রস্ত' বলে চিহ্নিত করুন না কেন, তাঁর মুক্তিমার্গেই এই চিত্রশিল্পীরা নিজেদের খুঁজে পেয়েছেন। এই গোষ্ঠীরই কয়েকজন এর পর নিজেদের আলোকবাদী (Luminista) অভিহিত করেই ক্ষান্ত হলেন না, প্যারিসে গিয়ে তাঁদের শিল্পীর অভিঘাত আবিষ্কার করে নিজেদের ইয়োরোপীয় হিসেবে গণ্য করতে শিখলেন। এঁদেরই একজন মুখপাত্র, হাভেলার, ১৯১৭ নাগাদ একটি মুখপত্রে স্পষ্টই জানালেন : 'ভ্যান গঘের মতো মানুষদের জন্যই আমরা আবার ইয়োরোপের জীবনধারায় অংশ নিতে পারছি।'

ফরাসীদেশ ভিনসেন্টকে মৃত্যুর আগেই বরণ করে নিয়েছিল। এই শতকের শুরুতে উত্তর-ইম্প্রেশনিস্ট 'বন্য' (Fauves) আন্দোলনের শরিকেরা বই-পড়া তাত্ত্বিকতার ধার ধারতেন না বলে শিল্পীকে কাছে টেনে নিতে দেরি করেন নি। তাঁদের কাছে প্রকৃতির প্রতিকৃতির চেয়েও বড়ো শর্ত ছিল প্রকৃতির সঙ্গে বোঝাপড়া, আর এই কাজে ভিনসেন্টই তো ছিলেন তৎপর। সবচেয়ে বড়ো কথা ভিনসেন্টের কাজগুলি থেকে তাঁদের নিরীক্ষাধর্মী বিবেক যথোচিত প্রশ্রয় পেয়েছিল। ফভ্ চিত্রকরদের প্রথম সারির প্রতিনিধি আঁদ্রে দের‍্যাঁ তো স্পষ্টই বলেছিলেন : 'মানে আর ভ্যান গঘের কথা শুনলে আমার বুক ভেঙে যায়...ভ্যান গঘের ছবি দেখবার পর একটা গোটা বছর কেটে গেল, কিন্তু স্মৃতি আমায় এখনো শান্ত হতে দিচ্ছে না। তাঁর যথার্থ অভিপ্রায় এখন আমি বুঝে উঠতে পারছি... তিনিই আমার ধ্যানধারণার আদিপুরুষ।' পক্ষপাতিত্ব ছাড়া শিল্পরচনা সম্ভব নয়। ভ্যান গঘ দক্ষিণ ফরাসীদেশকেই তাঁর শিল্পে ভালোবেসেছিলেন। 'বন্য' শিল্পীরাও এই ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের উষ্ণস্বভাবী আবহাওয়ায় খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁদের প্রেরণার প্রদেশ। স্বভাবের এই উষ্ণতার জন্যই দের‍্যাঁ বা মরিস দ্য ভ্লামিংক দল বেঁধে আন্দোলন করার সময়েও

তাঁর কাছ থেকেই বাঁচা ও আঁকার শক্তি পেয়েছেন। প্রথমজনের 'শোবার ঘর', 'বর্ণালি, পল্লীগ্রাম ও সমুদ্র' কিংবা 'আত্মপ্রকৃতি,' এবং শেষোক্ত শিল্পীর 'পাইপসুদ্ধু মানুষ' 'আমার বাবার বাড়ি' বা 'মাছধরা' ছবিগুলোয় আমাদের শতাব্দীর আধুনিকতা মুদ্রিত হয়ে গিয়েছিল। এই সমস্ত ছবিরই জগৎ ভিনসেন্ট-প্রেরিত, তাঁরই স্থাপিত পরম্পরায় স্বাধীনচিত্ত রঙের ব্যবহার, নিসর্গের সঙ্গে ভালোবাসার লড়াই আর ফভ-দের একান্ত প্রিয় ভ্যান গঘ সুলভ লীরিকসত্তার (lyrisme) সমাহার। আর ঐ দলের আঁরি মাতিসের কথাই বা কী করে ভুলে যাই? তাঁর চিত্রিত ভিতরঘর-উপসাগর-নারী বা স্টিল লাইফের ফল্গুপ্রাণ বহির্দেশে টেনে-আনা যেসব ছবি ১৯০৫-এর মধ্যে আঁকবার সঙ্গে-সঙ্গেই সারা বিশ্বে সাড়া তুলেছিল, তাদের অন্তরঙ্গ প্রবর্তনা কি ভিনসেন্টেরই দান নয়?

'বন্য' শিল্পীরাও সমাজ বিষয়ে অসাড় থাকেন নি। ভ্যান গঘের 'তাঁতিরা' সিরিজ তাঁদের মনে কাজ করেছিল। হাউপ্টমানের ঐ নামের নাটক ও একই বিষয়াশ্রিত কেটে কোলহ্বিৎসের চিত্রজগৎ, হয়তো-বা একই আলম্বনে রচিত হাইনের কবিতাটিও, প্রমাণ করে, শিল্পসাহিত্যের নাগরিকেরা মানুষেরই কুশলসমাচার জানতে ও জানাতেই উদ্‌গ্রীব। এই সূত্রে অনেকেই লক্ষ করেছেন, বন্ধুর মৃত্যু নিয়ে পিকাসোর প্রথম দিকের সেই শোকার্ত পোর্ট্রেট ভ্যান গঘের দ্বারাই প্রাণিত এবং পরের দিকে তাঁর আঁকার শৈলী আগাগোড়া পালটে গেলেও মানুষ বিষয়ে একই সমানুভূতি সেখানে কালান্তরে প্রসারিত হয়ে গিয়েছে। এই দৃষ্টিকোণে পিকাসোর প্রগতিচৈতন্যে ভ্যান গঘের সমাজতন্ত্রের দায়ভাগ মিললেও মিলতে পারে। কিন্তু সেই অভীপ্সা তত্ত্বতুলনার পর্যায়ে পড়বে সে বিষয়ে বাগ্‌বিস্তারের প্রলোভন সংবরণ করা গেল।

*

জার্মান এক্সপ্রেশনিজমের জন্ম ও বিবর্তনের সঙ্গেও ভ্যান গঘের নাম ওতপ্রোত হয়ে আছে। ভেবে দেখো, শিল্পীর ভিতরঘরটা কীভাবে ফুটিয়ে তুলতে হয়, কির্শ্‌নার তারই সন্ধানে ভ্যান গঘের হাত ধরেই অন্ত্যপর্যায়ী ইম্প্রেশনিজম হয়ে অভিব্যক্তিবাদের (Expressionism) দিকে এগিয়ে যেতে পেরেছিলেন। ১৯০৩-এ ভিসবাদেনে প্রথম যখন ভ্যান গঘের ছবি দেখানো হয়, কির্শনার তখন মিউনিখে শিল্পশাস্ত্রের আনকোরা ছাত্র। একদিন, সেটা বোধহয় ১৯০৫-এর মাঝামাঝি, লাইব্রেরি থেকে মায়ার-গ্রেফের আধুনিক শিল্পীবিষয়ক সচিত্র বইটি নিয়ে কির্শ্‌নার বন্ধুদের কাছে হাজির হলেন। সে-বইয়ের প্রধান চরিত্রই ভ্যান গঘ। তখন থেকেই তিনি 'সেতু' (Brücke) সংস্থার পথিকৃৎ। ১৯১২ সালে ক্যোল্‌নের একটি প্রদর্শনীতে একসঙ্গে ভ্যান গঘের অনেকগুলি ছবির সান্নিধ্যে রক্ষণশীল সমালোচকেরা শিল্পীর 'উন্মার্গগামিতায়' যতটা ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন, ঠিক ততোটাই পাগল হয়ে গিয়েছিলেন 'সেতু'র শিল্পীরা। এই যে 'রাইন অঞ্চলের এক্সপ্রেশনিস্টদের' নিয়ে মজা করা হয়, তা নিশ্চয়ই তাঁদের প্রাণখোলা মেজাজের জন্যই। এখানেও 'বুনো' ফরাসি চিত্রকরদের সঙ্গে ভিনসেন্টকে ভালো-লাগার ব্যাপারে তাঁদের একটি মিল আছে। অ্যাকাডেমিকতার পরিবর্জনে, চারপাশকে জড়িয়ে-ধরার তাঁদের ঐ অবৈধ ব্যগ্রতায় ভ্যান গঘের দাক্ষিণ্য শতধারে বর্ষিত হয়েছিল। একমাত্র এমিল নোল্‌ডেই বুঝি এড়িয়ে যেতে চেয়েছিলেন তাঁর প্রভাব। কিন্তু 'সেতু' ও 'নীল অশ্বারোহী'র (Blauer Reiter) প্রকাশোম্মুখ দুই দলের মাঝখানে ড্যুসেলডর্ফের শিল্পীসমাজ আর অনেকটা গোষ্ঠীনিরপেক্ষ পাউলা মোডারসোন-বেকার (রিলকের সূত্রে যাঁর শিল্পকাজ অপরিহার্য অনুষঙ্গ), মাক্স বেকমান কিংবা হিবহেল্‌ম মর্গনার তখন ভ্যান গঘের সাহায্য

নিয়েই মানুষ ও নিসর্গের সম্পর্ক অপাবরণে অনেক দূর এগিয়ে গেছেন।

'সেতু'র বৈষম্যে 'নীল অশ্বারোহীদের' প্রোগ্রাম ছিল অনেক বেশি সচেতন। তবু শিল্পের সমস্ত পূর্বধার্য সীমানা চুরমার করে দিয়ে আত্মিক শিল্পায়নের দিকে তাঁদের যাত্রাপথের পথপ্রদর্শক না হলেও সঙ্গীও ভিনসেন্ট ভ্যান গঘ। অবশ্যই শিল্পকে প্রকরণ এবং রঙের দাপটে স্বনির্ভর করার মধ্য দিয়ে নির্বস্তুক সৃষ্টির জন্য তাঁদের পরিশ্রম ও প্রবণতায় তাঁর কোনো হাত ছিল না। কিন্তু মনে করে দেখো এই গোষ্ঠীর অগ্রণী আলেক্সেই জাভ্‌লেনস্কি-র টাকা জমিয়ে ভিনসেন্টের একটিমাত্র ছবি কেনার সেই আত্মহারা আনন্দ। তাঁর 'অলিভ নিকুঞ্জে'র আপাতশান্ত গাছগুলো কি ভিনসেন্টের হাতে দুলে-ওঠা মশাল নয়? ফ্রানৎস মার্ক-এর রাঙা রুমালে পুঞ্জিত ঘরোয়া বেড়ালগুলো কিংবা আউগুস্ট মাকে-র শক্তি খেতের ছবিতে মুক্তিপ্রিয় অথচ সংযত রঙের বিষাদ ও বাহার কি অনেক দূরবর্তী ঘটনা? এসব ছবি আঁকতে গিয়ে এঁরা ভ্যান গঘের সঙ্গে মনে-মনে তর্ক করতে-করতেই এগিয়েছেন। এক-এক সময় প্রিয় বিষয়ের বলয়ে ভিনসেন্টের নিজেকে নিয়ে থেরাপির ধরনটা তাঁদের গ্রস্ত করে থাকবে। আউগুস্ট মাকে-র মুখোশগুলি ছবিটা তার জ্বলন্ত নিদর্শন। ভিনসেন্ট রুগ্ন দশায় তাঁর চিকিৎসক বন্ধুর যে-আলেখ্য এঁকেছিলেন তারই মধ্য থেকে ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে এই ছবি। আঁকার ভিতরকার ঐ মানুষটার সঙ্গে দুদণ্ড একটা ঘর ভাগ করে নেওয়া যায় কি না সেই ঔৎসুক্যে ক্যাণ্ডিনস্কির অঙ্কিত সেই বিজন ঘরের ছবিটিও এই প্রসঙ্গে ভুলে যাবার জো নেই : বাঁ-দিকের ঐ খাট মৃত্যুর সদ্য আগে আলতোভাবে যেন ভিনসেন্টেরই ব্যবহার-করা ছবির ডান দিকে, স্বতন্ত্র হবার তাগিদে, আসবাবপত্তরগুলো ক্যাণ্ডিনস্কি একটু বেশি অলংকারবহুল করে দিয়েছেন। কিন্তু সে দিকে আলাদা নজর দেবার কথা কারুরই তেমন মনে থাকে না। কেন না ঘনিষ্ঠ পরিসরে এক চিত্রকর্মী তাঁর শরিককে কীরকম প্রসন্ন উদ্‌বেগে দেখছেন সেদিকেই সবার মন পড়ে থাকে।

এভাবেই 'শিল্প-অভিব্যক্তির বৈচিত্র্যের' (ক্যাণ্ডিন্‌স্কি) আড়ালে একজন মানুষ আমাদের সব সময় ব্যস্তসমস্ত করে রাখেন। দু-দুটো মহাযুদ্ধ ছাপিয়ে আজও যখন কোনো-এক নতুন আঁকিয়ের দিকে তাকাই, ভিনসেন্টের সর্বব্যাপী অস্তিত্বের সংগ্রাম ভাবাসঙ্গে জেগে থাকে। তখন আবার ভাবতে থাকি, ব্যক্তি ও রচয়িতার বিপজ্জনক দুই শিখরের মধ্যে সেতু না হয়ে উঠতে পারলে মানুষের শিল্পরচনা এবং শিল্পীর মনুষ্যত্ব কি আদৌ সম্ভব হতে পারে?

এই চিঠিগুলির রচনাকাল দেয়ালি—ক্রিসমাস ঈভ ১৯৯৪

মাঝে মাঝে তাঁকে দেখি

শুভাপ্রসন্ন

একেবারে ছেলেবেলায় যখন টুকরো কাগজ পেলেই ছবি আঁকি, সকলের আদর পাই আর একরত্তি ছেলের মুন্সিয়ানা দেখে সবাই প্রশংসায় পঞ্চমুখ, সে সময় একদিন সন্ধ্যায় বাবার একজন বন্ধুস্থানীয় মানুষ খুব গম্ভীরভাবে ভ্যান গঘ-এর নাম করেছিলেন—বাবাকে জানিয়েছিলেন শিল্পীর জীবন দুঃসহ দুঃখের। তার চূড়ান্ত উদাহরণ ভিনসেন্ট ভ্যান গঘ। কাজেই বালখিল্য সময়ের শেষে আমি যেন ও পথে পা না বাড়াই।

তখন আমার কাছে সুখ, দুঃখ, জীবন এ সবই ভ্যান গঘ-এর মতো অজানা রহস্যের ছিল। তাই আমার প্রসঙ্গে প্রথম কোনো মানুষের কিছু মন্তব্য গম্ভীর কথা ছাড়া কিছুই মনে হয়নি তখন, সেদিন।

তারপর স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে যখন ছবি আঁকা ছাড়া আর কোনো কিছুতেই আমি আগ্রহহীন, চারিদিকে অজস্র প্রতিকূলতা, কিছুদিন আগেও যাঁরা আমার প্রতি সপ্রশংস ছিলেন, বাহবা দিতেন —তাঁরা অন্যরকম হয়ে গেলেন। আমি তাঁদের কাছে ব্রাত্য এক অন্ধকার পথের স্বেচ্ছাযাত্রী হয়ে গেলাম। বাবা কঠোর হলেন, লুকিয়ে ভর্তি হলাম আর্ট কলেজে। ভ্যান গঘ-এর ছবি দেখলাম, আর কৌতূহল হল তাঁর বিষয়ে জানার। ছাপাই ছবিতে সূর্যমুখী দেখেছি, হলুদ ধানখেতে আর কাটা কানে কাপড় জড়ানো আত্মপ্রতিকৃতির ভ্যান গঘ কৈশোর অতিক্রম করে যৌবন ছোঁয়া রোমাঞ্চের সোনালি আভাসেই সীমাবদ্ধ রেখেছিল আমায়।

ক্রমশ ছবি আমার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গেল। সুখদুঃখের তীব্রতা উপলব্ধি করতে শুরু করলাম। আমার শহরে সে সময় অসম্ভব এক রাজনৈতিক বিদ্রোহ শুরু হল। প্রবঞ্চনার প্রতি জেহাদ উস্কে দিল চেতনাকে। মনে হল আমি সৈনিক হই।

কিন্তু আমার হাতিয়ার কী হবে! আমি তো অন্য কিছু জানি না! আবার ভ্যান গঘ-এর মুখোমুখি হলাম। মনের বিদ্রোহকে উজাড় করার, যন্ত্রণার কাতরতাকে মূর্চ্ছনায় পরিণত করার ছবি দেখলাম। সূর্যমুখীর প্রতিটি পাপড়িই তখন মরমী সৈনিকের শাণিত বাণ মনে হল। ধানখেতের মাঝ বরাবর দগ্ধ পথ আর ঘূর্ণায়মান সূর্যের স্ফুলিঙ্গ। পৃথিবী জুড়ে যেন অস্তিত্বের চিৎকার শুনতে পেলাম। এভাবেই বিদ্রোহী হতে হবে। সৃষ্টির সঙ্গে মিশে থাকবে মরমী জীবনের স্পর্শ। সংবেদনশীল মননের গভীর থেকে মানুষের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ বেরিয়ে আসবে ছবির আকারে। শিল্প তো শুধু অলংকার নয়—শৌখিন উপঢৌকন বা সংসারের ভূষণমাত্র নয়—নয় তো চিত্তবিনোদনের পণ্য! কিংবা বুদ্ধিযুক্তির এক বিশেষ বিষয়। শিল্প মানুষের এক মরমী দলিল। শিল্পের সঙ্গে জীবনকে যিনি একাকার করেছেন তিনিই তো প্রকৃত শিল্পী।

ক্রমশ তাঁকে অনুসরণ করে অনেক পথ হেঁটেছি। প্রথম তাঁর প্রকৃত ছবির মুখোমুখি হলাম পারিতে লুভ মিউজিয়ামে—একপাশে গোগ্যাঁর আর অন্যদিকে ভ্যান গঘ-এর তিনটি মাঝারি মাপের

ছবি। তার মধ্যে ছোটো ছবিটি নীল আকাশ বিদীর্ণ করে গ্রাম্য পথ বেয়ে একটি গীর্জার। মনে হয় যেন এই মুহূর্তে শেষ হয়েছে আঁকা। অসম্ভব সতেজ উজ্জ্বল রঙ আর প্রয়োগ কৌশলে এক কম্পন যার সঙ্গে আগে দেখা কোনো মুদ্রিত ছবির তুলনা চলে না। প্রকৃত শিল্পের কাছে মানুষ নির্বাক হয়ে যায়—আমিও বেবাক হয়ে গেলাম। তারপর বহুবার বহু ছবি দেখার সুযোগ হয়েছে। পৃথিবীর প্রায় সব বিখ্যাত সংগ্রহশালা সমৃদ্ধ হয়েছে তাঁর ছবিতে।

জীবদ্দশায় এ সব কিছুই দেখে যাননি তিনি। জীবনযন্ত্রণা তাঁকে জারিত করে প্রেমিক করেছিল। প্রকৃত সাধক করেছিল। তাঁর অজস্র ছবিতে, চিঠিতে ছড়িয়ে আছে স্রষ্টার সেই মানবিক স্পর্শগুলো।

আমরা প্রায় সর্বত্রই এক সাজানো উদ্দেশ্যে তথাকথিত সৃষ্টির বয়ান দেখি যাতে প্রাণের ছোঁয়া থাকে না। পৃথিবীর সর্বকালের শিল্পের ইতিহাসে কয়েকজন দুর্লভ অকৃত্রিম শিল্পীর অন্যতম ছিলেন ভ্যান গঘ যাঁর জীবনের সঙ্গে শিল্প একাকার হয়ে আছে।

এই প্রাণহীন দুরন্ত সময়ে যখন আমাদের পেশাদারিত্ব বজায় রাখার ফাঁকে কোনো জীবনের স্পর্শ পাই, তখনই ভ্যান গঘকে মনে পড়ে।

মনে পড়ে সেই বালখিল্য সময়ে বাবার বন্ধুর সতর্ক বাণী যার প্রকৃত অর্থ এখন উপলব্ধি করতে পারি, কিন্তু সেই দুঃসহ দুঃখকে বোঝার মরমী চেতনা হয়তো নেই আমার।

সেই দুঃখী অপার ঐশ্বর্যের অধিকারী ছিলেন।

আত্মসমীক্ষা

অশোক মল্লিক

বেশ ছেলেবেলার কথা। মধ্য ডিসেম্বরে সবে শীত আসা ঠাণ্ডা আমেজের মধ্যে বড়ো বড়ো করোগেটেড বোর্ডে মোড়া ক্যালেণ্ডারের বান্ডিল আমাদের বাড়ির দোতলায় মুটে দমাদম শব্দ করে ফেলতে থাকত। এ ছিল বেশি কিছু বছর ধরে নিয়মমাফিক ঘটনা। বাবা-কাকার মিলিয়ে আমরা তিন ভাই নীচে নামার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা উপভোগ করতাম। আর আমি বোধ করি সব থেকে বেশি উত্তেজিত আর আহ্লাদিত হতাম কতক্ষণে বাবার নির্দেশ আসবে বান্ডিলগুলো খোলার। বাবার প্রেসে নাম ছাপাবার জন্য এগুলো আসত। আর আসত সোজা হল্যান্ড থেকে, মলঙ্গা লেন হয়ে চলে যেত ফিলিপস্ ইন্ডিয়া লিমিটেড নাম ছেপে জাসটিস চন্দ্রমাধব রোডে ওদের অফিসে।

যখন বান্ডিলগুলো খোলা হত ভেতর থেকে বের হয়ে আসত অবাক-করে-দেওয়া নানা ছবির ক্যালেন্ডার। বালকের বিস্ময় যেন কাটিত না। কত রং, কত বিষয়, কী সূক্ষ্ম কাজ। কখনো বা বড়ো বড়ো সূর্যমুখী ফুল, কখনো গাঢ় অন্ধকারে আলোর আশ্চর্য দ্যুতিতে রমণীর মুখ। আবার আরো ছবি—গীটার বাদনরত পুরুষের হাস্যময় মুখ। তখন কষ্ট করে বানান করে যে শিল্পীদের নাম পড়তাম, সে নাম ভুলতেও বেশি সময় লাগত না। শুধুমাত্র মনে থেকে যেত ছবিগুলো। বাবার কাছে শুনতাম এই শিল্পীরা সব 'মাস্টার পেন্টার'। আর বেশির ভাগ শিল্পীই হল্যান্ডের —ডাচ শিল্পী। এই শিল্পী তালিকায় ছিলেন ফ্রানজ হালস, রেমব্রান্ট, ইয়ান ভেরমেয়ার, ভিনসেন্ট ভ্যান গঘ ছাড়াও রেনোয়া, মনে, মানে, পল গোগ্যাঁ আরো আরো কত শিল্পী। বড়ো হয়ে আস্তে আস্তে জানতে থাকলাম, দেখতে লাগলাম এইসব শিল্পীর ছবি। এরই মধ্যে কখন নিজেই ছবি আঁকতে শুরু করেছি, ভর্তিও হয়েছি আর্ট কলেজে মনেও নেই। ব্যস্ততা, প্রতিষ্ঠার তাগিদ, স্বপ্ন। শিল্পী হবার স্বপ্ন। এই দৌড়ের মধ্যে একবার সুযোগও এসে-গেল বিদেশ যাবার। অমিত ঘোষ, মারগারেট আমন্ত্রণ জানালেন জার্মানীতে কাজ আর প্রদশনীর জন্য। মনটা নেচে উঠল বিখ্যাত সব মিউজিয়ামগুলো দেখতে পাব। দেরী না করে ১৯৯৪-র মে মাসে পাসপোর্টে জার্মানী ছাড়া ফ্রান্স, বেনেলাক্স (বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস, লুকসেমবুর্গ), ইটালির ভিসা নিয়ে বাংলাদেশ বিমানে চেপে বসলাম।

জার্মানীতেই একদিন শ্রদ্ধেয় অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের বাড়ি এলাম। নানা কথার মধ্যে যখন বললাম বিশেষভাবে আমস্টারডামে ভ্যান গঘ মিউজিয়াম আর পারিতে পিকাসো মিউজিয়াম দেখার অদম্য ইচ্ছা তখন তিনি আর বেশি কথা বলতে না দিয়ে শুধু বললেন : ভ্যান গঘ মিউজিয়াম দেখে তোমার উপলব্ধি লিখতেই হবে।

আজকের দিনে সারা পৃথিবীতে অনেক, অনেক শিল্পী। শিল্পকে তাঁরা জীবিকা হিসাবে নিয়েছেন। আমিও তাঁদের একজন। কিন্তু এ তো আমার পক্ষে কঠিন কাজ কারণ যাঁর শিল্পর

সামনে দাঁড়াতে হবে আবার পরে লিখতেও হবে এমন এক শিল্পী সম্পর্কে যিনি জীবিকা মেলাতে পারেননি জীবনের সঙ্গে।

যাই হোক জার্মানীতে নানা শহরে কখনো গ্রামে কেটে গেছে প্রায় দু মাস। ১৬ জুলাই তারিখে এবার কোলন থেকে ট্রেনে চেপে বসেছি আমস্টারডামের উদ্দেশ্যে।

সবুজ আর সবুজ। কত ধরনের সবুজ। উঁচুনীচু দুধারের দৃশ্য। কখনো হাওয়া কল, পুষ্ট গাভীর দল, কখনো ছোটো ছোটো গ্রাম। চলেছি হল্যান্ড। স্মৃতিতে ভেসে এল সেই ক্যালেন্ডারের সেইসব ছবি।

শীত শীত ভাব। তবে কি মধ্য-ডিসেম্বর!

দুঘণ্টার মধ্যেই আমস্টারডাম রেল স্টেশনে পৌঁছলাম। কথামতো মাদাম সো'র গ্যালারির এক মহিলা আমাকে নিয়ে যেন চেনা চেনা ১৪ নম্বর ট্রামে তুললেন। বঙ্গসন্তান অবাকবিস্ময়ে দেখতে থাকল হাসিখুশি পশ্চিমী মানুষদের।

তখন দুপুর। আমি গিয়ে উঠলাম শহরের প্রায় কেন্দ্রে কম পয়সার একটা হোটেলে। এখানে ভ্রমণে কোনো ক্লান্তি আসে না তাই সেদিনই বের হলাম আবার রাস্তায়। শহরের চতুর্দিকে খাল বহে চলেছে তাতে স্টীমারও চলছে। প্রায় সব মোড়ে রেস্তোরাঁ। মানুষ গান শুনছে। নাচছে। কোথাও লাগ ভেলকির খেলা। শোকেসে শোকেসে বেশ্যা রমণী, কী নেই! মানুষের ভীড়, আলো, নিয়ন আলোয় ভেসে উঠছে শহরের কোনায় কোনায় ভ্যান গঘ মিউজিয়ামের বড়ো বড়ো বিজ্ঞাপন।

শহরটা কিন্তু বেশি বড়ো নয়। এদিনই মোটামুটি জেনে নিয়েছি মিউজিয়ামগুলোর হদিশ। পরদিন রবিবার। ছোট্ট ব্রেকফাস্ট সেরে হেঁটেই রওনা দিলাম ভ্যান গঘ মিউজিয়ামের পথে।

সামনেটা ছোটো। ছিমছাম। দেখে বোঝার উপায় নেই ভিতরের বিশালতার। আধুনিক স্থাপত্যের সুন্দর নিদর্শন। ক্যামেরা, ব্যাগ ইত্যাদি সব জমা রাখলাম। টিকিটও কাটলাম কুড়ি গুলডেন দিয়ে। ঢুকে পড়লাম মিউজিয়ামের অন্দরমহলে। নীচ থেকে সব কটি তলা দেখা যায়। শুধু সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে যাও—সবটাই যেন একখানা। নীচে একদিকে গঘের ছবির বই, পোস্টকার্ড, ছবি-ছাপা গেঞ্জি ইত্যাদির বিক্রয়কেন্দ্র আর অফিসঘর। অন্য দিক দিয়ে প্রবেশ করা যেতে পারে ভ্যান গঘের ছবির সাম্রাজ্যে।

শিল্পীর ঘটনাবহুল জীবনচর্চা অনেক হয়েছে, আমি শুধু এক তরুণ শিল্পীর চোখ দিয়ে দেখব তাঁর ছবি, লিখব আমার ধারণা। তিনি ছিলেন এক দরিদ্র, গর্বিত শিল্পী অথচ জীবনে অসফল। ১৮৫৩ থেকে ১৮৯০ এই মাত্র সাঁইত্রিশ বছরের সংক্ষিপ্ত জীবন। তার মধ্যে মাত্র দশ বছর শিল্পীজীবন। এরই মধ্যে শিল্পের রীতিকৌশল আয়ত্ত করা। এ কাজ সে কাজ করে চলেন। কিন্তু কোনো কাজেই নেই এতটুকু শান্তি বা কোনো স্বীকৃতি। জীবনে অসাফল্য, ব্যর্থতা, প্রেম নিবেদনে প্রত্যাখ্যান—এরই মধ্যে নিঃসঙ্গ এক জীবনযাত্রা। শিল্পী হবেন এরকম কোনো ভাবনাও ছিল না। কিন্তু ছবি আঁকলেন। আঁকলেন শুধুমাত্র ভাই তেওর আন্তরিক ভালোবাসা, আর্থিক সাহায্য, প্রেরণার উপর ভরসা করে। শিল্পী ভ্যান গঘ তাই জীবনযন্ত্রণার মূর্ত প্রতীক। তেও ভ্রাতৃপ্রেমের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

শিল্পীর সৃষ্টির মধ্যে গা ভাসাই। মিউজিয়ামে বহু মানুষের মাঝখানে গা ছমছম করে। খুঁজতে

থাকি ভ্যান গঘকে তাঁর ছবির মধ্যে। ভিতরের তাগিদে একটার পর একটা ছবি আঁকা। হল্যান্ডের কালজয়ী শিল্পীপ্রতিভা ফ্রানজ হালস, ভেরমেয়ার, রেমব্রান্টের পাশে, পারির ইম্প্রেশনিজম শিল্পান্দোলনের উত্তপ্ত আবহাওয়া সৃষ্টিকারী এদুয়ার মানে, রেনোয়া, দেগা, ক্লদ মনে, সিসলে, গোগ্যাঁ, সেজান, তুলুজ-লোত্রেক প্রমুখের পাশে রেখা, সতেজ আর উজ্জ্বল রঙ-ব্যবহারে সহজাত দক্ষতা, উদ্ভাবনী চিত্রভাষা নিয়ে ভ্যান গঘ এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম।

ধূমকেতুসম এই শিল্পী শুরু করলেন মানুষকে নিয়ে ছবি আঁকা। সংসারের কাজে জড়িয়ে থাকা মানুষের ছবি। ছবি দেখতে থাকি। ধান-কাটার ছবি, ধান মাথায় করে নিয়ে চলেছে ইত্যাদি। মিউজিয়ামের নীচের তলায় ১৮৮৭ সালে আঁকা অরণ্যের দৃশ্যের ছবিগুলো প্রথমেই চোখে পড়ে। বড়ো বড়ো লম্বা গাছগুলো খুউব কাছ থেকে দেখা। বারবিজন স্কুল প্রভাবিত (মধ্য উনিশ শতকে একদল শিল্পী অরণ্যের নৈসর্গদৃশ্য আঁকতেন)। এরপর দেখি বিখ্যাত সেই 'আলুভোজী' ছবিটা। বাস্তবরীতিতে আঁকা তেলরঙের ছবিতে এক দরিদ্র পরিবারের সকলে আলোছায়াময় এক মায়াবী পরিবেশে টেবিল ঘিরে বসে খাওয়ার দৃশ্য। প্রত্যেকের মুখে যেন ক্ষুধার ছাপ আর উপরের লণ্ঠনের আলো তাদের চোখে-মুখে পড়ে এক রহস্যের সৃষ্টি করেছে। ছবির ধরনের লণ্ঠনটি সাজানো আছে এক কোনায় এক কাঁচের বাক্সে। এটাই কি শিল্পী এঁকেছিলেন না শুধুমাত্র সময়ের এক দলিল! একই ভাবে কাঁচের বাক্সে সযত্নে রাখা ভ্যান গঘ আর তাঁর ভাই তেওর চিঠিগুলো।

ধীরে ধীরে আরো গভীরে প্রবেশ করি। আরো শ্রমজীবী মানুষের ছবি, আরো প্রাণের প্রকাশ। সমুদ্রের ধারে সারিবদ্ধ নৌকো, অলস ঘোড়ার গাড়ি, ফুলদানিতে ফুল, কখনো প্রস্ফুটিত পীচগাছ। গার্হস্থ্য জীবনের নানা কাজে থাকা মানুষ—দিনযাপনের লড়াই, সুখ-দুঃখ, যন্ত্রণার প্রকাশ। অনেক ছবি। কখনো দাঁড়াতে হয় অনন্ত যৌবনের প্রতীক সেই বিখ্যাত সূর্যমুখী ফুলের সামনে আবার কখনো পারি পর্বের নানা ছবির মধ্যে পানপেয়ালার সামনে দুহাত টেবিলে রেখে যে-রমণীর দু চোখের ইঙ্গিত দুরকমের, এক আশাহীন নিঃসঙ্গ নারী, হাতে তার জ্বলন্ত সিগারেট যেন অনন্ত অপেক্ষায়, নীচের গোল স্টুলে রাখা ছোট্ট ছাতা, মাথায় তার লম্বা টুপি! কে এই রমণী!

জাপানী চিত্রকলার প্রভাবে তিনি যে বেশ কিছু চিত্র রচনা করেছিলেন সেই সব উজ্জ্বল রঙের ছবির মধ্যে পারিতে ১৮৮৭ সালে আঁকা 'দি ট্রি' বা 'দি অ্যাক্টর' মুগ্ধ করে।

পারিপর্ব শিল্পীকে শিক্ষিত আর দক্ষ করেছে ঠিকই কিন্তু এই পরিমণ্ডল অর্থাৎ নানা পথ, মত, নানা জটিল আবর্ত, প্রাণচঞ্চলতা তাঁর একান্ত, নিভৃত শিল্পসাধনায় বিঘ্ন সৃষ্টি করেছিল। সৃষ্টির জন্য চাই একটু নির্জনতা, শান্তির আশ্রয়।

ভ্যান গঘের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় এই আর্লপর্ব। সব থেকে সফল সমৃদ্ধ শিল্পসৃষ্টি, একই সাথে বিষাদময় করুণ পরিণতি। এখানেই তাঁর জীবনযন্ত্রণা এক মহান রূপ ধারণ করেছে। গাঢ় নীল রঙের আকাশের নীচে চার্চটা দুলে উঠেছে আবার কখনো শূন্য ঘরের খাট, বিছানা, ছবিগুলো টলমল করে উঠেছে, পায়ে পায়ে আমরা ঘরে ঢুকতে পারি, নীচ থেকে দাঁড়িয়ে তাঁর আর্লের বাড়িটাতে প্রবেশ করতে ইচ্ছে হয়। ছোট্ট নির্জন বাড়িটা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

জীবনের শেষ চার বছর যখন তাঁর শিল্পীসত্তার চূড়ান্ত বিকাশ, যখন নতুন করে বেঁচে ওঠার স্বপ্ন, নারীর প্রত্যাখ্যান বা বন্ধুবিচ্ছেদ, জীবনের হাহাকার, তখন তিনি রচনা করছেন অনেক আত্মপ্রতিকৃতি—যেন এক আত্মসমীক্ষা। কোনো প্রতিকৃতিতে তুলি প্যালেট হাতে গভীর চিন্তামগ্ন

মুখ, কখনো ফেল্ট টুপি মুখে পাইপ, কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। বেদনা ক্লান্ত, নিথর কানকাটা মুখে কাপড় জড়িয়ে ভ্যান গঘ। অনেক ছবি আবার পেনসিল অথবা চারকোলে আঁকা। বেশ কিছু ক্যানভাসের দু দিকেই শিল্পী তাঁর মুখচ্ছবি রচনা করেছেন। কোনোটা যেন অসম্পূর্ণ। অস্থির চিত্তের বহির্প্রকাশ অথবা যেন হাত একটু পাকিয়ে নেওয়া, বোধ করি অপছন্দেব জন্য ফের উল্টে কাজ করা। ১৮৮৬ সালে পারির এক বসন্তে করা আত্মপ্রতিকৃতি—গাঢ় খয়েরি রঙের পটভূমিকায় অল্প আলোয় উদ্ভাসিত মুখমণ্ডলে আছে গভীর চিন্তামগ্নতার ছাপ। কখনো ইম্প্রেশনিস্ট ধারা প্রভাবিত মুখচ্ছবি। প্রত্যেকটি কাজ আলাদা অভিব্যক্তির প্রকাশ—এক বাহ্যিক প্রতিরূপ, শুধুমাত্র প্রতিবিম্ব নয়। এখানেই দেখতে পাই সেই বিখ্যাত আত্মপ্রতিকৃতি যা পল গোগ্যাঁ পাঠিয়েছিলেন বন্ধু ভ্যান গঘকে। আবার গোগ্যাঁর উদ্দেশে যে মুখচ্ছবি গঘ এঁকেছিলেন তাও। এক্ষেত্রে তিনি সরলতার সঙ্গে চোখ মুখ নাকের গড়নে এনেছেন পারস্য গালিচার ফুল লতাপাতার নকশা।

ধারাল খুর নিয়ে অতর্কিতে আক্রমণ করতে আসেন বন্ধু গোগ্যাঁকে। গোগ্যাঁ কোনোরকমে পালিয়ে গেলে ভ্যান গঘ এসে খুরের সাহায্যে নিজের কান কেটে ফেলেন। সত্যি আর কল্পনা মিলিয়ে গল্প উপন্যাস চলচ্চিত্রের আকর্ষণীয় যে উপাদানই তৈরি হোক না, আমরা দেখতে পাই সেই ভয়ঙ্কর ঘটনার প্রমাণ হিসাবে দুটি কাজ। কানে মাথায় ব্যান্ডেজ জড়ানো, চোখেমুখে আতঙ্ক উৎকণ্ঠায় স্থির দৃষ্টি, আত্মমগ্নতায় আচ্ছন্ন শিল্পী ভ্যান গঘ। তবুও থাকে ঘরের দেয়ালে জাপানী ছবির প্রিন্ট আর অন্যটায় ব্যান্ডেজ জড়ানো মাথায় টুপি মুখে ব্রায়ার পাইপ। এত মানসিক যন্ত্রণা তবুও সহজাত দক্ষতার কমতি নেই কোথাও। এভাবেই আরো ছবি দেখতে থাকি আর প্রতিবারই শিল্পীর মুখোমুখি হই। প্রত্যেকটি তুলির আঁচড়ই দৃঢ় আর শক্তিশালী যেন রঙ থেকে বের হয়ে আসে এক নিগূঢ় আলো আর বিষয়ের মধ্যে শিল্পীর উপস্থিতি—এই আমি, এই আমার ছবি। সৃষ্টিতে অবিচল, প্রকাশের আকাঙ্ক্ষায় অধীর ভ্যান গঘ।

যে কথা এখানে অবশ্য উল্লেখনীয় তা হল ছবির রক্ষণাবেক্ষণ। ছবিগুলোর উজ্জ্বলতা পরিচ্ছন্নতা দেখে বোঝার উপায় নেই এগুলো শতবর্ষ অতিক্রান্ত। ক্যানভ্যাসের রঙ এখনও টাটকা সতেজ যেন অল্প কিছুদিন আগে আঁকা হয়েছে, এখনো ছবি শুকিয়ে ওঠেনি। আরো এক উপলব্ধি হয় তা হল অনেক বিখ্যাত মিউজিয়ামে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুধু ছবি আর ছবি দেখতে দেখতে চোখের যে ক্লান্তি আসে ভ্যান গঘের ছবির ক্ষেত্রে সে সমস্যা হয় না। চোখে এসে লাগে টাটকা সতেজ রঙের হাওয়া। মন হয়ে ওঠে উত্তেজনায় টানটান। সৃষ্টিতে যেন কোনো মীমাংসা নেই, আপোসহীন এক শিল্পসংগ্রাম। জীবনব্যাপী দারিদ্র্য বঞ্চনার করুণ এক পরিণতি। প্রেম যৌনতাড়না ভালোবাসার প্রমাণ দিতে কান কেটে প্রেমিকার উদ্দেশে পাঠানো আর শেষ পর্যন্ত বুকে গুলি করে আত্মহত্যা। জীবনের সবকিছু ঘাতপ্রতিঘাত মূর্ত হয় ছবিতে। আর তাই শিল্পীর স্বরূপসন্ধানে আমাদের বারবার যেতে হয় তাঁর ছবির সামনে।

সৃজনশীল জগৎ কিছু ধারণা প্রতীক রঙ আলো দুঃখকষ্ট ভালোবাসা আর নানা প্রশ্ন নিয়ে দাঁড়িয়ে। একজন সৃজনশীল শিল্পীর থেকে অন্যজনের জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ আলাদারকমের। জীবনযাত্রার মাপকাঠি বাঁধা তার কাজের অভিজ্ঞতায় নিজের পথে তাই তার প্রকাশও ভিন্ন।

এক স্বতন্ত্র ভিন্ন রকমের কখনো সে অদক্ষ। কারণ প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষা তার হয়নি। অপূর্ণতাই হয়ে উঠেছে স্বকীয়তার গুণে এক বিশিষ্ট রীতি। সে স্বতঃস্ফূর্ততা মাপা শিল্পচর্চায় সম্ভব নয়। আজকের বৈঠকখানা সোফাসেট কার্পেট মিলিয়ে শিল্পচর্চায় খুঁজে পাওয়া যায় না।

এই ছবি দেখা এক সময় শেষ হয়। তখন বিকেল। মনে অনেক সাহস আসে। বুক ভরে যায় সতেজ নিশ্বাসে। দৃষ্টি আরো স্বচ্ছ হয়। ফেলে আসি ভ্যান গঘকে। মনে মনে প্রণাম জানাই আর মাথা নত হয় যখন দেখতে পাই ছবির ক্রুশে বিদ্ধ এক শিল্পী—ভ্যান গঘ।

কবি-কাহিনী

শান্তনু গঙ্গোপাধ্যায়

If mankind saw these things for the first time,
Presented suddenly and unforeseen,
They could not name a thing more wonderful,
Or ancients would have less dared to believe.

LUCRETIUS

তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়েছিল আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের মতোই—অনুজ্জ্বল এবং অনাড়ম্বরভাবে : একটি চিত্র-ব্যবসায় সংস্থায় শিক্ষানবীশ হিসেবে। এমনকি ধোপদুরস্ত বাবু হবার আশায় কিনেও ফেলেন একটি চটকদার টুপি। তারপর বাড়িওয়ালির মেয়ের প্রেমে পড়ে গেলেন গভীরভাবে, যদিও উলটোদিক থেকে কোনো সাড়া মিলল না। আর এই আপাত-নগণ্য ঘটনাটির পর থেকেই তাঁর চরিত্রেও কিছু পরিবর্তন দেখা দিতে লাগল। স্বাস্থ্য ভাঙল, ভারাক্রান্ত ও বিষণ্ন হয়ে উঠল হৃদয়। কিন্তু এক গড়পড়তা ব্যর্থ প্রেমিকের সঙ্গে তাঁর তফাত এখানেই যে হতাশা-হাহাকারে কাল না কাটিয়ে তিনি মন দিলেন ছবি-আঁকায়, ছবি-আঁকা থেকে বই-পড়ায়, বিশেষত বাইবেল-পাঠে। এবং এই সবকিছুর আড়ালে ঘটে চলল এক প্রগাঢ় ঊর্ধ্বপাতন যার ফলে মাত্র বাইশটি বসন্ত পেরোতে না পেরোতেই তিনি উপলব্ধি করলেন, 'এ জগতে ভালো কিছু করার জন্যে নিজের যাবতীয় স্বার্থপর দৃষ্টিভঙ্গী ত্যাগ করতে হবে...নিছক সুখে থাকার জন্যেই মানুষ এ পৃথিবীতে আসেনি, সে এসেছে শুধুমাত্র সৎ হয়ে থাকতে, সে এসেছে মনুষ্যত্বের যা কিছু মহান তা উপলব্ধি করতে, যেদিকে অধিকাংশ ব্যক্তিই ধাবমান—সেই স্থূল মাঝারিয়ানাকে অতিক্রম করে নিজে বিশিষ্ট হয়ে উঠতে।'

ভ্যান গঘ-এর জীবন ও শিল্পের সারাৎসার কিছুই বোঝা যাবে না যতক্ষণ না আমরা মনে রাখব তাঁর হৃদয়স্থিত এই সরলসত্যটি : 'শুধুমাত্র সৎ হয়ে থাকা'। অসংখ্যবার উচ্চারিত, বহুকথিত হবার ফলে বিবর্ণপ্রায় এই বাক্যাংশটিই আমাদের চোখের সামনে এক লহমায় তুলে ধরে তাঁর সমগ্র সৃষ্টিশীল সত্তা, চতুর্পার্শ্বস্থ বৈরিতার বিরুদ্ধে এক অদম্য প্রাণশক্তির তুমুল সংগ্রামের ইতিহাস। কিন্তু কখনো যে তাঁর হৃদয়ে নৈরাশ্যের ছায়া পড়েনি এমন কথা বলা যাবে না। ১৮৮০ সালে ভাইকে লেখা একটি চিঠিতে ভ্যান গঘ বলছেন, "তুমি এরকম ভেবো না আমি সবকিছু অস্বীকার করে চলার চেষ্টা করছি; বরং বলতে পার আমার অবিশ্বস্ততার প্রতি আমি বিশ্বস্ত, এবং যদিও পরিবর্তন ঘটে গেছে আমার, তবু আমি আমিই রয়ে গেছি, এবং আমার একমাত্র উৎকণ্ঠা এই যে, কিভাবে আমি জগতের প্রয়োজনে আসতে পারি, আমি কি পারি না সংসারের কোনো কাজে লাগতে, কিভাবেই বা আমি শিখতে পারি আরও বেশি, বিভিন্ন বিষয়ে জানতে পারি আরও

গভীরভাবে? এসব কথাই সারাক্ষণ আমাকে ভাবিয়ে মারে, আর তার ওপর তো দারিদ্র্যের জ্বালা লেগেই আছে।...আমার বিষাদের এই এক কারণ বলতে পার, আর তারপর যখন দেখি আমি কীরকম বন্ধুহীন, স্নেহবন্ধনহীন জীবন কাটাচ্ছি, সবকিছু শূন্য মনে হয় তখন, মনে হয় এক তীব্র হতাশা আমার নৈতিক শক্তিকে কুরে কুরে খাচ্ছে, আর ভাগ্যকে মনে হয় যেন স্নেহ ভালোবাসার সমস্ত অনুভূতির সামনে এক প্রাচীর তুলে দাঁড়িয়ে, বুকভর্তি বীতশ্রদ্ধা ও ঘৃণা দলা পাকিয়ে উঠে এসে দম বন্ধ করে দেয়। ইচ্ছে হয় বলি, 'আরও কতদিন, ঈশ্বর!' "

যথার্থ সৎভাবে বেঁচে থাকা এবং একই সঙ্গে সুখস্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনযাপন—এই দুটি সূত্রের মধ্যে ভ্যান গঘ কোনোভাবেই সমীকরণ স্থাপন করতে পারেননি যেমন পারেন নি বোদলেয়ার, এবং উনিশ শতকের মধ্যলগ্নে ফরাসী শিল্পীসাহিত্যিককুলের আরও অনেকেই। ১৮৪৫-এ লেখা একটি চিঠিতে বোদলেয়ার বলছেন, "আমি নিজেকে অবিরাম হত্যা করে চলেছি, যেহেতু আমি অপরের কাছে অপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠছি ক্রমশ এবং নিজের কাছে বিপজ্জনক।" কিন্তু এমন নয় যে তাঁর নিজের বিষাদের প্রতিই কেবলমাত্র সচেতন ছিলেন বোদলেয়ার। বরং বলা চলে, সুখ ও পরিতৃপ্তিবোধমাত্রই যে ভীষণ রকমের মামুলি এবং স্থূল—এই সত্যটুকুর প্রতি তিনি অতীব সজাগ ছিলেন। পরবর্তীকালে আরও একটি চিঠিতে একই ব্যক্তির উদ্দেশে লিখছেন, "আপনি তো একজন সুখী মানুষ। কিন্তু আপনার জন্যে আমি দুঃখবোধ করি, কারণ এত সহজে আপনি সুখী হতে জানেন। একজন মানুষকে অনেকখানি নীচে নামতে হয় নিজেকে সুখী ভাবতে গেলে।"

কিন্তু প্রচলিত অর্থে এই যে সুখী, স্বাভাবিক ও স্বাচ্ছন্দ্যময় সুস্থ জীবন—যা আজীবন তুমুলভাবে অস্বীকার করে গেছেন ভ্যান গঘ—তার প্রতি আরও একজন বিষোদ্গার করলেন শিল্পসাহিত্যের পীঠস্থান পারির বহুদূরে থেকেও। সালতামামির বিচারে তাঁকে বলা চলে ভ্যান গঘ-এর প্রায় সমসাময়িক। ইয়োরোপীয় ইম্প্রেশনিজম-এর যে-ঢেউ সমাহিত রাশিয়ার বুকে এসে আছড়ে পড়ল, তার ফলস্বরূপ আবির্ভূত হলেন—না, কোনো চিত্রশিল্পী, কবি বা ঔপন্যাসিক নন —একজন ছোটগল্পকার, সমগ্র ইম্প্রেশনিস্ট আন্দোলনের শুদ্ধতম প্রতিনিধি : আন্তন চেখভ (১৮৬০—১৯০৪)। এই ঘটনাটিকে কি নেহাতই সমাপাতনিক বলব যে 'গুজবেরিজ' নামক একটি গল্পে তিনি সুখী জীবনের শস্তা ধারণাটির প্রতি আমাদের আলোচ্য শিল্পীর মতোই একইভাবে ঘৃণাবর্ষণ করেছিলেন?

ভ্যান গঘ এবং বোদলেয়ার যে-অর্থে দ্বন্দ্বদীর্ণ, যে-অর্থে তাঁরা সামাজিক সুখের বিপরীতে স্বেচ্ছায় ধাবমান, সেই একই অর্থে চেখভ-এর 'জনৈক চিত্রকরের কাহিনী'র নায়কও গৃহকর্তাকে প্রশ্ন করে, "আপনি কেন এমন ক্লান্তিকর জীবনযাপন করেন, তা কি বলবেন আমাকে?" গল্পটি পড়তে পড়তে আমরা বুঝতে পারি 'ক্ষমাসুন্দর' চেখভ-এর অনুরাগ কোনদিকে। শৈল্পিক উন্মার্গচারিতা, উনিশ শতকী ফরাসী দেশে যা 'bohème' নামে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল, যা বোদলেয়ার থেকে শুরু করে ভের্লেইন, তুলুস-লোত্রেক থেকে শুরু করে গোগ্যাঁ এবং অনিবার্য-ভাবে ভ্যান গঘ থেকে শুরু করে কবিকিশোর আর্তুর র‍্যাঁবো, সকলেরই ছিল অন্বিষ্ট—তা যে প্রকৃতপক্ষে এই রুশ মফস্বলী ডাক্তারকেও তুমুলভাবে আলোড়িত করবে, তাঁর আপাত সংযত জীবনচর্যার আড়ালে তাঁকে করে তুলবে তীব্রভাবে অসহিষ্ণু এবং গভীরভাবে bohème-র প্রতি

অনুরক্ত, তা বুঝতে আমাদের বেশিক্ষণ লাগে না। আমরা লক্ষ করি গল্পের সেই চিত্রকর ভ্যান গঘ-এর সঙ্গে প্রায় গলা মিলিয়েই যেন বলছেন, "আমার জীবন ক্লান্তিকর, নীরস, একঘেয়ে —কারণ আমি একজন চিত্রকর, এক অদ্ভুত প্রাণী, ভবঘুরে। কিন্তু আপনি অর্থবান, স্বাভাবিক মানুষ, জমিদার, ভদ্রলোক—আপনি কেন এরকম পোষা জানোয়ারের মতো বেঁচেবর্তে আছেন, কেনই বা আপনি এত সামান্য গ্রহণ করেন জীবন থেকে?"

আদি প্রজন্মের ফরাসী উন্মার্গচারীদের জীবনযাত্রায় রঙের বাহার ছিল। তেয়োফিল গোতিয়ে কিংবা জিরার দ্য নের্ভাল দুঃখকষ্টও সয়ে যেতেন চিত্তাকর্ষক ও বর্ণময় জীবন কাটানোর তাগিদে। কিন্তু বোদলেয়ার থেকে শুরু করে ভ্যান গঘ-এর প্রজন্মের বসবাস এক বিবর্ণ, ভ্যাপসা এবং শ্বাসরোধকারী ক্লান্তির মধ্যে; শিল্পের জারকরস তাঁদের আর মাতাল করে না, আচ্ছন্ন করে রাখে। এবং এই সত্যটি চেখভ বিস্ময়করভাবে অনুধাবন করেছেন, ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর গল্পে; একবার নয়, বারবার—বিভিন্ন রূপে, বিভিন্ন ভঙ্গীতে।

'বিস্ময়কর' কথাটি আমি কিঞ্চিৎ ভেবেচিন্তেই ব্যবহার করেছি। এমন এক দেশে চেখভ-এর আবির্ভাব যে-দেশের বৌদ্ধিক জাগরণ খুব বেশিদিন হল ঘটেনি এবং যে-দেশে পশ্চিমী ইম্প্রেশনিজম তখন অবধি এক সম্পূর্ণ বৈদেশিক জোয়ার হিসেবেই গণ্য। উপরন্তু, উনিশ শতক প্রযুক্তির শতক হলেও, শিল্পবাণিজ্য নির্ভর অর্থনীতির প্রসার ঘটলেও, আজকের মতো এতখানি যান্ত্রিক উন্নতি নিশ্চয় ঘটেনি যে কোনো দূর দেশে নতুন তত্ত্বের উদ্ভব হলেই তা ক্ষণকালের ব্যবধানে বহুযোজন অতিক্রম করে এসে পৌঁছবে। সুতরাং, স্থানকালের কথা মাথায় রেখে চেখভ-এর মতো এক ব্যক্তিত্বের উদয় বিস্ময়কর বইকি। রুশ সাহিত্যে চেখভ-এর ভূমিকা কতখানি সুদূরপ্রসারী হতে চলেছে, তা একমাত্র প্রথম থেকে বুঝতে পেরেছিলেন গোর্কি; তিনিই একমাত্র স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন চেখভ-এর আগমন এক প্রাচীন প্রজন্মের অবসান ঘটিয়ে উন্মোচন করছে নবদিগন্ত। "আপনি কি জানেন আপনি কী করছেন?" ১৯০০ সালে একটি চিঠিতে গোর্কি প্রশ্ন করেন চেখভকে। "বাস্তববাদকে হত্যা করছেন আপনি...আপনার যে-কোনো গল্প পড়ার পর, তা যত তুচ্ছই হোক না কেন, বাকি সবকিছু কর্কশ মনে হয়, মনে হয় আপনি কলমে না-লিখে মুগুর ব্যবহার করেছেন।"

অনেকটা ভ্যান গঘ-এর উল্লিখিত পত্র-প্রতিধ্বনি তুলেই যেন চেখভ-এর একাধিক গল্পের নায়ক আপন আপন বৃত্তে শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠে ব্যর্থ ও অক্ষম। হয়তো এদিক থেকে তাঁর পূর্বসূরী হিসেবে ডস্টয়েভস্কি এবং তুর্গেনিভ গণ্য হবেন কিন্তু এই দুই কথাসাহিত্যিকের একজনও ব্যর্থতা এবং নিঃসঙ্গতাকে অবশ্যম্ভাবী ভাগ্যলিখন হিসেবে মনে করেননি। রুশ সাহিত্যের ইতিহাসে চেখভই প্রথম স্রষ্টা যাঁর রচনায় বারংবার দেখি মানুষ অপ্রতিহতভাবে এগিয়ে চলেছে নিঃসঙ্গতার দিকে, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির মধ্যে যে অসেতুসম্ভব ব্যবধান, তার মধ্যে সংযোগস্থাপন করতে অসহায়ভাবে বদ্ধপরিকর, কখনো-সখনো সে যদি বা কোনো ফাঁক জুড়তে সফল হয়, তৎক্ষণাৎ এগিয়ে যায় নিকটতর আর একটি ফাঁকের দিকে। এটাই ইম্প্রেশনিজম-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। চেখভ-এর চরিত্ররা তাই প্রতিনিয়ত এক সুতীব্র আশাহীনতা দ্বারা আক্রান্ত হয়। তারা অসহায়, ইচ্ছাশক্তির শেষবিন্দুতে এসে তারা দাঁড়িয়েছে, যাবতীয় প্রয়াসের শূন্য পরিণামের কথা তাদের অজানা নয়। এই যে নৈরাশ্যময় এবং শ্রমবিমুখ জীবনদর্শন, জীবনের পরিণামহীন নগণ্যতার প্রতি

এই যে দুর্মর বিশ্বাস—এর সবকিছুরই ফলাফল নিশ্চিত ও ব্যাপক। আমরা তাই দেখতে পাই কাহিনীভাগের ওপর লেখক অধিকতর আস্থাবান, বাহ্যিক ক্রিয়াকর্মের প্রতি উদাসীন, গল্প লেখার ক্ষেত্রে যা কিছু বিধিবৎ, যা কিছু সাংগঠনিক, সেই সবই যেন লেখক প্রবলভাবে অস্বীকার করছেন, যাবতীয় সংহতি এবং কেন্দ্রীভবনের প্রতি এক গভীর বীতরাগ; শুধু স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছেন এমন এক রচনাশৈলীতে—যেখানে গঠনের কেন্দ্রবিন্দু বলে কিছু নেই, প্রচলিত অর্থে গল্পের পরিকাঠামোকে অস্বীকার, অগ্রাহ্য এবং একই সঙ্গে উদ্ধতভাবে অতিক্রম করেছেন। এবং এখানে চেখভ-এর আত্মার আত্মীয় কোনো কথাসাহিত্যিক নন, নন ইম্প্রেশনিস্ট আন্দোলনের পুরোধাগণ, কিন্তু এমন এক শিল্পী যিনি ইম্প্রেশনিস্টদের সমসাময়িক হয়েও 'ইম্প্রেশনিস্ট' হননি কখনো, সুস্পষ্টভাবে যাঁর কোনো পূর্বসূরী বা উত্তরসূরী দেখা যায় না ; চেখভ-এর মতোই তিনিও আপন সৃষ্টির ক্ষেত্রে যা কিছু প্রথাগত, যা কিছু সাংগঠনিক, সেই সবই প্রবলভাবে অস্বীকার করেছেন, যাবতীয় সংহতি এবং কেন্দ্রীভবনের প্রতি তাঁরও রয়েছে এক গভীর বীতরাগ, যাঁর চিত্রকলায় গঠনের কেন্দ্রবিন্দু বলে কিছু নেই, চিত্রের মধ্যে প্রচলিত অর্থে কোনো জ্যামিতিক পরিকাঠামোও ধরা পড়ে না—তিনি রেনোয়া, সেজান বা দেগা নন, তর্কাতীতভাবে ভ্যান গঘ। তাঁর দাউ দাউ সাইপ্রেস, বিস্তীর্ণ শস্যপ্রান্তর বা অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরে আলুভোজীদের দেখে মনে হয় ছবির ফ্রেম যেন অনেকখানি ঢেকে দিয়েছে ছবিকে, না হলে হয়তো 'আরও কিছু' আমরা দেখতে পেতাম। চেখভ-এর ছোটগল্প এবং নাটকগুলিও যেন একইরকম অসমাপিকা সুরধ্বনি বাজিয়ে শেষ হয়, জীবনের পরিণামহীনতাকে বোঝানোর জন্যে, অদ্ভুত খাপছাড়াভাবে, আমাদের মন কানায় কানায় সন্তুষ্ট না করেই, নেহাতই দায়সারাভাবে, অনেকাংশেই স্বেচ্ছাচারীর মতো। ভ্যান গঘ এর মতোই, চেখভও এমন শিল্পাদর্শে বিশ্বাসী যা কোথাও নির্দিষ্ট সীমানা নির্ধারণ করে না, শিল্পকে 'সীমায়িত' করতে তাঁরা দুজনেই নারাজ। ভ্যান গঘ-এর ছবি দেখতে দেখতে কিংবা চেখভ-এর গল্প পড়তে পড়তে মনে হয় চলমান জীবন যেন সহসা তাঁদের সৃষ্টির মধ্যে ধরা পড়ে গেছে। এ যেন স্রোতস্বিনী নদীর একটি 'ফ্রিজ শট' নেবার মতো। নদীর স্রোত ছবির ফ্রেমে স্তব্ধ, কিন্তু তার ফলে সেই স্রোতের সঞ্চরমাণতা বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না। এঁরা যা-কিছু সৃষ্টি করেছেন, সবই যেন আকস্মিকভাবে। যেন প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছেন ভ্যান গঘ। চোখে পড়ে গেল একটা সাইপ্রেস, বা শস্যপ্রান্তর, বা নদীর উপর সাঁকো। অমনি সেসব মনের মধ্যে ছাপ ফেলে গেল দুরন্তভাবে, যেন ভ্যান গঘ-এর সঙ্গে বহুদিন ধরেই নিবিড় আত্মীয়তা গড়ে উঠেছিল তাদের, আর তাই ক্যানভাসে তাদের ফুটিয়ে তুলতেও কালক্ষেপ ঘটল না। কিংবা ধরা যাক, কোনো চাষীবাড়ি সন্ধেবেলা গেছেন গল্প করতে। দেখলেন গোটা পরিবার বসেছে খাবার টেবিলে, বাটিভর্তি আলু নিয়ে। অমনি হয়ে গেল একটা ছবি। অনির্দেশ্যভাবে হাঁটতে হাঁটতে রাত্রিবেলা ঢুকে পড়েছেন একটি নির্জন কাফেতে। প্রায়শূন্য, নিস্তেজ, নিষ্প্রভ কাফেটি অমনি হয়ে উঠল এক পূর্ণাঙ্গ চিত্র। এই সবকিছুই—সাইপ্রেস, বা শস্যপ্রান্তর, বা নদীর উপর সাঁকো, বা আলুভোজী চাষী পরিবার, বা রাত্রের কাফে—এক-একটি খণ্ডচিত্র হলেও ভ্যান গঘ-এর কাছে চলমান জীবনের নির্যাস যেন। এদের কাউকে-না-কাউকে স্পর্শ করলে গভীরতম অর্থে আমরা জীবনের অমেয় আত্মাকেই স্পর্শ করি। অনুরূপভাবে চেখভ-এর গল্প পড়তে পড়তে মনে হয় তিনি যা-কিছু দেখেছেন, যা-কিছু শুনেছেন, সবই যেন অকস্মাৎ ঘটে গেছে, কোনো পূর্বপরিকল্পনা ছাড়াই। অভাগা কেরানিটির

মৃত্যু যেন হঠাৎ তিনি দেখে ফেলেছেন, হঠাৎ যেন তাঁর চোখ চলে গেছে হাসপাতালের ছ নম্বর ওয়ার্ডে উন্মাদ রোগীটির দিকে, এবং হঠাৎই যেন অন্ধকার ঘরে তাঁকে কোনো এক অজানা নারী এসে ভ্রমবশত চুম্বন করে পালিয়ে গেছে। সবই আকস্মিক, মুহূর্তের অভিজ্ঞতামাত্র। কিন্তু সেই মুহূর্তটুকুই শাশ্বত হয়ে ওঠে। লক্ষণীয়, তাঁর ছোটোগল্প এবং নাটক চেখভ যেভাবে তুচ্ছাতিতুচ্ছ, নগণ্য বিষয়কে আশ্রয় করে গড়ে তোলেন, জীবনের খণ্ডচিত্রগুলিকে পূর্ণরূপ দিয়ে থাকেন, সেই একইভাবে ভ্যান গঘ-এর অবলম্বন নগণ্য বস্তুসম্ভার। এক জোড়া বেখাপ্পা বুটজুতো বা একটা সাদামাটা খাট, একটা নিরাভরণ চেয়ার, একটা বিশেষত্বহীন সূর্যমুখী—এইসব নিয়েই গড়ে ওঠে তাঁর জগৎ। চেখভ-এর নাটকের মতোই তাঁর ছবিতেও 'নাটকীয়' কিছু ঘটে না, চোখধাঁধানো কোনো ক্রিয়াকাণ্ড নেই, নেই কোনো উত্থানপতন বা সংঘাত, বিস্ফোরণ বা বিপর্যয়। চেখভ-এর কুশীলবরা সংগ্রাম করে না, আত্মরক্ষাও করে না, জয়ী কিংবা পরাজিত, কিছুই হয় না—ভ্যান গঘ-এর 'আলুভোজীদের' মতোই সাধারণভাবে তারা দিন কাটিয়ে দেয়, ধীরগতিতে, পরিণামহীন জীবনের নিস্তরঙ্গ স্রোতে শুধু ভেসে চলাই তাদের কাজ। আপন ভাগ্যকে তারা মেনে নেয় সুস্থিরভাবে, 'দুর্ভাগ্য' বলে তাদের কাছে আলাদা আলাদা কোনোকিছুর অস্তিত্ব নেই। নিশ্বাসপ্রশ্বাসের মতোই ওটা তাদের কাছে স্বাভাবিক ব্যাপার। এবং এইভাবে, প্রায় ভ্যান গঘ-এর জীবনাদর্শ অনুসরণ করেই, চেখভ-এর পাত্রপাত্রীরা বেছে নেয় শুধুমাত্র সৎ, অনাড়ম্বর জীবন। 'শুধুমাত্র সৎ' হবার তাগিদে চেখভ ও ভ্যান গঘ আত্মপ্রকাশের এমন এক ভঙ্গি গ্রহণ করেন যেখানে যথাক্রমে শব্দ ও বর্ণের শুদ্ধতা এবং বাস্তবের সঙ্গে নিবিড় সংযোগ তাঁদের ক্রমশ আক্রান্ত করে তোলে—যার ফলে তাঁদের শিল্প হয়ে ওঠে বিশিষ্ট ও সপ্রাণ। আমরা তাই অবাক হই না যখন দেখি ভ্যান গঘ তাঁর সমসাময়িক প্রখ্যাত চিত্রশিল্পীদের দ্বারা প্রভাবিত না-হয়ে ঋণস্বীকার করছেন রেমব্রান্ট এবং মিইয়ের কাছে। আর চেখভ-এর মনোভূমির সঙ্গে কারও যদি ক্ষীণতম সূত্র ধরা পড়ে, তা ডস্টয়েভস্কির। এবং রেমব্রান্ট ও ডস্টয়েভস্কি, দুজনেই কি প্রায় এক জগতের বাসিন্দা নন—মানবমনের গহনগভীরে এঁরা দুজনেই কি সতত বিচরণশীল নন, এঁদের সৃষ্টির মধ্যে কি আমরা বারবার খুঁজে পাই না এক আত্মানুসন্ধানীর ছায়া, অপরূপ বিষণ্ণতার স্পর্শ, অনন্ত দুঃখের সুরলহরী? সুতরাং এতে আর আশ্চর্য কি যে এই দুই মহান স্রষ্টার মানসপুত্ররাও হবেন বহুলাংশে নিকটাত্মীয়, জগৎ ও জীবন— দুইয়ের প্রতি এঁদেরও থাকবে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি, এক অনাবিল মানবিকতা।

এক এক সময় মনে হয় ভ্যান গঘ এবং চেখভ—দুজনেই আপন আপন স্থান বিনিময় করে নিলেও হয়তো কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হত না। কথাটার মধ্যে কিছুটা ভাববাদী আবেগ থাকলেও, বস্তুতপক্ষে ভ্যান গঘকে আমরা অতি সহজেই এক মরমী কথাশিল্পী বলতে পারি, যেমনভাবে চেখভকে অবলীলাক্রমে বলতে পারি এক নিগূঢ় চিত্রকর। এটা বলা সম্ভব হয় এই কারণে যে এঁদের উভয়েরই সৃষ্টির মধ্যে এক প্রেমিক সত্তা, এক কবিহৃদয় সদাজাগ্রত। ভ্যান গঘ-এর প্রতিটি তুলির আঁচড়ের গভীরে, চেখভ-এর প্রতিটি শব্দগঠনের আড়ালে লুকিয়ে থাকে জীবনের প্রতি এক গভীর সংরাগ। ছবির বিষয় বা কাহিনীর আখ্যানভাগ ভিন্ন হলেও সেই আগুন মেঘের কোলে কোলে বিদ্যুতের মতো ঝলসে যায়। তখনই মনে হয় এই দুই মহান শিল্পীই যেন 'প্রেম'-নামক বস্তুটিকে আপন অন্তঃসারে পরিণত করে নিয়েছেন—তাঁদের মাধ্যম আলাদা হল কি না,

বিষয়নির্বাচনে কোনো তারতম্য ঘটল কি না, তাতে তার আর কিছুই আসে যায় না তখন, তাঁদের অনুভূতিটুকুই আমাদের কাছে আকাশের মতো অনিঃশেষ হয়ে ওঠে। মনে হয় তাঁদের এই তীব্র শক্তিই যেন তাঁদের সৃষ্টির পরতে পরতে অমর হৃদ্‌পিণ্ডের মতো ধ্বনিত হচ্ছে বিচিত্র আবরণের আড়ালে। এই কারণে তাঁদের ছবি ও গল্পগুলিকে দ্ব্যর্থহীনভাবে কবিতা বলতে ইচ্ছে করে। এঁদের উভয়েরই সৃষ্টির উপাদান ও অবলম্বন চিরচেনা জীবন ও জগৎ, মানবহৃদয়ের আদিম উদ্যান, কবির সেই একান্ত নন্দনকানন, যেখানে বহু ধৈর্য, বহু তিতিক্ষা, বহু ত্যাগস্বীকারের পর এক-একটি হীরকবিন্দুর মতো এক-একটি কবিতার জন্ম হয়ে থাকে। এই দুই কবি আজও তাই আমাদের কাছে অমলিনভাবে আধুনিক।



আহাররত চারজন কৃষক, ১৮৮৫
অ্যামস্টার্ডাম, ভ্যান গঘ্ মিউজিয়াম (ভিনসেন্ট ভ্যান গঘ ফাউন্ডেশন)

আলুভোজীরা

অনিৰ্বাণ রায়

ছবিও একটা পড়ার জিনিস। ছবিরও একটা অর্থ আছে, একটা বক্তব্য কথা আছে।

প্রমথ চৌধুরী, 'বইয়ের ব্যাবসা'

একশো বছরেরও আগে ন্যুয়েনেনে থাকার সময় ভিনসেন্ট ভ্যান গঘ এঁকেছিলেন 'আলুভোজীরা' (The Potato Eaters) নামে ছবিটি। সমালোচকেরা প্রায় সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করেছেন যে এটি তাঁর জীবনের অন্যতম একটি শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। সাঁইত্রিশ বছরের সংক্ষিপ্ত জীবনে ভিনসেন্ট ছবি এঁকেছিলেন মাত্র দশ বছর (১৮৮০-১৮৯০)। সেই সব ছবির ভেতরে 'আলুভোজীরা' ছবিকে কেন্দ্র করে তাঁর এত ভাবনাচিন্তা মূলত ভাই তেও-কে লেখা চিঠিপত্রে ছড়িয়ে আছে যে এ ছবি আমাদের রীতিমত কৌতূহলী করে তোলে। এই ছবিকে উপলক্ষ করেই তরুণ শিল্পীবন্ধু আন্তন ভান রাপার্ড (১৮৫৮—১৮৯২)-এর সঙ্গে ভিনসেন্টের উত্তপ্ত পত্র-বিনিময় হয়। 'আলুভোজীরা' ছবির কথা শেষ জীবনেও ভুলতে পারেন নি তিনি। Night Café (সেপ্টেম্বর ১৮৮৮) ছবির প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে টেনে এনেছেন 'আলুভোজীরা'কে: 'for the picture is one of the ugliest I have done. It is the equivalent, though different, of the Potato Eaters'.

কিন্তু এমন কী আছে এই ছবিতে যার কথা কিছুতেই ভুলতে পারেন না ভিনসেন্ট ভ্যান গঘ! সমালোচকদের একবাক্যে স্বীকার করতে হয় 'ইউরোপীয় চিত্রকলার ইতিহাসে' এই ছবি 'মাস্টারপিস'!

দুই

যাজক থেওডোরাস ভ্যান গঘ (১৮২২-১৮৮৫) এবং আনা কর্নেলিয়া কার্বেন্টুস (১৮১৯-১৯০৭)-এর ছয় সন্তানের জ্যেষ্ঠতম ভিনসেন্ট ভ্যান গঘ-এর পড়ালেখা শুরু হয়েছিল স্থানীয় একটি আবাসিক পাঠশালায়। লাল চুল, নীল নয়ন, মুখে দাগ ভিনসেন্ট পড়ালেখায় খুব একটা মনোযোগী ছিলেন না। এই পাঠশালা তাঁর পক্ষে উপযুক্ত মনে না হওয়ায়, তার ওপর ভিনসেন্ট আবার উদ্ধত হয়ে যাচ্ছেন দেখে, অভিভাবকরা তাঁকে আর একটি পাঠশালায় ভর্তি করে দিলেন। এখানে দেড় বছর থেকে উচ্চতর পাঠ নিলেন। টিলবুর্গের এই বিদ্যালয়ে পড়বার সময় গ্রন্থপাঠক্ষুধা তাঁকে অস্থির করে তোলা শুরু করে। বিশেষ করে তিনি পড়তেন দরিদ্র নিপীড়িতদের কাহিনী। *আঙ্কল টম্‌স্ কেবিন* পড়ে তাঁর 'ভালো' লেগেছিল।

ষোলো বছর বয়সে পড়ালেখার পর্ব চুকিয়ে কিছুকাল বাড়িতে বসে থাকেন। পরে তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় দ্য হেগ-এ কাকা সেন্ট-এর কাছে। তিনি ছিলেন ব্যবসায়ী। ব্যাবসা তিনি

বিক্রি করে দিয়েছিলেন গুপিল অ্যান্ড কোম্পানিকে। কাকার সুপারিশে এই কোম্পানিতে কেরানির কাজ পেলেন ভিনসেন্ট। এখানে সাত বছর (১৮৬৯-৭৬) কাজ করার পর চাকরি থেকে বরখাস্ত হলেন। পরের বছর ইংল্যান্ডে এক মিশনারী বিদ্যালয়ে শিক্ষাকতার কাজ করলেন কিছুকাল। এর পর হল্যান্ডে এক বইয়ের দোকানে স্বল্পকালের কর্মজীবন। তারপর আমস্টার্ডাম গেলেন ধর্মতত্ত্ব অধ্যয়ন করতে। এখানে ব্যর্থ হয়ে সেবার কাজ নিয়ে এলেন বোরিনাজের কয়লাখনি অঞ্চলে। এখানকার সাধারণ খেটেখাওয়া মানুষদের অবর্ণনীয় দুরবস্থা তাঁকে গভীরভাবে বিচলিত করেছিল। শ্রমিকদের মতো তিনিও কম খাওয়া ধরলেন। ফলে প্রায়-মরতে বসলেন ভিনসেন্ট। খবর পেয়ে ভাই তেও এসে সে-যাত্রায় দাদাকে বাঁচান।

এই সময় (১৮৮০) তাঁর ছবি আঁকা শেখার ইচ্ছা প্রবল হয়ে ওঠে। তেও তাঁকে নিয়মিত মাসোহারা পাঠাতেন এজন্য।

*

১৮৮০ থেকে ভিনসেন্টের জীবনে এক নতুন পর্বের শুরু হয়। 'আলুভোজীরা' ছবিটা আঁকা হয় ১৮৮৫তে। এই পাঁচ বছরে ভিনসেন্ট কয়েকবার প্রেমে পড়েছেন। ব্যর্থ হয়েছেন। দ্য হেগ-এ থাকার সময় মডেল সিয়েনের সঙ্গে ভিনসেন্টের একটি সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে এই সম্পর্ক ভেঙে গেলে তিনি হেগ থেকে চলে আসেন ড্রেনথে। এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ তাঁকে প্রেরণা দিলেও কাজের পরিবেশ অনুকূল ছিল না। তেও-র কাছ থেকে নিয়মিত মাসোহারা আসার বিলম্ব বৃদ্ধি পাচ্ছিল আর সেই সঙ্গে তাঁকে ছিঁড়ে খাচ্ছিল নিঃসঙ্গতা। বাধ্য হয়ে ভিনসেন্ট ঠিক করলেন ন্যুয়েনেনে বাবা-মায়ের কাছে চলে যাবেন।

ন্যুয়েনেনের সবচেয়ে আকর্ষক মানুষ হল তাঁতিরা। একটানা কাজ করে সপ্তাহে অন্তত ষাট গজ কাপড় একজন বুনতে পারে। শান্তিপূর্ণ তাদের জীবনযাত্রা। কথাবার্তায় হতাশার কাঠিন্য বা উত্তেজনার উত্তপ্ততা নেই। মেজাজ সবসময় বেশ হাসিখুশি।

তাঁতিদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হল ভিনসেন্টের। তাদের ছবি আঁকেন তিনি। ভোরবেলা উঠে বেরিয়ে পড়েন। ছবি আঁকেন। এখানেও ছবি আঁকায় বাধা সৃষ্টি করল একটি মেয়ে। প্রথমে তার সঙ্গে ভিনসেন্টের বন্ধুত্ব হল বটে কিন্তু গাঁয়ের লোকেরা ব্যাপারটা ভালো চোখে দেখল না। ভিনসেন্ট মেয়েটিকে বিয়ে করতে চাইলে তাঁর নিজের পরিবার থেকে সম্মতি মিলল না। এদিকে মার্গো বা মার্গত বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করতে চেষ্টা করল।

ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন বাবার মৃত্যু হল (২৬ মার্চ ১৮৮৫)। বোনেরা, বিশেষ করে আনা, চান না যে ভিনসেন্ট বাড়িতে থেকে ছবিটবি আঁকুন। তিনি যেন বাড়ি ছেড়ে চলে যান।

বাড়ি থেকে খানিকটা দূরে এক ক্যাথলিক গির্জার পাশে স্যাফ্রথের বাড়ি। তারই উপরতলায় দুখানা ঘর পাওয়া গেল। একটায় নিজের সব জিনিসপত্র রাখলেন। আর-একটাকে করলেন স্টুডিও।

ন্যুয়েনেনে থাকার সময় ডি গ্রুট নামে এক কৃষক পরিবারর সঙ্গে আলাপ হল ভিনসেন্টের। গ্রুট পরিবারে আছে মা, বাবা, এক ছেলে, দুই মেয়ে—সব মিলিয়ে মোট পাঁচজন। তারা সকলেই মাঠে কাজ করে।

আলু-সর্বস্ব জীবন ডি গ্রুট পরিবারের। তারা আলু চাষ করে, আলুই তাদের প্রধান আহার্য।

রাতে হয়তো দু-এক টুকরো মাংস ওই আলুর সঙ্গে কখনো কখনো জোটে। তার সঙ্গে পান করে খানিকটা কালো কফি।

ভিনসেন্ট প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় ডি গ্রুট পরিবারে যান। তাঁদের আঁকেন। এখানেও ব্যাপারটা ভালো চোখে নিল না অনেকেই। ভিনসেন্ট আর ডি গ্রুট পরিবারের মেয়ে স্টিয়েনকে জড়িয়ে কুৎসা রটনা করা হল। ভিনসেন্ট যাতে ডি গ্রুটদের মডেল করে ছবি আঁকতে না পারেন তার জন্য তাদের লোভ দেখানো হল। অবশ্য এতে করে টলানো গেল না তাদের। গাঁয়ের অন্যদেরও লোভ দেখানো হয়েছিল। তবে তাদেরও টলানো যায় নি।

ভিনসেন্টের মন ভেঙে যায় হতাশায়। ছবি আঁকেন ছিঁড়ে ফেলেন। কিছুতেই আর পছন্দ হয় না। ইতিমধ্যে ঠিক করে ফেলেছেন ন্যুয়েনেন ছেড়ে চলে যাবেন।

"প্রত্যেক রাত্রে সে গ্রুটদের বাড়ি যেতে লাগল। ওরা টেবিলে বসে বসে যতোক্ষণ না ঘুমে ঢুলে পড়ে ততোক্ষণ সে কাজ করতে লাগল। রঙ নিয়ে ভঙ্গি নিয়ে মূল্যবোধ নিয়ে পরীক্ষা করতে লাগল প্রতি রাত্রে ভোর না হওয়া পর্যন্ত। কিন্তু দিনের আলোয় ফাঁকি ধরা পড়ে, প্রকাশ হয় অসম্পূর্ণতা।

মাসের শেষ দিন। উন্মাদের মতো অবস্থা ভিনসেন্টের। বিনিদ্র রক্তচক্ষু—খাওয়া দাওয়ার সঙ্গে সম্পর্ক নেই। প্রচণ্ড একটা স্নায়বিক তাড়না তাকে খাড়া করে রেখেছে, ছুটিয়ে চলেছে অবিশ্রান্ত প্রতিটি মুহূর্তে। যতোবার সে ব্যর্থ হচ্ছে, তীব্রতর হচ্ছে এই তাড়না। ঈজেল সাজিয়ে রঙ গুলে সে প্রতীক্ষা করতে লাগল—কখন ডি গ্রুটরা মাঠ থেকে ফিরবে। আজ শেষ চেষ্টা। কাল সকালে নিউনেনের পাট তার উঠবে—চিরদিনের মতো।

নিঃশব্দে সে কাজ করে চলল ঘণ্টার পর ঘণ্টা। ডি গ্রুটরাও বুঝল; খাওয়া শেষ হবার পর তারা টেবিল ছেড়ে উঠল না, বসে রইল হাত গুটিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। চুপি চুপি কথা বলতে লাগল নিজেদের মধ্যে। যন্ত্রের মতো সে কাজ করে চলেছে, আঙুল ছুটেছে নিশি-পাওয়ার মতো। কী সে আঁকছে, কোন্ রঙ সে চড়াচ্ছে, তার যেন কোনো বোধ নেই, চেতনা নেই। দশটা বেজে গেল। ঘুমে ঢুলে এল সারা দিনের কর্মক্লান্ত কৃষাণ-কৃষাণীদের চোখ। ভিনসেন্টের সারা অঙ্গও যেন ক্লান্তিতে ভেঙে এল। উঠে পড়ল সে, গুছিয়ে নিল জিনিস-পত্র। বিদায় নিল সে নিউনেনের এই পরম বন্ধু পরিবারের সকলের কাছ থেকে, স্টিয়েনকে করল চুম্বন। পথে বার হয়ে স্টুডিয়োর দিকে হাঁটতে লাগল যন্ত্রচালিতের মতো।

স্টুডিয়োতে ফিরে এসে ক্যানভাসটা একটা চেয়ারের ওপর দাঁড় করিয়ে রাখল। পাইপটা ধরিয়ে তীক্ষ্ণ চোখে পরীক্ষা করল তার এই শেষ সন্ধ্যার কাজ। ভুল, সব ভুল হয়েছে। কিছুই হয়নি, আসল অনুভূতিটাই তাকে ফাঁকি দিয়ে দূরে সরে গেছে, প্রকাশকে এড়িয়ে গেছে উপলব্ধি। আবার তার হার। ব্যর্থ তার ব্র্যাবান্টের পূর্ণ দু-বছরের পরিশ্রম।

পাইপের তামাকটা শেষ পর্যন্ত সে টানল। জিনিসপত্র গুছিয়ে নিল ব্যাগের মধ্যে। ছবিগুলো ভরল একটা কাঠের বাক্সে। তারপর চিত হয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়।

এমনিভাবে কতোক্ষণ সময় কেটেছে খেয়াল নেই, হঠাৎ চমক লাগার মতো উঠে বসল। ক্যানভাসটাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ঈজেলের ফ্রেমে নতুন একটা ক্যানভাস পরালো। নতুন রঙ গুলে আবার কাজ আরম্ভ করল।

প্রকৃতিকে শুধু অনুকরণ করবার জন্যে শিল্পী যতো উন্মাদের মতো তার পেছনে ছোটে, ততোই সে ভুল করে,—প্রকৃতি ততোই এড়িয়ে যায়, দূরে সরে যায়। কিন্তু শিল্পী যখন তার সমস্ত উপলব্ধিকে সংহত করে রঙে আর রেখায় তার সমস্ত অনুভূতি মিশিয়ে আঁকে, প্রকৃতি তখনই হার মানে, কাছে এসে ধরা দেয়। মনে পড়ল পীটারসেনের উপদেশ। সে বড়ো কাছে পেতে চেয়েছিল প্রকৃতিকে, বড়ো কাছাকাছি বসিয়েছিল মডেলকে। তাই সে পারেনি,—যতোবার সে এঁকেছে, চিত্রবস্তুর আঁকার সম্বন্ধেই সঠিক সচেতনতা তার হয়নি। আর এই মৌলিক বিভ্রান্তিকে কাটাতে পারেনি বলেই সব ভুল হয়েছে তার। প্রকৃতির ছাঁচে নিজের শিল্পকর্মকে ঢালতে গিয়েছিল, ব্যর্থ হয়েছে। এবার সে প্রকৃতিকে ঢেলে দেখবে নিজের শিল্পকর্মের ছাঁচে।

রঙ? মূল রঙটিকে সে আবিষ্কার করল এতদিনে—জমি থেকে সবে তোলা ধূলোমাটি-মাখা নধর একটি আলুর মেটে রঙ। সব ছবিটি সে আঁকল এতোদিনের দেখার এতোদিনের অভ্যাসের জীয়ন্ত স্মৃতি থেকে। ধোঁয়া আর ঝুল-পড়া ধূসর দেয়াল, মলিন টেবিলক্লথ, কুটিরের কালো কাঠের বরগা থেকে ঝুলছে তেলের একটা সেজ। স্টিয়েন সেদ্ধ আলু পরিবেশন করছে, মা কেটলি থেকে কালো কফি ঢালছে, ভাই মুখে ধরেছে একটা পেয়ালা। প্রত্যেকের মুখের ভাবে এই অপরিবর্তনীয় জীবন-ধারার শান্ত সহজ স্বীকৃতি।

প্রভাতসূর্য উঠল পূর্ব আকাশে, জানলা দিয়ে স্টুডিয়োর ঘরে এল তার প্রথম আভা। ভিনসেন্ট তুলি রেখে টুল থেকে উঠে দাঁড়ালো। গত বারো দিনের নিত্য-নিয়ত উত্তেজনার অবসান। সারা মন জুড়ে এই প্রত্যূষের মতো শান্তি! চোখ মেলে ভালো করে তাকালো কৃতকর্মের দিকে, দেখল পুঙ্খানুপুঙ্খ করে। বেকন আর কফি আর গরম আলুর ধোঁয়াটে গন্ধ ঠিক যেন ছবিটা থেকে ভেসে উঠে নাকে এসে লাগছে। সাফল্যের খুশিতে বুক ভরে গেল তার। তার আঞ্জেলাস সে এঁকেছে। পরিবর্তমান জীবন-লীলার মাঝখানে দাঁড়িয়ে চিরন্তনকে সে বেঁধেছে শিল্পের স্বর্ণসূত্রজালে। অবিনশ্বর হয়ে রইল ব্র্যাবান্টের কৃষাণ—চিরকাল, চিরদিন!

ডিমের শাদা অংশ দিয়ে সে ছবিটার ওপর ভালো করে 'ওয়াশ' দিল। পুরোনো ছবিভর্তি বাক্সটা সে মা-র কাছে রেখে এল, সঙ্গে সঙ্গে বিদায় নিয়ে এল তাঁর কাছ থেকে। স্টুডিয়োতে ফিরে ক্যানভাসটার নিচে লিখল, 'আলুভোজীরা'।"

(আর্ভিং স্টোন : *লাস্ট ফর লাইফ*। অনুবাদ : নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়)

তিন

'আলুভোজীরা' ছবির পাঁচটি রূপান্তর এ পর্যন্ত লক্ষ করা গেছে।

প্রথম ছবিটির অঙ্কন কাল মার্চ ১৮৮৫। কালো খড়িতে আঁকা ড্রয়িং। মাপ $৮^{১}/_{৪}$ x $১৩^{৩}/_{৪}$ ইঞ্চি।

এ ছবিতে দেখা যায় একটি টেবিল ঘিরে চারজন বসে আছে। এদের ভেতর দুজন রমণী। একজন সামান্য বয়স্ক। পেছন ফিরে বসে আছে দুজন। টেবিলে একটা প্লেট। ঘরের ছাদ থেকে ঝুলছে ঘেরাটোপ দেওয়া বাতি।

দ্বিতীয়টি কালি-কলমে আঁকা ড্রয়িং, তেও-কে এপ্রিল ১৮৮৫তে লেখা একটি চিঠিতে পাঠিয়েছিলেন। মাপ ২ x $৩^{৩}/_{৪}$ ইঞ্চি।



আলুভোজীরা, ১৮৮৫
অ্যামস্টার্ডাম, ভ্যান গঘ মিউজিয়াম (ভিনসেন্ট ভ্যান গঘ ফাউন্ডেশন)

এখানে দেখা যায় চরিত্রের সংখ্যা পাঁচ। একজন রমণী কেটলি থেকে কফি ঢালছে। পেছন ফিরে বসে আছে একজন। ঘরের ছাদ থেকে ঝুলছে ঘেরাটোপ দেওয়া বাতি। আগের ছবিতে দেয়ালের আভাস ছিল। এবার সেটা স্পষ্ট হয়েছে। দেয়ালে কিছু-একটা টাঙানো আছে। ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

তৃতীয় ছবিটির অঙ্কনকাল এপ্রিল ১৮৮৫। প্যানেলের উপর ক্যানভাস। মাপ $২৮^{৩}/_{৮}$ x$৩৬^{৫}/_{৮}$ ইঞ্চি।

এ ছবিটা রঙিন। আগেকার ছবিতে পেছন ফিরে-বসা চরিত্রের বয়স ঠাহর করা যায়নি। এখন, এ ছবি দেখে মনে হয় তার বয়স পনেরোর কাছাকাছি। এখানেও চরিত্রের সংখ্যা পাঁচ। একজন কফি ঢালছে। ছবির বাঁ দিকে চেয়ারে লোকটি বসে আছে। মাথায় টুপি। টেবিলটা সু-দৃশ্যমান। প্লেট ভরা আলুসেদ্ধ। টুপি-পরা লোকটি ছুরি দিয়ে খাচ্ছে। একজন প্রবীণ মহিলা তাকিয়ে আছে। তার বাঁ-পাশে একজন বয়স্ক পুরুষ। হাতে বাটি। কফি পান করছে ? তারও মাথায় টুপি। ছাদ থেকে ঝুলছে ঘেরাটোপ দেওয়া বাতি। ফলে ছবির চরিত্রদের মুখে আলোছায়ার খেলা। সারা ঘরে এই কারণে ছেয়ে আছে দারিদ্র্যের চাপ-চাপ ছাপ। মানুষগুলো মুখেও অভাবের রেখা। ছাদ থেকে ঝোলানো টবে ক্যাকটাস। আগের ছবিতে কি এই আভাস ছিল ? বাঁ দিকে দেয়ালে আরও দুটো কী-যেন টাঙানো রয়েছে ঠিক বোঝা যায় না।

চতুর্থ ছবির অঙ্কনকাল এপ্রিল-মে ১৮৮৫। ক্যানভাস। মাপ $৩২^{১}/_{৪}$ x$৪৪^{৭}/_{৮}$ ইঞ্চি।

বোঝা যাচ্ছে আগের ছবি থেকে এ ছবিটি আকারে বড়ো। আগেকার ছবিটি থেকে এখানে আলো অনেক স্পষ্ট। লক্ষ করার বিষয় এখানেও চরিত্রের সংখ্যা পাঁচ। কিন্তু তাদের কারো কারো ব্যক্তিত্বের বদল ঘটেছে। টুপি-পরা প্রথম যুবকটির বয়স বেড়েছে। তার পাশে যে-রমণী বসে ছিল তার বয়স কমেছে। মুখে নারীসুলভ কমনীয়তা। তার পাশে বসা বৃদ্ধের চোখমুখ, ভাবভঙ্গী আগের তুলনায় স্পষ্টতর। এখানে তার দুটি হাত দৃশ্যমান। ডান হাতে কফির বাটি। এবারকার ছবিতে টেবিলে চারটে বাটি দেখা যাচ্ছে। তিনটিতে কফি ঢালা হয়েছে। চতুর্থ বাটিতে কফি ঢালা হচ্ছে। যে ঢালছে তার মুখে চিন্তার ছাপ।

পঞ্চম ছবির রচনাকাল মধ্য-এপ্রিল ১৮৮৫। লিথোগ্রাফ। মাপ ২৬.৫ x৩০.৫সে.মি.।

এখানে চরিত্রের সংখ্যা পাঁচ। একজন আছে পেছন ফিরে। টেবিলের চার পাশে বসে আছে। তারা। একজন রমণী কেটলি থেকে কফি ঢালছে। ঘরের ছাদ থেকে ঝুলছে ঘেরাটোপ দেওয়া বাতি। ঘরে চমৎকার আলোছায়ার খেলা।

ভিনসেন্ট ভ্যান গঘের মৃত্যু শতবার্ষিকী উপলক্ষে ১৯৯০তে আমস্টার্ডামে তাঁর ছবির প্রদর্শনী হয়। সেখানে 'আলুভোজীরা' ছবিটি প্রদর্শিত হয়। প্রকাশিত চিত্রপঞ্জী (catalogue) অনুযায়ী সেই ছবির বিবরণ এইরকম :

> আলুভোজীরা/এপ্রিল ১৮৮৫/ক্যানভাস/৮১.৫ x১১৪.৫ সেমি/স্বাক্ষর বাঁদিকে নীচে : ভিনসেন্ট/ আমস্টার্ডাম, রাইখসমিউজিয়াম, ভিনসেন্ট ভ্যান গঘ (ভিঁনসেন্ট ভ্যান গঘ ফাউন্ডেশন)।

এই ছবির রঙ গাঢ় সবুজ। যেখানে ঘেরাটোপ দেওয়া বাতির আলো পড়েছে সেখানে রঙ হালকা।

একটু সাদা। একটা টেবিল। তাকে ঘিরে বসে আছে পাঁচজন। চারজনের ' মুখ দেখা যায়। আর একজন বসে আছে পেছন ফিরে। মাথার আকার এবং চুল দেখে মনে হয় পাঁচ জনের মধ্যে কনিষ্ঠতম। টেবিলের উপর একটা বড়ো প্লেট। তাতে রয়েছে সেদ্ধ আলু। প্রথম লোকটার মাথায় টুপি। ডান হাতে কাঁটা-চামচ। সেটি আলুসেদ্ধতে রয়েছে। এর চেহারা রোগা। শিরা-ওঠা হাত। চেয়ে আছে ডান দিকে কিন্তু দৃষ্টি কারো প্রতি নয়। তার বাঁ-দিকে টুপি-পরা একজন রমণী। গোল গোল চোখে চেয়ে আছে নিজের ডান দিকে চেয়ারে বসা মানুষটার দিকে। তার ডান হাতের লম্বা কাঁটা-চামচ আলুসেদ্ধ লক্ষ করেছে। তার বাঁ হাতের মুঠো টেবিলে। এই রমণী যেন কিছু বলছে ডান দিকে বসা মানুষটাকে। কী বলছে ? এই মহিলার বাঁ দিকে টুপি-পরা একজন প্রবীণ মহিলা। ডান হাতে ধরে আছে একটা বাটি। তার হাতের মুঠো দেখা যায় আবছা। মহিলা চেয়ে আছে বাঁ-পাশে বসা রমণীর দিকে। কিছু একটা বলছে বোধ হয়। তার বাঁ পাশে চেয়ারে বসে কেটলি থেকে কফি ঢালছে আর-এক রমণী। তিনটি বাটিতে ঢালা হয়েছে। চতুর্থ বাটিতে ঢালা হচ্ছে কফি। প্রবহমান এই কফি দেখা যায়। এই রমণীর বাঁ পাশে একটি টেবিলের উপর আর একটি কেটলি। এই রমণীর নজর রয়েছে কফির দিকে। নত নয়ন। তারও মাথায় টুপি। দেখা যায় তার চেয়ারের একটুখানি।

ঘরের দশটা কড়ি দেখা যায়। বাঁ দিক থেকে চতুর্থ কড়ি থেকে ঝুলছে ঘেরাটোপ দেওয়া বাতি। বাতিটি আছে ছবির ঠিক কেন্দ্রস্থলে। ফলে গোটা ছবি বা ঘরটি আলোকিত হয়ে আছে। এই আলো আবার টেবিলেরও ঠিক মধ্যস্থলে। ফলে আলুসেদ্ধ ভর্তি প্লেট আলোয় উদ্ভাসিত। ডান দিকে কফি-ভরা বাটির ছায়া পড়েছে টেবিলে। টেবিলের এক কোণে বসা কনিষ্ঠতম চরিত্রটি ঠিক কী করছে বোঝা যায় না। বাঁ দিকে দেয়ালে কিছু-একটা ছবি টাঙানো রয়েছে। তার পাশে দরজার আভাস। দুটো জানলা দেখা যায়।

এই ছবি দেখে মনে হয় কোনো চলচ্চিত্রের ফ্রিজ শট। চরিত্রগুলো হঠাৎ যেন কথা বলতে-বলতে থেমে গেছে। অথবা, এখনই কথা বলে উঠবে। সকলের মুখে কী-যেন এক ভাবনার ছাপ। মানুষগুলো যে পরিশ্রম করে, খেটে-খাওয়া মানুষ তারা—সে তাদের চোখমুখ, হাত, অতি সাধারণ পরিচ্ছদ থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বেশ খানিকটা সময় তাকিয়ে থাকার পর আমরা নিজেরাও যেন একজন চরিত্র হয়ে উঠি এই ছবির। মানুষগুলোর ভাবনাচিন্তা, দারিদ্র্যের তাপ যেন আমাদেরও স্পর্শ করে।

এমন প্রাণবান ছবি, এমন সহানুভূতিভরা ছবি ভিনসেন্ট আর কি এঁকেছেন ?

চার

একটা চিঠিতে ভিনসেন্ট লিখেছিলন, 'শিল্প হল প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত মানুষ। শিল্প কথাটার এর থেকে ভালো সংজ্ঞা আমি এখনও পর্যন্ত খুঁজে পেলাম না।' প্রকৃতি তাঁকে গভীরভাবে আকর্ষণ করত। এমনও হয়েছে, ভোরবেলা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছেন প্রকৃতির সঙ্গে কথা কইবার জন্য। আলবেয়ার ওরিয়েরকে একবার লিখেছিলেন, 'প্রকৃতির সামনে এমন আবেগগ্রস্ত হয়ে পড়ি যে সংবিৎ হারিয়ে ফেলি আর তার ফলে দিন পনেরো কোনো কাজ করতে পারি না।' এই যে প্রকৃতি, তার সঙ্গে কোন ধরনের মানুষকে যুক্ত করতে চেয়েছিলেন ভিনসেন্ট ? আমাদের

মনে হয় 'চাষী, কাগজ কুড়ুনি, সব ধরনের শ্রমিক'। ভিনসেন্টের ভাষ্য অনুযায়ী 'এদের আঁকার চেয়ে সোজা আর কিছু নেই তবে এই সব সাধারণ চরিত্রের চেয়ে কঠিন বিষয়ও আর কিছু নেই ছবি আঁকায়'। সেই কঠিনকে সহজ করার জন্য, 'আলুভোজীরা' ছবির মানুষদের ঠিক ঠিক ফুটিয়ে তোলার জন্য তাঁর অনুশীলনীর বিরাম ছিল না। কৃষকের হাত আর মুখেরই স্টাডি করেছিলেন কিছু-না-হোক পঞ্চাশবার।

ভাই তেওকে লেখা চিঠিপত্রে নিজের ছবি-আঁকার বিষয়ে এত কিছু লিখেছিলেন ভিনসেন্ট যে সে সম্পর্কে আলাদা প্রবন্ধ রচনা করা যায়। আপাতত লক্ষ করা যায় 'আলুভোজীরা' ছবির বিষয়ে তেওকে যত কথা লিখেছেন এমন আর অন্য কোনো ছবির প্রসঙ্গে লেখেননি। এ থেকে অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে এ ছবি তাঁর হৃদয়-মন কতখানি অধিকার করে ছিল।

'সঙ্গে দুটো স্টাডির খসড়া পাঠালাম, আলুর প্লেট ঘিরে বসা সেই কৃষকদের নিয়ে আবার আমি কাজ করছি। এই কুটীর থেকে সবে ফিরেছি আর প্রদীপের আলোয় কাজ করে চলেছি যদিও এবার কাজ শুরু করেছিলাম দিনের আলোয়।'

কম্পোজিশনটা দেখতে এইরকম।

একটু বড়ো ক্যানভাসেই এঁকেছিলাম এটা আর স্কেচটা এখন যেরকম হয়েছে মনে হচ্ছে এটার মধ্যে প্রাণ আছে।

যদিও আমি নিশ্চিত যে, যেমন সি. এম., ড্রয়িঙে ভুল ধরবেন। তুই কি জানিস এর বিপক্ষে কী জোরালো যুক্তি আছে ? প্রকৃতি-তে আলোর সুন্দর প্রভাবকে ড্রয়িঙে ধরতে গেলে দ্রুত হাতে আঁকতে হবে।

আমি তো ভালো করেই জানি গ্রেট মাস্টারেরা, তাঁদের অভিজ্ঞতার স্বর্ণযুগে, জানতেন কীভাবে সবিস্তারে শেষ করতে হয় আর সেই সঙ্গে কোনো বস্তুকে প্রাণপূর্ণ করতে হয়। তবে বর্তমানে সে ক্ষমতা আমার নিশ্চয় নেই। এখন যে অবস্থায় আমি আছি, তা সে যাই হোক, আমি দেখছি আমি যা-দেখছি তার সত্যিকার একটা ভাব ফুটিয়ে তোলার সুযোগ রয়েছে।

সব সময় আক্ষরিক অর্থে হুবহু অথবা কখনো হুবহু নয় কেননা নিজের মনমার্জিমাফিকই তো একজন প্রকৃতিকে দেখে।

যে-কথাটা তোকে বলতে চাই, তুই তো জানিস, সেটা এই যে: সময়কে পালিয়ে যেতে দিস না, যতটা পারিস আমাকে কাজ করতে সাহায্য কর। আর এখন থেকে সব স্টাডিগুলো এক জায়গায় করে রাখ।' (৩৯৯/১১.৪.১৮৮৫)

'যতক্ষণ না নিশ্চিত করে জানছি যে 'আলুভোজীরা' ছবিতে কিছু একটা আছে ততক্ষণ সেটা তোকে পাঠাব না।

আমি আবার এটা নিয়ে পড়েছি আর আমার মনে হয় আমার কাজে এতদিন যা তুই দেখে এসেছিস তা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা বস্তু এতে আছে। অন্তত এত সুস্পষ্টভাবে। বিশেষ করে এটার মধ্যে যে প্রাণ রয়েছে সেটার কথাই আমি বলতে চাইছি। স্মৃতি থেকে সেটা আমি সরাসরি ছবিতেই এঁকেছি। তুই তো নিজেই জানিস কতবার করে ওই-মাথাগুলো আমি এঁকেছি।[২]

আর তারপর প্রতিরাতে অকুস্থলে যাই কিছু অনুপুঙ্খ ঠিক করার জন্য। তবে ছবিতে আমি মাথাকে অর্থাৎ ভাবনা বা কল্পনাকে স্বাধীন সুযোগ দিই, স্টোরির ক্ষেত্রে অবশ্য কথাটা খাটবে না যেখানে কোনো সৃষ্টিশীল পদ্ধতিই চলবে না, তবে যেখানে কেউ বাস্তবে তার কল্পনার রসদ পায় তাকে যথাযথ করার জন্য।

কিন্তু তুই জানিস মঁসিয়ে পোতিয়েরকে আমি লিখেছিলাম, 'আজ পর্যন্ত আমি কয়েকটা মাত্র *স্টাডি* করেছি, তবে *ছবিরাও* আসবে।' আর আমি সেটাকেই ধরে রাখব।

প্রকৃতি থেকেও করা কয়েকটা স্টাডি তোকে শিগগির পাঠাতে চাই।

এই দ্বিতীয়বার দ্যলাক্রোয়ার একটা কথা আমার খুব মনে পড়ছে। প্রথমবার সেটা ছিল বর্ণ বিষয়ক তত্ত্ব, কিন্তু পরে অন্য শিল্পীদের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তায় প্রস্তুতি অর্থাৎ *ছবি* সৃষ্টি সম্পর্কে পড়েছি।

তিনি দাবি করেছিলেন যে সেরা ছবিগুলো আঁকা হয় স্মৃতি থেকে। *দেখার সাহায্যে*! তিনি বলেছিলেন, আর সেই কথাবার্তা সম্পর্কে পড়েছি যে, সেই সম্মাননীয় মানুষেরা সন্ধেবেলা ঘরে ফিরে যাচ্ছিলেন, দ্যলাক্রোয়া তাঁর স্বাভাবিক প্রাণোচ্ছলতা আর প্রাণাবেগে সরণীর মাঝখান থেকে তাঁদের এই বলে চীৎকার করতে লাগালেন, *দেখার সাহায্যে! দেখার সাহায্যে*! সম্ভবত সম্মাননীয় পথচারীদের বিস্ময় সৃষ্টি করে।' (৪০৩, শেষ-এপ্রিল ১৮৮৫)

'এই মাত্র *জার্মিনাল* পেয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছি। পঞ্চাশ পাতা মতো পড়েছি। আমার তো অপূর্ব মনে হয়; ওইসব অঞ্চল আমি একদা পায়ে হেঁটে ঘুরেছিলাম।

সঙ্গে একটা মাথার স্কেচ যেটা সবেমাত্র বাড়ি এনেছি।

আগেরবার পাঠানো স্টাডিগুলোর মধ্যে একই রকম একটা ছিল, সবচেয়ে বড়ো। কিন্তু এঁকেছি অনায়াসে।

এখন আমি ব্রাশ স্ট্রোক মোলায়েম করিনি আর প্রকৃতই রঙও সম্পূর্ণ অন্যরকম।

এখনও পর্যন্ত একটা 'মাথা'ও আমি আঁকতে পারিনি যাতে 'মাটির গন্ধ' আছে, আর যার থেকে এরকম আরো কিছু যাবে।

সব ঠিকঠাক চললে— যদি আর একটু উপার্জন করতে পারি—যাতে আরও বেশি ভ্রমণ করতে পারি—তাহলে আশা করি একদিন খনিশ্রমিকদের মাথা আঁকতে পারব। তবে আমি কাজ করে যাব যতক্ষণ না নিজের হাতের ওপর পূর্ণ দখল আসছে, যাতে করে এখনকার চেয়ে আরও দ্রুত কাজ করতে পারি, এবং, ধর, যাতে এক মাসে তিরিশটার মতো স্টাডি বাড়িতে আনতে পারি। জানি না এ থেকে অর্থ উপার্জন হবে কিনা, তবে আমাকে যদি দারুণ পরিশ্রমের কাজ করতে দেওয়া হয় তো সে-ই যথেষ্ট, সুখী হব আমি; আসল কথা যে যা-করতে চায় সে তা-ই করুক'... (৪০৯, ১৫মে ১৮৮৫)

'আলুভোজীরা ছবিটা সোনালীতে ভালো দেখাবে, এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত, দেয়াল হলেও চলবে, পাকা শস্যের গাঢ় রঙের কাগজে ঢাকা।

এরকম না হলে চলবে না।

গাঢ় পশ্চাৎপট হলে ভালো দেখাবে, ম্যাড়মেড়ে পশ্চাৎপট একেবারেই নয়। কারণ হল এই যে ছবিটা খুব ধূসর অন্দরের আভাস দেয়। বাস্তবেও এটি যেন দাঁড়িয়ে আছে সোনালী ফ্রেমে কারণ চুল্লী আর দেয়ালের বুকে আগুনের আভা দর্শকের অনেক কাছে থাকবে, এখন তারা ছবির বাইরে, কিন্তু বাস্তবে গোটা জিনিসটাই আছে পরিপ্রেক্ষিতে।'...

'আমি চেষ্টা করেছি জোর দিতে যে এই মানুষগুলো, যারা দীপালোকে আলু খাচ্ছে, সেই হাত রেখেছে ডিশে যেই হাতে মাটি খুঁড়েছে, আর সেজন্য তারা কায়িক পরিশ্রমের কথা বলে, আর কী সৎভাবে তাদের রুটির জোগাড় করেছে।

আমাদের সভ্য মানুষদের থেকে সম্পূর্ণ অন্যরকম জীবনযাত্রার একটা ছবি তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি। সেজন্য সকলেই যে এটা পছন্দ করবে বা তৎক্ষণাৎ পছন্দ করবে এরকম কোনো দুশ্চিন্তা আমার নেই।'...

'আমি ভাবি আলুভোজীরা মোটের উপর সম্পূর্ণ হবে; একটা ছবির পক্ষে শেষের দিনগুলোই বড়ো ভয়ঙ্কর, তুই তো জানিস, কারণ পুরো না শুকনো পর্যন্ত লম্বা ব্রাশ দিয়ে নষ্ট হবার ঝুঁকি না নিয়ে কেউ কাজ করতে পারে না। পরিবর্তনগুলো করতে হবে ছোটো ব্রাশ দিয়ে ধীরেসুস্থে। সেইজন্য আমি সহজভাবে নিয়ে গিয়েছিলাম বন্ধুর কাছে আর তাকে বলেছি যত্ন নিতে যাতে আমি সেটাকে তা করতে গিয়ে তাকে নষ্ট করে ফেলি আর সেজন্য তার বাড়িতে এসেছি সেই শেষ টাচগুলো দেওয়ার জন্য। তুই দেখবি এতে মৌলিন্য আছে।' (৪০৪)

'আলুভোজীরা' বিষয়ে কী বলল পোতিয়ের? এতে ভুল আছে জানি কিন্তু যেহেতু দেখছি যে যে-মাথাগুলো নিয়ে কাজ করছি সেগুলো বেশ প্রাণবন্ত হয়ে উঠছে, এটা আমি জোর দিয়ে বলতে পারি যে আগামী দিনের ছবির তুলনাতেও আলুভোজীরা ছবিটা তার গুরুত্ব ধরে রাখতে পারবে।' (৪০৯)

'আলুভোজীরা' ছবির রঙটা যে ভালো হয় নি অন্তত অংশত সেটা রঙেরই দোষে। এটা আমাকে মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কারণ একটা বড়ো স্থির চিত্র এঁকেছিলাম সেটাতে আমি একই রকমের টোনই চেয়েছিলাম কিন্তু একই জিনিস পাওয়ায় আমি সন্তুষ্ট না হয়ে সেটা আবার নতুন করে এঁকেছিলাম।' (৪২৪)

'ছবিটাতে এমন মগ্ন হয় গিয়েছিলাম যে নড়নচড়ন, বা যাই বল না কেন সেদিকেও তো নজর রাখতে হবে।

আমি জোর দিয়ে বলতে পারি যে পরবর্তীকালের ছবির সূত্রে 'আলুভোজীরা' ছবিটা তার মূল্য বজায় রাখবে আর এই ছবিটা থেকে বুঝতে পারবি যে আরও ভালো কাজও আমি করতে পারি। এটা করতে আমার ভালো লেগেছে, খানিকটা উত্তেজনার বশেও এটাতে আমি কাজ করেছি। না না আমার একঘেয়ে লাগে নি; আর সম্ভবত সেই কারণেই অন্যদেরও এটা একঘেয়ে লাগবে না।'

তরুণ শিল্পী-বন্ধু আন্তন রাইডার ভান রাপার্ড (১৮৫৮–১৮৯২)-কে 'আলুভোজীরা' ছবির একটি লিথোপ্রিন্ট পাঠিয়েছিলেন ভিনসেন্ট। রাপার্ডের ভালো লাগেনি এ ছবি। ভিনসেন্টকে তিনি লিখেছিলেন, 'কাজটা যে গুরুত্ব দিয়ে করা হয়নি এ বিষয়ে আমার সঙ্গে তুমি একমত হবে। সৌভাগ্যক্রমে এর থেকে ভালো কাজ তুমি করতে পার তবে সব কিছু অমন ওপর ওপর করে দেখলেই বা কেন, নিলেই বা কেন? চলনগুলো ভালো করে পর্যবেক্ষণ করলে না-ই বা কেন? এখন তো ওরা কেবল পোজ দেখাচ্ছে। পশ্চাৎপটে স্ত্রীলোকটির ছোট্ট লীলায়িত হাতটি কত মিথ্যা আর ওই কফির কেৎলিটা, টেবিলটা আর হাতলের ওপর ওই যে হাতটা রাখা ওদের ভিতরের যোগসূত্রটাই বা কিসের? কেৎলিটা ওখানে কী কাজ করছে? ওটা দাঁড়িয়েও নেই, ওটাকে তুলে ধরাও হচ্ছে না—তাহলে কী ওটার কাজ? আর এই ডানদিকের মানুষটারই বা কেন একটা হাঁটু বা পেট বা ফুসফুস জুটল না? নাকি সেগুলো সব ওর পিঠের দিকে আছে? আর হাতটাই বা গজখানেক ছোটো কেন? আর নাকের আধখানা বাদ দিয়েই তাকে কাজ চালাতে হবে কেন? আর বাঁদিকের ওই স্ত্রীলোকটিরই ছোট্ট তামাকের পাইপের ডাঁটির ডগায় একটা ছোট্ট হুক্কার মতো নাক থাকতেই বা হবে কেন?

আর এ কাজের পর এইভাবে কি না মিইয়ে বা ব্রেতঁর নাম মুখে আনার মতো তোমার স্পর্ধা! ওহে শোনো। শিল্প জিনিসটা এমনই সুমহান একটা ব্যাপার যে সেটাকে এরকম হেলাফলা করে দেখা চলে না।'

ভান রাপার্ডের অভিযোগের উত্তরে ভিনসেন্ট লিখেছিলেন, 'লিথোগ্রাফটা সম্পর্কে আমার ব্যাখ্যাটা বলি। আমি এটা পুরোপুরি স্মৃতি থেকে করি, আমি একটা কম্পোজিশনের কথা ভেবেছিলাম, কিছুটা জোর করা আর একটা নতুন ধারণা তার সঙ্গে যুতে দেওয়ার জন্য সর্বতোভাবে ভিন্ন একটা পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলাম। তাছাড়া, এটা ছিল নিছক একটা পরীক্ষা, তার বেশি কিছু নয়। আর পরে পাথরের ওপর আমি ক্ষারক ব্যবহার করি।

মূলত—হাত বা নাকের ভুল ড্রয়িংটা যদিও থেকেই গেছে যা দেখে তুমি চটে গিয়েছিলে — পরবর্তীকালে আঁকা ছবিটার কম্পোজিশনে যা আছে তার থেকে আলোছায়ার জাল বুনুনিটা অনেক ভালো হয়েছিল। আর পরবর্তী ছবিটাতে ত্রুটি থাকলেও তাতে এমন সব জিনিসও রয়েছে যার ফলে ছবিটা এঁকেছি বলে আমায় অনুতাপ করতে হয় না।'

এখানে মনে রাখা ভালো যে এই 'আলুভোজীরা' ছবিটাকে কেন্দ্র করেই দুই বন্ধুর মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি হয়।

তেও-র সহধর্মিণী জে. ভ্যান গঘ-বোঙ্গার তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন যে জীবনের অন্তিমপর্বে দিন কয়েক তাঁদের সঙ্গে কাটিয়েছিলেন ভিনসেন্ট। তেওদের ফ্ল্যাট সাজানো ছিল ভ্যান গঘের ছবি দিয়ে। খাবার ঘরে ম্যান্টলপিসের উপর ছিল 'আলুভোজীরা'। আমাদের শুধু জানতে ইচ্ছে করে এটি কোন 'আলুভোজীরা'? এই ছবি দেখে কিছু কি বলেছিলেন ভিনসেন্ট?

পাঁচ

আমস্টার্ডামে ভ্যান গঘ মিউজিয়ম তাঁদের কুড়ি বৎসর পূর্তি উপলক্ষে এই ছবিটির উপর একটি বিশেষ প্রদশনীর আয়োজন করেন। খসড়া স্কেচ থেকে কীভাবে 'আলুভোজীরা' সত্যিকার ছবি

হয়ে উঠল, প্রদর্শনীতে ধারাবাহিকতার সেই সূত্রটি তুলে ধরা হয়। ল্যুই ভ্যান টিলবোর্গ এবং অন্যান্যদের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে The Potato Eaters of Vincent Van Gogh।

প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান রবার্ট ফ্যাগলস-এর ভিনসেন্টের ৪৩-টি ছবিকে অবলম্বন করে লেখা কবিতার সংকলন 'I, Vincent' প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস প্রকাশ করেছে ১৯৭৮-এ। এতে 'আলুভোজীরা'-কে নিয়ে একটি কবিতা আছে।

১ এই চারজন হল :

সিয়েন (গর্ডিনা) ডি গ্রুট। বাঁদিকে বসা তরুণী।
কর্নেলিয়া ডি গ্রুট। বৃদ্ধা, কফি ঢালছেন। সম্ভবত গর্ডিনার মা।
গিজবেরতুস ডি গ্রুট। সম্ভবত গর্ডিনার ভাই বা দেবর।
থিস ডি গ্রুট। বৃদ্ধ, সম্ভবত গর্ডিনার বাবা।

২ নীচের সারণি থেকে দেখা যাবে 'আলুভোজীরা' ছবির বিভিন্ন চরিত্র কতবার এঁকেছিলেন ভিনসেন্ট :

কৃষক	৫
কৃষক রমণী	৫৭
কৃষক রমণী আলু ছাড়াচ্ছে	১৮
গর্ডিনা	৮
হাত	২৫

ভ্যান গঘের জাপান এবং জাপানের ভ্যান গঘ

অনির্বাণ রায়

জাপানের সঙ্গে ভিনসেন্ট ভ্যান গঘের জন্মভূমি হল্যান্ড বা নেদারল্যান্ডের সম্পর্ক বহুকালের। ফিলিপ ফ্রানৎস ফন সীবোলডের বিশাল নৃতাত্ত্বিক সংগ্রহের মধ্যে বহু য়ুকিয়ো-ই প্রিন্ট ছিল। [এদো যুগে (১৬১৫-১৮৬৭) য়ুকিয়ো-ই প্রিন্টের চল ছিল। দৈনন্দিন জীবনের ছবি ছাড়াও কাবুকি অভিনেতারা ছিল এই প্রিন্টের বিষয়বস্তু। মোরোনোবু (১৬২৫-৯৫) এই প্রিন্টের আবিষ্কর্তা বলে মনে করা হয়। জনপ্রিয় সাহিত্যের জন্য করা তাঁর কাঠখোদাই অলংকরণের জন্য মোরোনোবু লোকপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। অন্যান্য য়ুকিয়ো-ই প্রিন্টশিল্পীদের মধ্যে নাম করা যায় হারুনোবু, হিরোশিগে, হোকুসাই, কিয়োনাগা, শরাকু এবং উতামারোর।] ১৮৩৭-এ লেডেন-এর নৃতাত্ত্বিক সংগ্রহশালায় সীবোলডের সংগ্রহ প্রদর্শিত হয়। দ্য হেগের রয়াল ক্যাবিনেট অব কিউরিওসিটিজ বহু জাপানী সামগ্রী সংগ্রহ করেছিল। সংগ্রহ করেছিলেন প্রধানত ঐ বিপণির পরিচালক ও কর্মী যথাক্রমে জে. কক ব্লমহফ এবং জে. এফ. ভ্যান ওবারমীর-ফিসার।

*

জাপানী য়ুকিয়ো-ই প্রিন্টের সঙ্গে ভ্যান গঘের পরিচয় হয় আন্তোয়ার্পে থাকার সময়। এই সময় তিনি কয়েকটি য়ুকিয়ো-ই প্রিন্ট সংগ্রহ করে নিজের স্টুডিওর দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখেন। তেওকে চিঠিতে লিখছেন (২৮ নভেম্বর ১৮৮৫) : 'স্টুডিও আমার মন্দ নয় কেননা বেশ কিছু ছোটো ছোটো জাপানী প্রিন্ট দেয়ালে ঝুলিয়েছি, এগুলোতে আমি খুউব মজা পাই। বাগানে বা সমুদ্রতীরে সেই ছোট্ট ছোট্ট নারীমূর্তি, ঘোড়সওয়ার, ফুল, কাঁটাওয়ালা শাখার গুচ্ছ—এ সব তোর জানা।'

১৮৭০ থেকেই পারির ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পীরা জাপানী শিল্পকে তাঁদের শিল্পে ব্যবহার করতে শুরু করেছিলেন। পারিতে ভ্যান গঘের শিল্পী-বন্ধুরা— গোগ্যাঁ, তুলুজ-লোত্রেক, পিসারো— য়ুকিয়ো-ই প্রিন্টের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। বন্ধুদের সূত্রে এই বিশেষ ধরনের প্রিন্টের প্রতি ভিনসেন্টের আগ্রহ যে বৃদ্ধি পাবে সে আর এমন আশ্চর্যের কি!

পারিতে সে-সময় একমাত্র বিঙ এবং হায়াশি টাডামাসা জাপানী শিল্পসামগ্রীর বেসাতি করতেন। বিঙের বিপণিতে বিনা দ্বিধায় ঢুকে পড়া যায় কারণ সেখানে সবরকম মূল্যের সামগ্রী সংগ্রহ করা সম্ভব। হায়াসি টাডামাসার বিপণিতে, অন্যদিকে, জাপানী শিল্পবস্তুর মূল্য বেশ চড়া। তেওর কর্মস্থল বুসো ভালদোঁর ঢিল-ছোঁড়া দূরত্বে ছিল বিঙের বিপণি। কল্পনা করে নেওয়া যায়, ভ্যান গঘ সেখানে গিয়ে জাপানী শিল্পবস্তু দেখছেন[১] অথবা ডুবে আছেন য়ুকিয়ো-ই প্রিন্টের

১ বিঙের বিপণি থেকেই কি ভ্যান গঘ সংগ্রহ করেছিলেন তাঁর নিজস্ব য়ুকিয়ো-ই প্রিন্টগুলি ? অথবা জাপানী লাল ল্যাকার-করা বাকসো যাতে তিনি পূরক বর্ণের সমন্বয় করার জন্য রেখেছিলেন তিন রঙের উল। একটি সূত্র থেকে জানা যায় ভ্যান গঘ প্রায় ৪০০ জাপানী প্রিন্ট সংগ্রহ করেছিলেন।

রসধারায়। এই প্রিন্টে তিনি এমন মজে গিয়েছিলেন যে ১৮৮৭র বসন্তে অগোস্তিনা সেগাটোরির ল্যো তাম্বুরিঁ নামের কফিখানায় য়ুকিয়ো-ই প্রিন্টের এক প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। একই বছরে, নভেম্বর/ডিসেম্বরে তাঁর নিজের এবং বন্ধুদের কাজের সঙ্গে য়ুকিয়ো-ই প্রিন্টের আর একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেন ৪৩ এভিন্যু দ্য ক্লিশি ঠিকানার গ্রাঁ বুলোঁর রেস্তোরাঁয়। প্রদর্শিত য়ুকিয়ো-ই প্রিন্টগুলি ধার করে আনা হয়েছিল বিঙের কাছ থেকে।

যত দূর জানা যায়, তিনটি য়ুকিয়ো-ই প্রিন্টের প্রতিলিপি করেছিলেন ভ্যান গঘ। 'ফুলন্ত প্লাম গাছ' (১৮৮৭) এবং 'বৃষ্টিতে সাঁকো' (১৮৮৭)— এই দুটি ছবিই হিরোশিগের যথাক্রমে 'কামেইদোর প্লাম-উদ্যান' এবং 'ওহাসি, আতেকে সহসা বর্ষণ'-এর প্রতিলিপি। তৃতীয় ছবিটি 'ওহরান' (১৮৮৭) 'পারি ইলাসট্রে'র বিশেষ জাপান সংখ্যার (মে ১৮৮৬) প্রচ্ছদে মুদ্রিত ছবির প্রতিলিপি। এ ছাড়া, ভ্যান গঘের আরও কিছু ছবিতে জাপানী প্রিন্টের প্রতিলিপি লক্ষ করা যায়। যেমন, প্যের তাঁগির প্রতিকৃতি (১৮৮৭), 'ল্যো তাম্বুরিঁ কফিখানায় বসা রমণী' (১৮৮৭), 'জাপানী প্রিন্টসহ আত্মপ্রতিকৃতি' (১৮৮৭), 'ব্যাণ্ডেজ বাঁধা কান সহ আত্মপ্রতিকৃতি' (১৮৮৯)। এখানে উল্লিখিত দ্বিতীয় ও তৃতীয় ছবিতে জাপানী প্রিন্টগুলোর অস্পষ্টতার জন্য তাদের বিষয়বস্তু অজানা থেকে যায়। তাঁগির প্রতিকৃতির ডান কোণের এবং জাপানী প্রিন্টসহ আত্মপ্রতিকৃতিতে দৃশ্যমান প্রিন্ট মনে হয় য়োশিতোরার তিন-প্রিন্টের মাঝেরটি—এটি ভ্যান গঘের নিজস্ব সংগ্রহেই ছিল। প্যের তাঁগির দুটি প্রতিকৃতি এঁকেছিলেন ভিনসেন্ট। দুটিতেই জাপানী প্রিন্ট দেখা যায় তাঁগির পেছনে। এর ভেতরে একটি প্রিন্ট দুটি ছবিতেই আছে। পারি-পর্বে আঁকা যে-সব ছবিতে য়ুকিয়ো-ই প্রিন্ট দেখা যায়— এই প্রিন্টগুলো ভ্যান গঘের নিজস্ব সংগ্রহ— সেগুলো হল :

১ তৃতীয় ইওয়াই কুমেসাবুরো মিয়ুরায়া নো তাকাওর ভূমিকায় / শিল্পী তৃতীয় তোয়োকুনি
২ ইশিয়াকুশি—এটি হিরোশিগের আঁকা তোকাইদো বরাবর ৫৩টি স্টেশনের বিখ্যাত দৃশ্যের ছবির একটি
৩ হারা—এটিও হিরোশিগের আগেকার ছবির অন্তর্ভুক্ত। পরবর্তীকালে আর্লে থেকে একটি চিঠিতে (৫৪০ সংখ্যক) ভিনসেন্ট লিখেছিলেন: 'এখানে আমার জীবন অনেকটাই প্রকৃতির কাছাকাছি থাকা জাপানী শিল্পীর মতো হয়ে যাবে...যদি অনেকদিন বেঁচে থাকি, বৃদ্ধ তাঁগির মতো কেউ একজন হয়ে যাব।' এই কথা থেকে বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না যে প্যের তাঁগিকে জাপানী শিল্পী হিসেবেই মনে করতেন ভ্যান গঘ। এই আর্লেতে থাকার সময় ভ্যান গঘ এঁকেছিলেন 'বোঞ্জেরূপে আত্মপ্রতিকৃতি' (সেপ্টেম্বর ১৮৮৮)। এখানে তিনি নিজেকে চিত্রিত করেছিলেন জাপানী সন্ন্যাসীরূপে, যে-ছবিতে দেখা যায় চোখ দুটি ইচ্ছাকৃতভাবে উপর পানে তোলা।

*

ভিনসেন্টের লেখা চিঠিপত্রে জাপান-প্রসঙ্গ কীভাবে জড়িয়ে আছ নিচের সংকলন থেকে তা বোঝা যাবে।

...বরফের মতো জ্বলজ্বলে আকাশের পরিপ্রেক্ষিতে চুড়োসহ বরফের মধ্যে ভূ-দৃশ্য, জাপানীদের আঁকা শীতের ভূ-দৃশ্যেরই মতো। (পত্র ৪৬৩)

এই দক্ষিণে থাকা প্রসঙ্গে, যদিও খুব ব্যয় বহুল, ধর: আমরা জাপানী ছবি ভালোবাসি, আমরা তার প্রভাব অনুভব করেছি, সমস্ত ইম্প্রেশনিস্টদের বেলায় এ কথা খাটে, তাহলে জাপান-যাত্রা নয় কেন, অর্থাৎ জাপানের সমগোত্রীয়, দক্ষিণে? (পত্র ৫০০)

আমার ইচ্ছে আরও খানিকটা সময় যদি তুই এখানে দিতিস, খানিক পরে তুই টের পেতিস, মানুষের দেখাটা বদলে যায়: জাপানী চোখ দিয়ে যত বেশি দেখবি, রঙ অনুভব করবি অন্যভাবে। জাপানীরা আঁকে দ্রুত, খুব দ্রুত, বিদ্যুৎ চমকের মতো, কারণ তাদের স্নায়ু সূক্ষ্ম, অনুভূতি সরল। (পত্র ৫০০)

তোমাকে লিখব কথা দিয়েছিলাম, শুরু করব এই কথা বলে যে এই দেশটা আমার জাপানের মতো সুন্দর মনে হয় পরিষ্কার আবহাওয়া আর আনন্দময় রঙের প্রভাবের জন্য। (আর্লে থেকে এমিল বার্নার্দকে)

বহুদিন ভেবেছি জাপানী শিল্পীরা নিজেদের মধ্যে প্রায়ই নিজেদের শিল্পকর্ম আদান-প্রদান করতেন এটা স্পর্শনীয়। এ থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে তাঁরা পরস্পরকে পছন্দ করতেন, সাহায্য করতেন আর তাঁদের মধ্যে একটা ঐক্য বিরাজ করত; স্বভাবতই তাঁরা সত্যি সত্যি এক ধরনের বন্ধুত্বপূর্ণ সমাজে বাস করতেন তার মধ্যে কোনোরকম লুকোচুরি ছিল না। (এমিল বার্নার্দকে লেখা)

জাপানীরা সবসময় খুব সাধারণ ঘরোয়া পরিবেশে থেকেছে, আর কোন বড়ো শিল্পী সে দেশে না থেকেছেন? আমাদের সমাজে যদি কোনো শিল্পী ধনী হল তো তাকে বাস করতে হবে দুর্লভ সামগ্রীর বিপণীপ্রতিম কোনো বাড়িতে, আমার কাছে ব্যাপারটা কোনোভাবেই শিল্পীসুলভ মনে হয় না। (ভিলহেলমিনাকে লেখা, পত্র সংখ্যা ১৫)

জাপানীদের প্রতিটি কাজে আছে চরম পরিচ্ছন্নতা একে আমি ঈর্ষা করি। কোনো কাজ অপরিচ্ছন্ন নয়, দেখে মনে হয় না তাড়াহুড়োয় করা। শ্বাসপ্রশ্বাস নেওয়ার মতোই তাদের কাজ সরল, কয়েকটা নিশ্চিত আঁচড়ে তারা একটা মূর্তি এমন এঁকে ফেলে যেন তোমার কোটের বোতাম লাগাচ্ছে।...

জাপানী শিল্প অনুশীলন করলে আমরা দেখব একজন মানুষ যিনি অবিসংবাদিতভাবে জ্ঞানী, দার্শনিক এবং বুদ্ধিমান, সময় কাটান কীভাবে? পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব কতো সেটা জানতে? না। বিসমার্কের নীতি জানতে? না। ঘাসের একটিমাত্র পাতা অনুশীলন করেন তিনি।

কিন্তু ঘাসের এই একটা পাতাই তাঁকে প্রতিটি উদ্ভিদ, ঋতুগুলো, দেশের বিস্তৃত বৈশিষ্ট্য, প্রাণীজগৎ, মনুষ্যমূর্তি আঁকায়। এতেই তাঁর জীবন কেটে যায়, জীবন এত সংক্ষিপ্ত পূর্ণের তুলনায়।

শোন, এটাই কি একটা সত্যিকার ধর্ম নয় যা এই সরল জাপানীরা আমাদের শেখান, যাঁরা প্রকৃতির মধ্যে ফুলের মতো থাকতেন?

আমার তো মনে হয় যথেষ্ট প্রফুল্ল, সুখী না হলে তুই জাপানী শিল্প অনুশীলন করতে পারবি না এবং আমাদের শিক্ষা ও রীতির জগতে কাজ করা সত্ত্বেও ফিরে যেতে হবে প্রকৃতির কাছে। (পত্র সংখ্যা ৫৪২)

জাপান সম্পর্কে ভ্যান গঘের ধারণা গড়ে দিতে সাহায্য করেছিল গঁকুরদের উপন্যাস; গুয়মে এবং রেগামির লেখা *প্রোমেনাদস জাপোনেইসেস* (১৮৭৮); 'গাজেত দ্য বোজার্ট' পত্রিকায় প্রকাশিত (সেপ্টেম্বর ১৮৭৮) 'ল্যে জাপোঁ আ পারি' (লেখক: এর্নেস্ট শেসন্যু);ল্যুই গঁসের লেখা প্রবন্ধ 'লার্ট জাপানেইস' (প্রথম সংস্করণ ১৮৮৩); এবং 'পারি ইলাসট্রে, ল্যে জাপোঁ' (মে ১৮৮৬)। এছাড়া স্যামুয়েল বিঙ সম্পাদিত 'ল্যে জাপোঁ আর্টিস্টিক' (মে ১৮৮৮) এবং পিয়ের লোতির *মাদাম ক্রিসেনথিমাম* (প্রথম প্রকাশ ১৮৮৭) গ্রন্থটি তাঁকে সবিশেষ সাহায্য করেছিল জাপান প্রসঙ্গে।

দুই

'শিরাকাবা' পত্রিকার জুলাই সংখ্যায় (১৯১০ ?) 'ভ্যান গঘ' শিরোনামে একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। রচয়িতা সানেআৎসু মুশানোকেজি। কবিতাটি হল:

ভ্যান গঘ,
তোমার আছে সেই আগ্নেয় ইচ্ছা,
যখনই ভাবি তোমার কথা
ভেতরে ভেতরে শক্তি আমার বেড়ে যায়।
উঁচুতে ওঠার জন্য লড়াই করার শক্তি,
যতক্ষণ আর যেতে না পারছি ততক্ষণ যাওয়ার শক্তি।
আঃ,
যতক্ষণ আর যেতে না পারছি ততক্ষণ যাওয়ার শক্তি।

'শিরাকাবা'—এই নতুন ধরনের সাহিত্য পত্রিকার (প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯১০) মাধ্যমে ভ্যান গঘের সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয় জাপানের। এই পত্রিকায় ভ্যান গঘ বিষয়ক ৫৯টি প্রবন্ধ এবং ৭৫টি আর্ট প্লেট ছাপা হয় (শিরাকাবার অন্তিম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় অগাস্ট ১৯২৩-এ)। ভ্যান গঘকে জাপানে জনপ্রিয় করে তোলার নেপথ্যে 'শিরাকাবা'র ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

'শিরাকাবা'র নভেম্বর ১৯১০ সংখ্যাটি নিবেদিত হয় অগাস্ত রোদ্যাঁকে তাঁর সত্তরতম জন্মদিন উপলক্ষে। এই সংখ্যায় পাশ্চাত্যধারার শিল্পী ইয়োরি সায়তোর একটি প্রবন্ধসূত্রে ভ্যান

গঘের নাম সর্বপ্রথম জাপানী ভাষায় মুদ্রিত হয়। সায়তো লিখেছিলেন: 'ভ্যান গঘ নামে শিল্পীর করা মিইয়ের একটা প্রতিলিপি দেখেছিলাম। রঙ এবং ফর্মের দিক দিয়ে মূলের মতো কোনোভাবেই নয়... যারা কেবল বাইরের আকারটুকু নকল করে তাদের কোনোরকম মাথাব্যথাই নেই সে-প্রয়াস সীরিয়াস হল কি হল না তা নিয়ে। যাই হোক, আমি মনে করি শিল্পগতভাবে এটা একটা মূল্যবান প্রতিলিপি—এটা এমন একজন শিল্পী করেছেন যিনি শিল্প ব্যাপারটা সত্যিই বোঝেন।'

'শিরাকাবা'র ফেব্রুয়ারি, জুন এবং সেপ্টেম্বর ১৯১১সংখ্যায় প্রকাশিত হয় ভিনসেন্ট ভ্যান গঘের পত্রাবলী। ফেব্রুয়ারি কিস্তির সঙ্গে ছিল মাক্স ওসবোর্নের লেখা ভিনসেন্টের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

যে মুশানোকোজির কবিতার উল্লেখ করা হয়েছে, সেই মুশানোকোজি ছিলেন 'শিরাকাবা' পত্রিকার মূল উদ্যোক্তা। প্রধানত তাঁরই আগ্রহে কবি মোতোমারো সেনজে 'ভ্যান গঘের বীজবপনকারী' এবং 'ভ্যান গঘ' নামে কবিতা লেখেন। শোহাচি কিমুরা ভ্যান গঘ বিষয়ক একাধিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ লেখেন।

ভ্যান গঘের সহোদরা এলিজাবেথ কিউসনে দাদার বিষয়ে একটি স্মৃতিকথা লেখেন। এটি প্রকাশিত হয় ডাচ ভাষায় ১৯১০ সালে। স্মৃতিকথাটির সংক্ষিপ্ত অনুবাদ প্রকাশিত হয় 'সো-উন' পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় (১৯১২)। অনুবাদক নন্দনতাত্ত্বিক জিরো আবে। 'গেনদাই নো য়োগা' পত্রিকার পঞ্চম সংখ্যায় প্রকাশিত হয় শোহাচি কিমুরা লিখিত 'ভ্যান গঘের সমালোচনামূলক জীবনী'।

'শিরাকাবা'র নভেম্বর ১৯১২ সংখ্যাটি ভিনসেন্ট ভ্যান গঘ সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হয়। এই বিশেষ সংখ্যায় পূর্বোল্লিখিত আবের রচনাটি পুনর্মুদ্রিত হয়। এ ছাড়া এতে যে-লেখাগুলো ছিল:

ভ্যান গঘের শিল্প: মায়ার-গ্রাফে; অনুবাদ : জিরো আবে।
ভিনসেন্ট পত্রাবলী: অনুবাদ : কিকুয়ো কোজিমা।
ভ্যান গঘের একটি দিক: মুশানোকোজি।
ভ্যান গঘ বিষয়ক রচনা: মুনেয়োশি ইয়ানাগি।
বিশেষ ভ্যান গঘ সংখ্যা উপলক্ষে: বারনার্ড লীচ।

এই বিশেষ সংখ্যাটির সূত্র ধরে এই বছরই (১৯১২) ডিসেম্বরে 'কিসেকি' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ভ্যান গঘকে কেন্দ্র করে রচিত একটি উপন্যাস— শিজিয়ো ফুনাকির 'ভ্যান গঘের মৃত্যু'।

মোতোমারো সেঙ্গে সম্পাদিত 'ইগো' পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যাটি (জানুয়ারি ১৯১৪) ছিল বিশেষ ভ্যান গঘ সংখ্যা। এর ৭০ পৃষ্ঠা জুড়ে ছিল তাইজিরো নারিতা অনুবাদিত ভ্যান গঘ পত্রাবলি। পাশ্চাত্য ধরনের জাপানী শিল্পী কানেইএ ইয়ামামোতো, সহকর্মী ৎসুনেতোমো-মোবিতাকে সাথী করে ওভারে ভ্যান গঘ সমাধিক্ষেত্র পরিদর্শনে যান। তাঁরা ডা. গাসের পুত্র পলের সঙ্গে সেই সময় সাক্ষাৎ করেন। ইয়ামামোতো লিখিত এই ভ্রমণকথা প্রকাশিত হয় 'ওভার সুরোয়াজ' নামে 'বিজুৎসু শিনেপো' পত্রিকার অক্টোবর ১৯১৪ সংখ্যায়।

'মিজুয়ে' পত্রিকার ফেব্রুয়ারি, মার্চ ১৯২৪ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় একটি নাটক : 'ভ্যান

গঘের জীবনে একটি দিন', নাট্যকার কো মুরাতা। এই বছরই আর-একটি নাটক প্রকাশিত হয় 'ভিনসেন্ট' নামে। পাঁচ অঙ্কের নাটকটি রচনা করেন হেরমান কেসাক।

'শিরাকাবা' পত্রিকার মাধ্যমে যাঁরা ভ্যান গঘ সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠেন রিয়ুজাবুরো শিকিবা তাঁদেরই একজন। নীগাতা মেডিক্যাল কলেজে পড়ার সময় তিনি মায়ার-গ্রাফের জীবনীটি গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। তাঁর নিজের বিষয় ছিল মনস্তত্ত্ব। ১৯২৯ সালে ইয়োরোপে উচ্চতর পাঠগ্রহণের সুযোগ পেয়ে ভ্যান গঘ অনুষঙ্গী স্থানসমূহ তিনি ভ্রমণ করেন, ভ্যান গঘের মূল ছবিগুলো দেখার জন্য বহু শ্রম স্বীকার করেন এবং তাঁর বিষয়ে বহু তথ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হন। জাপানে ফিরে এসে ১৯৩১ সালে তৃতীয় 'কংগ্রেস অব দ্য জাপানীজ অ্যাসোসিয়েশন অব সাইকোলজি'তে একটি গবেষণাপ্রবন্ধ পাঠ করেন। এটির শিরোনাম: 'দ্য সাইকোপ্যাথোলজি অব ভিনসেন্ট ভ্যান গঘ'। শিকিবার গবেষণালব্ধ ফলাফল ১৫৫৮ পৃষ্ঠার দুটি খণ্ডে 'দ্য লাইফ অ্যান্ড সাইকোসিস অব ভিনসেন্ট ভ্যান গঘ' নামে ১৯৩২ সালে প্রকাশিত হয়।

১৯৫১র বসন্তে মিনগেই নাট্যদল ঠিক করে যে ভ্যান গঘের জীবনকে মঞ্চে রূপ দেবে। গঠিত হয় ভ্যান গঘ কমিটি। বিখ্যাত নাট্যকার জুরো মিয়োশিকে ভার দেওয়া হয় নাটক লেখার। তিনি লিখলেন 'ম্যান অব ফ্লেমস'। শিমবাশি এনবুজোতে ১৬-২৮ সেপ্টেম্বর নাটকটি মোট ৭৬বার অভিনীত হয় এবং ৬০ হাজার মানুষ দেখে। নাট্যকার ইয়োমিয়ুরি পুরস্কার লাভ করেন। এই নাটকে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করার সুবাদে ওসামু তাকিজাওয়া পান মৈনিচি পুরস্কার।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ভ্যান গঘের জন্মশতবর্ষে প্রকাশিত হয় দুটি গ্রন্থ: *গঘ* (তিন খণ্ড) এবং *ভ্যান গঘ : এ ক্রিটিকাল বায়োগ্রাফী অ্যান্ড কালেকশন অব পেইন্টিংস*। দুটি গ্রন্থেরই রচয়িতা রিয়ুজাবুরো শিকিবা।

কবিতারসিক ভিনসেন্ট

অনির্বাণ রায়

শুরুতেই দুটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত (১৯ ডিসেম্বর ১৯৯৩) একটি সংবাদ উদ্ধার করা যাক :

> অ্যামাসফুর্ট, ১৮ ডিসেম্বর (এপি)—২২ বছরের ভিনসেন্ট ভ্যানগগ্ তখনও চিত্রশিল্পী হয়ে ওঠেননি। আর পাঁচজন যুবকের মত তিনিও তখন ডায়েরিতে লিখে রাখতেন প্রিয় কবিতার লাইন, গান। এমনই একটি ডায়েরি পাওয়া গেল ভ্যানগগের বোন এলিজাবেথের নাতনি লেডি ডেবেলিঙের বাড়িতে একটি পুরনো ট্রাঙ্ক থেকে। (আজকাল)

> অ্যামার্সফুর্ট, ১৮ ডিসেম্বর—ভান গঘের হাতে লেখা একটি কবিতার খাতার হদিশ দিয়েছেন আমস্টারডামের ভান গঘ সংগ্রহশালার কর্তৃপক্ষ। খাতাটি তাঁরা উদ্ধার করেছেন বিখ্যাত ওই ডাচ শিল্পীর এক বংশধরের কাছ থেকে। গঘের হস্তলিপিতে তাঁর প্রিয় গান ও কবিতার ওই সংকলন দেখে বোঝা যায় শিল্পী হয়ে ওঠার বহুদিন আগেই তিনি ছন্দের প্রেমে পড়েছিলেন। শিল্পীর কিশোর বয়সের একটি প্রিয় অভ্যাস ছিল ভালো লাগার কবিতাগুলি খাতায় লিপিবদ্ধ করা। খাতাগুলি কিন্তু নিজের কাছে রাখতেন না কিশোর গঘ। বিলিয়ে দিতেন আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবদের। (আনন্দবাজার পত্রিকা)

আমস্টার্ডামের ভিনসেন্ট ভ্যান গঘ মিউজিয়াম 'কাইহে ভিনসেন্ট' পর্যায়ে অনেকগুলি গ্রন্থ প্রকাশ করেছে। এর প্রথম গ্রন্থ *ভিনসেন্ট ভ্যান গঘ'স পোয়েট্রি অ্যালবামস*। গ্রন্থটি চাক্ষুষ করার সুযোগ ঘটেনি। কিন্তু টেমস অ্যাণ্ড হাডসন-প্রকাশিত তিনখণ্ডের *দ্য কমপ্লিট লেটারস অব ভিনসেন্ট ভ্যান গঘ*-সৌজন্যে দেখতে পাচ্ছি ভ্যান গঘের কবিতাপ্রীতির অতুলনীয় নজীর। ২ জুলাই ১৮৭৩ লন্ডন থেকে দ্য হেগের ভ্যান স্টোকাম-হানেবীক পরিবারের উদ্দেশে লেখা চিঠিতে ভ্যান বীয়ারস-এর একটি কবিতা কপি করে পাঠিয়েছিলেন সদ্য কুড়ি পেরনো ভিনসেন্ট ভ্যান গঘ। (এই কবিতা তাঁকে কপি করে দিয়েছিলেন এলিজাবেথ নামে একজন যুবতী।) এরপর তাঁর চিঠিতে কবিতার ব্যবহার নিয়মিত হয়ে উঠেছে যেমন লক্ষ করা যায় তেমনি দেখা যায় চিঠিতে জায়গা নিচ্ছে কবি ও কবিদের প্রসঙ্গ। মেজাজে কবি ভিনসেন্টকে কবি স্টিফেন স্পেন্ডার ঠিক ঠিক অনুভব করে যথার্থই লিখেছেন, 'কবিতা তিনি আদৌ সমালোচনামূলক দিক থেকে বুঝতেন না ; তিনি নিজে যা প্রকাশ করার চেষ্টা করছেন সেটিকেই প্রকাশ করার একটা পথ হিসাবে কবিতাকে তিনি গণ্য করতেন।' আন্তন মভ—যাঁর কাছে ভিনসেন্ট ছবি আঁকার পাঠ গ্রহণ করেছিলেন একদা—এর মৃত্যুসংবাদ জানিয়ে তেওকে লিখেছিলেন,

O never think the dead are dead,
So long as there are men alive,
The dead will live, the dead will live.

এই কবিতাংশ কোন কবির তার কোনো সূত্র তিনি দেননি আর এই সূত্র ধরেই আমাদের জানতে ইচ্ছে করে ভাইকে লেখার সময়ে তবে কি তিনি স্মৃতি থেকেই উদ্ধার করে দিয়েছিলেন এই তিনটি পঙ্‌ক্তি! নাকি তাঁর লেখার টেবিলে হাত-নাগালেই অবস্থান করত প্রিয় কবির কাব্যগ্রন্থ। অসম্ভব গ্রন্থপ্রেমী, অতুলনীয় পাঠক ভিনসেন্ট তাঁর ভাই তেওকে লেখা চিঠিতে কত-কতবার যে চার্লস বোদল্যের, জন বুনিয়ান, দান্তে আলিঘিয়েরি, গ্যোয়েটে, হাইনরিশ হাইনে, ভিক্তর য়ুগো, হোমার, লংফেলো, টমাস মুর, টেনিসন, হুইটম্যান প্রমুখদের প্রসঙ্গ এনেছেন ভাবলে অবাক হতে হয়। কেবল ভাই তেও নয়, বোন ভিলহেলমিনাকে লেখা চিঠিতেও ভিনসেন্ট কবিতার কথা এনেছেন। কবিতা তিনি একাকী পাঠ করতেন না। হয়তো চাইতেন কবিতাপাঠের ভালো-লাগা অন্যের সঙ্গে ভাগ করে নিতে। পারি থেকে লেখা (১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৬) একটা চিঠিতে জানা যাচ্ছে যে গ্ল্যাডওয়েল নামে এক ভদ্রলোক প্রতি শুক্রবার ভ্যান গঘের কাছে আসতেন। তারপর তাঁরা দুজনে মিলে কাব্যপাঠে মেতে উঠতেন।

মেতে উঠতেন এবং অন্যদেরও মাতাতেন। চাইতেন তাঁরাও তাঁর মতো পান করুক কাব্যরসসুধা। নইলে কী দরকার ছিল ভাইকে কবিতা কপি করে পাঠানোর? কেনই বা লিখলেন ওই স্টোকাম-হানেবীক পরিবারকে : 'এই শেষের দিনগুলোয় জন কীটসের কবিতা পাঠ করে দারুণ আনন্দ পেয়েছি ; আমার মনে হয় এই কবি হল্যান্ডে খুব একটা পরিচিত নন। এখানে [লন্ডনে] সব শিল্পীদের কাছেই তিনি খুব প্রিয়, আর সেইজন্যেই আমি তাঁকে পড়তে শুরু করেছিলাম।' এই সঙ্গে কীটসের 'দ্য ইভ অব সেইন্ট মার্ক' কবিতা কপি করে পাঠিয়েছেন। অসমাপ্ত এই কবিতায় আছে সন্ধ্যার ছবি :

The chilly sunset faintly told
Of unmatur'd green vallies cold,
Of the green thorny bloomless hedge,
Of rivers men with spring-tide sedge,
Of primroses by shelter'd rills,
Of daisies on the anguish hills.

এই কবিতা যে-কাগজে কপি করে দিয়েছিলেন, তার উল্টোদিকে লিখে দিয়েছিলেন এই কবিতা :

Autumn

Season of mists and mellow fruitfulness,
Close bosom-friend to the maturing sun;
Conspiring with him how to load and bless
With fruit the vines that round the thatch-eaves run;

এখানে সবটা আর তুলে দিলাম না যদিও বোঝা যাবে ভিনসেন্ট কেন পছন্দ করেছিলেন এই কবিতা। ভিনসেন্ট ছিলেন প্রকৃতি-প্রেমিক। প্রাকৃতিক দৃশ্য তাঁকে সময় সময় এমন আচ্ছন্ন করে রাখত যে ঘোর কাটতে পক্ষকাল লেগে যেত। নন্দলাল বসু যে বলেছিলেন প্রকৃতিই যুগে

যুগে শিল্পীদের প্রেরণা জুগিয়ে এসেছে সে কথা যেন ভিনসেন্টেরই কথার প্রতিধ্বনি : 'যতটা পারিস হাঁটবি আর ধরে রাখবি প্রকৃতি-প্রেম কেননা শিল্পকে বেশি বেশি বুঝতে শেখার সেই হল ঠিক পথ' (ভাইকে, লন্ডন থেকে, জানুয়ারি ১৮৭৪)। ওই একই চিঠিতে আরও লিখেছেন যে লন্ডনকে জানছেন, বুঝছেন ইংরেজদের জীবনযাপন, জাতটাকে। এরপর আছে 'প্রকৃতি, শিল্প এবং কবিতা'। প্রকৃতির কবিরা তো এক অর্থে প্রকৃতির শিল্পীও বটে। সুতরাং শিল্প অনুশীলনে কবিতার ভূমিকা ভিনসেন্টের কাছে বড়ো করে দেখা দেবে এটা সহজেই ভেবে নেওয়া যেতে পারে। একটা ছোটো নোটবুকে নিজের ভালোলাগা কবিতাগুলো ভাই তেওকে দেবার জন্য টুকে রাখতেন ভ্যান গঘ। নোটবুক ভর্তি হয়ে গেলে ভাইকে পাঠিয়ে দিতেন। এইরকম এক কবিতা হাইনের Meeresstille (শান্ত সমুদ্র)। এই কবিতার প্রসঙ্গে লিখেছেন : 'কিছুকাল আগে দেখা থিজ মারিজের একটা ছবি আমাকে এর কথা মনে করিয়ে দিয়েছিল।' লন্ডনে থাকার সময় গৃহকর্ত্রীর তেরো বছরের কন্যার মৃত্যুসংবাদ জানিয়ে তেওকে চিঠি লিখলেন। সঙ্গে একটা স্কেচ এঁকে পাঠালেন। কিসে? এডমন্ড রোশের 'পোয়মস' নামক কাব্যগ্রন্থের আখ্যাপত্রে! সেই সঙ্গে ভালো-লাগা কবিতা থেকে কিছু কিছু পঙ্‌ক্তি। শিল্পী কোরো-র একটা এচিং-এর বর্ণনা আছে যে-কবিতায় সে সম্পর্কে তেওর কৌতূহল নিরসন করতে চার ছত্র কপি করে দিয়েছেন সঙ্গীয় চিঠিতে। কবি জুল ব্রেতঁ এবং তাঁর স্ত্রী ও দুই কন্যার সঙ্গে দেখা হয়েছিল ভিনসেন্টের। সে সংবাদ জানিয়ে ভাইকে লিখছেন ব্রেতঁর *ল্যে চ্যামপস এট লা মের* নামের কাব্যসংকলনটি তাকে পাঠিয়ে দেবেন। এই কবির কবিতা তাঁর ভালো লাগে। "সেন্ট জনস এভ" কবিতায় ধরা আছে সুন্দর এক ছবি। সেন্ট জনস-এর আগুন ঘিরে গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় নাচছে কৃষক-বালিকারা, প্রেক্ষাপটে দেখা যায় গ্রাম, চার্চ, তার মাথায় চাঁদ।

Dansez, dansez, oh jeunes filles,
En chantant vos chansons d'amour,
Demain pour courier aux faucilles,
Vous sartirez au petit jour.

শুধু নিজের ভালো লাগা না, ভাইকেও সেই ভালো লাগার সঙ্গী করে নিতে চান; যেন তাঁরও মনে বুনে দিতে চান ছবি ও কবিতার বীজ। তেও যে পরবর্তীকালে অত্যুত্তম চিত্রব্যবসায়ী হয়েছিলেন তাতে কি দাদা ভিনসেন্টের পরোক্ষ কোনো ভূমিকা ছিল না? কবিতার সঙ্গে প্রার্থনাগীতের প্রতিও ভ্যান গঘের ভালোবাসা ছিল। ভাইয়ের কাছে জানতে চান সস্তার কোনো প্রার্থনাগীতের সংস্করণের খোঁজ সে রাখে কি না। পেলে যেন একটা তাঁকে পাঠিয়ে দেয়। কয়েকটি ইংরেজি প্রার্থনাগীত ভিনসেন্টের ভালো লেগেছে। নমুনাস্বরূপ তা থেকে এমন কয়েকটি পাঠিয়ে দেন চিঠিতে :

Thy way, not mine, O Lord,
However dark it be :
Lead me by thine own hand
Choose out the path for me...

Nearer, my God, to Thee
Nearer to Thee.

E'en though it be a cross,
That raiseth me;
Still all my long shall be,
Nearer, my God, to Thee,
Nearer to Thee.

এর সঙ্গে আরো তুলে দেন প্রার্থনাগীত থেকে :

Oft is sorrow ... oft in woe
Onward, Christians, onward go :
Fight the fight, maintain the strife,
Strengthened with the Bread of life.

মনে রাখা ভালো এইসব দৃষ্টান্ত যখন প্রাণের ভাই তেওকে পাঠাচ্ছেন তখনও সেভাবে ছবি আঁকা শুরু করেননি ভিনসেন্ট। এসব প্রার্থনাগীত যেন তাঁর আগামী জীবনের পূর্বাভাষ হয়ে ধরা দিয়েছিল তাঁর মনে। ভ্যান গঘের জীবন তো সংগ্রাম আর সংগ্রামেরই। এই প্রার্থনাগীতগুলো তাঁর মন জুড়ে ছিল। সাত মাস পরে (১মে ১৮৭৬) চিঠি শেষ করে ভাইকে লিখছেন ভিনসেন্ট : 'কিছুদিনের ভেতরেই কিছু ইংরেজি প্রার্থনাগীত গ্রন্থ তুই পেয়ে যাবি ; তার মধ্যে কয়েকটা আমি চিহ্ন দিয়ে দেব। এত অসংখ্য সুন্দর প্রার্থনাগীত আছে, বিশেষ করে মাঝে মাঝে শুনলে তাদের প্রতি অনুরাগ জন্মাবেই।' বাইবেল এবং কবিতার ভক্ত এই ভিনসেন্ট ভ্যান গঘ গির্জার রবিবাসরীয় উপদেশদানের সময় পরবর্তীকালে যে কবিতা ব্যবহার করবেন সে আর আশ্চর্য কী।

ভাইকে লেখা চিঠির মাঝখানে যেমন কবিতার উদ্ধৃতি দিতেন ভিনসেন্ট, তেমনি আবার অনেক সময় কবিতার শুরুতে বা শেষে তিনি কবিতা ব্যবহার করেছেন। যেমন

Mijn oog o ween niet meer, maar houd un tranen,
Mijn ziele, treur nist meer, maar bid, maar bid, mijn ziel.

(নয়ন আমার, কেঁদো না আর, অশ্রু ধারণ করো তোমার,
হৃদয় আমার, করো না শোক আর, শুধু প্রার্থনা, প্রার্থনা করো
হৃদয় আমার।)

এর পরেই ভিনসেন্ট লেখেন ঈশ্বরের কথা। লেখেন যে জীবনের এই প্রহর দিন আর পর্বে ঈশ্বর তাঁর মুখ লুকোন যেন ; কিন্তু এই দুঃখের সময় ঈশ্বরকে যারা ভালোবাসে, ঈশ্বরকে ছেড়ে যায় না তারা...। বৃহদায়তন এই চিঠিতে এর পর আছে আরো অনেক কবিতা থেকে উদ্ধৃতি। আছে ঈশ্বরের আরো অনেক কথা। ভিনসেন্টের মন ঈশ্বরপ্রেমে পরিপূর্ণ হয়ে আছে—এই চিঠি তার নিদর্শন। অনেক বছর পরে দেখি ভাইকে লেখা দীর্ঘ এক চিঠি ভিনসেন্ট শেষ করেন এই কবিতা দিয়ে :

What you ought to do?
Mais toi tu te tairas,
Tel que l'on voit se taíre un coq sur la bruyère
[But you will be silent,
Just as one sees a cock being silent on the heather.]
You cannot act more coolly than that.

ইংরেজি আর ফরাসীতে মেশা এই কবিতা কার তার কোনো হদিশ ওই চিঠি থেকে পাওয়া

যায় না। এই কবিতা কি ভিনসেন্টের নিজের রচনা? এই চিঠিতে অনেক প্রসঙ্গ আছে। তেওকে বলছেন অনেক প্রাণের কথা। মনের কথা। তেও যে মনেপ্রাণে একজন সত্যিকার শিল্পী এই কথাও ভিনসেন্ট লেখেন এই চিঠিতে। লিখছেন যে পেইন্টিংস তাঁকে (ভিনসেন্টকে) সহজে ধরা দেয়। তিনি স্বপ্ন দেখেন তেও আর তিনি এক সঙ্গে ছবি আঁকছেন। তাঁর আর তেওর মধ্যে সম্পর্কের স্বরূপটি কী তা তিনি এইখানেই স্পষ্ট করে বলেছেন, "We should help each other, for I, on my part, would be the same to you, and that is of some importance. Two persons must believe in each other, and feel that it *can* and *must* be done — that way they are enormously strong. They must keep each other's courage up. Well, I think you and I would understand each other." তেওকে শিল্পী হিসেবে পাশে পেতে চান। সেই বিষয়ে অনেক কথা বলে চিঠি শেষ করেন ভিনসেন্ট। আর সব শেষে লেখেন ওই কবিতা। শান্ত সংযত কর্তব্যপরায়ণ দাদা-অন্ত-প্রাণ তেওর ব্যক্তিস্বরূপটাই কি ওই কবিতায় এঁকে দিয়েছেন ভিনসেন্ট?

ভিনসেন্ট কি হাইনরিশ হাইনের কবিতা খুব পছন্দ করতেন? একটি সূত্র থেকে জানা যাচ্ছে যে Das Buch der Lieder থেকে ভিনসেন্ট হাইনের এইসব কবিতা নিজস্ব খাতায় টুকে রেখেছিলেন (খাতাটি তিনি মাথাইজ মারিসকে ১৮৭৪-এ উপহার দেন। এখন সেটি আছে হারলেমের টেইলারস মিউজিয়মে) :

1. Abenddämmerung
2. Am fernen Horizonte
3. Aus alten Märchen winkt es
4. Der bleiche, herbstliche Halbmond
5. Das ist ein schlechtes Wetter
6. Dein Angesicht so lieb und schön
7. Du bist wie eine Blume
8. Es stehen unbeweglich
9. Ein Fichtenbaum steht einsam
10. Im Rhein, im schönen Strome
11. Im Traum sah ich die Geliebte
12. In Vaters Garten heimlich steht
13. Die Lotusblume ängstigt
14. Mein Liebchen, wir sassen beisammen
15. Mir träumte von einem Königskind
16. Sie haben heut abend Gesellschaft
17. Die Weisse Blume
18. Wie der Mond sich leuchtend dränget
19. Wir sassen am Fischerhause

তেওর জন্য হাইনের Meeresstille (শান্ত সমুদ্র) কবিতাটা টুকে দিয়েছিলেন। পারি থেকে লেখা চিঠিতে (১৩ ডিসেম্বর ১৮৭৫) ভিনসেন্ট বলছেন তেওকে : 'আমার মতো তুই হাইনে এবং উহল্যান্ডের কবিতা উপভোগ করেছিস, তবে ভাই সাবধান, এ কিন্তু সাংঘাতিক বস্তু— মায়াবিশেষ যা বেশিদিন থাকে না ; এর কাছে যেন নিজেকে সঁপে দিস না। তোর জন্য যে ছোটো বইগুলো কপি করে দিয়েছিলাম সেগুলো সরিয়ে রাখা সবচেয়ে ভালো বলে কি তোর মনে হয়

না? হাইনে এবং উহল্যান্ডের এই বইগুলো তোর হাতে পরে আবার এসে পড়বে, তখন অন্য আবেগ আর আরো শান্ত হৃদয়ে সেগুলো পড়িস।'

এরপর একটা আশ্চর্য অদ্ভুত পরীক্ষা করার কথা লিখছেন ভিনসেন্ট।

'আর-একবার হাইনের প্রসঙ্গে আসি। বাবা আর মায়ের প্রতিকৃতি এবং বায়ন-এর "বিদায়" নে, এই তিনটের সামনে হাইনে পড়; তাহলে বুঝতে পারবি আমি কী বলতে চাইছি।'

তেও এই পরীক্ষা করেছিলেন কি না জানা নেই।

যোহান উলফগ্যাং গ্যোয়েটে

ভিনসেন্টের চিঠিপত্রে দুবার গ্যোয়েটের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। এটেন থেকে লেখা (ডিসেম্বর ১৮৮১) চিঠিতে দেখি তিনি লিখছেন : 'যেহেতু রেভারেন্ড মি. টেন কেট গ্যোয়েটের *ফাউস্ট* অনুবাদ করেছেন, বাবা-মা সে বই পড়েছেন কারণ একজন যাজক যখন সেটা অনুবাদ করেছেন তা খুব একটা অনৈতিক হতে পারে না???'

পূর্বে উল্লিখিত মাথাইজ মরিসকে দেওয়া খাতায় গ্যোয়েটের এই কবিতাগুলো ১৫ খণ্ড Sämmtliche Werke থেকে ভিনসেন্ট নকল করে দিয়েছিলেন :

1. Abendlied
2. Harfenspieler (Wer nie sein Brot mit Thränen ass)
3. Harfenspieler (Wer sich der Einsamkeit ergibt)
4. Heidenröslein
5. Der König in Thule
6. Mignon (Heiss mich nicht reden)
7. Mignon (Kennst du das Land)
8. Mignon (So lasst mich Scheinen)
9. Die Spinnerin
10. Vor Gericht

এমিস রাপার্ডকে লেখা একটি চিঠিতে (মার্চ ১৮৮৩) গ্যোয়েটের প্রসঙ্গ আছে : 'তিনি —কার্লাইল—গ্যোয়েটের কাছ থেকে অনেক শিখেছেন।' এছাড়া ভিনসেন্টের চিঠিপত্রে গ্যোয়েটের প্রসঙ্গ আর পাওয়া যায় না।

ভিনসেন্টের চিঠিতে আরও কিছু কবির উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁদের কয়েকজনের কথা এখানে রইল।

আলফ্রেড টেনিসন

গত সপ্তাহে এখানে একজন যাজকের মৃত্যু হল; দেশের সবাই তাঁকে জানতেন। গত শনিবার তাঁকে সমাধিস্থ করা হল; অ্যামস্টেল-এর সবুজ সীমান্ত বরাবর সেই পথ ধরে চলা শোভাযাত্রা আমাকে 'ইন মেমোরিয়াম' মনে করিয়ে দিল।

ওয়াল্ট হুইটম্যান

হুইটম্যানের আমেরিকান কবিতা পড়েছিস? নিশ্চিত জানি তেওর কাছে আছে, তোকে জোর দিয়েই বলছি সেগুলো পড় কারণ ওদের দিয়ে শুরু করা সত্যিই সুন্দর, ইংরেজরা তাদের কথা

খুব বলে। তিনি দেখেন ভবিষ্যৎ এমন কি বর্তমানও, স্বাস্থ্যবান, দৃঢ় অকৃত্রিম রক্তমাংসের ভালোবাসার পৃথিবীর, বন্ধুত্বের, কাজের স্বর্গের নক্ষত্রালোকিত মস্ত সিন্দুকের নীচে যাকে একমাত্র ঈশ্বর বলা যায়—এবং সর্বোপরি শাশ্বত এক পৃথিবীর। প্রথমটা তোর হাসি পাবে, এত সরল আর নিখাদ তারা ; আর সেই কারণে তোকে ভাবাবেও।

'কলম্বাসের প্রার্থনা' খুব সুন্দর।

(বোন ভিলহেলমিনাকে, গোগ্যাঁর আগমনের আগে)

হেনরি ওয়াডসওয়ার্থ লংফেলো

একজন আমেরিকান, লংফেলোকে তিনি খুবই পছন্দ করেন, এবং ঠিকই করেন ; আমি জানি তাঁর তিনটে ছবি 'দ্য কোর্টশিপ অব মাইলস স্ট্যান্ডিশ' অনুপ্রাণিত। ছবিগুলো দেখে 'মাইলস স্ট্যান্ডিশ' আর 'ইভানজেলাইন' আবার পড়তে বাধ্য হয়েছি ; জানি না কেন, কখনো ভাবিনি এই কবিতাগুলো এত সুন্দর এখন যেমন ভাবছি।

তোকে লংফেলো আর অ্যান্ডারসনের 'ফেয়ারি টেলস' পাঠাব ; ওদের জোগাড় করার চেষ্টা করব। পাঠালে বিশেষ করে পড়িস লংফেলোর 'ইভানজেলাইন', 'মাইলস স্ট্যান্ডিশ', 'কিং রবার্ট অব সিসিলি' ইত্যাদি।

অবশেষে তোকে লংফেলোর কবিতা পাঠাচ্ছি ; আমি নিশ্চিত বইটা তোর বন্ধু হয়ে উঠবে।

যখন তখন পড়বি লংফেলো, যেমন :
বৃষ্টি আর কুয়াশার ভেতর দিয়ে দেখতে পাই গ্রামের আলো,
বিষাদের এক অনুভব আমার দিকে আসে, হৃদয় আমার তাকে পারে না বাধা দিতে।

In every life some rain *must* fall
And days be dark and dreary.

(লংফেলোর *ব্যালাডস অ্যান্ড আদার পোয়েমস*-এর অন্তর্গত 'দ্য রেইনি ডে' থেকে ভিনসেন্ট এই দুই ছত্র উদ্ধার করেছেন। তবে ঠিক পাঠ হবে : Into each life some rain must fall, some days must be dark and dreary.—আমরা কি ধরে নিতে পারি চিঠিতে ওই দুই ছত্র ভিনসেন্ট স্মৃতি থেকে উদ্ধার করেছিলেন?)

'কবিতা এত গভীর এবং স্পর্শাতীত যে কারো পক্ষে সবকিছুর রীতিবদ্ধ সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়।' আন্তন মউভের পাঠ করার প্রসঙ্গে তেওকে লিখেছিলেন ভিনসেন্ট (ডিসেম্বর ১৮৮১)। এর অনেক দিন পরে লিখেছিলেন তিনি, 'আমাদের চারিদিকে সর্বত্র কবিতা ঘিরে আছে তবে তাকে কাগজে ধরা, হায়, দেখতে যতটা সহজ ততটা নয়।' পিতৃব্য ভিনসেন্ট সম্পর্কে ভাইপো ভিনসেন্ট ভ্যান গঘ ভাই তেওকে লিখেছিলেন (১৫ জুলাই ১৮৭৫), 'স্যাঁৎ-ব্যভ বলেছেন, "অধিকাংশ মানুষের ভেতর একজন কবি থাকে যৌবনে যার মৃত্যু হয়, মানুষ যাকে বাঁচিয়ে রাখে।" আর মুসে বলেছেন, "জানবে যে আমাদের ভেতর একজন ঘুমন্ত কবি লুকিয়ে আছে, সদা তরুণ, প্রাণবান।" আমার মনে হয় কাকা ভিনসেন্ট প্রথম শ্রেণীর।' ভিনসেন্ট নিজেও কি কবি ছিলেন না? তাঁর ছবি কি চারপাশে ঘিরে থাকা কবিতা নয়! আর তাঁর চিঠিপত্রের ভেতর

লুকিয়ে থাকা এইসব ছত্র কি কবিতারই নামান্তর নয়।

পরদিন ভোরে ট্রেনে হারউইচ থেকে লন্ডন যাওয়ার পথে কী সুন্দর দেখতে লাগছিল কালো মাঠ আর সবুজ তৃণভূমিতে মেষ আর মেষশাবকের, মাঝে মাঝে থর্নবুশ, কয়েকটা মস্ত ওকগাছ কালো তাদের ডালপালা, ধূসর মসে ঢাকা গুঁড়ি ; ঝকঝকে নীল আকাশে তখনও রয়ে গেছে কয়েকটি তারা আর দিগন্তে ধূসর মেঘের তীর। সূর্য ওঠার আগেই শুনেছি ভারুই পাখির ডাক। লন্ডনের ঠিক আগের স্টেশনের কাছে যাওয়ার আগেই সূর্য উঠল। ধূসর মেঘের তীর গিয়েছে মিলিয়ে। সূর্য, সত্যিকার পুবের সূর্য দেখেছিলাম যেমন তারই মতো সরল, মহান। শিশিরে, রাতের তুষারে, ঝলমল করছে তৃণ।...

শনিবার অপরাহ্নে সূর্য অস্ত না-যাওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে ছিলাম ডেকের বুকে। মোটামুটি ঘন নীল জল আর যত দূর তাকানো যায় সাদা মাথা উঁচু উঁচু ঢেউ। দৃষ্টি থেকে ইতিমধ্যে অদৃশ্য হয়েছে তীরভূমি। মস্ত হালকা নীল আকাশ, মেঘ নেই একটিও। জলের বুকে সূর্যাস্ত ফেলেছে উজ্জ্বল আলোর রেখা।...

বড়ো শহরের মানুষের ভেতর ধর্মের প্রতি এমন একটা আকাঙ্ক্ষা থাকে। বহু কারখানা বা দোকান কর্মীরই ছিল নিষ্পাপ ছেলেবেলা। নগর-জীবন কখনোসখনো "সকালের প্রথম শিশির" কেড়ে নেয়।

আগের দিন লন্ডনের পথে এক দীর্ঘ হাঁটা ধরেছিলাম। ভোর চারটের সময় এখান ছেড়ে যাই, সাড়ে ছটা পার করে হাইড পার্কে। ঘাসের বুকে তখন শিশির পড়ে রয়েছে, গাছ থেকে ঝরে পড়ছে পাতা ; দূরে দেখা যায় দীপের বিবর্ণ আলো, যেগুলো তখনো নিভিয়ে দেওয়া হয় নি ; ওয়েস্টমিন্সটার অ্যাবে আর হাউসেস অব পার্লামেণ্ট, সকালের কুয়াশা ভেদ করে উঠল লাল সূর্য।

তুই তো জানিস বাবা এখানে ছিলেন। তিনি আসতে কী খুশি যে আমি। দুজনে মিলে দেখা করতে গেলাম মেন্ডেস, স্ট্রিকার আর কর কাকা আর দুই মেয়েস পরিবারের সঙ্গে আর সবচেয়ে সুখস্মৃতি হল আমার ছোট্ট পড়ার ঘরে এক সকালে বাবা আর আমি একসঙ্গে কাটালাম, কিছু কাজ সংশোধন করে, আর পাঁচটা বিষয়ে কথা বলে। কল্পনা করে নিতে পারিস দিনটা কী ভাবে উড়ে পালাল। স্টেশনে বাবাকে বিদায় জানিয়ে, চোখের বাইরে ট্রেনের চলে যাওয়া দেখে, এমন কি তার ধোঁয়াটুকুও, বাড়িতে নিজের ঘরে ফিরে এলাম। দেখলাম আগের দিন যে ছোট্ট টেবিলটার ওপর বই-খাতা পড়ে রয়েছে তার কাছে দাঁড়িয়ে আছে বাবার চেয়ার। যদিও জানি শীগ্গিরি আমাদের দেখা হবে, আমি ছেলেমানুষের মতো কেঁদে ফেললাম।

ভালোবাসা হল এমন কিছু এত ইতিবাচক, এত জোরাল, এত বাস্তব যে যে-ভালোবাসে তার পক্ষে এই অনুভূতি ফিরিয়ে নেওয়া নিজের জীবন নেওয়ার মতোই অসম্ভব। এর উত্তরে তুই যদি বলিস, "কিন্তু কিছু মানুষ তো আছে যারা তাদের জীবন নিয়ে নিতে পারে," আমার

সোজা উত্তর, "আমি সত্যিই মনে করি না এমন ইচ্ছের মানুষ আমি।"

জীবন আমার কাছে মহার্ঘ হয়ে উঠেছে। আমি খুব খুশি যে আমি ভালোবাসি। আমার জীবন আর আমার ভালোবাসা অভিন্ন।...

যে-মানুষ বলতে শেখেনি, "সে, আর কেউ নয়," সে কি জানে ভালোবাসা কী?...সেই কথা যখন তারা আমাকে বলল, তখন আমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে, আত্মা দিয়ে, মন দিয়ে অনুভব করলাম! "সে, আর কেউ নয়।"

... ...

তুই বলবি, তাকে যদি জয় করিস কিসের ওপর বাঁচবি। অথবা সম্ভবত, তাকে তুই জিততে পারবি না। না, তুই ওভাবে বলিস না। ভালো যে বাসে, সে বাঁচে ; যে বাঁচে, সে খাটে ; যে খাটে তার জন্য রুটি আছে।

... ...

আমি মনে করি সত্যিকারের ভালোবাসা ছাড়া আর কিছুই জীবনের বাস্তবতায় আমাদের জাগিয়ে তুলতে পারে না। প্রকৃতই মানুষ যখন প্রেমে পড়ে সে যেন এক নতুন দুনিয়া আবিষ্কার।

পাঠক ভিনসেন্ট

অনির্বাণ রায়

ভিনসেন্ট ভ্যান গঘ শুধু বই পড়তেন না, ভাই-বোনকে বই পড়তে পরামর্শ দিতেন, নিজে যে বইটি পড়েছেন তার কথা জানাতেন, বন্ধুকে বই উপহার দিতেন। বাবার জন্মদিনে ভাইয়ের সঙ্গে মিলে বই উপহার দিয়েছেন বাবাকে। এবং আরও কি, শুধু বইকে বিষয় করে ছবি এঁকেছেন। তাঁর অনেক ছবিতে বইয়ের উজ্জ্বল উপস্থিতি এই কথাটিই নীরবে ঘোষণা করে নাকি বই তাঁর মন কতখানি অধিকার করে ছিল! শিল্পের ইতিহাসে এমন বইপ্রেমী শিল্পী খুব বেশি আছেন কি না জানা নেই।

খুব দ্রুত পড়তে পারতেন ভিনসেন্ট। *জেন আয়ার*-এর মতো বড়ো বই তিনি তিনদিনে শেষ করেছিলেন। তাঁর সম্পর্কে এক স্মৃতিকথায় একজন জানিয়েছেন যে এক রাতে তিনি একশো পাতা পড়ে ফেলেছিলেন। ভিনসেন্ট চাইতেন যেটা তিনি একটু একটু করে আয়ত্ত করেছিলেন সেটা যদি অন্যরাও আয়ত্ত করতে পারত অর্থাৎ 'বিনা আয়াসে অল্প সময়ের ভেতরে একটা বই পড়ে ফেলা'। মনে রাখা দরকার ভিনসেন্ট প্রথম জীবনে বইয়ের দোকানে কেরানীর কাজ করেছেন। তিনি একটি চিঠিতে লিখেছেন, 'বই ভালোবাসা রেমব্রান্টকে ভালোবাসার মতোই পবিত্র, আমি তো মনে করি এরা দুজন পরস্পরর পরিপূরক।' কথাটা ভিনসেন্টের—একমাত্র ভিনসেন্টের মুখেই শোভা পায় কেননা তিনি ছিলেন রেমব্রান্টের পরম ভক্ত। রেমব্রান্টের ছবি সম্পর্কে তাঁরই কথা, 'যদি এক পক্ষ ধরে এই ছবির সামনে বসে থাকার সুযোগ পাই তো জীবন থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারি দশটা বছর আর এক টুকরো শুকনো রুটি খেয়েই কাটিয়ে দিতে পারি দিনগুলো।' ১৮৮৯-এ ভিনসেন্ট ছিলেন মানসিক হাসপাতালে। এই বছর ২৪ মার্চ এক চিঠিতে তেওকে লিখছেন তিনি, 'কামিয়ে লেমোনিয়ের-এর *সে: দ্য লা গ্রিব* বইটা কেনার অজুহাতে বাইরে বেরিয়েছিলাম। দুটো অধ্যায় পড়ে ফেলেছি এর—কী গাম্ভীর্য, কী গভীরতা! বইটা তোকে পাঠানো পর্যন্ত অপেক্ষা কর। গত ক'মাসের ভেতর এই প্রথম একটা বই পেলাম হাতে। এ আমার কাছে অনেকখানি আর আমার সেরে ওঠার পক্ষেও অনেকটা কাজ করবে।' অর্থাৎ বই পড়াটা তাঁর কাছে কোনো সময়বিলাস নয়, তা তাঁকে সুস্থ করে তুলতেও সহায়ক। শ্রীযুক্ত এম. জি. ডেলসউট তাঁর এক স্মৃতিকথায় জানিয়েছেন যে ভিনসেন্ট খেতে বসেও ড্রয়িং করতেন, নয়তো পড়তেন। আর, একবার ভিনসেন্টের পিতৃদেব কুজমেসে এসেছিলেন বইয়ের পেছনে. তাঁর (ভিনসেন্টের) অর্থব্যয় বন্ধ করতে।

বইয়ের দোকানে কাজ করার সূত্রেই হোক বা অন্য যে-কোনো কারণেই হোক, ভিনসেন্ট বইয়ের নানা অংশবিভাগের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তেওকে একবার একটা বই পাঠালেন, এডমন্ড রোশ-এর *কবিতা*। কিছু না পেয়ে এ বইয়ের আখ্যাপত্রেই একটা স্কেচ করে পাঠালেন। আর একবার ড. এম. বি. মেন্দেস দা কোস্টাকে (ইনি কিছুদিন ভিনসেন্টকে গ্রীক-ল্যাটিন

পড়িয়েছিলেন) টমাস আ কেম্পিসের *ইমিটেশন অব ক্রাইস্ট* উপহার দেওয়ার সময় তার উড়োপত্রে (ফ্লাই লীফ) লিখে দিয়েছিলেন, 'তাঁর ভেতরে ইহুদীও ছিল না, গ্রীকও ছিল না, প্রভুও ছিল না মনিবও ছিল না। পুরুষও ছিল না নারীও ছিল না, ছিলেন শুধু খ্রীস্ট আর খ্রীস্ট।' শাপেঁই-এর আঁকা একটি ছবিতে (এটি আছে পারির লুভরে) ভিনসেন্ট *ইমিটেশন অব ক্রাইস্ট* বইটি লক্ষ করেছিলেন। বইটি তাঁকে গভীরভাব প্রভাবিত করেছিল। তেওকে লিখেছেন, 'এ বইটা তোকে প্রচুর আলো দেবে।' ৪ সেপ্টেম্বর ১৮৭৭ তেওকে লেখা চিঠির আর-একটুকরো:

'I am also copying the whole of the Imitation of Christ from a French edition which I borrowed from Uncle Cor; the book is sublime, and he who wrote it must have been a man after God's own heart. A few days ago such an irresistible longing for that book came over me— perhaps because I so often look at the lithograph after Ruyperez— that I asked uncle Cor to lend it to me; now I am copying it in the evening : it means much work, but I have finished most of it, and I know no better way to study it ...... Thomas à Kempis' book is peculiar; in it are words so profound and serious that one cannot read them without emotion, almost fear— at least if one reads with a sincere desire for light and truth— the language has eloquence which wins the heart because it comes from the heart. You have a copy, haven't you?'

নানারকম সংস্করণের বইয়ের খোঁজখবর রাখতেন ভিনসেন্ট। তেওকে ফরাসী বাইবেল পাঠাবেন বলে একটা চিঠিতে লিখেছিলেন। একবার ভাইকে জিজ্ঞেস করলেন, '*ইমিটেশন অব ক্রাইস্ট*-এর ফ্লেমিশ সংস্করণ চাই তোর? কিছুদিনের মধ্যে তোকে এটা পাঠাতে পারব আশা করি— এটা একটা ছোট্ট বই পকেটে নেয়া যাবে।' (এখানে মনে পড়ে যাওয়া স্বাভাবিক রবীন্দ্রনাথের *শেষের কবিতার* কথা। এই উপন্যাসের নায়ক অমিত রায় নানারকম সংস্করণের বই সঙ্গে রাখত।) আর একবার তেওকে লংফেলোর কবিতা পাঠিয়ে লিখেছিলেন, 'আমি নিশ্চিত বইটা তোর বন্ধু হয়ে উঠবে।'

দুই

বহু লেখকের বই পড়েছিলেন ভিনসেন্ট। তবে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় লেখক ছিলেন চার্লস ডিকেন্স এবং জর্জ এলিয়ট। ডিকেন্স তিনি পড়তে শুরু করেন ছেলেবেলায়। *এ খ্রীস্টমাস ক্যারল অ্যান্ড দি হন্টেড ম্যান* সম্পর্কে ভিনসেন্ট লিখেছেন, 'সেই ছেলেবেলা থেকে ও দুটো ছেলেদের গল্প আমি প্রায় প্রতিবছর পড়েছি আর প্রত্যেকবারই তারা আমার কাছে নতুন মনে হয়।' ভিনসেন্টের মতে 'এমন কোনো লেখক নেই যিনি ডিকেন্সের মতো এমন একজন ছবি-আঁকিয়ে এবং সাদা-কালোর শিল্পী'।

সময় পেলে ভিনসেন্ট পড়া-বই আবার পড়তেন। সাঁ-রেমির উন্মাদাশ্রমে থাকার সময় ডিকেন্স তিনি পুনর্বার পড়েছিলেন। তিনি নিজেই যেন ছিলেন ডিকেন্স এবং এলিয়টের উপন্যাসের জীবন্ত প্রতিমূর্তি! ডিকেন্সের উপন্যাস তাঁর মানসিক গঠনে সাহায্য করেছিল। ভিনসেন্টের সমাজসচেতন মন এবং তাঁর অনেকানেক সদ্‌গুণের বিকাশ ঘটার কারণ ডিকেন্সের উপন্যাস। বোরিনাজের কয়লাখনি অঞ্চলে থাকার সময় ভাইকে লিখছেন কীভাবে ডিকেন্সর *হার্ড টাইমস*-

এর ফরাসী সংস্করণ আবিষ্কার করেছেন, 'ডিকেন্সের *লে ত্যাঁপ দিফিসিল* পড়েছিস কখনো? ফরাসী নামটা জানালাম এই কারণে যে ১.২৫ ফ্রাঁতে খুব ভালো একটা ফরাসী অনুবাদ প্রকাশ করেছে হাশেত... ।' ডিকেন্সের সমস্ত উপন্যাস সংগ্রহ করার খুব ইচ্ছে ছিল ভিনসেন্টের। শিল্পীবন্ধু আন্তন ভান রাপার্ডকে লিখছেন, 'ভালো কথা, ডিকেন্সের প্রায় সম্পূর্ণ একটা ফরাসী সংস্করণ আমার আছে। ডিকেন্সের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এই অনুবাদ করা হয়। মনে পড়ছে তুমি একবার বলেছিলে যে ইংরেজিতে ডিকেন্সকে উপভোগ করতে পারনি তাঁর জটিল ইংরেজির জন্য বিশেষ করে *হার্ড টাইমস*-এ খনি শ্রমিকদের উপভাষা। এই ফরাসী সংস্করণ ইচ্ছে করলে পড়তে পার... অন্য কিছুর বিনিময়ে ডিকেন্সের এই পুরো ফরাসী সংস্করণ বদল করতে রাজি আছি যদি তুমি যত্ন নাও। আস্তে আস্তে ইংরেজি হাউসহোল্ড সংস্করণ সংগ্রহ করার কথা ভাবছি।' ভিনসেন্টের ডিকেন্স পড়ার বিষয়ে তাঁর মা একবার লিখেছিলেন, 'সারাদিন সে শুধু ডিকেন্স পড়ে আর কেউ কথা বললে কথা বলে।' ১৮৮২তে হাসপাতালে থাকার সময় পড়েছিলেন ডিকেন্সের অসমাপ্ত উপন্যাস *এডউইন ড্রুড*। *দ্য টেল অফ টু সিটিজ* সম্পর্কে ভিনসেন্ট বলেছিলেন যে এ উপন্যাস থেকে বিপ্লবী-যুগের ছবি আঁকার প্রচুর উপকরণ পাওয়া যাবে। পল গোগ্যাঁর ছবি অবলম্বনে মাদাম জিনুর যে প্রতিকৃতি ভিনসেন্ট এঁকেছিলেন সেখানে দেখা যায় মাদামের সামনেকার টেবিলে দুখানি বই, একটা *আঙ্কল টম্‌স কেবিন*, অন্যটি ডিকেন্সের *খ্রীস্টমাস স্টোরিজ*।

জর্জ এলিয়টের উপন্যাসও বিশেষ প্রিয় ছিল ভিনসেন্ট ভ্যান গঘের। এলিয়টের *মিডলমার্চ*, *ফেলিক্স হোল্ট, দি র‍্যাডিক্যাল* উপন্যাস দুটি তাঁর পড়া ছিল। হেগ থেকে একটি চিঠিতে তেওকে তিনি লিখছেন যে ফেলিক্স্ হোল্ট-এর মধ্যে একজন ডাচ শিল্পীকে খুঁজে পেয়েছেন, 'তার মধ্যে উদার এবং রুক্ষ একটা ব্যাপার আছে যেটা আমাকে খুব টানে—অনেকটা ব্লীচ না-করা সুতি কাপড়ের খরখরে ভাবের মতো— একজন মানুষ যে-কিনা আপাতভাবে বাইরের বস্তুতে সংস্কৃতি খোঁজে না, কিন্তু অন্তরের দিক দিয়ে অন্য অনেকের চেয়ে অনেক, অনেক বেশি অগ্রসর।' এ কি কথায়-আঁকা ভ্যান গঘের আত্মপ্রকৃতি নয়? *ফেলিক্স্ হোল্ট* উপন্যাসের অংশবিশেষ উদ্ধার করে তিনি সিয়েন ('দুঃখ' ছবির সেই মেয়েটি) এবং তার পরিবারের মানুষদের তুলনা করেন। উপন্যাসটি তিনি দ্বিতীয়বার পড়েছিলেন। ভান রাপার্ডকে লিখেছিলেন এলিয়ট সম্পর্কে, 'খুব কম লেখকই আছেন যাঁরা এলিয়টের মতো গভীরভাবে আন্তরিক এবং সৎ।' সাঁ-রেমিতে থাকার সময় মা আর সহোদরা ভিলের জন্য এঁকেছিলেন 'আর্লের শোবারঘর' ছবির একটি ছোটো রূপান্তর। এই প্রসঙ্গে লিখেছিলেন 'একটি মাত্র শোবার খাট, দুটি চেয়ার শূন্য শোবার ঘরের এই আভ্যন্তরীণ দৃশ্য দেখে তোমরা হয়তো ভাববে সবচেয়ে অসুন্দর জিনিস— যদিও এ আমি বড়ো মাপে দুবার এঁকেছি। *ফেলিক্স্ হোল্ট*-এ যে ধরনের সরলতার বিবরণ আছে আমি সেইরকমটি ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছি।'

তিন

ভিনসেন্টের অনেক ছবিতে বই দেখতে পাওয়া যায়। শুধুমাত্র বইকে বিষয়বস্তু করেও তিনি ছবি এঁকেছেন।

১৮৮৫তে ন্যুয়েনেনে থাকার সময় ভিনসেন্ট এঁকেছিলেন 'খোলা বাইবেল, মোমবাতি এবং

বই'। এই বাইবেলটি ছিল সম্ভবত তাঁর পিতার। এ ছবিতে যে বইটিকে তিনি বাইবেলের সামনে দেখিয়েছেন সেটি এমিল জোলার লেখা: *লা জোয়া দ্য ভিভর*। এ বইকে আবারও দেখা যাবে ১৮৮৮তে আঁকা 'ওলিয়েন্ডার ফুলদানি এবং বইয়ের স্টিল লাইফ' ছবিতে। ১৮৮৭তে ভিনসেন্ট আঁকলেন 'প্লাস্টারের ছোট্ট স্ট্যাচু আর দুটি বই'। এই বই দুটি হল গঁকুর ভায়েদের লেখা *জারমিনি নাসেরত্যু* আর মপাসাঁর *বেল আমি*। 'স্টিল লাইফ উইথ অনিয়ন অ্যান্ড বুক' ছবিতে পেঁয়াজ, মদ, জল, বই, খাম, পাইপ-তামাক, পোড়া দেশলাই কাঠি, একবাকসো দেশলাই, মোমের কাঠি, মোমদান, মোমবাতি দেখতে পাওয়া যায়। এ ছবিতে যে বইটি দৃশ্যমান তার নাম *মানুয়েল আনুয়ের দ্য লা সাঁতে উ মেদেসির এ ফার্মাসি দমেস্তিক*। লেখক এফ. বি. রাসপেইল। এটি ছিল গৃহ-চিকিৎসার অতি বিখ্যাত বই। সুস্থ সবল থাকার জন্য ভিনসেন্ট এ বইতে গভীর মনোযোগ দিয়েছিলেন। ১৮৮৭-৮৮র শীতে আঁকা 'স্টিল লাইফ উইথ বুকস, রমাঁ পারিজিয়্যাঁ' ছবিতে দেখা যায় একটি টেবিলে পড়ে আছে কুড়িটি বই। একটা বইয়ের আবার পাতা খোলা। ভিনসেন্টের অনুমতি নিয়ে তেও এই ছবিটি ১৮৮৮তে 'স্বাধীনদের বসন্তকালীন প্রদর্শনী'তে দিলে গুস্তাভ কান অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন এই বলে যে এত সাধারণ বিষয় অবলম্বনে আঁকা স্টাডি কোনো প্রদর্শনীতে দেওয়া ঠিক নয়। গোগ্যাঁর ছবি অবলম্বনে মাদাম জিনুর যে প্রতিকৃতি ভিনসেন্ট এঁকেছিলেন (সাঁ-রেমি,১৮৯০) সেখানে দুটি বই দেখতে পাওয়া যায়: *আঙ্কল টমস্ কেবিন, খ্রীস্টমাস ক্যারল*। ড. গাসের প্রতিকৃতি (১৮৯০)-তে দেখা যায় দুখানি বই: *মানেত সলোমন* আর *জ্যারমিনি লাতের্তো*। ১৮৮৭তে আঁকা 'তিনটি উপন্যাস' হল জাঁ রিশপ্যাঁ-র *ব্রাভেস জেনস,* এমিল জোলার *ও বনের দো দাম*; এদমঁ দ্য গঁকুর-এর *ফিইয়ে এলিজা*।

পারি-পর্বে বই-বিষয়ক ছবি যেমন এঁকেছিলেন ভিনসেন্ট তেমনি প্রচুর পরিমাণে পড়েছিলেন। ফরাসী ঔপন্যাসিক জোলা, ফ্লবেয়র, মপাসাঁ, গঁকুর-ভায়েরা, জ্যাঁ রিশপ্যাঁ, আলফঁস দোদে, অইসমাঁস প্রমুখের রচনা ভিনসেন্ট যথেষ্ট মন দিয়ে পড়েছিলেন শুধু নয় এঁদের কোনো কোনো উপন্যাস থেকে তিনি শিক্ষা করেছিলেন অনেক কিছু। শহুরে শ্রমজীবী মানুষদের সম্পর্কে সত্যটুকু জেনেছিলেন জোলা এবং গঁকুর ভায়েদের উপন্যাস থেকে। ফরাসী উপন্যাস কীভাবে তাঁকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল তার একটুকরো ছবি পাওয়া যাবে গোগ্যাঁর লেখা থেকে। গোগ্যাঁ লিখেছেন যে ১৮৮৬-র শীতে ভিনসেন্ট কদিন অনাহারে কাটাচ্ছিলেন। সে সময় পাঁচ ফ্রাঁতে তাঁর একটা ক্যানভাস বেচে দিলেন। ছবির দোকান থেকে বেরিয়েই দেখতে পেলেন এক ফুটপাথবাসী বালিকা। 'ভ্যান গঘ ফরাসী সাহিত্যের মধ্যেই ছিলেন। *এলিজা বালিকার* কথা মনে পড়াতে বালিকাকে তিনি পাঁচ-ফ্রাঁটা দিয়ে দিলেন।'

তেওকে একবার লিখেছিলেন ভিনসেন্ট, 'একটা বইয়ের দোকানের ছবি আঁকব সামনেটা হলুদ আর গোলাপী, সন্ধেবেলা, কালো পথিকের দল—।'

ভিনসেন্ট ভ্যান গঘ এ ছবি শেষ পর্যন্ত এঁকেছিলেন কিনা জানা নেই।

বাংলায় ভিনসেন্ট ভ্যান গঘ

অনির্বাণ রায়

বাংলাভাষায় প্রকাশিত ভ্যান গঘ বিষয়ক আদিতম রচনাটির সন্ধান এখনও পর্যন্ত করে ওঠা যায়নি। আর্ভিং স্টোন-এর *লাস্ট ফর লাইফ/দ্য নভেল অফ ভিনসেন্ট ভ্যান গঘ*-এর প্রকাশকাল ১৯৩৪। উপন্যাসটির অদ্বৈত মল্লবর্মণ কৃত বঙ্গানুবাদ 'জীবনতৃষ্ণা' শিরোনামে 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় (১৯ মার্চ ১৯৪৯—২০মে ১৯৫০)। অদ্বৈত মল্লবর্মণের এই অনুবাদ অদ্যাবধি গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত। *লাস্ট ফর লাইফ*-এর আরও তিনটি অনুবাদ পরবর্তীকালে প্রকাশিত হয়।

নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়: জীবন পিয়াসা / কলকাতা, অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির, ১৯৫৪, পৃষ্ঠা ৪৬৩।

গীতা দেবী: প্রেম মৃত্যুহীন / বোম্বে, পার্ল পাবলিকেশনস, ১৯৫৮, ২ খণ্ড।

ঈশানী রায়চৌধুরী: লাস্ট ফর লাইফ / কলকাতা, পত্রপুট, ১৯৮২, পৃষ্ঠা ৬+২৭৩।

অগ্যস্ত রদ্যাঁ (১৮৪০-১৯১৭), পল গোগ্যাঁ (১৮৪৮-১৯০৩), পাবলো পিকাসো (১৮৮১-১৯৭৩) অথবা মরিস উত্রিলো (১৮৮৩-১৯৫৫) সম্পর্কে এক / একাধিক গ্রন্থ বাংলায় প্রকাশিত হলেও যতদূর জানা আছে ভিনসেন্ট ভ্যান গঘ বিষয়ক একটিও গ্রন্থ এখনও পর্যন্ত অপ্রকাশিত।

প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়ে যায়, পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ভ্যান গঘ বিষয়ক গ্রন্থের পরিমাণ কী বিপুল। পাস্কাল বোনাফু তাঁর *ভ্যান গঘ দ্য প্যাসনেট আই* গ্রন্থে জানিয়েছেন যে ১৮৯০ থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত সময়সীমায় ভ্যান গঘ বিষয়ক ৭৭৭টি 'স্টাডি' প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৪২ থেকে আধুনিকতম কাল পর্যন্ত এই সংখ্যা ইতিমধ্যে কোন রূপ ধারণ করতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। জাপানে তাঁকে নিয়ে গবেষণাপত্র লেখা হয়েছে। আমাদের দেশেও লেখা হচ্ছে বলে শুনেছি। চাক্ষুষ করার সুযোগ এখনও হয়নি।

দুই

ভ্যান গঘ বিষয়ক যে-কোনো রচনার জন্য ভাই তেও-কে লেখা তাঁর চিঠিপত্রের তিনটি খণ্ড আকর বিশেষ। এই পত্রধারা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯১৪-১৫ সালে, দুটি খণ্ডে। এমিল বার্নার্দকে লেখা ভিনসেন্টের চিঠিপত্রের সংকলন প্রকাশিত হয় ১৯১১তে। ১৯৩৭-এ এর ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করে দ্য মিউজিয়াম অফ মডার্ন আর্ট, নিউ ইয়র্ক। তেও-কে লেখা ভ্যান গঘের চিঠিপত্রের ডাচ ও ফরাসী সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯২৮-এ। ভিনসেন্টের জন্মশতবর্ষে, ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত হয় *কালেক্টড লেটার্স*। ১৯৫৮তে প্রকাশিত হয় তিন খণ্ডের *দ্য কমপ্লিট লেটার্স অফ ভিনসেন্ট ভ্যান গঘ / উইথ রিপ্রোডাকশনস অফ অল দ্য ড্রয়িংস ইন দ্য করেসপনডেনস্*।

পরিতোষ সেন একটি সাক্ষাৎকারে (দেশ/১৫ ডিসেম্বর ১৯৯০) বলেছেন যে '*লাস্ট ফর লাইফ* তো ভীষণ রোমান্টিক বই। জনপ্রিয় বই। আমার মনে হয় এই বই থেকে ইন্টারেস্টিং বই ভ্যান গঘের চিঠির বই'। 'বারোমাস শারদীয় ১৯৭৯' সংখ্যায় ছবি বসু 'ভান গক্-এক চিঠি' শিরোনামে ছটি চিঠি (তিন খণ্ডের সংকলনে ধৃত এগুলির ক্রমিকসংখ্যা: ১৭১, ২৭২, ৩৭৯, ৫৩১, ৫৭৯, ৬৫২) অনুবাদ করেন সংক্ষিপ্ত জীবনী সংবলিত ভূমিকাসহ। ছবি বসু লিখেছেন:

> ভিন্‌সেন্ট ভান্ গকের চিঠিগুলি তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও আবেগপ্রবণ উত্তপ্ত হৃদয়ের পূর্ণ প্রকাশ। শিল্পী এবং তাঁর ছোট ভাই থিও যেন এক অচ্ছেদ্য মানসিক বন্ধনে যুক্ত ছিলেন। বিশেষ করে থিও ছিলেন এক অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ভাই, গিনি অসীম মমতা, ধৈর্য ও স্নেহে শিল্পীকে বুঝতে পেরেছিলন। শিল্পী ভান গক্ তাঁর একক সংগ্রামের সঙ্গী থিওকে চিঠির পর চিঠিতে নিজের মনের কথা মেলে ধরেছেন। কেউ কেউ বলবেন শিল্প-সৃষ্টিতে চিত্রশিল্পীর পরিচয়। চিঠি ত নেহাতই গদ্যময়। কতটুকু তাতে ধরতে পারা যায়। কিন্তু শিল্পীর মনোরাজ্যে কত ভাঙাগড়া, কত সংঘর্ষ, বাধা, বিচ্ছেদ, জীবনযুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ে হতাশার বেদনা চিঠিগুলিতে চেনা যায়।

'শিল্পের বোধোদয়ে পঞ্চাশ বছরের দেশ' (দেশ/সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যা ১৩৪০-১৩৯০/পৃ. ১৭১) নামে তাঁর প্রবন্ধটি পূর্ণেন্দু পত্রী শুরু করেছিলেন ভ্যান গঘের চিঠি দিয়ে। তিনি লিখেছেন:

> থিও-কে লেখা এক চিঠিতে ভ্যান গঘ নিজের আত্মবিকাশের পদ্ধতি জানিয়েছিলেন এই ভাবে—"তুমি অবশ্যই প্রশ্ন করবে: তোমার নির্দিষ্ট লক্ষ্য কি ? লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট হয় ক্রমে ক্রমে, ধীরে এবং নিশ্চিতভঙ্গীতে, ঠিক যেমন আঁকিবুকি ক্রমে হয়ে ওঠে স্কেচ, স্কেচ ছবি, একটু একটু করে, গভীর নিষ্ঠায় কাজটা করতে করতে এবং আইডিয়া সম্পর্কে নিয়ত ভাবনার পরিণামে, প্রথমে যা হয়ে থাকে ঝাপসা, কারণ সুস্থির হওয়ার আগে ভাবনারা ভেসে বেড়ায় এলোমেলো।

ভ্যান গঘের আরও কিছু চিঠি বাংলায় অনুবাদ করেন দেবীপ্রসাদ বসু। এগুলি প্রথমে বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে অনূদিত এই চিঠিগুলি *প্রিয়তম থিও, তোমার ভিনসেন্ট* নামে গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয় (প্রকাশক ও মুদ্রক: রতিকান্ত নস্কর; প্রথম প্রকাশ : পৌষ ১৩৯৮/পৃ. ৮০)। এখানে নটি পত্র সংকলিত। ভূমিকায় অনুবাদক/সংকলক/সম্পাদক দেবীপ্রসাদ বসু লিখেছেন:

> ভিনসেন্ট ভ্যান গঘ (১৮৫৩-১৮৯০) সম্পর্কে আমরা এতদিন যা জেনে এসেছি তা হল: সূর্যমুখী পুষ্পগুচ্ছের ছবি, উন্মাদ হয়ে যাওয়া, নিজের কান কেটে একজন মহিলাকে তা উপহার এবং বুলেটে আত্মহত্যা। কিন্তু পৃথিবীব্যাপী চমকবিলাসী ও অপসংবাদজীবীগণ তাঁদের এই সব দাঁড়ি কমাহীন প্রচারক্রমে যে লসাগু সম্পাদন করেছেন, তাতে ভিনসেন্টের জীবন ও সৃষ্টি নিয়ে উন্মাদনা ছাড়া আর কিছু উৎপন্ন হয় নি। বর্তমান বিশ্বের মৃত্যুকাতর প্রজন্মের কাছে তিনি মূর্তিমান বিভীষিকা, শিল্পের অপরাজেয় দানব এবং এক বিনষ্ট দূষিত জীবনপরাক্রমী। কিন্তু এই মাটির ওপর প্রত্যেক ব্যক্তির বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয়তা আবিষ্কার

করলেন যে-মানুষ, সেই ভিনসেন্টের নব্বই শতাংশ সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে যাব আমরা, তা তো হয় না। পূর্ণ এক শতাব্দী ধরে ধারাবাহিক প্রচারাভিযানে ভিনসেন্ট ভ্যান গঘের প্রতি সমহিম ঘৃণা প্রকাশ করা হয়ে আসছে। মার্কিন সাংবাদিক কেনেথ উয়িস্কির প্রতিবেদনের কল্যাণে ("গঘ অ্যাসাইনমেন্ট") আমরা জানতে পেরেছি, পাগলাগারদে ভিনসেন্ট যে ঘরে থাকতেন সে-ঘর জনসাধারণের জন্য নিষিদ্ধ, গারদের প্রহরী একটি কুকুরের নাম "ভিনসেন্ট"।...বীক্ষণ-অক্ষমে ভবে যাচ্ছে যেন সারা পৃথিবী। শ্রমে চিন্তায় অধ্যয়নে অধ্যাপনে অক্লান্ত ভিনসেন্ট তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমে আমাদের কী দেখাতে চাইছেন? তাঁর পত্রাবলীর মধ্যে আশা করা যায় উত্তর পাওয়া যাবে।

•

দেবীপ্রসাদ বসু অনূদিত/সংকলিত/সম্পাদিত *প্রিয়তম থিও, তোমার ভিনসেন্ট* (প্রকাশক: দেবীপ্রসাদ বসু, জুলাই ১৯৯৩, পৃ. ৯৬)-এ তেইশটি চিঠি সংকলিত হয়েছে। প্রথম খণ্ডের পত্রগুলির 'একটি একটি নামকরণের উদ্দেশ্য, প্রথমত আমার ব্যক্তিগত অনুভূতিকে সামান্য প্রশ্রয় দান, এবং দ্বিতীয়ত, পাঠান্তে বিষয় উল্লেখের প্রয়োজনে পাঠকদের সুবিধা হতে পারে, এমন ভাবনা', দ্বিতীয় খণ্ডের সংকলিত পত্রগুলিরও শিরোনাম দেওয়া হয়েছে। এই খণ্ডের ভূমিকায় দেবীপ্রসাদ লিখেছেন:

> প্রথম খণ্ডে আমরা ভিনসেন্ট ভ্যান গঘ-এর যে প্রাজ্ঞতা, প্রেম ও দার্শনিকতা লক্ষ্য করেছিলাম, তা এই দ্বিতীয় খণ্ডে চিত্রশিল্পের পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনায় পৌঁছে গেছে। শুধুমাত্র চিত্রশিল্প কেন, সাহিত্য, ধর্ম, রাজনীতি ও ব্যক্তিগত জীবনযাপনের খুঁটিনাটি প্রচারণেও গঘ সমরূপ পারদর্শী ও বিশিষ্ট। এখানে গঘ পরিহাসপ্রিয়, সমবেদনাময় ও তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ অভিলাষী যেন বা এক ঝাঁঝাল তামাকের স্বাদের মত প্রচণ্ড অনুশাসক, রঙবনে প্রকাণ্ড মাতাল। এখানে তাঁর লেখার মধ্যে যেমন পেয়েছি সংযত আবেগ, তেমনই চমকিত হয়েছি তাঁর অনুচ্ছেদের পর অনুচ্ছেদ টলস্টয়ী অনুপুঙ্খের একঘেয়েমি বিচরণে। বাক্যগঠন খুবই সরল অথচ তা কখনো কখনো শাস্ত্রীয় সংগীত, পাশ্চাত্য অথবা প্রাচ্য যাই বলি না কেন।

'আজকাল' সংবাদপত্রের একটি প্রকাশনা 'সকাল'-এর ২৭মে ১৯৯৪ সংখ্যায় একটি প্রতিবেদন মুদ্রিত হয়: 'ভ্যান গঘের আত্মপ্রতিকৃতির প্রদর্শনী জুনে'। এই সূত্রে তাঁর একটি পত্রাংশের অনুবাদ যুক্ত করা হয়।

> তোমার নিজের দেশ সম্পর্কে হয়তো তুমি কখনও ভাবনি। যা তোমার চারপাশে ব্যাপ্ত সেটাই তোমার দেশ। যা তোমাকে লালন পালন করেছে, যাকে তুমি ভালবেসেছ, ঐ যে প্রান্তর, ঐ যে ঘরবাড়ি, ঐ যে গাছপালা, ঐ সব যুবতীরা যারা হাসতে-হাসতে চলে যাচ্ছে —ঐ সব চারপাশ দিয়ে তৈরি যে প্রিয় জিনিসটি, সেটাই তোমার দেশ। তোমাকে রক্ষা করার জন্য রয়েছে আইনকানুন, তোমার শ্রমের বিনিময়ে রয়েছে খাবার, তোমাকে মুখর করেছে ভাষা, মানুষের কাছ থেকে তুমি পাচ্ছ সুখ ও দুঃখ, সেই যে প্রতিবেশ যার মাঝে তুমি বেঁচে আছ—সেটাই তোমার দেশ! যে ছোট্ট ঘরে তোমার মায়ের সঙ্গসুখ পেতে, যে মায়ের স্মৃতিভার তুমি কাঁধে তুলে নিয়েছে, যে মাটিতে তোমার মা শুয়ে আছেন—সেটাই

তোমার দেশ! তুমি তো তাকেই দেখছ, তারই বাতাস তোমার নিঃশ্বাসে! এমন একটা ছবি আঁক তো মনে মনে, যার মাঝে অন্তর্লীন হয়ে আছে তোমার দায়বদ্ধতা, তোমার অধিকার, কত ভালবাসা, কত আকাঙ্ক্ষা, কত স্মৃতি আর কৃতজ্ঞতা—এ সবের সমাবেশে যে ছবি, তার একটাই নাম—সেটা তোমার দেশ।

তিন

ভ্যান গঘের পূর্ণাঙ্গ জীবনী সম্ভবত কোথাও আলোচিত হয়নি। নানাজন তাঁদের রচনায় তাঁর জীবন সম্পর্কে আলো ফেলেছেন। প্রকাশিত সেই সব রচনা থেকে অংশবিশেষ এখানে সংকলিত হল (কালানুক্রম যদিও রক্ষিত হয়নি)।

...এবার বলব আরেকজন পোস্ট ইম্প্রেশনিস্টের কথা যিনি সেজানের থেকে বয়সে অনেক ছোট। তিনি ভ্যাঁস ভান গখ। হল্যাণ্ডে ১৮৫৩ সালে জন্ম। মারা যান ১৮৯০ সালে। মাত্র ৩৭ বছর বেঁচেছিলেন। জীবন আরম্ভ করেন এক ছবির দোকানে। কেউ ছবি কিনতে এসে যদি বাজে ছবি কিনতে চাইত, এমন লম্বা ধমক দিতেন যে লোকে পালাত, দোকানের বদনাম হত। দোকান ছাড়তে হল। কিছুদিন স্কুল মাস্টারি করলেন, কিন্তু এত বদমেজাজি লোক মাস্টারি করবেন কেমন করে? সুতরাং সে চাকরিও গেল। তারপর ঠিক করবেন পাদ্রী হবেন। তাও হল না, কারণ পাদ্রীর কলেজে ভর্তি হয়ে কিছু দিন পর আর ভালো লাগল না। শেষে মিশনারি হয়ে বেলজিয়মে খনির মজুরদের মধ্যে চলে গেলেন। সেখানে মজুরদের অবস্থা দেখে এত কষ্ট হল যে যা সামান্য টাকাকড়ি ছিল, সব বিলিয়ে দিয়ে নিজে উপোস করতে লাগলেন। এই সময়ে ছবি আঁকা আরম্ভ করলেন, তাঁদের ছবি যাঁদের তিনি টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করতেন।...

ইম্প্রেশনিস্টরা ছবি আঁকতেন রঙের ফুটকি আর আঁচড় দিয়ে। ভান গখ আঁকলেন আঁকাবাঁকা লম্বা লম্বা সুতোর মত রঙের রেখা দিয়ে। তাঁর এক বন্ধু একবার দুঃখ করে বলেন, 'ভান গখ এমন দৈত্যে ভর করার মত হয়ে আঁকেন, যে দেখলে ভয় করে, আতঙ্ক হয়।' ভান গখের ছবি দেখলে বোঝা যায় কি ভয়ানক একাগ্রতার সঙ্গে তিনি আঁকতেন।

ভান গখের সমস্ত ছবি যেন সূর্যের আলোয় ভরা। চিত্রকলার ইতিহাসে এত সূর্যের আলো কখনও দেখা যায়নি। সমস্ত কিছুই যেন সূর্যের আলোয় ঝকমক করছে।...

ভান গখের ছবি সময়ে সময়ে মনে হয় যেন রঙ দিয়ে আঁকা নয়, তাল তাল রঙ দিয়ে মডল্ করা। চাপ চাপ রঙ অনেকখানি জায়গা জুড়ে লাগানো, সেগুলি সমান, মসৃণ করে লাগানোর জন্যে কোনো চেষ্টাই যেন নেই। ক্যানভাসে রঙ পড়ে আছে, উঁচু-নীচু, পাহাড়ের কর্কশ পায়ের মত, তার শত শত ছোট ছোট গা থেকে যেন আলো ঠিকরে পড়ছে, তার সঙ্গে ছবির গায়েই ছোট ছোট ছায়াও পড়ছে।

অশোক মিত্র, 'পশ্চিম ইওরোপের চিত্রকলা', পৃ. ১২৭-১২৯

*

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের শীতে সেজান যখন তাঁর জন্মস্থান এক্‌সে নবশৈলীতে ভূচিত্র ও স্টিল লাইফ চিত্রণের সাধানায় মগ্ন তখন দক্ষিণ ফ্রান্সের উজ্জ্বল আলো ও রঙের সন্ধানে ভান

গখ (১৮৫৩-১৮৯০ খৃঃ) নামে এক তরুণ ডাচ শিল্পী সেখানে এলেন। ইউরোপীয় চিত্রশিল্পের সমগ্র কাহিনীতে ভান গখের মত আর কারো নামোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই হৃদয়ে যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদ জাগে না। হর্ষ তাঁর সৃষ্টির আশ্চর্য মহত্ত্বে, সৌন্দর্যে, ইন্দ্রিয় ঘনত্বে, সর্বোপরি মৃত্যুর স্বল্পকালের মধ্যেই তাঁর দিগজয়ী খ্যাতিতে। বিষাদ শিল্পীর সংক্ষিপ্ত জীবনে তীব্র যুগ যন্ত্রণার নিদারুণ প্রকাশ ব্যাকুলতায় এবং তদানীন্তন সমাজের মূঢ় অবহেলায়।

... ...

ভান গখ রাফাইলের চেয়েও কম বয়সে মারা যান। তিনি কোনো প্রতিষ্ঠানে কিংবা প্রতিষ্ঠিত শিল্পীর কাছে শিল্প শিক্ষা করেন নি। তাঁর শিল্প জীবনের শুরু থেকে শেষ মাত্র দশ বছরে। তার মধ্যে মনোবিকার ও নানা বিপত্তিতে ব্যাহত হয়ে মোদ্দা শেষ তিন বছরে তিনি যে-সব ছবি আঁকেন তার জন্যেই শিল্পের ইতিহাসে তাঁর স্থান অমর। আজ তাঁর আঁকা সূর্যমুখী ফুল, বন্ধুর ভূচিত্র, তাঁর নিরাভরণ শয্যাকক্ষ যে ভাবে মুদ্রিত হয়ে সাধারণ মানুষের ঘরে ঘরে সমাদৃত হচ্ছে তাতে তাঁর জনপ্রিয়তার আভাস পাওয়া যায়। ভান গখ ঠিক তাই চেয়েছিলেন। শুধু ধনী ক্রেতা নয়, সাধারণ মানুষ তাঁর শিল্পকে ভালোবাসুক, এই ছিল তাঁর একান্ত বাসনা।

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, 'পাশ্চাত্য চিত্রশিল্পের কাহিনী', পৃ. ১৪৪, ১৪৬

*

তাঁকে আমরা জানি ঝড়ের পাখি হিসেবে। জানি তিনি হলেন সেই রকম এক হতভাগ্য মানুষ পাটিগণিতের নিয়মে দুই যুক্ত দুই-এর যোগফলে শৃঙ্খলাময় চার-এর পরিবর্তে জীবন যাকে উপহার দিয়েছে বিধ্বস্ত ডানা-ঝাপটানোর সাত-পাঁচ। সভ্যতার পক্ষে অনুপযুক্ত, সমাজের পক্ষে অ-নিরাপদ, বেশ্যার পক্ষেও ভালোবাসার অযোগ্য, জীবনযাপনে যাযাবর, অনিয়মে আগ্রহী, প্রথায় বীতশ্রদ্ধ, আপাত-কুশ্রীতার ভিতরে সত্য এবং সৌন্দর্য সন্ধানী, সারল্যে শিশু, আবেগে যুবক, মমতাময়ী জননী, ক্রোধে দস্যু প্রেমে ভিক্ষুক, সংযমে সন্ন্যাসী, কীটের মতো জীবন, কবির মতো কল্পনা, এবং সম্রাটের মতো সৃষ্টি, বহু বৈপরীত্যের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা এই রকম একটি মানুষের নাম যে ভ্যান গক, তাও অজানা নয় আমাদের। রেমব্রান্টের সামনে দাঁড়িয়ে যিনি বলতে পারেন, যদি এক পক্ষ ধরে এই ছবির সামনে বসে থাকার সুযোগ পাই তো জীবন থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারি দশটা বছর আর এক টুকরো শুকনো রুটি খেয়েই কাটিয়ে দিতে পারি দিনগুলো, চিত্রকলার সঙ্গে তাঁর প্রণয়ের অতলতার সংবাদ তখন আর অজানা থাকার কথাও নয় কোনোখানে। এমন কি প্রণয়ের সে-অতলতার খানিকটা পরিমাপেও পেয়ে যাই হাতে-নাতে, যখন দেখি পকেটে কোনোভাবে কিছু টাকা এলে মডেলের পিছনে সে-টাকা খরচ করে নিয়ত সর্বস্বান্তের জীবনযাপনই হয়ে উঠেছে তাঁর নিয়তি। আবার মডেলের পিছনে সর্বস্ব ফেলে দেওয়ার এই অভ্যাসকে অপব্যয়িতা হিসেবে অভিযুক্ত করতে গিয়েও থমকে যেতে হয় যখন কানে আসে ঝড়-ঝঞ্ঝার অমানবিক কোলাহলকে ছাপিয়ে তাঁর পরিশুদ্ধ উচ্চারণ—আমি আঁকতে চাই মানবতা, মানবতা, মানবতা।

পূর্ণেন্দু পত্রী, 'কালি কলম মন/ভিন্ন ভ্যান গক' পৃ. ২৩-২৪

ভ্যান গঘের ছবি দেখে এখনকার আর্টিস্টরা ভাবে ওই বুঝি একটা স্টাইল। ও স্টাইল নয়। থুপো থুপো করে রঙ দেওয়া সে তো অতি সহজ। ও হচ্ছে ভাবোন্মাদনার কথা, ভাবোন্মাদনা না থাকলে অমন রঙ বের হয় না। এই কথাটাই বুঝল না এরা।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর: রানী চন্দ, 'শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ' পৃ. ১৪৭

জীবন তাকে অভিভূত করেছিল।

চার পাশে চোখ মেললে দেখতে পেতো লক্ষ লক্ষ জীবনের হাতছানি; চোখ বুজে নিজের অন্তরে দৃষ্টি সমাহিত করে দেখতে পেতো অগুন্তি জীবনের প্রতিচ্ছবি। এই জীবনের জন্য একটা শাশ্বত পিপাসা তার চিত্তে একটা অনির্বাণ জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছিল। সেই জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে সে খাঁটি সোনা হয়ে উঠেছিল। তার মধ্যে শিল্পসৃষ্টির যে প্রতিভা প্রচ্ছন্ন ছিল তাকে অবলম্বন করে তার পরম সেই জীবন-তৃষা প্রচণ্ড আবেগে চোখ মেলেছিল।

তার নাম ভিনসেন্ট ভ্যান গোঘ্।

... ...

ভ্যান গোঘ মাত্র সাঁইত্রিশ বৎসর জীবিত ছিলেন। জীবনের মাত্র দশটি বৎসর বাকি থাকতে তিনি ছবি আঁকা শুরু করেন। এই দশটি বৎসরই তাঁর শিল্পীজীবনের আরম্ভ ও শেষ। এই অত্যল্প জীবনের মধ্যেই তিনি দুই হাজার পেন্টিং ও ড্রইং করেছিলেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ ছবিগুলি আঁকা হয়েছিল জীবনের শেষ চারি বৎসরের মধ্যে।

আজ তাঁর ছবিগুলি পৃথিবীর সর্বত্র সমাদৃত। তাঁর ছবিতে বিশ্বমানবের দুঃখবেদনা রূপ পেয়েছে বলে, তার মধ্যে সর্বজনীন মানবাত্মা বিকশিত হয়ে উঠেছে বলে সর্বদেশের শিল্পরসিকদের কাছে সে-সব ছবি অকুণ্ঠ বন্দনা লাভ করেছে। কিন্তু তাঁর এই আন্তর্জাতিক খ্যাতির কণামাত্রও তিনি দেখে যেতে পারেন নি। তিনি নিজের নিভৃত লোকের উচ্ছলিত আনন্দে মশগুল হয়েই ছবির পর ছবি এঁকে যেতেন। জীবনের যে অনন্ত নগ্ন মূর্তি তাঁর অন্তরের তটে আজীবন ঢেউয়ের মতো মাথা কুটে মরছে, প্রচণ্ড আবেগে সেগুলি তাঁর তুলি চালনার মধ্যে বেরিয়ে আসতে লাগল। তাই খ্যাতির প্রতি, নামের প্রতি, অর্থের প্রতি উদাসীন থেকে তিনি অধীর আনন্দে আচড়ে আচড়ে জীবন সৃষ্টি করে চলতেন। সে সব কারো ভালো লাগল কিনা সেদিকে ফিরেও তাকাতেন না। আর সত্যি সত্যি, তখন সে-সব ছবি কারো ভালো লাগে নি। কারণ এর ভিতরকার নবজীবনের সূচনা তখন তারা আভাসেও বুঝতে পারেনি। তাঁর দুই হাজার ছবির মধ্যে জীবদ্দশায় মাত্র একখানা ছবি বিক্রি হয়েছিল। তাও, তাঁর এক বন্ধু নিতান্ত কৌতূহলের বসে সেখানাকে পয়সা দিয়ে কিনে নিয়েছিলেন। সাফল্য এসেছিল তাঁর মৃত্যুর অনেক পরে। আজ তাঁর বড়ো বড়ো ক্যানভাসগুলোর এক একটির দাম আমাদের দেশের মুদ্রায় পৌণে দুই লক্ষ থেকে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা। সর্বসাকুল্যে তাঁর ছবিগুলির আনুমানিক মূল্য হবে ভারতীয় মুদ্রায় সতেরো কোটি থেকে পঁচিশ কোটি টাকার মধ্যে।

[অস্বাক্ষরিত], 'ভিনসেন্ট ভ্যান গোঘ্', দেশ ২৮শে ফাল্গুন ১৩৫৫, পৃ. ২৪৭-২৪৮

*

অপেক্ষাকৃত অভিনবদিগের মধ্যে দেখলাম ভ্যান গঘের (Van Gogh) প্রশংসায় আধুনিক



ভিনসেন্টের মূর্তির সামনে ভাস্করশিল্পী অসিপ জাডকিন

নরনারী শতমুখ। ভ্যান গঘ্ উত্তর ব্রাবর্ন্টে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কিছুদিন ইংলণ্ডে শিক্ষক ছিলেন। পরে দেশে ফেরেন। বহু কষ্ট ও বিপদের মাঝে তিনি শিল্প-সাধনার মহান উচ্চাশা বর্জ্জন করেন নাই। তাঁর বিদ্রোহ ছিল ক্ল্যাশিকাল চিত্রের বিরুদ্ধে। ১৮৮২ খৃঃ অব্দে তিনি কলা-বিদ্যায় মনোনিবেশ করেন। বাইবেল, রাজারাণী, ডিউক-ডাচেস, সুদৃশ উপবন ও সজ্জিত প্রাসাদ শিল্পশোভার সার, এই সংস্কারের মূলে কুঠরাঘাত না করলে, শিল্পের শাপ ও পাশ মুক্তি অসম্ভব। উচ্চ মধ্যশ্রেণীর লোকরাই বা চিত্রের আদর্শ হবে কেন? অর্দ্ধেক আলো অর্দ্ধেক ছায়া; কালো পটভূমি হ'তে সুসজ্জিত মানুষের শান্ত মুখ ভেসে ওঠায় তো দরিদ্রের ভাঙ্গা মন, হাড়-ভাঙ্গা খাটুনি এবং দৈনিকজীবনের কুরুক্ষেত্রের কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না। তাই তিনি দিনের পর দিন কৃষি-ক্ষেত্রের ধারে বসে কৃষক নারীর পরিশ্রম-ভার-নত দেহের রূপ অধ্যয়ন করতেন, কারখানা হ'তে ক্লিষ্ট, বাকা, মোটা বস্ত্রের সাজে সজ্জিত শ্রমিকের দেহের চিত্রে মনের ভাব ফোটাবার উপায় ভাবতেন। তিনি গতি দেখতেন জলে, স্থলে, জীবে এবং উদ্ভিদে। তাঁর চিত্র মতি ও গতির ভাব ফুটিয়েছে নিঃসন্দেহে।

আমরা যখন আমষ্টারডামে, তখন রেক চিত্র-সংগ্রহ-শালায় ভ্যান গঘের চিত্র-প্রদর্শনী হচ্ছিল। বহু প্রাচীর পত্র সে সমাচার সরবরাহ করছিল। বিদেশীকে প্রকৃত আনন্দের সন্ধান দেবার মানসে বহু নরনারী সে প্রদর্শনীর উল্লেখ করলেন। তাদের দেশ ছেড়ে যাবার পূর্বে যেন ভ্যান গঘের প্রদর্শনী দেখে যাই, এ-অনুরোধ বহু মুখে শুনলাম। একজন বললেন —শিল্পী বহুদিন পাগলা-গারদে ছিলেন কিন্তু তার সকল কাজে অন্তরের বোধ ফোটাবার ক্ষমতা ছিল অসীম।

পুত্রবধূ চিত্রিতা ভ্যান গঘের গুণ-মুগ্ধ। সে মোহের কারণ তাঁর রূপসৃষ্টি না বিচিত্র জীবন-কাহিনী? অবশ্য বহু পরিপ্রশ্নের দ্বারা তাব মনোভাব বিশ্লেষণ করতে পারলাম না। ইম্প্রেসনিজম চায় মনের পটে চিত্রের সাহায্যে একটা প্রচ্ছন্ন ভাব ফোটাতে— সংবেদনের ভাবের প্রতি এ প্রথার লক্ষ্য অধিক। ভ্যান গঘের বহু চিত্র দেখলাম— খুঁটিনাটি হাত পা পোষাক পরিচ্ছদের স্পষ্ট রেখার বালাই নাই, অথচ ছবি দেখলে বোঝা যায় চিত্রের গতিশীল আখ্যান বস্তু। কতগুলি ছবি শ্রমিকের কষ্ট জীবনের। একদল বেদনা-ক্লিষ্ট শ্রমিক মোটা জামা চাপা দিয়ে কারখানা হতে বাহিরে আসছে। সত্যই গতি আছে, ভারসাম্য আছে, সহানুভূতির ভাব জাগাবার রেখা-সম্পদ প্রচুর।

ইমপ্রেসনিজম, কিউবিজম প্রভৃতি নবীন শিল্প ধারা। চিরদিন মানবজাতি প্রস্তুতি ও জীবদেহের সৌন্দর্য্যকে স্মরণীয় করবার জন্য লালায়িত। আমার মনে হয় এই সংস্কার শিল্পের প্রেরণা। আদিম নর ও শিশু ছবি আকে। কিন্তু সাধনা অল্প তাই রূপ-সৃষ্টি প্রাণবন্ত নয়। এক কথায় কোনো শিল্প-প্রবাহের সমালোচনা অবিধেয়। শিল্পের প্রথা ভাষার মত। কিন্তু সত্য-গোপনও ততোধিক অন্যায়। সুতরাং যখন বললাম— হ্যাঁ মা তা বেশ। এ-ধরণের ছবির মধ্যে অবশ্য ভ্যান গঘের সাফল্য পর্য্যাপ্ত। কিন্তু আমরা সে কালের লোক, আমাদের র‍্যাফেল, মুরিল্লো, বারনিনি বা অজন্তা যেমন ভাল লাগে, এ শ্রেণীর চিত্র বুড়ো হৃদয়কে তেমন সুখ দিতে পারে না। শিল্পী একাধারে দার্শনিক, কবি এবং চিত্রকর। এ নবীন ব্যাপারে তুলির চেয়ে ভাব প্রবণতার প্রকোপ অধিক তাই সাফল্যের দুরাশা বহুক্ষেত্রে নিরাশার জনক।

মা লক্ষ্মী তুষ্ট হ'লেন না। বললেন—বাবা এমনভাবে গতি ও ভাব ফোটান অত্যন্ত দক্ষতার প্রয়োজন। নাইবা হ'ল এরা পরিশ্রমী।

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত, 'ওলন্দাজের দেশে', ভারতবর্ষ, অগ্রহায়ণ ১৩৫৮, পৃ. ৪৮৬-৮৭

*

ভ্যান গখ্ এমন এক শিল্পী যিনি জীবিতাবস্থায় ব্যবহারিক জীবনের শান্তি ও সম্মানের কোনো স্পর্শ পাননি, যাঁর জীবনে চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যে এক বিরাট ব্যবধান, যাঁর জীবন-পিপাসা কোনো দিনই তৃপ্ত হয়নি, যাঁর সমগ্র শিল্প-জীবনই আবেগ, কামনা ও উদ্দামতার এক বিচিত্র কাহিনী। অপার জীবন-তৃষ্ণাকে যেন এক প্রবল চেতনা ও দুর্জয় বাসনা সম্পৃক্ত করেই তাঁর শিল্পসৃষ্টি। তুলির আঁচড়ে ভ্যান গখ্ তাঁর জীবনতৃষ্ণাকে রূপ দিতে চেয়েছিলেন। অঙ্কনের মধ্য দিয়ে আনন্দের সন্ধান পেলেও সাফল্য তিনি পাননি—অর্থাৎ নিজের একটি ছবিকেও তিনি বিক্রীত দেখে যাননি, বা সামান্যতম খ্যাতি-স্বীকৃতি শিল্পীমহলে বা রসিকসমাজে পাননি। প্রেম ছিল তাঁর জীবনে প্রয়োজন, অথচ প্রার্থিত নারীর কাছ থেকে এসেছে শুধু প্রত্যাখ্যান। গতানুগতিক জগতের কাছে যাঁর জীবনের চরম মূল্য আত্মহত্যা করে দিতে হয়, সেই শিল্পীকে ভাবীকাল জগৎবরেণ্য করে নিয়েছে—এমন আশ্চর্য শিল্পীজীবনের তুলনা ইতিহাসে বিরল। ব্যক্তিগত জীবনের ব্যর্থতা ও তীব্রতা, বেদনা ও সাধানাকে ভ্যান গখ্ তুলে ধরেছেন তাঁর ক্যানভাসে—পরিচিতের প্রতিকৃতি দিয়ে, পরিবেশের প্রতিলিপি দিয়ে, প্রকৃতির প্রতিরূপ দিয়ে। তাঁর শিল্পকর্ম তাই এমন জীবনের ঘটনাবলীর ওপর নির্ভরশীল, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ওপর তার অবস্থান। পোস্ট-ইমপ্রেসনিষ্ট শিল্পী হিসাবে ভ্যান গখের যেখানে সাফল্য সেখানে আছে তাঁর অভিজ্ঞতার সঙ্গে দৃষ্টি কোণের, বাস্তবতার সঙ্গে রসসংবেদনার ও শিল্পকর্মের সঙ্গে অদম্য জীবনকামনার সম্মিলন। আর সব কিছুকে ছাপিয়ে তাঁর শিল্পসৃষ্টির মধ্যে যে কামনার রূপায়ণ, শিল্পীর নিজের ভাষায় তা হল: "I want to paint humanity, humanity and again humanity."

অসীম সোম। 'শিল্পীর জীবন পিপাসা' (ভিনসেন্ট ভ্যান গখের জীবনালেখ্য আর্ভিং স্টোন রচিত 'লাস্ট ফর লাইফ' উপন্যাসের চিত্ররূপ প্রসঙ্গে)। 'সুন্দরম্'/পৌষ-জ্যৈষ্ঠ : তেরশো তেষট্টি-চৌষট্টি/পৃ. চারশো ষোল-চারশো-সতেরো

*

ভিনসেন্ট ভ্যান গঘ ও তাঁর ভাই থিও-র কবর অবস্থান করছে পাশাপাশি। মৃত্যুর পরেও তাঁদের ঘটেনি বিচ্ছেদ। পরবর্তীকালে তীর্থক্ষেত্র হিসাবে পরিগণিত ফ্রান্সের অভার্স-সার-অয়েস গ্রামে প্রতিদিন বহু দর্শকের চলে আনাগোনা। এই কবর দুটি থেকে অল্প দূরত্বে সম্প্রতি স্থাপিত হোয়েছে এক বৃহদায়তন মূর্তি। ক্যানভাস ও ইজেল সহ ভ্যানগগ। তাঁর গভীর দৃষ্টি নিবদ্ধ দূরান্তরে, শস্যক্ষেত্রের দিকে। (মৃত্যুর পূর্বে সর্বশেষ ছবির পটভূমি ছিল শস্যক্ষেত্র) মাথায় বিশেষ একধরণের টুপি এবং কোট ও ট্রাউজার পরিহিত ভ্যানগগের সঙ্গে দক্ষিণ ফ্রান্সের কৃষকদের চেহারার সাদৃশ্য সুস্পষ্ট। এই ভাস্কর্য কর্মটির রূপকার হোচ্ছেন অসিপ জাডকিন। জাডকিনের জন্ম হোয়েছিল রাশিয়ায়। তিনি বলেন যে, ভ্যানগগ অঙ্কিত দুটি আত্মপ্রতিকৃতি (সেলফ পোর্ট্রেট) তাঁকে প্রেরণা দেয় ওই মহান শিল্পীর মূর্তি

গড়তে। তাঁর উদ্দাম জীবনের প্রতিটি ঘটনা ভাস্কর্য শিল্পী অসিপ জাডকিনের কাছে মোহনীয় বোলে মনে হয়। মনে হয় আশ্চর্য রোমাঞ্চসঞ্চারী।

সাতাশ বছর বয়সে ভ্যানগগ-এর চিত্রশিল্পের প্রতি মনোনিবেশ এবং সাঁইত্রিশ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ। আঠারশো আশি সাল থেকে আঠারশো নব্বই সাল পর্যন্ত জীবনের শেষ দশ বছরই তাঁর শিল্পসৃষ্টির কাল।

আঁর্লেতে আরো কয়েকমাস থাকার পর ভিনসেন্টকে আঠারশো উননব্বই সালে নিকটস্থ সেন্ট রেমি গ্রামে সেন্ট পল দ্য মশেল মানসিক হাসপাতালে ভর্তি কোরে দেওয়া হোল।

. হাসপাতলের পরিবেশ যখন অসহ্য, ভিনসেন্ট শেষবারের মতো স্থান পরিবর্তনের মনস্থ কোরলেন। থিওর পরামর্শ অনুযায়ী এবারে তিনি গেলেন অভার্স-সার-অয়েস গ্রামে। কিন্তু সেখানেও মানসিক অবসাদ তাঁকে গ্রাস করে। সেইসময় থিও বিবাহ কোরেছেন ও তাঁর একটি ছেলে হয়েছে। সুতরাং ভ্যানগগ হয়তো ভাবতেন যে তিনি থিও-র ওপর একটা অনাবশ্যক ভারস্বরূপ হোয়ে আছেন। অথবা তিনি হয়তো আবার মস্তিষ্ক বিকৃতির ভয় কোরতেন। যাই হোক জীবনের শেষ সত্তর দিনে সত্তরটি রঙিন চিত্র ও বহু রেখাচিত্র এঁকে তারপর আত্মহত্যা সম্পর্কে কৃতসঙ্কল্প হন। আঠারশো নব্বই সালের সাতাশে জুলাই তিনি নিজেকে গুলিবদ্ধ করেন এবং উনত্রিশে জুলাই অভার্সের ছোট পান্থশালায় এই চিরকালের অশান্ত শিল্পী চিরদিনের মতো শান্ত হোয়ে যান। তাঁর ভাই থিও—যাঁর ওপর চিরজীবন নির্ভরশীল ছিলেন তিনি—তিনিও প্রায় ছ মাস পরে, আঠারশো একানব্বই খৃষ্টাব্দে মারা যান।...

অসিপ জাডকিন নির্মিত ভ্যানগগ মূর্তিটি দেখবার পর দর্শকরা তাঁদের সামনে তাঁর বাস্তব উপস্থিতি অনুভব করেন। সেই বিশ্ব-বিখ্যাত শিল্পীর পবিত্র স্মৃতির রোমন্থনে তাঁদের হৃদয়ের উজাড়-করা শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পিত হয় অমর শিল্পীর বেদনাদগ্ধ আত্মার উদ্দেশ্যে।

(অস্বাক্ষরিত), 'ভিনসেন্ট ভ্যানগগ: তাঁর মূর্তি', সুন্দরম, ষষ্ঠ বর্ষ, তেরশো আটষট্টি, দ্বিতীয় সংখ্যা

*

ভ্যান গঘ কিন্তু আমাব মতে প্রথমে মানুষের দুঃখ দুর্দশা নিয়ে ভাবতেন। ছবি আঁকা পেশা হিসাবে গ্রহণ করার আগে বেলজিয়ামের বরিনাজের কয়লাখনিতে মজদুরদের সেবা শুশ্রূষা করতে কিছুদিন কাটিয়েছিলেন। তখন ওঁর মনে দুঃস্থ মানুষদের প্রতি তীব্র একটা সমবেদনা জেগে উঠেছিল। ওঁর ছবির মধ্যে সেই যে মানবিকতা, মানুষের জন্য সহানুভূতি—হিউম্যান কমপ্যাশন —যে ভাবটা আসে যখন মানুষের দুঃখ দুর্দশা দেখে কারও মনে ব্যথা বেদনার আলোড়ন ওঠে। করুণাঘন ভাব তখন মনের ভিতর জাগ্রত হয়। ভ্যান গঘের জীবনের এই যদি আমাদের জানা থাকে, তাহলে আমরা বুঝতে পারি ওঁর ছবিতে অভিব্যক্তিবাদী প্রবণতা কোথা থেকে এল।...ভ্যান গঘ সরাসরি প্রকৃতি থেকে আঁকতে পছন্দ করতেন। মানুষজনকে বসিয়ে প্রতিকৃতি আঁকতেন। সামনে ইজেল রেখে প্রকৃতি বা মানুষজন আঁকলেও, চোখের দেখা দৃশ্য বা পাত্রপাত্রীকে তিনি নিজের মত করে ব্যক্ত করতেন। রঙের দিক থেকে দেখতে পারি ব্যাপারটা। যে ধরনের রঙ উনি ব্যবহার করতেন তার সঙ্গে

প্রকৃতিতে দেখা রঙের কত গরমিল ? ওগুলি ওঁর মনের জগতের রঙ। উনি ব্যবহার করছেন যে ধরনের লাল, যেরকম হলদে, যেমন নীল সেগুলো ওঁর, কী বলে, ভিতরকার। অন্তর্জগতের রঙ সেগুলো।...

ভ্যান গঘ বুদ্ধি দিয়ে ছবি আঁকতেন না। আঁকতেন হৃদয় দিয়ে। যার জন্যে ওঁর বেশিরভাগ ছবিতে আগুনের মধ্যে দাউ দাউ করে ওঁর প্যাশন জ্বলছে। এ খুব কম লোকের ছবিতে দেখা গেছে আজ পর্যন্ত।

পরিতোষ সেন, সাক্ষাৎকার, দেশ, ১৫ ডিসেম্বর ১৯৯০

*

দর্শকেরা এই প্রদর্শনীতে খুঁজে পেয়েছেন এক প্রখরভাবে আত্মসচেতন, বুদ্ধি-দীপ্ত শিল্পীকে যিনি কঠোর অনুশীলনে আয়ত্ত করেছেন বুদ্ধি আর আবেগপুষ্ট এক পরিচ্ছন্ন প্রকরণ। বোধ হয় ইম্প্রেশনিস্ট পরবর্তী প্রজন্মে তিনিই ছিলেন খুব পরিচ্ছন্ন চিন্তার শিল্পী যিনি ছবির বিষয়ের সঙ্গে নির্মিতি, শৈলীর সঙ্গে অভিব্যক্তির সুষম ভারসাম্য খুঁজেছেন। পরস্পর বিরোধী রঙ, চড়া-নরম বর্ণপ্রলেপের প্রকরণ সম্পর্কে নানা জটিল সূক্ষ্ম ভাবনায় নিজেকে নিরন্তর নিযুক্ত রেখেছেন, একই বিষয় নিয়ে বারবার ছবি এঁকেছেন, একটি ছবি বারবার কপি করেছেন নিজের মনোজগৎ আর বাইরের জগৎ মিলিয়ে কল্পদৃষ্টিতে দেখা এক অভাবনীয় বাস্তবতার নির্ভুল চিত্রকল্প রচনার জন্যে। সেই সঙ্গে ছিল এক প্রবল জীবনবোধ, হার্দ্যগুণ, দুঃখ যন্ত্রণার নির্মম কাঠিন্যে অস্থির আত্মপ্রকাশের প্রচণ্ড তাড়না। অবশ্যই তাঁর ছবির জন্ম এক তীব্র উপলব্ধি থেকে কিন্তু সেই উপলব্ধির উষ্ণ মরমী অনাহত এবং প্রত্যক্ষ ব্যঞ্জনার জন্যে তাঁকে তৈরি করতে হয়েছে, সযত্নে অনুশীলিত, বুদ্ধিশাসিত আঙ্গিক ও রঙে রেখায় প্রাণিত এক ইন্দ্রিয়বেদ্য ভাষা যা দর্শকের হৃদয় মন আবিষ্ট করে দৃষ্টিবাহিত এক নিরঙ্কুশ অভিঘাতে।

মনসিজ মজুমদার, 'আর্তি ও বিপন্নতার শিল্পী ভ্যান গখ', দেশ ১৫ ডিসেম্বর ১৯৯০

*

ভ্যান গখ্ হয়তো এই সুযোগের জন্য নিজের ডান কানটিই দিয়ে দিতেন আর আপনি শুধুই এ ব্যাপারে কান দিতে পারেন

ভিনসেন্ট ভ্যান গঘ তাঁর সারাজীবনে একটিমাত্র ছবিই বিক্রী করতে পেরেছিলেন তাঁর সতীর্থ শিল্পীবন্ধুর কাছে। এই ব্যাপারটি নিশ্চয় আপনাকে একটু ভাবাবে—হতে পারে তাঁর ইম্‌প্রেশনিজম্ তাঁর সময়কার লোকেদের ওপর তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি বা খুব সম্ভবত সেই সময়ে তাঁর ইম্‌প্রেশনিজম নিয়ে যথেষ্ট প্রদর্শনীই হয়নি।

দ্য ইনকোডার বিজ্ঞাপন লেখন, আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩ জানুয়ারি ১৯৯১

*

মহান শিল্পী ভিনসেন্ট ভ্যান গঘের মৃত্যুর শতবর্ষ পূর্ণ হল ২৯ জুলাই ১৯৯০। কলকাতার সরকারী চারু-কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ছাত্রছাত্রীরা শিল্পীর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন তাঁদর ক্লাসরুমে ৩০ জুলাই। সেদিন প্রথম বর্ষের ক্লাসঘরটি অপূর্ব চেহারা লাভ করেছিল। দেয়াল জুড়ে ছিল তিরিশ জনের চিত্রকর্ম, শিল্পীর প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন। ঘরের মাঝখানে ভ্যান গঘের আত্মপ্রতিকৃতির প্রতিলিপি। আর ছিল সারা ঘর ছড়িয়ে সেই সূর্যমুখী,

ভিনসেন্টের প্রিয় ফুল, যা তিনি তাঁর তুলিতে অমর করে গেছেন। অনুষ্ঠান উপলক্ষে সমস্ত কলেজের ছাত্রছাত্রী, কর্মচারী থেকে অধ্যাপকবৃন্দের মধ্যে দারুণ সাড়া পড়ে যায়। অধ্যক্ষ ঈশা মহম্মদের তত্ত্বাবধানে কলেজ-প্রাঙ্গণে একটি রাধাচূড়া ফুলের চারা রোপণ করে দিনটিকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হয়।

কলকাতার কড়চা, 'শিল্পী স্মরণে' আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩ অগাস্ট ১৯৯০

*

ভান ঘ'র মুখটা কি লম্বা? খোচা খোচা দাড়ি ভর্তি? উচ্ছন্নে যাওয়া চেহারা? মুখ মনে হয় সাধারণত ধোন না? আমস্টার্ডামের ভান ঘ' মিউজিয়ামে ভান ঘ'র আত্মপ্রতিকৃতির দিকে তাকিয়ে আমার তাই মনে হয়, অজান্তে আমার গালে হাত দিই, দাড়ির খোচা লাগে, নিজের চেহারা মনে হয় হতচ্ছাড়া। ভান ঘ'র মুখটা নিজের মুখ মনে হয় এবং নিজের মুখের মতন আপন মনে হয়। ভান ঘ' এভাবে আমাকে গ্রাস করেন এবং এভাবে আমি ভান ঘ'কে গ্রাস করি: আমাদের মধ্যে কোন দূরত্ব নেই। সত্যি কি নেই? প্রশ্নটা আমাকে ভান ঘ'র আরো কাছে আনে। ভান ঘ' সারাজীবন বাস্তব বুঝতে চেয়েছেন। কিন্তু বাস্তবটা একটা পর্দার মতো তাঁর এবং তাঁর বিচারের মধ্যে কিংবা তাঁর এবং তাঁর ঈশ্বরের মধ্যে কম্পমান। তিনি যখন যা কিছু এঁকেছেন, তাঁর মুখ শুদ্ধ, সবই বাস্তবের দিকে তাঁর যাত্রা, তাঁর পদক্ষেপ। নিজের মুখ আঁকার পর তাঁর মনে হয়েছে একটা ফাঁকা কোথাও আছে। একটা গাছ, এক গোছা সূর্যমুখী ফুল, একটা গির্জা, একটা চেয়ার আঁকার পর তাঁর মনে হয়েছে গাছের সূর্যমুখী ফুলের সঙ্গে, গির্জার সঙ্গে চেয়ারের সঙ্গে তাঁর একটা অনতিক্রম্য দূরত্ব আছে। একপক্ষে দূরত্ব ঘোচাবার ইচ্ছা এবং অন্যপক্ষে দূরত্বের অনিবার্যতা থেকেই তাঁর মধ্যে বাস্তবকে বুঝবার চেষ্টা হয়েছে। যেন বাস্তব হাতের কাছে থেকেও নেই, একটা সংকটে তিনি আবর্তিত, তিনি সচেষ্ট সব সময় বাস্তব উদ্ধার করতে। তাঁর চোখের যন্ত্রণা আমার চোখে গেঁথে যায়। তিনি তাঁর চোখ দিয়ে বিদ্ধ করেছেন একটা চেয়ারকে একটা গাছকে এক জোড়া জুতোকে এবং নিজেকে, তিনি তাঁর চোখ দিয়ে বিদ্ধ করেছেন ঈশ্বরকে। হাতের কাছে থেকেও কিছু থাকে না: সেজন্য তাঁর মুখ অপার্থিব মনে হয়, তাঁর চেয়ার জুতো খাট কম্পমান মনে হয় বাস্তবের কাছে পৌঁছবার চেষ্টা ঈশ্বরের মতো দূরে থেকেই হয়। এই যন্ত্রণা এবং সংশয়ে তাঁর দু'চোখের মধ্যে, সেজন্য তাঁর প্রতিকৃতিতে স্পষ্ট অবিশ্বাস। নিঃসংশয় বলে কিছু নেই। নির্দ্বন্দ্ব বলে কিছু নেই। বিশ্বাস বলে কিছু নেই। যদি এসবই থাকে তাহলে চোখের মধ্যে কম্পন কেন, ঘূর্ণন কেন, স্থির নিশ্চয়তা নেই কেন? ভান ঘ'র প্রতিকৃতি আমার মধ্যে ভয় ধরিয়ে দেয়। তাহলে বাস্তব কি ভয়? ঈশ্বরের হাত থেকে বাস্তব উদ্ধার করতে হবে। সেজন্য বাস্তব হচ্ছে ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের যুগপৎ ঝগড়া এবং লড়াই। চোখের মধ্যে যা দেখি সে হচ্ছে নিয়মিত নির্মাণ : এই নির্মাণের সামনে, ভান ঘ'র আত্মপ্রতিকৃতির সামনে আমার মধ্যেকার সকল দূরত্ব অতিক্রম করতে থাকি। এক লড়াইর জন্য তাঁর মুখ মনে হয় ঘামে ভেজা, তাঁর চোখে আর্তি, আমি বধির হয়ে যাই ভান ঘ'র চিৎকারে। আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচি বাইরে, রোদ এবং কোলাহলের মধ্যে ফিরে এসে।

বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, 'আত্মপ্রতিকৃতি'; মাটি, ৩বর্ষ ২ সংখ্যা (নভেম্বর ১৯৯৪), পৃ. ১৩

ভ্যান গগ্

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল

১৮৭০ সালে প্যারীর গোঁপীল গ্যালারী নামে ছাপা ছবির দোকানের লণ্ডন শাখায়, একজন লোককে salesman হিসাবে কাজ করতে দেখা যেতো। একটী ঢলঢলে প্যান্ট ও ছেঁড়া কোট পরে, মাথায় লালচে চুলগুলিকে একটী লম্বা টুপির মধ্যে ঢেকে নিয়ে লোকটী রোজ ঠিক সময়ে দোকানে যাতায়াত করতো। খোঁচা খোঁচা দাড়ী শুদ্ধ শুকনো মুখের দিকে তাকালে তাকে একজন অস্বাভাবিক প্রকৃতির লোক বলে মনে হোতো। কপালের ঠিক নিচে নামিয়ে আনা টুপীটার অন্ধকার ছায়ার ভিতর দিয়ে তার লাল লাল চোখ দুটি যেন কিসের সন্ধানে চেয়ে থাকতো—দূর হতে বহু দূরের দিকে। এইভাবে কিছুদিন চলে যাবার পর ঐ লোকটীকে আর দোকানে দেখা গেল না। ক্রমে ওখানকার লোকেরা তাকে গেল ভুলে। বিশ বছর পরে আবার তার খবর পাওয়া গেল —তখন তার মৃত্যু হয়েছে। ১৯১০ সালে লণ্ডনের একটী "Post Impressionist" ছবির Exhibitionএ ঐ লোকটীর আঁকা কয়েকটী ছবি সকলকে বিস্মিত ও চমৎকৃত করে দিলো, বিংশ শতাব্দীর সভ্য জগৎ একজন বিরাট শিল্পীকে তার সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানালো। এই কাহিনীটীর নায়ক হোলেন ভ্যানগগ্ স্বয়ং। পৃথিবীতে যে সকল প্রতিভাবান শিল্পীর জীবন এক একটী করুণ ও ব্যর্থতাময় ইতিহাস রচনা করেছে, তাঁদের মধ্যে ভ্যানগগ্ যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে আছেন, একথা বোধ হয় বেশ জোর দিয়েই বলা যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষের দিকে, ফ্রান্সে Impressionistদের প্রভাবে, ইউরোপের পূর্ব্ববর্ত্তী শিল্পকলা যখন ম্লান হয়ে এসেছিলো, তখন পৃথিবীর বহু শ্রেষ্ঠ শিল্পীর জন্মস্থান হল্যাণ্ডে এই বিশিষ্ট শিল্পীর বিচিত্র জীবনের অভ্যুত্থান সুরু হোলো।

জীবনের নানা ঘটনাবলী তাঁর মনে যে বিভিন্ন অনুভূতি জাগিয়ে তুলতো, সেই অনুভূতির সঙ্গে তাল রেখে তাঁর শিল্পও এগিয়ে চলেছিল অদ্ভুত বৈচিত্রময় পথে। সেই কারণে, দৈনন্দিন জীবনের সহিত তাঁর শিল্পীকর জীবনকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা সম্ভবপর ছিল না। তখনকার দিনের ম্যানে, মনে, গঁগ্যা, ডেফ্ জেগাস্, রেণয়াঁ, লোট্রে ইত্যাদি তথাকথিত Impressionist শিল্পীদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে, তাদের ক্যানভাসের উপর রং দেবার পদ্ধতিটী তিনি গ্রহণ করেছিলেন কিছু পরিমাণে—কিন্তু তাঁর দৃষ্টি-ভঙ্গী ছিল সম্পূর্ণ পৃথক। অন্যান্য শিল্পীরা, কোন বস্তু বা প্রাণীর অন্তর বা বাহিরের রূপ তাঁদের মনকে যেভাবে দোলা দিতো, সেইভাবেই অনুপ্রাণিত হয়ে শিল্প-রচনা করতেন; কিন্তু এই অদ্ভুত শিল্পীটীর প্রেরণার সঞ্চয় তাঁর চোখের দৃষ্টি হতে আসতো না, আসতো হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ হতে। দুঃখ, দৈন্য, ব্যর্থতা ইত্যাদি তাঁর মনকে যখন যেভাবে অভিভূত করতো, সেই অনুভূতিকেই কোন অবলম্বনের আশ্রয় করে ছবির উপর ফুটিয়ে তোলবার সাধনাই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র আনন্দ। "Corn-field with Cypresses" "Ravens flying over the corn-field", "Portrait of Dr. Gachet" ইত্যাদি ছবিতে এবং তাঁর কয়েকটী "self Portrai" এ এই প্রকারের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর অশান্ত মন ঝড়ো হাওয়ার গতিতে ছুটে চলে যেতে চাইতো অজানার উদ্দেশ্যে-

—একটু শান্তির আশায়। তাই তাঁর ছবি দেখলে মনে হয়, গাছ, পাহাড়, পর্ব্বত, মেঘ সব যেন তাঁর মনের সঙ্গে তাল রেখে আকাশে কিনারা খুঁজে পাবার জন্য ছুটে যেতে চাইছে। "Dr. Gachet"এর Portraitএর দিকে দেখলে একটী দুর্ব্বল প্রকৃতির জরাজীর্ণ প্রৌঢ়ের কথাই আমাদের মনে ভেসে আসে। জীবনে দুঃখ ও দৈন্যের অনেক ঝড় ঝাপটা যেন তার শরীরের উপর দিয়ে বয়ে গেছে। কিন্তু নীল নীল চোখ দুটির মধ্যে একজন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ লোকের সন্ধান আমরা পাই। জীবনে অনেক ঝড় ঝাপটা বয়ে গেলেও সে বিপদগুলিকে তুচ্ছ করে সামনে এগিয়ে যাবার যে শক্তির প্রয়োজন, তার সঞ্চয় যেন আছে লোকটীর মধ্যে। সত্যিকারের Dr. Gachet'-এর সহিত ছবির Dr. Gachetএর প্রকৃতির কোন মিল না থাকাই সম্ভব —কারণ উক্ত ছবিটীকে আশ্রয় করে ভ্যানগগ্ নিজের প্রকৃতিকেই রূপ দেবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর এই প্রচেষ্টা ছবিটীর মধ্যে চমৎকার ভাবে সফল হয়েছে। এক কথায় বলতে গেলে তাঁর অধিকাংশ ছবি সম্পূর্ণ তাঁর মনেরই প্রতিচ্ছবি এবং ভ্যানগগের ছবির সমালোচনা করতে গেলে এই বিষয়টীই সবচেয়ে আগে চোখে পড়ে।

জীবনে অনেক পাপ বা অন্যায় কাজ করেছেন বলে তাঁর বিশ্বাস ছিল, তাই তাঁর ধর্ম্মভীরু মন প্রায়শ্চিত্তের জন্য আকুল হয়ে থাকতো; যারা দুর্ভাগ্য নিয়ে পৃথিবীতে জন্মেছে, তাদের সান্ত্বনা দেবার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করে দিয়ে তিনি শান্তি খুঁজে পাবার চেষ্টা করেছিলেন। দুঃখ দারিদ্র ও ব্যর্থতায় পরিপূর্ণ মন, মানুষকে সেবা করে তার পরিবর্ত্তে চেয়েছিল একটু সমবেদনা ও সহানুভূতি, কিন্তু তাও সে পায়নি। যে মানুষকে তিনি এতো ভালোবেসেছিলেন, সেই মানুষই তাঁকে ঘৃণা ও অবহেলায় দূরে সরিয়ে দিয়েছিল। জীবনে তিনজন নারীকে তিনি ভালোবেসেছিলেন, কিন্তু তাদের ভালোবাসা তিনি পাননি—পেয়েছিলেন তীব্র ঘৃণা ও প্রত্যাখ্যান। মানুষের এই নিষ্ঠুর অবহেলা মানব সমাজ থেকে তাঁকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল,—তাঁকে সন্দেহী, অস্থিরচেতা, একগুঁয়ে ও শেষে পাগল করে তুলেছিল। এই বিরাট বুভুক্ষুমন নিজেকে প্রকাশ করবার অন্য কোনো পথ খুঁজে না পেয়ে শেষে শিল্পকলার স্মরণ নিলো, মনের নানা বিচিত্র অনুভূতির অবরুদ্ধ স্রোত শিল্প চর্চ্চার মধ্য দিয়ে স্রোতস্বিনীর বেগে দ্রুত প্রবাহিত হয়ে চললো অবাধ গতিতে। জগৎ তাঁকে অশেষ দুঃখ দৈন্য ও নৈরাশ্যে নিষ্পেষিত করে প্রতিদানে তাঁর কাছে যা পেলো তার তুলনা নাই।

জীবনে শিল্পকলার পথ বেছে নেবার পরই তাঁর অভিযান তীব্র গতিতে সুরু হোলো অত্যুৎকৃষ্ট শিল্প সৃষ্টির পথে। দশ বৎসরের ক্ষণকাল স্থায়ী শিল্পিক্-জীবনে তিনি যতো ছবি এঁকেছেন তা সেঁজার (Cezanne) চল্লিশ বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমে আঁকা ছবির চেয়ে সংখ্যায় ঢের বেশী। প্রথমে তিনি গভীর ও গাঢ় রংএ কাজ করতে ভালাবাসতেন, পরে রুবেনস্ ও জাপানী শিল্পীদের প্রভাবে তার রং ধীরে হালকা হয়ে আসে। ভ্যানগগের ছবিতে রংএর মাধুর্য্য শিল্প জগতে অতি উচ্চস্থান অধিকার করে আছে—নানা জ্বলজ্বলে রংএর এতো সুন্দর সুসমাবেশ আর অন্য শিল্পীর ছবিতে ততো দেখা যায় না। প্রকৃতি তার ফুলে, ফলে, পাখীতে, গাছে, মাটিতে, আকাশে নানা রংএর অদ্ভুত সামঞ্জস্যে যে সুন্দর ছন্দের সৃষ্টি করেছে—তাকে সম্পূর্ণভাবে রূপ দেবার ক্ষমতা ভ্যানগগের ছবির মধ্যে দেখা যায়। "Sun-

flowers" "Daubigny's Garden", "Bed-Room at Arles", "House at Arles", "Free", "The draw-bridge", ইত্যাদি ইত্যাদি কয়েকটী ছবি চিত্রজগতে ভ্যানগগের সার্থক দান।

আজীবন দুঃখ দারিদ্রের অবিরাম সংঘাত তাঁর মস্তিক সুস্থভাবে বহন করতে পারেনি, তাই শেষের দিন যতো এগিয়ে আসতে লাগলো—তাঁর মাথাও ততো খারাপ হতে লাগলো। আর্লেতে ভ্যানগগের বাড়ীতে গর্গ্যা কিছুদিন বাস করেছিলন। উভয়ের কোন কারণে মনোমালিন্য হওয়ায় ভ্যানগগ্ তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বির মাথায় কাঁচের গ্লাস ছুঁড়ে মারেন এবং ক্ষুর দিয়ে তাঁকে হত্যা করবার চেষ্টা করেন। গর্গ্যা প্রাণ ভয়ে আর্লে ছেড়ে পালালেন। পাগলামীর এইখানেই শেষ হোলো না —একদিন তিনি নিজের একটী কান কেটে ফেলেন; এইসমস্ত কারণে তাঁকে সেন্ট-রেমী নামে একটী পাগলা গারদে পাঠানো হোলো। সেখানে থাকার সময় তিনি আরও অনেক সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকেন। কয়েক দিন বেশ শান্তিতে কেটে গেল। প্যারীর কোনও পত্রিকায় তাঁর ছবির বিষয়ে সুন্দর সমালোচনা প্রকাশিত হোলো; এবং যা ছিল একান্ত অসম্ভব তাই শেষে সম্ভব হোলো; তাঁর ভাই থিও চিঠিতে লিখে জানালেন যে তাঁর একটী ছবি বিক্রী করা সম্ভব হয়েছে। (থিও ছিলেন ভ্যানগগের জীবনে একমাত্র বন্ধু ও সাথী—অর্থ, সহানুভূতি ও সাহায্য দিয়ে বাহিরের নানা দুঃখ ও দারিদ্রের আঘাত থেকে শিল্পীকে সব সময়ে রক্ষা করার চেষ্টায় ভবিষ্যৎ শিল্পী ও শিল্প-রসিকদের কাছে তিনি শ্রদ্ধার বস্তু হয়ে থাকবেন।) উপদ্রব আবার বাড়তে লাগলো, একদিন টিউব থেকে খানিকটা রং বার করে তিনি খেয়ে ফেললেন। থিও পরামর্শ করে ভ্যানগগকে ডাক্তার গ্যাসের তত্ত্বাবধানে পাঠানো স্থির করলেন। ডাক্তার গ্যাসে, ইমপ্রেসনিস্ট শিল্পীদের বিশিষ্ট বন্ধু ও সমজদার ছিলেন; তিনি ভ্যানগগকে সাদরে অভ্যর্থনা করলেন। ওখানে নূতন উদ্যমে আবার শিল্প-সৃষ্টি সুরু হোলো, প্রকৃতির বিরুদ্ধে তিনি শেষ যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হোলো না, শিল্প জগৎ তাঁর কাছে নূতন রূপে ধরা দিলো, কিন্তু তাতেও তাঁর বুভূক্ষু মন শান্তি পেলো না। শেষে মৃত্যুর পরম ও চরম শান্তিপূর্ণ আশ্রয়ের সন্ধান তাঁকে নিতে হোলো। পাখী শিকারের অজুহাতে একটী রিভলভার ধার করে, ১৮৯০ সালের জুলাই মাসে তিনি আত্মহত্যা করলেন। মৃত্যুর আগে ভ্যানগগ্ বলেছিলেন 'দুঃখের শেষ কখনও হবে না,' কিন্তু এতো দিনে সত্যিই দুঃখের শেষ হোলো। তাঁর সাঁইত্রিশ বৎসরের ক্ষণিক জীবনে যদি মটো হিসাবে কিছু বলা চলে তবে তাঁর নিজের কথাই বলতে হয়—"Dying is hard, but living is harder still".

ললিতা, তৃতীয় বর্ষ/তৃতীয় খণ্ড/ পঞ্চম সংখ্যা

ভ্যান গগের শেষ দিনগুলো

ইকবাল আজিজ

কাটা কানের গভীরে ব্যথা আছে এখনো লুকোনো—
যেনো সব আনন্দের গান না আসে নিকটে।
যেনো ভ্রাতা থিও সজল ছায়ার সাথে মিশে থাকে দূরে!
কাছে কেউ নয়—কাছে কোনো ভালোবাসা নয়
দক্ষিণ ফ্রান্সের রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশের নিচে
শিল্পের শহীদ এক জীবন্মৃত
আপন খেয়ালে শুধু অন্বেষণ করে
জীবনের শেষ তৃষ্ণা শেষ গান কতো দূরে—
কতো দূরে!

কাটা কানের গভীরে ব্যথা আছে এখনো লুকোনো—
প্যারিসের অহংকারী মানুষ
যেনো রুক্ষ পাথরের পাহাড় সুদূর সাগরের পাশে—
সূর্যমুখী কিংবা আত্মপ্রতিকৃতি তাদের হৃদয়ে শুধু প্রলাপের মতো!
ভ্রাতা থিও মাফ কোরো সকল ব্যর্থতা
ভ্রাতা থিও ভুলে যেয়ো জগতের যত কিছু গ্লানি।
গোরস্থানে সাইপ্রেস গাছের সারি ডাকছে আমায়—
এ জীবন একদিন ছিলো আমারও—
আমিও চেয়েছিলাম হতে স্যেন নদীতীরে
একটি সামান্য সূর্যমূখী ফুল।

'পূর্ণতা'/হেমন্ত সংখ্যা ১৪০১/পৃ. ২৪ (অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৯৪)

আমাকে মার্জনা করো ভ্যান গগ্

আর্সেনেই তারকোভস্কি

আমাকে মার্জনা করো ভ্যান গগ্
আমি তোমায় কোনো সাহায্য করতে পারিনি।

আমি তোমার রুক্ষ পথে,
বিছিয়ে দিতে পারিনি বুনো ঘাস-পাতা

আমি তোমার চাষীদের বুটজুতোর ফিতে
আল্গা করে দিতে পারিনি।

সেই দগ্ধ দিনে, তোমায় দিতে পারিনি জল,
নিজেকে বুলেট বিদ্ধ করে হাসপাতালে আশ্রয় নিয়েছি।

তোমার পাক-খাওয়া সাইপ্রেসের শিখা
আমায় দাঁড় করিয়েছে অসীম শূন্যে।

লেবু-রাঙা তার শিখরে মিশেছিল অন্ধকারের নীল
আমি হতাম না 'আমি' কিছুতেই এই রহস্য ছাড়া।

আমি ব্যক্তিগত উদ্ধত স্বর ছুঁড়ে ফেলেছি
কাঁধ থেকে ফেলা অন্যের বোঝার মতো করে।

এ সেই রুক্ষ দেবদূত যার সঙ্গে মিশেছিল
তুলির টান আমার রেখার টানে।

চলো, তোমায় নিয়ে যাই সেই দৃষ্টিপথে,
আকাশে, যেখানে তারাদের মাঝে স্পন্দিত ভ্যান গগ্।

অনুবাদ : কৌশিক গুহ

ভিনসেন্টের অভিযোগ

জাক প্রেভের

পল এলুয়ারকে

আর্লের পাশে ধীরে বয় রোণ
মধ্যাঞ্চলের তীব্র আলোয়
ভাস্ফরস আর স্বপ্নেভরা এক মানুষ
মুখে তার নিরন্তর বিলাপ
সন্তানের জন্মদাত্রী নারী যেন
বস্ত্র যার হয় রক্তাক্ত
আর আর্ত চীৎকারে ছোটে
সেই সূর্যক্রীত মানুষ

পীতবর্ণ কর্কশরব মার্তণ্ড
রোণের তীরেই এক গণিকালয়ে
সেই মানুষের আবির্ভাব প্রাজ্ঞনরপতির মতো
সঙ্গে এক উদ্ভট উপহার
সুনীল কোমল দৃষ্টি তার
যথার্থ সে-দৃষ্টি স্বচ্ছ ও উন্মত্তের
সর্বস্ব তুলে দেয় যারা জীবনের হাতে
যারা নয় ঈর্ষাজর্জরিত
অসহায় শিশুর শয্যায় রাখে
বস্ত্রাচ্ছাদিত কর্ণ তার
বিমূঢ় ক্রন্দনরতা রমণী
কোন সে-অমঙ্গল চিন্তায় চেয়ে থাকে
সাহস পায় না ছুঁতে
ভয়ানক আর মধুর সেই শঙ্খ পানে
প্রেমের অনুযোগ যেখানে মরে মাথা কুটে
আর শিল্পের অমানব কণ্ঠস্বর
মিশে গিয়ে সমুদ্রের মর্মরে
মরণের পানে চলে পাথরে বাঁধানো মেঝেতে
শয়নকক্ষে লাল পাল্‌কের লেপ
আচম্বিতে ফেটেপড়া এই লাল
তার সাথে মিশে লালে লাল
স্বপ্ন দেখে আরও লাল
অর্ধমৃত ভিনসেন্টের
যন্ত্রণার ও প্রেমের প্রতিমূর্তি
প্রাজ্ঞ সেই ভিনসেন্টের
উলঙ্গ শিশু বয়সের বন্ধনহীন
চেয়ে থাকে হতভাগ্য ভিনসেন্টের দিকে
যথার্থ ঝঞ্ঝাহত ভিনসেন্ট
আছড়িয়ে পড়ে টালিবসানো মেঝেতে
সুন্দরতর তার ছবির মাঝখানে
ঝড় হয় শান্ত উদাসীন
তার সমান উবুড় হয়ে
স্বপ্নের সেই বনানী মহান
ভিনসেন্টের আত্মায় উদ্ভাসিত সেই ঝড়
আর প্রচণ্ড ঝড়ের স্বপ্নে বিভোর নিদ্রামগ্ন ভিনসেন্ট

আর সেই পতিতালয়ের মাথায় জ্বলে সূর্য
নামহীন মরুভূর বুকে আনন্দে অধীর ঝড়ের মতো
আর্লের মাথায় জ্বলে সূর্য
গর্জনরত, চক্রাকারে আবর্তিত।

অনুবাদ : রণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অকৃতজ্ঞ সূর্যমুখীর ব্যালাড

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

জীবদ্দশায় একটিমাত্র ছবি
কোনোক্রমে বিকিয়েছিল তাঁর
ভাইয়ের দেওয়া ঈষৎ মাসোহারায়
সেই শিল্পীর স্বগত সংসার

একদিনের বেশিও চলত না;
আত্মহত্যা করার আগে তাই
সূর্যমুখীর সাতটি ছবি এঁকে
তাদের মধ্যে বাঁচবার যন্ত্রণা
জীবনমুখী আনন্দে তর্জমা
করেন তিনি।
সদ্য সেদিন কি না
সাত মিলিয়ার্ড ইয়েন দিয়ে জাপান
সেই সিরিজের একটি নিল কিনে।

শিল্পীর নাম ভিনসেন্ট ভ্যান গঘ্,
এই কথাটা আজকে সবার জানা,
জীবদ্দশায় এখনো শিল্পীকে
তা সত্ত্বেও বাঁচতে দেওয়া মানা।

ভ্যান গখ্, ভাই

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

কাঁধের ওপর সাজ-সরঞ্জাম
দুই চোখে জিঘাংসা
গ্রাম থেকে গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ভ্যান গখ।
হরিণ না, হরিয়াল পাখি না, খুঁজছেন
ঝকঝকে আকাশের নীচে জলজ্যান্ত প্রকৃতি।

ধরা দিচ্ছে না সে কিছুতেই
বুরুশ ভেঙে যাচ্ছে, ছিঁড়ে যাচ্ছে ক্যানভাস
ইউরোপের ময়লা আকাশ তাঁকে জিভ ভ্যাঙাচ্ছে।
রাগে দুঃখে হতাশায়
ক্লান্ত ভ্যান গখ্
নিজের বাঁ কানটি কেটে ফেললেন এক উৎসবের রাতে,
এই বছর সেই কাটা কানের শতবর্ষ।

ধানসিমলা থেকে কুঞ্জর সামন্ত
বেলিয়াতোড় থেকে শর্মিলা গায়েন
চিঠি লিখছে, 'ভ্যান গখ ভাই;
চৈত্রমাসে এসো আমাদের দেশে;
গনগনে আকাশ উপুড় করে দেব
আর শাল-পলাশের হুলুস্থুলু
এত রং ধরাতে পারলে তুমি খুশি হবে তো?'

আনন্দমেলা পূজাবার্ষিকী ১৩৯৫

যে-সব গ্রন্থে ভিনসেন্ট ভ্যান গঘ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে

পাশ্চাত্য চিত্রশিল্পের কাহিনী। বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়। কলকাতা, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ। ২৫ বৈশাখ ১৩৭৮; দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৯৭। ভ্যাঁসঁ ভান গখ, পৃ. ১৪৪-১৪৭

দূরের বই। চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা, সাহিত্যলোক। ১৯৮০। শিল্পায়ণ, পৃ. ১৭৫-১৯২

পুনশ্চ পারী। নীরদ মজুমদার। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। ১৯৮৩। ভ্যান গগ্, পৃ. ৫৩-৫৪

আলেখ্য মঞ্জরী। পরিতোষ সেন। কলকাতা, জি.এ.ই. পাবলিশার্স। ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪। ভ্যান গখের চেয়ার, পৃ. ৩৫-৮৬

ছবি কাকে বলে। অশোক মিত্র। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। ১৯৮৪। ভ্যান গখ, পৃ. ২৩০

পশ্চিম ইওরোপের চিত্রকলা। অশোক মিত্র। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। দ্বিতীয় সংস্করণ, জুলাই ১৯৮৮। ভ্যাঁস ভান গখ, পৃ. ১২৭-১২৯

চিত্রকলা। সম্পাদনা: চন্দ্রিমা দাশগুপ্ত, অরবিন্দ ঘোষ। কলকাতা, চারুকলা প্রকাশনী। ১৯৮৯। ভ্যান গঘ ১৪১-১৪২

কালি কলম মন। পূর্ণেন্দু পত্রী। কলকাতা, অন্বেষা। জানুয়ারি ১৯৮৯। ভিন্ন ভ্যান গখ, পৃ. ২৩-২৯

দেশ বিদেশের শিল্পী। নিখিলেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। বাক্‌চর্চা, বর্ধমান ১। ১৯৮৯। ভ্যানগখ, পৃ. ৭৫–৮৩

প্রিয়তম থিও, তোমার ভিনসেন্ট। অনুবাদ/সংকলন/সম্পাদনা: দেবীপ্রসাদ বসু। কলকাতা, রতিকান্ত নস্কর। পৌষ ১৩৯৮।

প্রিয়তম থিও, তোমার ভিনসেন্ট, ২য় খণ্ড। অনুবাদ/সংকলন/সম্পাদনা: দেবীপ্রসাদ বসু। কলকাতা, দেবীপ্রসাদ বসু। জুলাই ১৯৯৩

পশ্চিম দিগন্তে, প্রদোষকালে। বিক্রমন নায়ার। আনন্দ পাবলিশার্স। ১৯৯৪। পৃ. ৬২–৬৩

নিজের মুখের ছবি । সমীর ঘোষ। কলকাতা, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস্ প্রাইভেট লিমিটেড। জানুয়ারি ১৯৯৫। ভিনসেন্ট ভ্যানগঘ, পৃ. ২১-৩৬

আলোচনা, প্রতিবেদন ইত্যাদি

ভ্যানগগ্ / শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল। ললিতা/তৃতীয় বর্ষ/ তৃতীয় খণ্ড/ পঞ্চম সংখ্যা/ পৃ. ১৫-১৬

ভিনসেন্ট ভ্যান গোঘ্ (অস্বাক্ষরিত)/ দেশ, ২৮ ফাল্গুন ১৩৫৫

যন্ত্রণাবিক্ষুব্ধ শিল্পী ভিনসেন্ট ভ্যান গখ। শুদ্ধশীল বসু। দেশ/৩ অগ্রহায়ণ ১৩৭৩/পৃ ২৯২-৯৩; ১০ অগ্রহায়ণ ১৩৭৩/ পৃ. ৩৯৯-৪০১

ভান গক্-এর চিঠি। ভূমিকা ও অনুবাদ: ছবি বসু। বারোমাস, শারদীয় ১৯৭৯

শিল্পের বোধোদয়ে পঞ্চাশ বছরের দেশ। পূর্ণেন্দু পত্রী। দেশ সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যা ১৩৪০-১৩৯০। ১৯৮৩

একশ কোটি টাকার ছবি। মদনগোপাল মুখোপাধ্যায়। দেশ ৩০ জুন ১৯৯০
একটি প্রদর্শনীর পথে। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। দেশ ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৯০
ভ্যান গখ: ব্যক্তি ও শিল্প। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। অমৃতলোক। শারদ সংখ্যা ১৩৯৭
আর্তি ও বিপন্নতার শিল্পী ভ্যান গঘ। মনসিজ মজুমদার। দেশ ১৫ ডিসেম্বর ১৯৯০
ভ্যান গঘের শিল্পধর্মই আমার সাধনা। পরিতোষ সেন (সাক্ষাৎকার)। দেশ ১৫ ডিসেম্বর ১৯৯০
একটি মুখ। হিরণ মিত্র। চাক্ষুষ ৪। সেপ্টেম্বর ১৯৯১
ভিনসেন্ট। সংকলন ও সম্পাদনা: অনির্বাণ রায়। অন্তেবাসী, ক্রোড়পত্র, মাঘ ১৪০০
উনিশ শতকের পাশ্চাত্য চিত্রকলা এবং ভিনসেন্ট ভ্যান গখ। তপোধীর ভট্টাচার্য। এবং এই সময়। শারদ সংখ্যা ১৩৯৯
একটি গ্রাম ও ভ্যান গগ্। অসীমকুমার রায়। দেশ ৩০ জানুয়ারি ১৯৯৩
মহান শিল্পী মহান জীবন/ভ্যাঁস ভান গখ (১৮৫৩-১৮৯০/ Vincent Van Gogh)। অসীম রেজ। যুবমানস, মার্চ ১৯৯৪
ভ্যান গঘের আত্মপ্রতিকৃতির প্রদর্শনী জুনে। সকাল, ২৭মে ১৯৯৪
ভিনসেন্ট। অনির্বাণ রায়। কহন, অক্টোবর ১৯৯৪
মডেলের বদলে আয়না। নির্মলেন্দু চক্রবর্তী। আনন্দবাজার পত্রিকা, ২ অক্টোবর ১৯৯৪

8

ভিনসেন্ট : নির্বাচিত চিত্রপঞ্জী

১. বপনকারী (মিইয়ে অনুসরণে)। কলম, ধোয়া, সবুজ-সাদায় উন্নীত। ৪৮ x ৩৬.৫ সেমি। এপ্রিল-মে ১৮৮১

২. হাওয়াকল সহ ভূদৃশ্য। পেনসিল, পোড়াকয়লা। ৩৫.৫ x ৬০ সেমি। মে ১৮৮১

৩. প্রতিকৃতি সম্ভবত ভিলমিন ভ্যান গঘ। পেনসিল। ৩৫ x ২৪.৫ সেমি। জুন ১৮৮১

৪. জানলার নিকটে বসে আলু ছাড়াচ্ছে মহিলা। কালো খড়ি, জল রং, সাদায় উন্নীত। ৪০.৫ x ৩৩ সেমি। সেপ্টেম্বর ১৮৮১

৫. খনক এবং নারীদেহ। স্কেচ ১৫০ সংখ্যক পত্রে। সেপ্টেম্বর ১৮৮১

৬. আগুনের ধারে পাঠরত কৃষক। পোড়াকয়লা জলরং, সাদায় উন্নীত। ৪৫ x ৫৬ সেমি। অক্টোবর ১৮৮১

৭. সীবনরত রমণী। পোড়াকয়লা, কালো চক, জল রং, সাদায় উন্নীত। ৬২.৫ x ৪৭.৫ সেমি। অক্টোবর ১৮৮১

৮. বাঁধাকপি এবং কাঠের জুতো সহ স্টিল লাইফ। প্যানেলের ওপর কাগজে। ৩৪.৫ x ৫৫ সেমি। ডিসেম্বর ১৮৮১

৯. দাঁড়ানো বালিকা, বুননরত। পেনসিল ৫২ x ২৫.৫ সেমি মার্চ ১৮৮২

১০. নগ্ন মহিলা। স্কেচ ১৮৫ সংখ্যক পত্রে। ২০ x ১১ সেমি। এপ্রিল ১৮৮২

১১. দুঃখ। পেনসিল, ধোয়া। ৪৫.৫ x ২৯.৫ সেমি। ১০ এপ্রিল ১৮৮২

১২. দু হাতের ভেতর মাথা রাখা বৃদ্ধ মানুষ। লিথোগ্রাফ। ৫৫ x ৩৬.৫ সেমি। ২৭ নভেম্বর ১৮৮২

১৩. টুপি মাথায় অনাথ মানুষ, বসে বই পড়ছে। পেনসিল। ৪৮ x ২৮.৫ সেমি। মধ্য-ডিসেম্বর ১৮৮২।

১৪. গাঢ় টুপি মাথায় নারী (সিয়েনের মা?)। পেনসিল, কালো লিথোগ্রাফি-খড়ি, সাদা-কালোয় ধোয়া। ৪৫ x ২৬.৫ সেমি। ডিসেম্বর ১৮৮২

১৫. হামাগুড়িটানা শিশু। স্কেচ, আন্তন ভান রাপার্ডকে লেখা ৩০ সংখ্যক পত্রের সঙ্গে। ৫ মার্চ ১৮৮৩। কালো মাউন্টেন খড়ি। ৭ x ৯ সেমি

১৬. জমা জঞ্জালের কাছে ঘোড়া। পেনসিল, কালো চক, ধোয়া। ৪২ x ৫৯ সেমি। জুন ১৮৮৩ .

১৭. ছোটো সাঁকো সহ পরিখা। প্যানেলের উপর ক্যানভাস। ৪৬ x ৩৪ সেমি। অগাস্ট ১৮৮৩

১৮. শয়ান গোরু। ৩০ x ৫০ সেমি। অগাস্ট ১৮৮৩

১৯. ভূদৃশ্য বালিয়াড়ি সহ। প্যানেল। ৩৩.৫ x ৪৮.৫ সেমি। সেপ্টেম্বর ১৮৮৩?

২০. বৃষ্টিতে চার্চপ্রাঙ্গণ। পেনসিল-কলম। ২৩ x ৩৭ সেমি। ডিসেম্বর ১৮৮৩

২১. তাঁতি মুখ বাঁদিকে। পেনসিল, জল রং। ৩৫ x ৪৫ সেমি। ২ জানুয়ারি ১৮৮৪?
২২. তাঁতি মুখ বাঁদিকে, চরকা সহ। ৬১ x ৮৫ সেমি। ১ এপ্রিল ১৮৮৪
২৩. তাঁতি, সুতো সাজাচ্ছে। প্যানেলের উপর ক্যানভাস। ৪১ x ৫৭ সেমি। মে, প্রথমার্ধ ১৮৮৪
২৪. গম চাষ। স্কেচ ৩৭৪ সংখ্যক পত্রে। অগাস্ট ১৮৮৪
২৫. মেষের পাল সহ মেষপালক। কার্ডবোর্ডের উপর ক্যানভাস। ৬৭ x ১২৬ সেমি। অগাস্ট ১৮৮৪
২৬. সূর্যাস্তে পপলার-পথ। ৪৬ x ৩৩ সেমি। শেষ অক্টোবর ১৮৮৪
২৭. মৃৎপাত্র ও তিনটি বোতল সহ স্টিল লাইফ। প্যানেলের উপর ক্যানভাস। ৩৯.৫ x ৫৬ সেমি। নভেম্বর ১৮৮৪
২৮. ফুলদানি ফুলসহ। কার্ডবোর্ডের উপর ক্যানভাস। ৪২.৫ x ৩২.৫ সেমি। নভেম্বর ১৮৮৪
২৯. কৃষক রমণী, মাথা। পেনসিল, কালো খড়ি, ধোয়া। ৩৪.৫ x ২১ সেমি। ডিসেম্বর ১৮৮৪—জানুয়ারি ১৮৮৫
৩০. হাত। কালো খড়ি। ৩২ x ২৪ সেমি। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৮৮৫
৩১. মৃত চড়াইপাখির স্টাডি। কালো খড়ি। ২৪ x ৩২ সেমি। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৮৮৫
৩২. হাত; চার ব্যক্তি খেতে বসেছে। কালো খড়ি। ৪২ x ৩৪.৫ সেমি। মার্চের গোড়ায়, ১৮৮৫
৩৩. পাঁচ ব্যক্তি খেতে বসেছে (আলুভোজীরা)। প্যানেলের উপর ক্যানভাস। ৭২ x ৯৩ সেমি। শেষ এপ্রিল ১৮৮৫
৩৪. পাঁচ ব্যক্তি খেতে বসেছে। স্কেচ ৪০০ সংখ্যক চিঠির সঙ্গে পাঠানো। কলম, লিথোগ্রাফির খড়ি। ১১ x ১৮ সেমি। ১৩ এপ্রিল ১৮৮৫
৩৫. পাঁচ ব্যক্তি খেতে বসেছে (আলুভোজীরা)। ৮২ x ১১৪ সেমি। মে-র গোড়ায় ১৮৮৫
৩৬. গাছ এবং কৃষক রমণী সহ কুটির। ৪৭.৫ x ৪৬ সেমি। জুন-জুলাই ১৮৮৫
৩৭. কৃষক পুরুষ ও রমণী, খননরত। কালো খড়ি, জলরং। ২০ x ৩৩ সেমি। অগাস্ট ১৮৮৫
৩৮. গমখেত, ফসল ছেদক, লুব্ধ কৃষক রমণী, হাওয়াকল। কালো খড়ি। ২৭ x ৩৯.৫ সেমি। অগাস্ট, দ্বিতীয়ার্ধ ১৮৮৫
৩৯. মাটির পাত্র, কয়েকটি নাশপাতি সহ স্টিল লাইফ। ৩৩ x ৪৩.৫ সেমি। সেপ্টেম্বর ১৮৮৫
৪০. পাখির বাসা সহ স্টিল লাইফ। ৩৩ x ৪২ সেমি। অক্টোবর ১৮৮৫
৪১. খোলা বাইবেল, মোমবাতিদান এবং উপন্যাস সহ স্টিল লাইফ। ৬৫ x ৭৮ সেমি। শেষ অক্টোবর ১৮৮৫
৪২. পিছন থেকে দেখা বাড়ির সারি। ৪০ x ৩৩.৫ সেমি। ডিসেম্বর ১৮৮৫
৪৩. নারী-মাথা। পোড়াকয়লা, কালো-লাল খড়ি। ৫১ x ৩৯ সেমি। জানুয়ারি ১৮৮৬

৪৪. ঝোলানো কঙ্কাল ও বেড়াল। পেনসিল। ১০.৫ x ৬ সেমি। ফেব্রুয়ারি ১৮৮৬
৪৫. করোটি, দাঁতের মাঝে জ্বলন্ত সিগারেট। ৩২.৫ x ২৪ সেমি। ফেব্রুয়ারি ১৮৮৬
৪৬. পায়ের চারটি স্কেচ। কালো খড়ি। ১০ x ১৩.৫ সেমি। ফেব্রুয়ারি ১৮৮৬
৪৭. প্লাস্টারের নারী-কবন্ধ। পেনসিল। ১১.৫ x ৯ সেমি। ফেব্রুয়ারি ১৮৮৬
৪৮. নগ্ন পুরুষ, দাঁড়িয়ে এবং নগ্ন মহিলা, বসে। কালো খড়ি, পোড়া কয়লা। ৩০.৫ x ২১.৫ সেমি। ফেব্রুয়ারি ১৮৮৬
৪৯. টুপিমাথায় আত্মপ্রতিকৃতি। কালো খড়ি। ২০ x ১১ সেমি। বসন্ত ১৮৮৬
৫০. হাঁটু মোড়া মানুষের প্লাস্টারেব ছোটো মূর্তি। কার্ডবোর্ড। ৩৫.৫ x ২৬.৫ সেমি। বসন্ত ১৮৮৬
৫১. প্লাস্টারে ছোটো অশ্বমূর্তি। কার্ডবোর্ড। ৩৩.৫ x ৪১ সেমি। বসন্ত ১৮৮৬
৫২. গায় ফেল্টটুপি মাথায় ইজেলের সামনে আত্মপ্রতিকৃতি। ৪৫.৫ x ৩৭.৫ সেমি। বসন্ত ১৮৮৬
৫৩. খ্রীস্টমাস গোলাপ সহ কাঁচের গেলাস। প্যানেলের উপব ক্যানভাস। ৩১ x ২২.৫ সেমি। বসন্ত ১৮৮৬
৫৪. পারির দৃশ্য। কালো, সাদা এবং বাদামি-লাল খড়ি। ২২.৫ x ৩০ সেমি। বসন্ত ১৮৮৬
৫৫. পারির দৃশ্য। লাল, কালো এবং সাদা খড়ি। ২২.৫ x ৩০ সেমি। বসন্ত ১৮৮৬
৫৬. পপি, ডেইজি, কর্নফ্লাওয়ার, পিউনিসহ ফুলদানি। ৯৯ x ৭৯ সেমি। গ্রীষ্ম ১৮৮৬
৫৭. পথের দৃশ্য, বাস্তিল দিবস উদ্‌যাপন। ৪৪ x ৩৯ সেমি। গ্রীষ্ম ১৮৮৬
৫৮. ম্যাকারেল, লেবু এবং টোমাটো সহ স্টিল লাইফ। ৩৯ x ৫৬.৫ সেমি। গ্রীষ্ম ১৮৮৬
৫৯. এক জোড়া জুতো। ৩৭.৫ x ৪৫.৫ সেমি। গ্রীষ্ম ১৮৮৬
৬০. ডাবল বাস বাদক। সবুজ খড়ি। ৩৪ x ২৫.৫ সেমি। গ্রীষ্ম ১৮৮৬
৬১. বেহালাবাদক। নীল ও সবুজ খড়ি। ৩৫ x ২৬ সেমি। গ্রীষ্ম ১৮৮৬
৬২. ক্লারিনেট এবং বংশী -বাদক। নীল খড়ি। ২৬ x ৩৫ সেমি। গ্রীষ্ম ১৮৮৬
৬৩. পিয়ানোবাদক। সবুজ খড়ি। ২৫.৫ x ৩৪ সেমি। গ্রীষ্ম ১৮৮৬
৬৪. মানুষের মাথা, সম্ভবত তেও ভ্যান গঘের প্রতিকৃতি। পোড়া কয়লা, রঙিন খড়ি। ৩৫ x ২৬ সেমি। গ্রীষ্ম ১৮৮৬
৬৫. ঝিনুক ও চিংড়ি। ২৭ x ৩৪ সেমি। শীত ১৮৮৬
৬৬. খড়ভরা পেঁচা। পেনসিল, কলম, নীল কালি। ৩৫.৫ x ২৬ সেমি। হেমন্ত ১৮৮৬
৬৭. মাছরাঙা। ১৯ x ২৬.৫ সেমি। হেমন্ত ১৮৮৬
৬৮. খড়ভরা কালং বাদুড় (উড়ন্ত কুকুর)। ৪১ x ৭৯ সেমি। শীত ১৮৮৬
৬৯. আত্মপ্রতিকৃতি। পেনসিল। ১৯ x ২১ সেমি। শীত ১৮৮৬
৭০. পিয়ের তাঁগির প্রতিকৃতি। ৪৭ x ৩৮.৫ সেমি। জানুয়ারি ১৮৮৭
৭১. তিনটি উপন্যাস। ৩১ x ৪৮ সেমি। বসন্ত ১৮৮৭
৭২. এক জোড়া জুতো, একটি উলটানো। ৩৪ x ৪১.৫ সেমি। বসন্ত ১৮৮৭
৭৩. উড়ন্ত সোয়ালো। কলম। ২৬.৫ x ৩৫ সেমি। গ্রীষ্ম ১৮৮৭

৭৪. বৃষ্টির ভেতর সাঁকো (হিরোশিগে অনুসরণে)। ৭৩ x ৫৪ সেমি। গ্রীষ্ম ১৮৮৭
৭৫. আত্মপ্রতিকৃতি। ৪১ x ৩৩ সেমি। গ্রীষ্ম ১৮৮৭
৭৬. কর্তিত দুটি সূর্যমুখী। ৫০ x ৬০ সেমি। গ্রীষ্ম ১৮৮৭
৭৭. এক পাঁজা ফরাসি উপন্যাস এবং গ্লাসের ভেতর গোলাপ। ৭৩ x ৯৩ সেমি। শীত ১৮৮৭-৮৮
৭৮. গোলাপী পীচ গাছ (মাউভের স্মৃতি)। ৭৩ x ৫৯.৫ সেমি। ৩০ মার্চ ১৮৮৮
৭৯. ভিনসেন্টের বাড়ি। স্কেচ ৪৮০ সংখ্যক চিঠিতে। ১ মে ১৮৮৮
৮০. গমের খেত। তেল রং। ৫৪ x ৬৫ সেমি। ১৭-২৩ জুন ১৮৮৮
৮১. তারাস্কঁর পথে শিল্পী। ৪৮ x ৪৪ সেমি। জুলাই ১৮৮৮
৮২. সূর্যাস্তবেলায় বীজবপনকারী। খাগের কলম। ২৫ x ৩১ সেমি। ১৭ জুলাই ১৮৮৮
৮৩. বেতের চেয়ারে যোসেফ রুল্যাঁ। ৮১ x ৬৫ সেমি। ৩১ জুলাই—৩ অগাস্ট ১৮৮৮
৮৪. সমুদ্রে মাছ-ধরা নৌকো। খাগের কলম। ২৪ x ৩১.৫ সেমি। ৬-৮ অগাস্ট ১৮৮৮
৮৫. ফুলদানিতে বারোটি সূর্যমুখী। ৯১ x ৭১ সেমি। ২১-২৬ অগাস্ট ১৮৮৮
৮৬. এক জোড়া পুরনো জুতো। ৪৪ x ৫৩ সেমি। ২৯ অগাস্ট ১৮৮৮
৮৭. রাতে কফিখানার প্রাঙ্গণ। ৮১ x ৬৫.৫ সেমি। ১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৮৮
৮৮. আত্মপ্রতিকৃতি। ৬২ x ৫২ সেমি। ১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৮৮
৮৯. সাধারণের উদ্যানে একটি পথ। ৭৩ x ৯২ সেমি। ১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৮৮
৯০. তারাভরা রাত। ৭২.৫ x ৯২ সেমি। ২৮ সেপ্টেম্বর ১৮৮৮
৯১. মায়ের প্রতিকৃতি (ফোটোগ্রাফ অনুসরণে)। ৪০.৫ x ৩২.৫ সেমি। ৮ অক্টোবর ১৮৮৮
৯২. ভিনসেন্ট-এর শোওয়ার ঘর। ৭২ x ৯০ সেমি। ১৬-১৭ অক্টোবর ১৮৮৮
৯৩. পুরনো গাছের গুঁড়ি। ৯১ x ৭১ সেমি। ২৮ অক্টোবর ১৮৮৮
৯৪. উপন্যাস পাঠরত মহিলা। ৭৩ x ৯২ সেমি। ১৬ নভেম্বর ১৮৮৮
৯৫. ভিনসেন্ট-এর চেয়ার। ৯৩ x ৭৩.৫ সেমি। ২৩ নভেম্বর ১৮৮৮
৯৬. গোগ্যাঁর চেয়ার। ৯০.৫ x ৭২ সেমি। ২৩ নভেম্বর ১৮৮৮
৯৭. দুটি কাঁকড়া। ৪৭ x ৬১ সেমি। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৮৮৯
৯৮. উলটোনো একটি কাঁকড়া। ৩৮ x ৪৫.৫ সেমি। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৮৮৯
৯৯. চোদ্দটি সূর্যমুখীসহ ফুলদানি। ৯৫ x ৭৩ সেমি। জানুয়ারি (দ্বিতীয়ার্ধ) ১৮৮৯
১০০. ঘাসের বোঝা। ৪৪.৫ x ৪৯ সেমি। এপ্রিল ১৮৮৯
১০১. হাসপাতালের প্রাঙ্গণ। পেনসিল, খাগের কলম, বাদামি কালি। ৪৫.৫ x ৫৯ সেমি। ৩০ এপ্রিল ১৮৮৯
১০২. আইরিসেস। ৭১ x ৯৩ সেমি। ১০-১৫ মে ১৮৮৯
১০৩. মথের মাথা। কালো খড়ি, কলম, বাদামি কালি। ১৬ x ২৬ সেমি। ২১ মে ১৮৮৯
১০৪. প্রজাপতিসহ পপিফুল। ৩৩.৫ x ২৪.৫ সেমি। মে ১৮৮৯
১০৫. সাইপ্রেস। কলম, খাগের কলম। ৬২.৫ x ৪৬.৫ সেমি। ২৫ জুন ১৮৮৯
১০৬. আইভিসহ গাছের গুঁড়ি। ৪৫ x ৬০ সেমি। ৬ জুলাই ১৮৮৯

১০৭. তিনটি ঝিঁঝিপোকা। স্কেচ ৬০৩ সংখ্যক পত্রের সঙ্গে। কলম। ২০.৫ x ১৮ সেমি। ৬ জুলাই ১৮৮৯

১০৮. করুণা (দ্যলাক্রোয়া অনুসরণে)। ৭৩ x ৬০.৫ সেমি। ৬-৭ সেপ্টেম্বর ১৮৮৯

১০৯. কৃষকের প্রতিকৃতি। ৬১ x ৫০ সেমি। মধ্য-সেপ্টেম্বর ১৮৮৯

১১০. তাঁত বুননরত নারী (মিইয়ে অনুসরণে)। ৪০ x ২৫.৫ সেমি। সেপ্টেম্বর (প্রথমার্ধ) ১৮৮৯

১১১. আরোগ্যশালায় ভিনসেন্টের স্টুডিওর জানলা। কালো খড়ি, গুয়াশে। ৬১.৫ x ৪৭ সেমি। ৫-২২ অক্টোবর ১৮৮৯

১১২. রাতে পরিবার (মিইয়ে অনুসরণে) ৭২.৫ x ৯২ সেমি। অক্টোবর ১৮৮৯

১১৩. বেড়া দেওয়া তরুণ গমের খেত এবং উদিত সূর্য। ৭১ x ৯০.৫ সেমি। ১৭—শেষ নভেম্বর ১৮৮৯

১১৪. গাছে ঘেরা পথে নারী। ৩৩.৫ x ৪০.৫ সেমি। ডিসেম্বর ১৮৮৯

১১৫. পানরত মানুষেরা (দ্যমিয়ের অনুসরণে)। ৬০ x ৭৩ সেমি। ১০-১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৯০

১১৬. বন্দীদের বৃত্ত (গুস্তাভ ডোরে অনুসরণ)। ৮০ x ৬৪ সেমি। ১০-১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৯০

১১৭. ফুলন্ত বাদাম গাছের ডালপালা। ৭৩ x ৯২ সেমি। ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৯০

১১৮. আহাররত দু দল কৃষক এবং অন্যান্যরা। কালো খড়ি। ৩৪ x ৫০ সেমি। মার্চ-এপ্রিল ১৮৯০

১১৯. লাজারাসের উত্থান (রেমব্রান্টের এচিং অনুসরণে)। ৪৮.৫ x ৬৩ সেমি। ৩ মে ১৮৯০

১২০. অলিভ গাছেদের ভেতর দিয়ে হেঁটে যাওয়া দম্পতি, পাহাড়, বাঁকা চাঁদ। ৪৯.৫ x ৪৫.৫ সেমি। ১২-১৫ মে ১৮৯০

১২১. টেবলের বইয়ের কাছে বসে বসে আছেন ডা. গাসে। ৬৬ x ৫৭ সেমি। ৩ জুন ১৮৯০

১২২. পিয়ানোর সামনে মার্গারিত গাসে। ১০২ x ৫০ সেমি। ২৬-২৭ জুন ১৮৯০

১২৩. ঘোড়া এবং গাড়ি। কালো খড়ি, পেনসিল। ১৩ x ৮ সেমি। জুন-জুলাই ১৮৯০

১২৪. মুরগি ও মোরগের স্কেচ। পেনসিল। ১৩ x ৮ সেমি। জুন-জুলাই ১৮৯০

১২৫. মেঘভরা আকাশের নীচে গমের ক্ষেত। ৫০ x ১০০ সেমি।

১২৬. গমের খেত, আকাশে কাকের দল। ৫০.৫ x ১০০ সেমি। মধ্য জুলাই ১৮৯০

(অনুল্লেখিত মাধ্যম : তেল রং)

ডাচ চিত্রকলা

রণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ষোল শতকের প্রথম ভাগে ইউরোপের দেশে প্রোটেস্ট্যান্ট রিফর্মেশনের বান ডেকে গেল। জার্মানিতে মার্টিন লুথার (Martin Luther ১৪৮৩-১৫৪৬), জেনিভা ও ফ্রান্সে জাঁ কোভ্যাঁ (Jean Cauvin), লাতিন কায়দায় যিনি ক্যালভিন নামে পরিচিত (১৫০৯-৬৪), সুইজারল্যান্ডে উলরিশ ৎসুইংলি (Ulrich Zwingli, ১৪৮৪-১৫৩১), স্কটল্যান্ডে জন নক্স (John Knox ১৫০৫-৭২) এবং ইংলন্ডে ডেসিডেরিয়াস ইরাজমাস (Desiderius Erasmus, ১৪৬৬-১৫৩৬) কেবল যে ইতালিয় রেনেসাঁসের প্রভাবে গ্রীক চর্চায় মনোনিবেশ করেছিলেন তাই নয় পোপের তথা চার্চের কার্যকলাপের কদর্যতার বিরুদ্ধে এক প্রবল ধর্মীয় ও গির্জার অভ্যন্তরীণ সংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটালেন। রিফর্মেশনের প্রথম যুগে চিত্রশিল্পে জার্মানি এবং জার্মান শিল্পী ড্যুরেরের (Albrecht Dürer, ১৪৭১-১৫২৮) মতো গুরুত্বপূর্ণ স্থান অন্য কোনো দেশ বা শিল্পীরই ছিল না। জার্মানি তখন মধ্যযুগে থেকে রেনেসাঁসের আওতায় আসতে শুরু করেছে, আবার ক্যাথালিক চার্চের আওতা থেকে বেরিয়ে আসার ব্যাপারেও নিজেদের ভূমিকা সম্বন্ধে সজাগ। সেইজন্যে ড্যুরেরকে উত্তরদেশে 'ইতালিয় রেনেসাঁসের দূত' হিসেবে গণ্য করা হলেও ইতালিয় সুনির্মল মানবতাবাদ ও শিল্পরূপের প্রতিনিধিত্ব করার পাশাপাশি জাগতিক স্থূলতার স্থানীয় গথিক প্রতিক্রিয়ার বিপরীতমুখী ধারাও তাঁর শিল্পকর্মের মধ্যে দেখা যায়। পঞ্চাশ বছর বয়সেও চির অনুসন্ধিৎসু এই শিল্পী সম্রাট নেদারল্যান্ডসে এলেন। রাজার মতো অভ্যর্থনা দেওয়া হল তাঁকে, রাজকীয় ঐশ্বর্যময় জীবনযাত্রার ব্যবস্থা হল তাঁর জন্যে। সম্ভবপর সমস্ত রকমের সম্মানে ভূষিত করা হল তাঁকে। এদেশে তাঁর এই ভ্রমণের ফলে ইউরোপের উত্তরাঞ্চলের নিম্নভূমির চিত্রশিল্পী ও খোদাই শিল্পীর রেনেসাঁসমুখী হয়ে উঠলেন, নব নব উন্মেষশালিনী চিন্তার দরজা খুলে গেল তাঁর প্রভাবে।

ষোল শতকের মাঝামাঝি উত্তর ইউরোপের সব থেকে বেশি তাৎপর্যপূর্ণ ও সাড়াজাগানো শিল্পী হিসাবে নাম করতে হয় পিয়েতার ব্রুয়েগেলের (বড়ো) (Pieter Brueghel, elder, ১৫২৫-৬৯)। ছোট্ট ফ্লেমিশ শহর ব্রুয়েগেলে তাঁর জন্ম। আন্তোয়ার্প তখন বিরাট বাণিজ্যকেন্দ্র আবার শিল্পকলা চর্চারও কেন্দ্র। একশ বছর আগে ব্রুগেস শহরের যে মর্যাদা ছিল ইয়ান ভান আইক (Jan van Eyck, ১৩৮০/৯০?-১৪৪১) ও রোজিয়ার ভান ডার ভেইডেনের (Rosier van der Weyden, ১৪০০-১৪৬৪) সময় আন্তোয়ার্পের তখন সেই মর্যাদা। ছবি আঁকা বিদ্যার টানে তরুণ পিয়েতার যখন এসে পৌছলেন এই শহরে তখন সেখানে এক নতুন চিন্তাধারার প্রবল জোয়ারে গোটা ইউরোপের চরিত্রে বিরাট বিরাট পরিবর্তন ঘটছে। তদানীন্তন সাবেকী চিন্তা জগতের উপর রটরডামের বিখ্যাত চিন্তানায়ক ইরাজমাস তাঁর মানবতাবাদী ও ঈশ্বরতত্ত্বে সন্দেহবাদী নতুন চিন্তালব্ধ জ্ঞানের স্বাক্ষর এঁকে দিচ্ছেন। আন্তোয়ার্পের প্লানতিনদের (Plantin) বড়ো বড়ো

ছাপাখানায় প্রতিদিন মুদ্রিত হচ্ছে সেই সব নতন নতুন কথা।

কিন্তু নেদারল্যান্ডসে রিফর্মেশনের ধাক্কা এসে পড়লে কি হবে ষোল শতকের গোড়ার দিকে সে যে ছিল স্পেনের অধিকৃত অঞ্চল। স্পেনের রাজা চাইলেন এই দেশের অধিবাসী ডাচ আর ফ্লেমিংদের ঠিকমতো নিজের কব্জার মধ্যে রাখতে। তিনি পাঠিয়ে দিলেন তাঁর ভাড়াটে সৈন্যদের জাহাজ বোঝাই করে। আক্রমণকারী ভাড়াটে সৈন্যরা চিরকাল ইতিহাসে অন্য দেশের উপর হামলা করে নিজেদের যে চেহারাটা ফুটিয়ে তুলেছে এখানেও তার অন্যথা হল না— নরহত্যা, নারীধর্ষণ আর লুণ্ঠনের বন্যা বয়ে গেল সাধারণ মানুষের উপর। ব্রুয়েগেলের ছবিতে প্রচ্ছন্ন ফ্লেমিংদের সেই যন্ত্রণার ইতিহাস, কখনও তির্যক ব্যঙ্গ বিদ্রূপে, কখনও ইতিহাসের ঘটনার সাধারণীকৃত চিত্ররূপ হিসেবে, আবার কখনও বা কৃষিজীবী জনসাধারণের সরল জীবনযাত্রার সহাস্য সহানুভূতিপূর্ণ ছবির ভেতর দিয়ে। তাদের স্বাভাবিক স্থূল আচরণকেও মিথ্যার আশ্রয়ে সুন্দর করে দেখানোর কোনো চেষ্টাও তাঁর মধ্যে দেখা যায় না। কেবল সমসাময়িক নানা ঘটনা এবং দোষগুণসমেত মানুষই নয়, প্রকৃতি এবং তার রূপ.ককাহিনীধর্মী সম্ভাবনাকে ফুটিয়ে তুলতেও তাঁর আগ্রহ অনেক ছবিতে দেখা গেছে। আর এইসব রূপককাহিনী মূলক প্রাকৃতিক দৃশ্যের ভেতর দিয়ে গভীর আবেগময় কোনো সময়ে নিজের দেশ ও সেখানকার মানুষদের সম্বন্ধে নিজের আবেগকেও তিনি প্রকাশ করেছেন। ধর্মীয় সংঘাত চরমে উঠেছিল ১৫৬৯ সালে। প্রোটেস্ট্যান্টদের সঙ্গে ক্যাথলিকদের লড়াই, সাধারণ নাগরিকদের সঙ্গে সৈন্যদের হাতহাতি। ব্রুয়েগেলের মৃত্যুর কয়েক মাস আগে এগারো বছর ব্যাপী যে যুদ্ধ শুরু হল তা কালক্রমে পর্যবসিত হল স্পেনের কবল থেকে নেদারল্যান্ডসের মুক্তিতে।

ব্রুয়েগেলের আঁকা ভূদৃশ্যের ছবিতে যে মেজাজ ও রঙের সমারোহ আর আলোবাতাসের গুণ দেখা যায় তা দেখে পূর্বতন কালের ফ্লেমিশ চিত্রকরদের কথা যেমন মনে পড়ে তেমনি পরবর্তী কালের ডাচ শিল্পীদের রচনাকৃতির পূর্বাভাষও তাতে পাওয়া যায়। ব্রুয়েগেলের দুই ছেলে 'নরক' ও 'ভেলভেট' নামে খ্যাত হলেও বাবার কাজে নতুন সুর যেভাবে ফুটেছে এদের কাজে ততটা হয় নি।

১৫৫১তে আন্তোয়ার্পের চিত্রকরদের গিল্ডের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর প্রথামাফিক ব্রুয়েগেলও গিয়েছিলেন ইতালিতে। সেখানে তখন মিকেলাঞ্জেলো, তিশিয়ান ও তিনতোরেত্তোর (Michelangelo Buonarroti, ১৪৭৫-১৫৬৪, Tiziano Vecellio, ১৪৭৭-১৫৭৬, Jacopo Robusti Tintoretto, ১৫১৮-৯৪) খ্যাতির মধ্যাহ্নসূর্যের দীপ্তি। কিন্তু আন্তোয়ার্পে ফিরে এসে ব্রুয়েগেল এমন সব হাস্যরসাত্মক খোদাই আর ভূতপতরির ছবি আঁকলেন যে তাঁর ডাকনামই হয়ে গেল 'রগুড়ে পিয়েতার' (Pieter the droll)। গাঁয়ের মানুষের মতো সাজগোজ করে এক ব্যাবসাদার বন্ধুর সঙ্গে চাষীদের মেলায় কি তাদের বিয়ের আসরে ঢুকে পড়তেন, আর পরে 'বিয়ের নাচ'-এর (The Wedding Dance) মতো সেই সব হৈ-চৈ খোশমেজাজের নানা মজাদার ছবি আঁকতেন। কিন্তু শুধু স্ফূর্তির বা সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁর অনুভূতির ব্যাপারই নয়, এইসব ছবিতে তিনি নানা ফর্ম ও লাইনের সযত্ন প্যাটার্ন এঁকেছেন এবং গতিমুখের ওপরেও জোর দিয়েছেন। এর ফলে স্বতন্ত্র ব্যক্তিদের এক শৃঙ্খলাবদ্ধ মণ্ডন বিন্যাসের অংশ হয়ে উঠেছে। এদিক থেকে তাঁর ছবি হান্স হলবাইনের (ছোটো) (Hans Holbein, the younger, ১৪৭৯-১৫৪৩)

'ম্যানারিস্ট' শিল্পরীতি বা ষোল শতকের ইতালির শিল্পীদের স্পেসকে টেলিস্কোপের টিউবের মতো ছোটো-বড়ো করার এবং এখানে ওখানে কোনো একটা রঙকে বার বার বেশি জোর দেওয়ার সঙ্গে তুলনীয়। 'বিয়েবাড়ির নাচ' ছবিতে মানুষগুলোকে তিনি অনেকগুলো পরস্পরের জাল-বোনা রেখার মধ্যে বিন্যস্ত করেছেন। এই রেখাগুলো আবার ছবির নীচের অংশের ভেতর দিয়ে কেবলই সামনে পিছনে বাঁকা হয়ে আসাযাওয়া করছে। এই জটিল ঘনসংবদ্ধ মানুষের গোষ্ঠীটি ছবির বাকি অংশের সঙ্গে লাল সাদা কালো হলুদ রঙের বার বার ছোপ লেগে একটা সামগ্রিক প্যাটার্ন গড়ে তুলছে।

সতের শতকের ইউরোপে নতুন তিনটি জোরালো শক্তির উদ্ভব ঘটেছিল সমকালীন শিল্পকলার উপর যার প্রভাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর প্রথমটি হল মার্টিন লুথারের সংস্কার আন্দোলনের বিরুদ্ধে সংগঠিত প্রতি-আক্রমণ। জঙ্গী নতুন 'সোসাইটি অব যীশাস' এল ক্যাথলিক চার্চের নেতৃত্বে। সেন্ট ইগনেসিয়াস লয়োলা (Ignatius Loyola, ১৪৯১-১৫৫৬) ১৫৩৪ সালে পারিতে এই সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। এদের প্রধান কাজ ছিল ধর্মপ্রচার, ধর্মশিক্ষাদান ও দোষ স্বীকারোক্তি করানো এবং অতীব বাধ্য এক আধ্যাত্মিক সেনাবাহিনী গড়ে তোলা। ষোল শতকের রিফর্মেশন আন্দোলনের বিরুদ্ধে রোমান চার্চের সহায়তা করাই ছিল এদের লক্ষ্য। স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলায় সরাসরি এর প্রতিফলন পড়ল—করুণ, অতিনাটকীয় (melodramatic) এবং প্রগাঢ় আবেগপ্রবণ দিকে জোর দেওয়া হতে থাকল।

দ্বিতীয়ত, পৃথিবী সম্পর্কে এক ব্যাপকতর ধারণার সৃষ্টি হল ইউরোপ ভিন্ন অন্যান্য দেশের জাতিদের মধ্যে, বিশেষত আমেরিকা ও পূর্বাঞ্চলের দেশগুলোর সম্পর্কে জ্ঞানের সীমানা উত্তরোত্তর বেড়ে যাওয়ার ফলে। তাছাড়া কোপার্নিকাস প্রমুখ বিজ্ঞানীদের আবিষ্কারের ফলে মানুষ ও পৃথিবীকেন্দ্রিক বিশ্বজগতের সুপ্রাচীন ধারণা ঘুচে গিয়ে সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্বসম্পর্কে এক নতুন ধারণার সৃষ্টি তো ইতোপূর্বেই ঘটেছে। ফলে পৃথিবীটাকেও এখন আগের থেকে অনেক বড়ো আর জটিল বলে দেখা হতে থাকল। ভূদৃশ্যের ছবিতে এখন আগের থেকে ছোটো মনুষ্যমূর্তি দেখা দিতে থাকল। আর তার থেকেও বড়ো কথা সীমিত দেশ থেকে অসীম দেশের দিকে প্রতিনিয়ত এখন দৃষ্টি পড়তে থাকল এইসব নতুন ধ্যানধারণার আবির্ভাবের ফলে।

তৃতীয় শক্তিটি হল রাজতন্ত্রগুলো আরও দানাবাঁধার ফলে অনেক দেশের চিত্রকলাতেই একটা সুস্পষ্ট অভিজাত দিক রূপ পেতে থাকল। এই স্থিতিশীলতার ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশে অগ্রগতি দেখা দিল এবং তারাও শিল্পকলার নতুন পৃষ্ঠপোষক হয়ে উঠতে থাকল। স্পেন, ইতালি, ফ্ল্যান্ডার্স ও ফ্রান্সের মতো ক্যাথলিক প্রধান দেশে অভিজাত ও আবেগাপ্লুত ধর্মীয় উপাদানের প্রভাব দেখা দিল, যেমন জিয়োভান্নি গেরচিনো (Giovanni Guercino, ১৫৯১-১৬৬৬), পিটার পল রুবেন্স (Peter Paul Rubens, ১৫৭৭-১৬৪০) এবং অন্যান্যরা। হল্যান্ড প্রভৃতি মধ্যবিত্ত শ্রেণী প্রধান দেশে জোরটা পড়ল স্বাভাবিক গুণাবলীর দিকে যদিও অসীমের ধারণাটি প্রবল উপাদান হিসেবে থেকেই গেল।

সতের শতকেও ফ্ল্যান্ডার্স থেকে গেল স্পেনের অধীনেই। এখানকার রাজতন্ত্রপন্থী ও ক্যাথলিক পরিবেশে যেসব দরবারী চিত্রশিল্পী দেখা দিলেন তাঁদের মধ্যে সব থেকে রোমাঞ্চকর হলেন পিটার পল রুবেন্স। সেকালের প্রধান শিল্পধারাগুলোর চমৎকার কার্যকর মিশ্রণ দেখা গেল

তাঁর রচনার মধ্যে। 'ইউট্রেক্টের সন্ধির' ফলে (১৭১৩) নেদারল্যান্ডস ক্যাথলিকপন্থী ফ্ল্যান্ডার্স আর প্রোটেস্ট্যান্টপন্থী হল্যান্ড এই দুই অঞ্চলে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। আন্তোয়ার্পের অপেক্ষাকৃত শান্ত প্রাথমিক চিত্রশিক্ষার শুরু হয় স্থানীয় শিল্পীদের হাতে। এঁরা সকলেই তখন ইতালির স্টাইল গ্রহণ করছেন [যেমন ভেনিসের কাতেনা নামে পরিচিত (Catena) ভিনসেঞ্জো দ্য বিয়াজিও (Vincenzo de Biagio, ১৪৭০-১৫৩১)]। ডিউক অব মান্তুয়ার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে রুবেন্স ইতালিতে গিয়ে বড়ো রেনেসাঁস ও প্রথম যুগের বারোক (Baroque) শিল্পের যাবতীয় দিকের সংস্পর্শে এলেন। কারাভাজ্জিওর (Michelangelo Merisi da Caravaggio, ১৫৭৩-১৬১০) ছবি কেনেন, নকল করেন, লেওনার্দো দ্য ভিঞ্চি (Leonardo da Vinci, ১৪৫২-১৫১৯) ও তিনতোরেত্তোর পদ্ধতিতে স্কেচ করেন আবার তিশিয়ান ও অন্যান্য বড়ো শিল্পীদের রীতির স্টাডি করেন। ভাইসরয় ফার্দিনান্দের রাজসভার শিল্পী হিসেবে ১৬০৮ সালে আন্তোয়ার্পে রুবেন্স যখন ফিরে এলেন তখন তাঁর স্টুডিওটাই হয়ে উঠল ফ্ল্যান্ডার্সের শিল্পচর্চার কেন্দ্র। ইতোমধ্যেই যেসব শিল্পী প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন তাঁরাও অনেকে এলেন তাঁর ছবির ফ্যাক্টরিতে (বিশাল আয়োজন তাঁকে করতে হয়েছিল প্রচুর ছবি ফরমাস মতো জোগান দেওয়ার জন্যে) কাজ করার উদ্দেশ্যে। কেউ পশুপাখির ছবি আঁকেন, কেউ ভূদৃশ্যের ছবি, কেউ বা শুধু স্টিল লাইফের ছবি। পরিচালক রুবেন্স মূল ডিজাইনটা জোগান, আপন মনোহর তুলির টানে যাবতীয় উপাদানকে একসূত্রে সংযুক্ত করেন। করুণ, অভিজাত, ইন্দ্রিয়পরায়ণ যাবতীয় উপাদানই মিলিত হয়ে রুবেন্সকে দরবারী বারোক স্টাইলের বিশিষ্ট চিত্রকর করে তুলল।

ইতোমধ্যে মান্তুয়ার ডিউকের সঙ্গে রুবেন্স ফ্লোরেন্সে গিয়েছিলেন মারি দ্য মেদিচির সঙ্গে ফ্রান্সের রাজা চতুর্থ আঁরির বিবাহ অনুষ্ঠানে (কার্যত বিয়েটা হয়েছিল কনের ছবির সঙ্গে, কনে নিজে উপস্থিত ছিলেন না এই অনুষ্ঠানে। আসলে বিবাহ রাজনীতিভিত্তিক) যোগ দিতে। তাঁর এই খ্যাতিবৃদ্ধি দেখে ফ্ল্যান্ডার্সের শাসক আলবার্ট ও ইজাবেলা তাঁকে মান্তুয়ার কাজ ছেড়ে দিয়ে তাঁদের রাজসভার শিল্পীর কাজ নিতে জানিয়েছিলেন। এই কাজ নেওয়ার ফলে ব্রুসেলসের দরবারে না থেকে আন্তোয়ার্পে বসবাসের অনুমতি তাঁকে দেওয়া হল। এই শহরে ১৬০৯ সালে জন ব্রান্টের মেয়ে ইজাবেলাকে বিয়ে করে ইতালিয় কায়দাকেতায় এক অট্টালিকা তৈরি করিয়ে সেখানে বসবাস করতে থাকেন। ফলে এইখানেই তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'আন্তোয়ার্প স্কুল'। ১৬২১-এ আর্চ ডিউক আলবার্টের মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা পত্নী ইজাবেলা রুবেন্সকে তাঁর নিজস্ব পরামর্শদাতাদের দলে অন্তর্ভুক্ত করেন এবং বিভিন্ন রাজসভায় আধাসরকারি দূত হিসেবে তাঁকে পাঠাতে থাকেন। ফ্ল্যান্ডার্সের শাসকদের একটা বড়ো উদ্দেশ্য তখন ছিল ইংল্যান্ড ও হল্যান্ডের সঙ্গে স্পেনের সম্প্রীতি যাতে বজায় থাকে এবং ফ্রান্সের পক্ষে এরা কেউ যেন কিছুতেই না চলে যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা। এই দৌত্য কাজে প্রথম দিকেই রুবেন্সকে যেতে হল দি হেগে ১৬২৩ সালে হল্যান্ড ও ফ্ল্যান্ডার্সের মধ্যে একটি সন্ধিপত্র নবীকরণের জন্যে। এই সময়েই স্পেনের রাজা 'নাইটহুড' দিয়ে তাঁকে অভিজাত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। চিত্রশিল্পীদের এতাবৎকাল সামাজিক মর্যাদা বলতে বিশেষ কিছু ছিল না। সেই মর্যাদা ফরাসী বিপ্লবের আগে ইউরোপ দেয় নি।

রুবেন্সের দৌত্যজীবনের একটা মস্ত বড়ো ঘটনা (চিত্রকলার ইতিহাসের দিক থেকে) হল

স্পেনে ভেলাসকেথের (Diego Velásquez, ১৫৯৯-১৬৬০) সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ। রুবেন্সের বয়স তখন বাহান্ন, ভেলাসকেথের তিরিশ। দুজনের মধ্যে শুধু বন্ধুত্বই হল না, তরুণ শিল্পীর উপর জ্যেষ্ঠের প্রভাবও পড়ল প্রচুর, স্পেনের পরবর্তীকালের চিত্রকলায় তার চিহ্ন দেখা যাবে। ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম চার্লসের দরবারেও ফ্লেমিশ প্রতিনিধি হিসেবে তিনি যান (১৬২৯)। সেখানেও তিনি রাজকার্যের সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার চিত্রকলাতেও নিজের স্বাক্ষর রেখে আসেন। ১৬৩০-এ ইংল্যান্ড থেকে নাইট খেতাব নিয়ে দেশে ফিরে আবার আন্তোয়ার্পে বসবাস করতে থাকেন। চার বছর আগে ইজাবেলা ব্রান্ট মারা গেছেন। দানিয়েল ফুরসেন্তের ষোল বছরের মেয়ে হেলেনকে এই বছরেই তিনি বিয়ে করেন এবং কার্যত ১৬৩৩-এর পর রাজনৈতিক কার্যকলাপ থেকে বিদায় নেন। জীবনের শেষ সাত বছর গৃহসুখ যেমন ভোগ করেছেন তেমনি পুরোপুরি ছবি আঁকার কাজেও নিজেকে সঁপে দেন।

দরবারী বারোক শৈলীর সঙ্গে ক্যাথলিক কাউন্টার রিফর্মেশনের মূল অনুভূতিটিও ফুটে উঠল 'ক্রুশ থেকে অবতরণ' ছবিতে। ফ্রান্সের রানী মারি দ্য মেদিচির ফরমাসে রানীর জীবনের নানা ঘটনা নিয়ে যে একরাশ রূপককাহিনীমূলক ছবি আঁকলেন তা ফ্রান্সের চিত্রকলায় ফ্লেমিশ বারোক রীতির প্রসার ঘটাল। পরবর্তীকালে গোটা আঠার শতক ধরে ফরাসী চিত্রকররা লুক্সেমবুর্গে যেতেন এই ছবিগুলো স্টাডি করার জন্যে ঠিক যেমন গোড়ার যুগের ইতালিয় শিল্পীরা যেতেন ফ্লোরেন্সে ব্রানকাচ্চি চ্যাপেলে মাজাচ্চিওর (Thomaso Guidi Masaccio, ১৪০১ ?—১৪২৮) ফ্রেস্কো স্টাডি করতে। উত্তরাঞ্চলের বারোক রীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার একক কৃতিত্ব রুবেন্সের। পরবর্তীকালের ওয়াত্তো (Jean Antoine Watteau ১৬৮৪-১৭২১) থেকে দ্যলাক্রোয়া (Eugène Delacroix, ১৭৯৯-১৮৬৩), এমন কি আমাদের কালের শিল্পীরাও বারবার তাঁর রচনাকর্মের উল্লেখ করে থাকেন। তাঁর শেষ বয়সের কাজের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল ভূদৃশ্যের ছবি। সুখ সমৃদ্ধির মাঝখানে জীবনযাপনের ছাপ এইসব ছবিতে উজ্জ্বল। বলা হয় ভূদৃশ্যের ছবি হয় দু রকমের। এক ধরনের ছবি আমাদের আত্মার শান্তি ও প্রাণের আরাম দেয়, আর এক ধরনের ছবি আমাদের উল্লসিত করে। রুবেন্সের আঁকা ভূদৃশ্যের ছবি এই শেষের জাতের। প্রকৃতির প্রতি তাঁর মনোভাবে অতীন্দ্রিয়বাদের কোনো লক্ষণ নেই; নিঃশঙ্কচিত্তে এক শক্তিমানের প্রতি আর এক শক্তিমানের সশ্রদ্ধ বন্ধুত্বপূর্ণ প্রগল্‌ভতা নিয়ে প্রকৃতিকে তিনি দেখেছেন। নিজের বসবাসের জায়গায় আশপাশের গ্রামীণ দৃশ্যের ছবিই তিনি বেশি এঁকেছেন যার মধ্যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতি ভালোবাসার সঙ্গে সুন্দর ও সুশৃঙ্খল এক ভূসম্পত্তির মালিক হিসেবে আপন পরিতৃপ্ত গর্বেরও চিহ্ন বর্তমান। তাঁর আঁকা এই সব ছবি ভবিষ্যতের ডাচ শিল্পী হব্বেমা (Meindert Hobbema, ১৬৩৮-১৭০৯) এবং ইংল্যান্ড ও হল্যান্ডের 'ন্যাচারাল পেন্টার্স' বা প্রকৃতিবাদী চিত্রকরদের পূর্বসূরী।

তরুণদের অনেকেই রুবেন্সকে অনুসরণ করতেন, তার মধ্যে অ্যান্টনি ভান ডাইকের (Antony Van Dyck, ১৫৯৯-১৬৪১) জন্ম আন্তোয়ার্পেই। ১৬১৮তে রুবেন্সের স্টুডিওতে শিক্ষার্থী হয়ে এলেও মানসিক গঠনের দিক থেকে রুবেন্সের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য ছিল প্রচুর। ১৬২০-তে রুবেন্স তাঁকে বললেন ইতালি যেতে। সেখানকার শিল্পরীতি বিশেষ করে তিশিয়ানের প্রভাব পড়ল এই কাব্যধর্মী শিল্পীর উপর। সেখানকার শিক্ষা ও মার্জিত রুচি তাঁর পোর্ট্রেট আঁকায়

প্রকাশ পেল এবং এই কাজে তাঁর বৈশিষ্ট্য সকলেই অনুসরণ করতে থাকলেন। কেবল মার্জিত ভাবই নয় ছবির মানুষটির চরিত্রের গভীরে ঢুকে সেটিকে ফুটিয়ে তোলার মতো প্রগাঢ় অন্তর্ভেদী মনস্তাত্ত্বিকসুলভ দৃষ্টিশক্তিও তাঁর ছবির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মানুষের শরীরই শুধু নয় তার আত্মাকেও ফুটিয়ে তোলার কাজে তাঁকে অতিক্রম করতে কেউ পারেন নি। আর পূর্বসূরীদের মধ্যে এই ক্ষমতা দেখা যায় একমাত্র বোত্তিচেল্লিতে (Sandro Botticelli, ১৪৪৫-১৫১০)।

১৫৬৮ সালে স্পেনের সঙ্গে হল্যান্ডের বিরোধ ব্রাবান্ট অঞ্চলে সামরিক রূপ নিল। স্থানীয় অধিবাসীদের দিক থেকে আপাত দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ হতাশাজনক এই সংগ্রাম কিন্তু আশি বছর ধরে চলতে থাকে এবং শেষ অবধি উদ্ধত স্পেন ডাচ প্রজাতন্ত্রের স্বাধীনতাকে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়। স্পেনীয় পক্ষের শেষ জয়লাভের ঘটনাটি অমর হয়ে আছে ভেলাসকেথের আঁকা 'দি সারেন্ডার অব ব্রেডা' ছবিতে। বিজয়ী স্প্যানিশ সেনাপতি স্পিনোলা বিজিত ডাচ সেনাপতি জুস্তিনের কাঁধে প্রায় স্নেহপরবশ ভঙ্গিতে হাত রেখেছেন। আর বিজিত সেনাপতি বিষণ্ণভাবে কিন্তু সশ্রদ্ধ মর্যাদার সঙ্গে শহরে প্রবেশের চাবিটি বিজয়ীর হাতে তুলে দিচ্ছেন।

১৫৭২-৩এর শীতকালে স্প্যানিশ সেনাবাহিনী আমস্টার্ডামের সামান্য পশ্চিমে হার্লেম শহর অবরোধ করল। সাত মাস ধরে এই অবরোধ চলে। পৃথিবীসুদ্ধ না হলেও অনেক লোক মনে করেন তার অল্প কিছু আগে এই শহরের বার্জার পিয়েতার হাল্স্ যেদিন তাঁর স্ত্রী ও পরিবারের লোকজনদের নিয়ে এসে আন্তোয়ার্পে আশ্রয় নেন সেটি বড়ো সৌভাগ্যের দিন। পতনের আগে শহর রক্ষার যুদ্ধে অন্যান্য বীর ডাচদের মতো তিনি হয়তো প্রাণ দিতেন কিন্তু পৃথিবী বঞ্চিত হত ফ্রানজ হালসের (Frans Hals, ১৫৮০-১৬৬৬) শিল্পকর্ম থেকে। আন্তোয়ার্পে জন্মগ্রহণ করলেও সম্ভবত ১৬০০ সালের আগেই তিনি বাবা মায়ের সঙ্গে আবার ফিরে যান নিজেদের সেই হার্লেম শহরে। ১৬৬৬তে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত এই শহরেই হাল্স্ নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর শিল্পকর্ম করে যান। সামাজিক প্রতিষ্ঠালাভের সঙ্গে সঙ্গে হার্লেমের শিল্পী ও কারিগরদের স্বার্থরক্ষায় যত্নবান গিল্ড অব সেন্ট লুকাসের পরিচালক হিসাবেও এই কর্তব্যের দায়িত্বভার নেন চৌষট্টি বছর বয়স হওয়া সত্ত্বেও।

হালসের শিল্পকর্মের বিচার যাঁরা করেছেন তাঁরা সকলেই জানেন যে তাঁর পরিণত বয়সের রচনার পটভূমিতে ছিল ক্রমাগত যুদ্ধের দামামা। নিজের নিজের ঘরবাড়ি রক্ষা করার আপাত অসম্ভব যুদ্ধ থেকে বিদেশী শাসন থেকে পিতৃভূমিকে মুক্ত করার যুদ্ধে পরিণত করলেন ডাচরা এই প্রতিরোধ সংগ্রামকে। ইউরোপের ক্ষুদ্রতম একটি দেশের পক্ষে বিশাল এক সাম্রাজ্যের শক্তিকে সরাসরি দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহবান করার এই অমিত স্পর্ধা পৃথিবীর ইতিহাসে পরবর্তীকালের সমস্ত নিপীড়িত মানুষের কাছে এক দিগদর্শক শিক্ষা হয়ে থাকল। জয়পরাজয় সম্পর্কে প্রথম দিকের সন্দেহ-শঙ্কা ফুটেছে তাঁর ১৬১৬তে আঁকা সেন্ট জরিসেস শুটিং গিল্ডের অফিসারদের প্রথম ছবিতে, যুদ্ধের ফলাফল তখনও অনিশ্চিত। ১৬৩৯-এ এই সিরিজের শেষ ছবিটি যখন আঁকছেন হল্যান্ডের চূড়ান্ত জয়লাভ তখন শুধু ঘোষণা করাটাই যা বাকি। ১৬৩৩এর 'সেন্ট আদ্রিয়ানের তীরন্দাজদের গিল্ডের অফিসারদের পুনর্মিলন' ছবিতেও সকলের মুখ চোখে এই আনন্দের প্রকাশ। অথচ কেউ হাসছে প্রফুল্ল মনে, কেউ বা গম্ভীর ও কঠোর মূর্তি, দু-একজন তো স্পষ্টতই আহ্লাদে আটখানা, কিন্তু সকলের মনেই জয়লাভ সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস, উদ্‌বেগের কোনো চিহ্ন

সেখানে নেই, শিল্পীর তুলির টানেও একই আস্থা ও নির্ভুলতা। চূড়ান্ত বিজয়ের প্রায় পঁচিশ বছর আগে ১৬২৪ সালে হালসের সেই বিখ্যাত 'দি লাফিং ক্যাভেলিয়ার' ছবিতে মানুষের মুখভাবের যে অসাধারণ গতিকে তিনি তুলিতে ফুটিয়েছেন তার ফলে কখনও মনে হয় অশ্বারোহী বুঝি তীব্র ঘৃণাভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন, কখনও আবার মনে হয় সহাস্যমুখে উপভোগ করছেন আশপাশের ব্যাপার। পরবর্তীকালের 'নার্স অ্যান্ড চাইল্ড' ছবিতেও দেখা যায় হালসের এই ক্ষণস্থায়ী পলাতকা মনোভাবকে ছবিতে ধরে রাখার অপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতা। মনে হয় শিশুটি বুঝি হাসিতে ফেটে পড়বে এখনই। সম্ভবত বাড়িতে নিজের শিশুসন্তানদের লক্ষ্য করার অভ্যাস থেকেই এই গুণটি চর্চার সুযোগ তাঁর হয়েছিল।

অনতিকাল পরেই এলেন রেমব্রান্ট (Rembrandt van Rijn, ১৬০৬-১৬৬৯)। দুজনের মধ্যে প্রথমেই যে পার্থক্যটা নজরে পড়বে তা হল হালসের রচনাকর্মের বেশির ভাগ সময়টাতেই ডাচরা যুদ্ধে ব্যস্ত ছিল, আর রেমব্রান্টের পরিপক্কতা এসেছে শান্তিস্থাপনের পরে এবং তার পরেই তাঁর শ্রেষ্ঠ ছবিগুলো আঁকা হয়েছে। হল্যান্ড তখন তার রাজনৈতিক লাভালাভের গুরুত্বই শুধু নয় জীবনের নানা সমস্যা সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা করারও অবকাশ পেয়েছে। স্যার উইলিয়াম অরপেন (১৮৭৮–১৯৩১) বলেছেন, 'যুদ্ধরত হল্যান্ডের শৌর্য দেখিয়েছেন হাল্‌স্‌, রেমব্রান্ট দেখিয়েছেন তার মননের প্রগাঢ়তা।' কাকতালীয় হলেও, মনে হয় ডাচ দার্শনিক চিন্তা ও শিক্ষার পীঠস্থান লাইডেনের বিশ্ববিদ্যালয় শহরই যেন তাঁর উপযুক্ত জন্মস্থান। এমন কি লেখাপড়া শিখিয়ে পণ্ডিত করে তোলার উদ্দেশ্যেই তাঁকে ১৬২০ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানো হয়, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর অন্তর্নিহিত প্রবণতার সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটল। শিল্পকলা শিক্ষার জন্যে প্রথমে একজনের কাছে নবিশী করার পরে আমস্টার্ডামে সেকালের খ্যাতনামা পোর্ট্রেট-শিল্পী পিয়েতর লাস্টমানের (Pieter Lastman) কাছে পাঠানো হল তাঁকে। ফ্যাশনমাফিক পোর্ট্রেট আঁকা শিখতে ছ'মাসের বেশি সময় লাগল না। ১৬২৪ সালে লাইডেনে নিজের বাড়িতে ফিরে এসে নিজে নিজেই ছবি আঁকার কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। স্টাটগার্টে কিছুদিন থাকলেন। সেই সময়েই তাঁর প্রথম যুগের বিখ্যাত 'বন্দীশালায় সেন্ট পল' ছবিটি আঁকা হয় ১৬২৭ সালে। তাঁর কাজের বৈশিষ্ট্যগুলি সব এই ছবিতে বর্তমান, আবার ভবিষ্যতে তাঁর ছবিতে আলোর যে লক্ষণীয় প্রভাব দেখা যায় তারও পূর্বাভাষ এখানেই পাওয়া যায়। পোর্ট্রেট শিল্পী হিসেবে নাম ছড়িয়ে পড়তে থাকে, কাজও আসছে প্রচুর। তাই দেখে ১৬৩১ সালে রাজধানী আমস্টার্ডামে যাওয়াই স্থির হল। এদিকে এচিং-এর কাজেও কিছুটা নাম হয়েছে। সব থেকে বড়ো লাভ হল সাসকিয়া ভান উলিয়েনবার্গের ছবি আঁকার বরাত পাওয়া। ক্রমে দুজনের মধ্যে প্রেম ও শেষে নানা বাধা আপত্তি কাটিয়ে ১৬৩৪ সালে পরিণয়। শিল্পীর মনে যে আনন্দ ও স্ফূর্তির জোয়ার বয়ে গেল তার স্বাক্ষর আছে 'শিল্পী ও তাঁর প্রথমা স্ত্রী' ছবিটিতে। পরবর্তীকালে, ১৬৪২ সালে সাসকিয়ার মৃত্যুর পর থেকে সারা জীবন রেমব্রান্টের কেটেছে দুঃখে আর আঘাতে। এমন উৎফুল্লতার প্রবল প্রকাশ তাঁর অন্য কোনো ছবিতে দেখা দেয় নি। নাটকীয় মুহূর্তের ছবি একের পর এক তাঁর হাতে তৈরি হতে থাকল। দুঃখ ক্লিষ্ট মনে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়িয়েছেন সান্ত্বনার সন্ধানে। এচিং আর ভূদৃশ্যের বেশির ভাগ ছবিই আঁকা হয়েছে ১৬৪০ থেকে ১৬৫২র মধ্যে। ১৬৪৩ সালে একটু দূর থেকে আমস্টার্ডাম শহরের বিখ্যাত ভূদৃশ্যের ছবিটির নাম 'তিনটি গাছ'। আকাশে ঝড়ের মেঘ আর তার ছায়াকে মিলে

প্রকৃতির সেই মুহূর্তের বিশিষ্ট মেজাজ আর আলোর উজ্জ্বলতাকে ফুটিয়ে তুলেছে। ১৬৪৫ সালের 'সিক্সের সেতু' এচিংটিও আর এক দৃষ্টান্ত স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রকৃতির পলাতকা প্রসন্ন মুহূর্তটিকে ছবিতে ধরে রাখার অপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতার। পরিচিত প্রাত্যহিক জীবনের দৃশ্যের মধ্যে অসাধারণ অপরিচিতের পরিচয়কে ফুটিয়ে তোলায় রেমব্রান্টের কৃতিত্ব ভবিষ্যতের উনিশ শতকী রোমান্টিকতার পূর্বসূরী।

কষ্টের বিরাম নেই। ১৬৪৭ থেকে ১৬৫৩ সাল পর্যন্ত নানা অশান্তি পরিচারিকা হেনড্রিকিয়ে স্টফেলসকে বিয়ে করা ও তাকে আগের পক্ষের সন্তান তিতাসের ট্রাস্টি করার প্রশ্ন নিয়ে। এই নারী অবশ্য শিল্পীর জীবনকে নানা দিক দিয়ে পূর্ণ করে তুলেছেন তাঁর মহৎ চরিত্র ও স্বার্থশূন্য সেবা দিয়ে। ১৬৫৬তে রেমব্রান্ট যখন দেউলিয়া হয়ে গেলেন এই নারী তখন শুধু তাঁর দুঃখেরই অংশীদার মাত্র ছিলেন না, ধীরে ধীরে সংসারকে আবার স্বচ্ছল করে তুললেন তাঁর সুচিন্তিত গৃহিণীপনা দিয়ে। একের পর এক ছবি এঁকে যান রেমব্রান্ট, নিজের মুখের ছবিই আঁকেন বারবার। এই সব ছবিতে শুধু তাঁর টেকনিকের ওপর উত্তরোত্তর দখলের পরিচয়ই নয়, মনুষ্যচরিত্রের এবং তার আবেগময় মুহূর্তের নানা বিচিত্র ও সূক্ষ্ম জটিলতাকে তীক্ষ্ণ ও নিবিড়ভাবে ফুটিয়ে তোলার ক্ষমতার পরিচয়টিও প্রকাশিত। বিখ্যাত চিত্র-সমালোচক স্যার জন এভারেট মিলেইস (Sir John Everett Millais) লিখেছেন, 'ক্ষমতার পরিপূর্ণ বিকাশের ফলে তাঁর প্রথম যুগের অনুপুঙ্খবহুল রচনাভঙ্গির সুবিধাগুলো বজায় থাকলেও তাঁর তুলির ব্যাপ্তি ও নমনীয়তার (breadth and facility) বিরাট ওড়নার আড়ালে সব কিছু—চিত্রাঙ্কনবিদ্যার গোটা বিজ্ঞানটাই ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। বেশ কিছুদিন মানুষের লেগেছিল এই কথাটা বুঝতে যে একক বা গ্রুপ পোর্ট্রেট আঁকার ক্ষেত্রে রেমব্রান্টের কাজ তুলনাবিহীন।'

১৬৪৮ সালে 'ম্যুনস্টারের শান্তির' মধ্যে দিয়ে ডাচ প্রজাতন্ত্রের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ঘটনাটি আর এক ডাচ শিল্পী টেরবুর্গের (Gerard Terborch বা Terburg, ১৬১৭-৮১) তুলিতে চুক্তি সই করার ব্যাপারটির মধ্যে ধরা আছে। প্রোটেস্ট্যান্ট ডাচ প্রতিনিধিরা হাত তুলে আর রোমান ক্যাথলিক স্পেনের ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি স্থানীয় অফিসাররা বাইবেল হাতে নিয়ে চুক্তি সমর্থন করলেন। কিন্তু ঐতিহাসিক ঘটনাদির ছবিতে নেদারল্যান্ডসের চিত্রকরদের শ্রেষ্ঠ ক্ষমতার প্রকাশ ঘটে নি। হল্যান্ডের শিল্প না চার্চভিত্তিক, না রাষ্ট্রভিত্তিক, তা হল গার্হস্থ্য শিল্প। বড়ো বড়ো প্রাসাদে বা গির্জায় টাঙানোর জন্যে নয়, তা তৈরি হত সাধারণ গৃহস্থ নাগরিকদের বাড়িতে টাঙানোর জন্যে। দেশপ্রেমের জোয়ারে এবং গণতন্ত্রপ্রিয়তার জয়লাভে আশ্চর্য শিল্পচর্চার বিকাশ দেখা গেল। এই সময়কার অসংখ্য ডাচ চিত্রকরের নামই রটে গেল 'ক্ষুদে ওস্তাদের দল' ('Little Masters') হিসেবে। ডাচ চিত্রকলায় পরবর্তীকালে যে পরম বাস্তবধর্মিতার আবির্ভাব ঘটার ফলে শিল্পীরা সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার নানা দিককে তাঁদের ছবির বিষয় করে তুলেছিলেন তার উল্লেখযোগ্য পূর্বসূরী হলেন আদ্রিয়ান ব্রাউয়ার (Adrian Brouwer, ১৬০৫-৩৮) এমন কি নিতান্ত তুচ্ছ দৈনন্দিন ঘটনাও এঁর হাতে সকৌতুক সজীবতায় সুসংহতভাবে প্রকাশ পেত, তার সঙ্গে দেখা গেছে স্বকীয় বিশিষ্টতায় উজ্জ্বল এনামেলের মতো বর্ণের বিন্যাস শোভা। কামারশালা বা ঐ জাতীয় কোনো জায়গায় কাজ উপলক্ষ্যে আসা ভব্যতায় খাটো কোনো মানুষ হয়তো দেয়ালে ঠেস দিয়ে ঘুমিয়েই পড়েছে। সেটাও যে ছবির বিষয় হিসেবে তুচ্ছ নয় ব্রাউয়ার তা দেখিয়ে দিয়েছেন।

যেসব ডাচ চিত্রশিল্পী এই যুগে গার্হস্থ্য জীবনের ছবি এঁকেছেন তাঁরা সকলেই হাল্স্ বা রেমব্রান্টের শিষ্য। এঁদের মধ্যে জেরার্ড ডাউ (Gerard Dou, ১৬১৩-৭৫) জাগতিক উন্নতির দিক থেকে সকলের চেয়ে বেশি সফল হলেও টেরবুর্গ, দ্য হুগ (১৬২৯-১৬৭৭) বা ইয়ান ভেরমের (Jan Vermeer, ১৬৩২-৭৫), নিকোলাস মায়েস (Nicholas Maes ১৬৩২–৯৩), গাব্রিয়েল মেটস্যু (Gabriel Metsu ১৬৩০-৬৭) এঁরা সকলেই ছবির সামগ্রিক ঐক্যের মধ্যে ডিটেলসের নতিস্বীকারের ব্যাপারে তাঁর থেকে বেশি দক্ষ ছিলেন। টেরবুর্গ অবশ্য হল্যান্ডের বাইরে অন্যান্য দেশ থেকেও সম্পদ আহরণ করেছেন নিজস্ব স্টাইল গড়ে তুলতে। ইংল্যান্ড, জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি স্পেন সর্বত্রই তিনি গেছেন। স্পেনের ভেলাসকেথের ছবি তো নিশ্চয়ই তিনি পর্যালোচনা করেছেন। অন্যান্য বেশিরভাগ ডাচ শিল্পীর বিপরীতে মেজাজের দিক থেকে ভেলাসকেথের মতোই তিনি ছিলেন অভিজাতপন্থী, সমাজের উচ্চতর স্তরের মানুষের ছবিও তিনি অন্যান্য ডাচ শিল্পীদের তুলনায় অনেক বেশিই এঁকেছেন। তা সত্ত্বেও এটা লক্ষণীয় যে এই যুগের ডাচ শিল্পীরা সকলেই কিন্তু দেশের সমসাময়িক কালের মানুষদের জীবনযাপনের রীতিনীতির ছবি আঁকার দিকেই বিশেষ নজর দিয়েছেন। সেদিক থেকে এঁদের ছবির একটা স্থায়ী ঐতিহাসিক মূল্য গড়ে উঠেছে। ভেতর বাড়ি, উঠান, পানশালা, কথোপকথন বা প্রসাধন দৃশ্য, পোশাক পরিচ্ছদ এইসব দিকে বিশেষ আগ্রহ ফুটে উঠেছে তাঁদের ছবিতে। টেরবুর্গকে বাদ দিলে অন্যান্য যাঁরা মধ্যবিত্ত ও কৃষক সম্প্রদায়ের মানুষের জীবনযাত্রার ছবি এঁকেছেন তাঁদের মধ্যে ইয়ান স্টেনের (Jan Steen, ১৬২৬-৭৯) মধ্যে প্রায়ই দেখা যায় এক সকৌতুক বিদ্রূপাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি। আদ্রিয়ান ভান ওস্তাদে (Adrian van Ostade, ১৬০০-৮৫) এবং টেনিয়ার্সের (Fleming David Teniers, ১৬১০-৯০) মধ্যেও এই বিশেষ দিকটি প্রবল।

টেরবুর্গের প্রতিদ্বন্দ্বী হলেন দ্য হোখ (Peter de Hooch)। স্পষ্ট আলোয় আদর করে আঁকা এঁর ছবি অবশ্য অভিজাত সম্প্রদায়ের মানুষের জীবনযাত্রার নয়। 'সূর্যের আলোকে বোতলে পোরার একমাত্র সমস্যাটিতেই তাঁর প্রধান আগ্রহ', বলেছেন স্যার ওয়াল্টার আর্মস্ট্রং। ঘরের ভেতরে জিনিসপত্র, মানুষ জন সর্বত্র দূরত্ব অনুযায়ী আলোর যে আনুপাতিক বণ্টন তা মিলেছে প্রতিটি সামগ্রীকে নিখুঁতভাবে আঁকার সঙ্গে। 'পাঠরতা মেয়ে' 'ডাচপরিবারের গৃহাভ্যন্তর' ইত্যাদি ছবি তার দৃষ্টান্ত। টাটকা তেল রঙ ব্যবহারে এতটুকু কমতি হলে কালে সেই ত্রুটি ঠিক ওপরে ভেসে উঠবে। দ্য হোখের মতো এমন নিখুঁতভাবে আঁকার ও রঙ লাগানোর ব্যাপারে সজাগ শিল্পীরও কোনো কোনো ছবিতে ভুলচুক ঢাকা দেওয়ার চেষ্টার প্রমাণ পাওয়া গেছে শেষের ছবিটিতে।

ভেরমেরের হল্যান্ড কিন্তু ততদিনে রক্ষণশীল, মধ্যবিত্ত প্রধান এক প্রোটেস্ট্যান্ট গণতন্ত্র হয়ে উঠেছে। অন্যান্য যে কোনো বৃত্তির মানুষের মতো চিত্রশিল্পীও অবাধ প্রতিযোগিতার বাজার ব্যবস্থায় অংশ হয়ে উঠেছেন। সংগঠিত চার্চের দিন শেষ হয়ে গেছে, সেখান থেকে আর কাজের ফরমাস আসে না। বরং ধর্মীয় শিল্পকে বাঁকা চোখেই দেখা হয়। আবার দরবারী অভিজাত সম্প্রদায়ের গুরুত্বপূর্ণ পৃষ্ঠপোষকতারও অন্তর্ধান ঘটেছে। আধ্যাত্মিক অনুভূতি এখন সাধারণ সামগ্রীকে আরও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ কিছু সামগ্রীতে পরিণত করার দিকে প্রবাহিত করা হল। ভেরমের তার দৃষ্টান্ত। আধ্যাত্মিক ধ্যানধারণা ও আবেগকে আরও বেশি জাগতিক স্তরে নামিয়ে আনার চেষ্টা করেছিলেন

রেমব্রান্ট। দুটি দৃষ্টিভঙ্গিই ভান আইকের (Jan van Eyck, ১৩৮০/৯০?—১৪৪১) আমল থেকে ইউরোপের উত্তর পশ্চিম প্রান্তের এই নিম্নভূমি অঞ্চলে দুশ' বছর ব্যাপী যে ইতিহাস চলে এসেছে তারই অংশ। এদিকে শিল্পীর সংখ্যা যাতে বিপুলভাবে বেড়ে না যায় তার জন্যে রাজতন্ত্রী দেশগুলোতে যে সাবেকী গিল্ড প্রথা ছিল তা এখানে ভেঙে পড়েছে। ফলে বাজারে ছবি আর শিল্পী দুইয়েরই জোগান বেড়েছে। বণিক সম্প্রদায়ের ওপরেই চিত্রশিল্পীদের নির্ভর করতে হবে। অথচ সংস্কৃতি ও রুচির দিক থেকে বণিকরা তখনও সূক্ষ্মতার ব্যাপারটা আয়ত্ত করতে পারে নি। হাল্‌স্‌, রেমব্রান্ট বা অন্যান্যদের মতো ভেরমেরকেও তাই যথেষ্ট আর্থিক অনটন সহ্য করতে হয়েছে। তোরে (Thoré উনিশ শতকে এক নির্বাসিত ফরাসী মনীষী) হল্যান্ডে যখন বছর তিনেক বসবাস করেন সেই সময়ে এই দেশের সংগ্রহশালায় ঘুরে ঘুরে ভেরমেরের ছবির সন্ধান করেন। তোরের পর্যালোচনা প্রকাশ হওয়ার পর ভেরমেরের খ্যাতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। পুরানো ওস্তাদদের মধ্যে যাঁদের ছবির দাম বর্তমান শতকে আকাশছোঁয়া হয়েছে ভেরমের তাঁদের অন্যতম। তাঁর ছবিতে রঙের বৈপরীত্য ও মাধুর্য যেমন উপছে পড়েছে তেমনি তাতে আলোর সৌন্দর্য। ব্যাখ্যার অতীত এই বৈশিষ্ট্য। 'দি অফিসার অ্যান্ড দি লাফিং গার্ল' ছবিতে ঘরের মধ্যে টেবিলের পাশে বসে থাকা বর্ণাঢ্য পোশাকে সজ্জিত এই মানুষ দুটিকে ঘিরে আছে ঘরজোড়া এক উষ্ণ পরিবেশ, দুজনেই মর্যাদাসম্পন্ন, দুজনেই আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। ছবির বিভিন্ন অংশ মিলে গেছে এক অপূর্ব ঐক্যে। সমকালীন শিল্পের সঙ্গে তার সম্পর্কটিও লক্ষ করা যায় দূরত্ব আর অনন্ত দুটিকেই সুস্পষ্ট ভাবে জাগিয়ে তোলার মধ্যে। দিনের আলো আসছে জানালা দিয়ে কত লক্ষ মাইল দূর থেকে, পৃথিবীজোড়া বাণিজ্যব্যস্ত এক সমৃদ্ধিশালী জাতি হিসেবে ডাচদের পরিচয় টাঙানো মানচিত্রে প্রতীকায়িত। বাইরে থেকে আসা আলোর বন্যায় পানীয় সামনে নিয়ে কথোপকথনরত মানুষ দুটিকে ভিত্তি করে অন্য কোনো সাংস্কৃতিক পরিবেশ ক্লাসিক্যাল বা পবিত্র দৃশ্যও আঁকা সম্ভব হতে পারত। বলেছেন বার্নার্ড মায়ার্স (Bernard Meyers)। আবাব 'হেড অব এ ইয়ং গার্ল' ছবিতে শিল্পী তাঁর প্রিয় আসমানী আর লেবু হলুদ রঙের বৈপরীত্য ঘটিয়ে চিরকালের এক প্রফুল্লতার মূর্তি করে তুলেছেন মেয়েটিকে। রঙ তাঁর হাতে হয়ে উঠেছে গীতিকবিতার সুর নিজস্ব যার লাবণ্য।

'দি পার্ল নেকলেস' ছবিতেই হোক বা 'জলের জগ ও যুবতী মেয়ে' ছবিতেই হোক জানালা দিয়ে আসা রোদের টুকরো বা আলো ঘরের সব কিছুতেই প্রতিফলিত, দেয়ালে, পোশাকে, গহনার বাক্সে বা নীল কুশনে। আশপাশের জিনিসের পরস্পরের ওপর প্রভাব সম্বন্ধে এই সজাগতা প্রায় ইম্প্রেশনিস্ট চিত্রকরদের সমগোত্রীয়। দি হেগ শহরের 'ভিউ অব ডেল্‌ফট্‌' ছবিতে আলো-বাতাস ভরা মুক্ত আকাশের বোধ জাগিয়ে তুলেছেন অনবদ্যভাবে। চোখে দেখা কোনো কোনো সামগ্রী বা দৃশ্য এর থেকে সত্য এর থেকে স্বাভাবিক বুঝি হয় না। এ যেন এক অতি পরিচ্ছন্ন শহর, সূর্য তার প্রথম কিরণ উত্তরীয় বুলিয়ে দেওয়ার আগেই প্রতিদিন সেখানকার সমস্ত রাস্তাঘাট ঘরদোর পরিষ্কার ঝকঝকে তকতকে করে রাখা হয়।

গাবিয়েল মেট্‌সুর ছবির কোমলতা অনেক সময় ভেরমেরের ছবির কাছাকাছি। 'বিস্মিত পত্রলেখক' ছবিতে রঙের যে কোমলতা ফুটেছে তার পাশে টেরবুর্গের ছবিও সামান্য কঠোর মনে হয়, বলেছেন স্যার উইলিয়াম অরপেন। মেটসুর থেকে অপেক্ষাকৃত কম গুণসম্পন্ন হলেও

রেমব্রান্টের অন্য এক শিষ্য নিকোলাস মায়েস পোর্ট্রেট ছবিতে এবং কাহিনীমূলক ছবিতে যেমন ধরা যাক 'অলস ভৃত্য' ছবিটিতে নাটকীয় মুহূর্ত ফুটিয়ে তোলার কাজে আলোর ব্যবহারের ক্ষেত্রে গুরুর কথাই স্মরণ করিয়ে দেন।

সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা এবং ভূদৃশ্যের ছবি এই দুইয়ের মাঝামাঝি আর এক ধরনের ছবি সতের শতকের ডাচ চিত্রকলার মধ্যে লক্ষ করা যায়। এই দুই ধারার মধ্যে যাঁরা সেতুবন্ধন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ইয়ান ভান গইয়েন (Jan van Goyen, ১৫৯৬-১৬৫৬) এবং আর্ট ভান ডার নের (Aart van der Neer ১৬০৩-৭৭) উল্লেখযোগ্য। প্রথম জন ভূদৃশ্যের ছবি আঁকার ক্ষেত্রে ডাচ শিল্পীদের মধ্যে পথিকৃৎ, আবার সেই পটভূমিতে ছোটো ছোটো মনুষ্যমূর্তি এমনভাবে এঁকেছেন যাতে হল্যান্ডের সতের শতকের মানুষের জীবনযাত্রা সম্পর্কেও প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়, যেমন 'স্কেটিং-এর দৃশ্য' ছবিটি। ড. উইলিয়াম বোডে 'শীতকালীন ভূদৃশ্যর নিখুঁত ছবি' বলে এটিকে প্রশংসা করেছেন। কৃষিভিত্তিক জীবনযাত্রার গোরুবাছুর এক বিশিষ্ট রূপ পেয়েছে পল পটারের (Paul Potter ১৬২৫-৫৪) এবং আলবার্ট কুইপের (Albert Cuyp ১৬২০-৯১) ছবিতে। কুইপের ছবিতে অবশ্য মাথার ওপরের এই বিশাল আকাশের মহিমা প্রকাশের ব্যাপারেই বেশি আগ্রহ দেখা যায়। আলোর দীপ্তি আর সোনালী রঙের ব্যবহারে কুইপ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আকাশচিত্রীদের অন্যতম। ভূদৃশ্যের ছবি আঁকার ক্ষেত্রে জ্যাকব ভান রুইজডায়েল (Jacob van Ruisdael ১৬২৮-৮২) এই শতকের সমস্ত ডাচ শিল্পীদের মধ্যে কঠোরভাবে অনাড়ম্বর ও মহিমাময় এক স্বতন্ত্র মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। প্রকৃতির হেন দিক নেই যার ছবি তিনি আঁকেন নি। তবে যৌবনে প্রকৃতির অপেক্ষাকৃত শান্ত দিকটির ছবিও তিনি এমন সুচারুভাবে এঁকেছেন যে মনে হয় না কুইপের থেকে তিনি আট বছরের ছোটো এবং কোনো দিন তিনি তরুণ ছিলেন। এমন কি সরল সাদামাটা 'শেভেনিনগেনের সমুদ্রতীর' (The Shore at Scheveningen) ছবিটিও যখন এঁকেছেন আকাশে ঘনায়মান মেঘের পদসঞ্চারে এক নাটকীয় সান্দ্রতার সৃষ্টি হয়েছে যেখানে নীচের উত্তেজিত সমুদ্রের অস্থিরতাই আবার উচ্চারিত হয়েছে। আবার 'দি মিল' ছবিটি আপাতদৃষ্টিতে যতই স্তব্ধ হোক না কেন ঝড়ের আগের স্তব্ধতা তো আমরা আকাশ দেখেই অনুভব করতে পারি। এক বিষাদময় গুরুত্ব তাঁর অতি সাধারণ ও সাদাসিধা ভূদৃশ্যের ছবিতেও বিরাজ করে। কুইপের থেকে তাঁর ছবির পার্থক্য বোঝাতে মার্কিন চিত্রকর জন লা ফার্জ (John La Farge) বলেছেন এ যেন ছায়ার সঙ্গে সূর্যালোকের পার্থক্য। দেব মন্দিরে ভক্ত পূজারীর মনোভাব নিয়ে রুইজডায়েল যদি প্রকৃতিকে দেখে থাকেন তাঁর শিষ্য হব্বেমা যেন আনমনে অনায়াস পদক্ষেপে নিজের বাড়িতে ঢুকছেন। একই বিষয় বার বার তিনি এঁকেছেন। ন্যাচারালিজমের প্রতি তাঁর বিনম্র নিষ্ঠা এমন এক দৃঢ় প্রত্যয় ও সতেজতার সঙ্গে ফুটে উঠেছে যাতে গ্রামাঞ্চলের রোদ ঝলমল দিন ও খোলা হাওয়ার পরিবেশে প্রত্যেকের মনে যে প্রফুল্লতার সঞ্চার হয় তা প্রকাশ পেয়েছে। ইংল্যান্ডের ভূদৃশ্য চিত্রশিল্পীদের ওপর এর প্রগাঢ় ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়েছিল। গেনসবরো (Thomas Gainsborough ১৭২৭-৮৮) বা নরউইচ সোসাইটি অব আর্টিস্টস স্থাপনের প্রধান উদ্যোক্তা জন ক্রোম (John Crome ১৭৬৮-১৮২১) তো বার বার হব্বেমার প্রতি তাঁদের ভালোবাসা কথায় ও কাজে প্রকাশ করেছেন।

জলপথে ডাচরা চিরকালই এক শক্তিশালী জাতি। তাদের জীবনযাত্রা নির্বাহের এক

উল্লেখযোগ্য উপায় হল নৌবাণিজ্য ও জাহাজ মেরামতি। জাহাজের কাপ্তান আর কোম্পানির মালিকরা স্বভাবতই যে প্রাকৃতিক শক্তির সঙ্গে যোঝাযুঝি করে তাকে জয় করার স্পর্ধা রাখে ছবিতে তার প্রতিফলন দেখতে আগ্রহী। ব্যাবসাবাণিজ্যে সমৃদ্ধির ফলে এখন তাদের হাতে অর্থও পর্যাপ্ত। তাছাড়া ডাইক বেঁধে সমুদ্রকে বরাবরই এখানকার মানুষকে শাসনে রাখতে হয়েছে। ফলে ভূদৃশ্যের সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রদৃশ্য ও জাহাজ-জাহাজীদের ছবিও চিত্রকররা আঁকতে থাকলেন। ডুবেলস (Henrick Dubbels ১৬২০-৭৬); তাঁর শিষ্য ও আরও বেশি বিখ্যাত বাখুইৎজেন (Ludolf Bakhuizen, ১৬৩১-১৭০৮) এই ধরনের ছবি আঁকায় সতের শতকের ডাচ চিত্রকলাকে পারদর্শিতার শিখরে নিয়ে গেছেন। বাখুইৎজেনের সামুদ্রিক ঝড়ের ছবি দেখে অবশ্য সমালোচক রাস্কিন (John Ruskin, ১৮১৯-১৯০০) বলেছিলেন প্রাকৃতিক ঝড়ের থেকে একে বরং মেলোড্রামাই বলা যায়, কিন্তু সেকথায় পরবর্তীকালের দর্শক বিভ্রান্ত হন নি। ভান ডে ভেলডে (ছোটো)র (Willem Van de Velde, Younger, ১৬৩৩-১৭০৭) ছবিতে কিন্তু শান্ত সমুদ্রের রূপ এমন সৌন্দর্য ও মহিমায় ফুটে উঠেছে যে পৃথিবীর সমস্ত নাবিকের মনকেই তা মুহূর্তে জয় করে নেয়। কদাচিৎ মেঘডম্বর আকাশের নীচে উত্তাল সমুদ্রের বুকে ঝড়ের প্রচণ্ডতা আঁকার চেষ্টা করলেও মত্ত ঝটিকার হা-হা রবে ছুটে আসা প্রলয়ঙ্কর মূর্তি তিনি নিখুঁতভাবে ফুটিয়েছেন যা দেখে দর্শকের মন উত্তেজনায় ভরে ওঠে। 'এ গেল' ছবিতে বুক-কাঁপানো মেঘলা আকাশের নীচে ঝড়ের দাপটের মুখে সমুদ্রের বুকে দক্ষ নাবিকের নৌচালনা বুক চেতিয়ে দাঁড়ানো দুঃসাহসী নাবিক জীবনের কথা মনে করিয়ে দেয়। ভেলডে পিতাপুত্র দুজনেই অবশ্য পরবর্তীকালে আমস্টার্ডাম ছেড়ে ইংল্যান্ডে গিয়ে বসবাস করেন এবং সেখানকার রাজা দ্বিতীয় চার্লসের কাজে নিযুক্ত হন। ফলে টার্নার (J. M. W. Turner ১৭৭৫-১৮৫১) প্রমুখ পরবর্তী অনেক ইংরেজ শিল্পীর মডেল হিসেবে তাঁর ছবি সেই দেশের চিত্রকলার উপর প্রভাব বিস্তার করে।

এইকালে 'স্টিল লাইফ' এবং ফুলের ছবিরও আশ্চর্য বিকাশ ঘটে। কত রকমের দুর্লভ ফুল ছাড়াও বিশেষ করে টিউলিপ, পূর্বদেশ থেকে প্রথম আসা কমলা ও লেমন জাতীয় দুর্লভ ফল আর আমেরিকা থেকে আসা তামাক ও ধূমপানের সামগ্রী এবং অন্যান্য নানা গার্হস্থ্য জীবনযাত্রার সামগ্রী, খাদ্য পানীয়, ঘরসাজানোর জিনিস সব কিছুই পরিপাটি করে আঁকা হতে থাকল আঠারো শতকের হুইজুম (Jan van Huysum ১৬৮২-১৭৮৯) বা মহিলা চিত্রকর রাচেল রুইশের (Rachel Ruysch ১৬৬৪-১৭৫০) কাল পর্যন্ত। একজন সুকৌশলে তাঁর ছবিতে এক প্রজাপতি নিয়ে আসেন তো অন্যজন এক ছোট্ট শামুক বা এক ফোঁটা শিশির ধরে রাখেন ফুলের পাপড়িতে। কিন্তু পরের শতকের প্রথম দিকেই দেখা গেল চিত্রকলায় স্থবিরত্ব দেখা দিয়েছে ডাচদের দেশে, আর ফ্রান্সে অন্য এক ধারায় ঘটছে তার প্রাণের বিকাশ। সে আর এক কাহিনী।

আর্নল্ড হাউসের বলছেন ফ্ল্যান্ডার্সে স্পেনের শাসন সমাজের ওপর তলার লোকে মেনে নেওয়ার ফলে সেখানেও সেই সময়কার ফ্রান্সের মতো অবস্থারই সৃষ্টি হল। অভিজাত সম্প্রদায়কে রাষ্ট্রের ক্ষমতার ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল করে তাকে এক পোষমানা দরবারী সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ে পরিণত করা হল। সমাজবিকাশের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য এখানেও দেখা গেল। বুর্জোয়াদের অভিজাত স্তরে তোলার ফলে যত শীঘ্র সম্ভব তারা ব্যবসায় কর্মের দিকে বিমুখ হয়ে পড়ল। এখানেও চার্চকে একটা প্রায় একচেটিয়া অবস্থান দেওয়া হল, যদিও ফ্রান্সে যেরকম দেখা গিয়েছিল

এখানেও সেইরকম সরকারের একটা যন্ত্র হয়ে পড়ার মূল্য তাকে দিতে হল। শাসক শ্রেণীগুলোর সংস্কৃতি পুরোপুরি একটা দরবারী রূপ নিল এবং ক্রমে ক্রমে কেবলমাত্র জনপ্রিয় ঐতিহ্যগুলোর সঙ্গেই তাদের যোগসূত্র যে ছিন্ন হয়ে গেল তাই নয়, তখনও পর্যন্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণী দ্বারা কমবেশি অনুপ্রাণিত বুর্গুদিঁ রাজসভার সঙ্গেও তাদের যোগসূত্র কেটে গেল। বিশেষ করে শিল্পকলার উপরেও মোটামুটি ভাবে একটা সরকারী শীলমোহরের ছাপ পড়ল, যদিও ফরাসী বারোকের সঙ্গে বিপরীতে সেই সঙ্গে তাতে একটা ধর্মীয় প্রবণতাও রয়ে গেল—এটার ব্যাখ্যা অবশ্য সর্বোপরি স্পেনের প্রভাবের সাহায্যেই করতে হবে। আর একটা পার্থক্য এই যে শিল্পকলার উৎপাদন ব্যবস্থাটা রাষ্ট্রের হাতে সংগঠিত হল না, আবার উৎপন্ন যাবতীয় শিল্পকর্ম রাজ দরবারও পুরোপুরি নিয়ে নিল না। কারণ আর্চ ডিউকের দরবারের অত আর্থিক সঙ্গতি ছিল না। তাছাড়া, হাবসবুর্গ বংশ যেরকম সমঝোতামূলক কায়দায় ফ্ল্যান্ডার্সে শাসন চালাতে চেয়েছিল তার সঙ্গে সেই ধরনের সরকারী কড়াকড়ি মানানসই-ও হত না। চার্চও মোটামুটি একটা ক্যাথলিক লাইন বাৎলে দিয়েই হাত গুটিয়ে নিল; চিত্রকর্মের মধ্যে মূলগত মেজাজ বা বিষয় বস্তুগত ডিটেলস্যের ব্যাপারে শিল্পকলার উপর কোনো বিশেষ বাধ্যতামূলক চলন চাপিয়ে দিল না। পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ক্যাথলিক চার্চ অন্য জায়গার থেকে এখানে শিল্পীদের বেশি স্বাধীনতা দেওয়ার ফলে ফ্লেমিশ শিল্প ফ্রান্সের রাজদরবারের থেকে অনেক কম ফর্মালিস্টিক ও অনেক বেশি স্বতঃস্ফূর্ত রূপ নিল, এবং সাধারণ মেজাজের দিক থেকে রোমের চার্চশিল্পের থেকে অনেক বেশি স্বাভাবিক ও প্রফুল্ল হয়ে উঠল। পরিস্থিতির সমস্ত দিক যদিও রুবেন্সের মতো কোনো শিল্পীর শিল্পপ্রতিভার পুরো ব্যাখ্যা করতে পারে না তবুও তা থেকে এটা খুবই পরিষ্কার যে ফ্ল্যান্ডার্সের দরবারী ও গির্জা ঘেঁসা পরিবেশেই তিনি তাঁর শিল্পের বিশিষ্ট রূপটির সন্ধান পেয়েছিলেন।

দক্ষিণের জার্মান দেশগুলোর বাইরে ফ্ল্যান্ডার্সের মতো এমন সাফল্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ক্যাথলিক চার্চ অন্য কোথাও আর পায় নি; অ্যালবার্ট ও ইজাবেলার শাসনকালে ছাড়া, অর্থাৎ ফ্লেমিশ শিল্পের সুবর্ণযুগের বাইরে চার্চ এবং রাষ্ট্রের মধ্যে মৈত্রী এমন ঘনিষ্ঠ ও আর কোনো দিন হয় নি। উত্তরাঞ্চলের প্রজাতন্ত্র যেমন স্বাভাবিকভাবেই প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে নিয়েছিল ক্যাথলিক ধ্যানধারণাও সেইরকম রাজতন্ত্রের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে নেয়। ক্যাথলিক ধর্মমত অনুসারে আধ্যাত্মিক জগতে ঈশ্বরবিশ্বাসীদের প্রতিনিধিত্বের নীতি অনুযায়ী শাসকের সার্বভৌম ক্ষমতা ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রাপ্ত; অন্যদিকে, প্রোটেস্ট্যান্টদের বিশ্বাস হল সব মানুষই ঈশ্বরের সন্তান, সেই কারণে মূলত তারা কর্তৃপক্ষর বিরুদ্ধাচারী। কিন্তু ধর্মীয় মতামত নির্বাচনের ব্যাপারটা প্রায়ই রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যেই নির্ধারিত হত। বিদ্রোহের অব্যবহিত পরে পরে উত্তরাঞ্চলে ক্যাথলিকরা সংখ্যায় প্রোটেস্ট্যান্টদের প্রায় সমান সমান ছিল। পরে কিন্তু তারা রোমের বিরোধী পক্ষের দিকে চলে যায়। দক্ষিণ ও উত্তরাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ধর্মীয় বিরোধটা সেইজন্যে কোনো মতেই দুটি অঞ্চলের সাংস্কৃতিক বিরোধিতার প্রকৃত কারণ ছিল না। আবার, জনসাধারণের জাতিগত (racial) চরিত্র থেকেও এই বিরোধের সৃষ্টি হয় নি—কারণটা অর্থনৈতিক ও সমাজতত্ত্বগত নিম্নাঞ্চলের শিল্পকলার ভেতরকার মূলগত স্টাইল সংক্রান্ত পার্থক্যটাও এর সাহায্যেই ব্যাখ্যা করা যায়। প্রায় একই ধরনের বাহ্যিক পরিস্থিতিতে ভৌগোলিক দিক থেকে পাশাপাশি অবস্থিত দুটি দেশে, ফ্লেমিশ ও ডাচ এই দুই ধরনের বারোক শিল্পের মতো এইরকম দুই মূলত ভিন্ন প্রবণতার

বিকাশের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ শিল্পকলার ইতিহাসের অন্য কোনো যুগেই এখানকার ইতিহাসের বিশ্লেষণের মনে এত মূল্যবান হয়ে ওঠে নি।

ইংল্যান্ডের রানী এলিজাবেথের সমসাময়িক স্পেন সম্রাট দ্বিতীয় ফিলিপের বাজত্বকালে (১৫৫৬-১৫৯৮) নেদারল্যান্ডসের সংস্কৃতি দুভাগে ভাগ হয়ে যায়। ফিলিপ ছিলেন প্রগতিশীল সম্রাট, তিনি চেয়েছিলেন নেদারল্যান্ডসে অ্যাবসল্যুটিজম বা স্বেচ্ছাচারতন্ত্রের সুফলগুলো (কেন্দ্রীকৃত রাষ্ট্রব্যবস্থা ও পরিকল্পিত বাজেটের যৌক্তিকতাবাদ) চালু করতে। কিন্তু গোটা দেশ এই কর্মসূচীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল; উত্তরাঞ্চল সফল হল, কিন্তু দক্ষিণাঞ্চল ব্যর্থ হল। 'প্রোটেস্ট্যান্ট' উত্তরাঞ্চলের মতো 'ক্যাথলিক' দক্ষিণাঞ্চলেও কেন্দ্রীকৃত সরকার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাছ থেকে যেসব নতুন নতুন আর্থিক স্বার্থত্যাগ দাবি করল তার বিরুদ্ধে সমান তিক্ততার সঙ্গেই তারা বিদ্রোহ করল। স্পেনের সঙ্গে বিরোধের আগে এই দুই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক বিরোধিতা দেখা দেয় নি। এই সংগ্রামে যেরকম ভিন্ন ভিন্ন পরিণতি দেখা দিতে থাকল কেবলমাত্র সেই সেই ভাবেই এটা বিকশিত হতে থাকল। উভয় অঞ্চলের বিদ্রোহের পরিণতিতে যেসব সামাজিক পার্থক্য দেখা দিতে থাকল তারই প্রতিফলন হিসেবে তা বিকশিত হতে থাকল। স্পেনের প্রতি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মনোভাব প্রথম দিকে সর্বত্র একই রকম ছিল। সম্রাট বড়ো হয়ে উঠেছিলেন রাজনৈতিক যৌক্তিকতাবাদ ও মার্কেন্টিলিজমের মতাদর্শগত পরিবেশে। তিনি নয়, এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীই তার গিল্ড প্রথার পটভূমি, বিকেন্দ্রীকরণের প্রতি তার পক্ষপাত ইত্যাদি সমেত রক্ষণশীলভাবে চিন্তা করত এবং সাড়া দিত। বুর্জোয়ারা সব থেকে বেশি করে চাইল শহরগুলোতে তাদের স্বায়ত্তশাসন আর সেই সঙ্গে জড়িত সুযোগসুবিধাগুলো বজায় রাখতে। সারাদেশে এই ব্যাপারে মতৈক্যও হয়েছিল। নৃশংস ইনকুইজিশন প্রথা আর তার পিছনে দুরাচারী ফৌজী দলের শক্তিতে পুষ্ট ক্যাথলিক স্বেচ্ছাচারীদের বিরুদ্ধে প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মমতে বিশ্বাসী ও প্রজাতন্ত্রী ডাচদের বিদ্রোহের কাহিনী বলে যাঁরা এই দেখেন তাঁরা নিছক গল্পকাহিনীতেই আগ্রহী। প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মবিশ্বাসের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ তাদের বিদ্রোহের প্রচণ্ডতাকে তীব্রতর করে থাকতে পারে কিন্তু ডাচরা প্রোটেস্ট্যান্ট বলেই যে স্পেনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল তা ঠিক নয়। প্রোটেস্ট্যান্টিজম যেমন মূলত বিপ্লবী নয়, ক্যাথলিক মতবাদও সেইরকম মূলত প্রতিক্রিয়াশীল নয়। তবে হ্যাঁ, একজন ক্যাথলিকের থেকে একজন ক্যালভিনপন্থী সম্ভবত আরও বেশি বিবেকের নির্দেশে রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে থাকতে পারে। তবে ব্যাপারটা যাই হোক না কেন নেদারল্যান্ডসের এই বিদ্রোহ ছিল রক্ষণশীলদেরই বিদ্রোহ। বিজয়ী উত্তরাঞ্চলের প্রদেশগুলো স্বাধীনতার মধ্যযুগীয় প্রত্যয়গুলোকে আর এক বস্তাপচা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থাকেই সমর্থন করেছিল। কিছুকালের জন্যে তারা যে নিজেদের প্রাধান্য স্থাপন করতে পেরেছিল তার কারণ এই যে স্বেচ্ছাচারতন্ত্রই যুগের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ একমাত্র রাজনৈতিক ব্যবস্থা ছিল না। তবে তাদের এই স্বল্পকালীন সাফল্যই প্রমাণ করে দিয়েছিল যে কালে শেষ অবধি কেন্দ্রীকৃত সম্প্রদায়ের যুগের সঙ্গে এক বিপরীত ভিত্তিক ফেডারেল সরকার কিছুতেই কার্যকর হতে পারে না।

উত্তরাঞ্চলের রাজ্যগুলো দক্ষিণাঞ্চলের প্রদেশগুলোর থেকে ভিন্ন অর্থে এক 'নগরগুলির ইউনিয়ন' গড়ে তুলেছিল। দক্ষিণেও সেই রকমেরই অনেক এবং বড়ো বড়ো নগর ছিল, কিন্তু স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন লোপ পাওয়ার ফলে সেগুলোর কার্যকলাপে এক আমূল পরিবর্তন দেখা দিল।

বিদ্রোহের পরাজয়ের পর শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণী হল্যান্ডে যেরকম হয়েছিল সেইরকম আর সর্বপ্রধান প্রভাবশালী সামাজিক শক্তি রইল না। রাজ্যসভার ওপর নির্ভরশীল অভিজাত বা ছদ্ম-অভিজাত উচ্চ শ্রেণী সেই প্রধান প্রভাবশালী শক্তি হয়ে উঠল। দক্ষিণের বিদেশী শাসনে শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংস্কৃতির ওপর রাজসভার সংস্কৃতির জয় ঘটল; ওদিকে উত্তরাঞ্চলে জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের ফলে বুর্জোয়া সংস্কৃতি বজায় থেকে গেল। হল্যান্ডে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির নতুন জোয়ারে স্বাধীনতাপ্রেমী গুণগুলো কিন্তু সব থেকে বড়ো ভূমিকা পালন করেনি; ভাগ্য প্রসন্ন আর নিছক আকস্মিক ঘটনাই সেই ভূমিকা পালন করেছিল। অনুকূল সমুদ্রশক্তিগত পরিস্থিতি; নানা যুদ্ধের ফলে শত্রুর কাছ থেকে পণ্য কিনতে স্পেনের বাধ্য হওয়া; ১৫৯৬ সালে দ্বিতীয় ফিলিপের দেউলিয়া হয়ে যাওয়া, যার ফলে ইতালিয় ও জার্মান ব্যাঙ্কব্যবসায়ীদের সর্বনাশ হয়ে গেল আর আমস্টার্ডাম হয়ে উঠল ইউরোপীয় অর্থবাজারের কেন্দ্রস্থল—এইসব নানা সম্ভাবনাকে শুধু বিত্তবান হওয়ার কাজে লাগাতে হল হল্যান্ডকে, এগুলো তাকে সৃষ্টি করতে হয় নি। সাবেকপন্থী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কাছে যেটুকু তার ঋণ তা হল শুধু এইটাই যে নতুন সম্পদ রাষ্ট্র ও রাজবংশের উপকার না করে শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপকার করল। মধ্যযুগের মতো এখনও এই শ্রেণী ছিল ক্ষতবিক্ষত এবং এখনও তারা অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নতা ও স্বায়ত্তশাসনের কথাই চিন্তা করছিল। কিন্তু তার ফলে এই শ্রেণী ও শিল্পমালিকরা হয়ে উঠল শাসকশ্রেণী। আর এই শ্রেণী যেখানেই প্রভাব প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা লাভ করেছে সেখানেই দেখা গেছে কেবল মজুরি উপায় করা শ্রেণীকেই নয় স্বাধীন কিন্তু নিঃস্ব কারিগর ও ছোটো ব্যবসায়ীদের নিয়ে গড়া পেটি বুর্জোয়াদেরও তারা পীড়ন করছে। হল্যান্ডে এই বুর্জোয়া শ্রেণীর সামাজিক অবস্থা এমন কি অন্যান্য জায়গার থেকেও আরও বিশেষভাবে সম্পদ ও অর্থ উপার্জনের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল। এই শ্রেণী তার নিজের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থরক্ষার ভার তাই নিজের শ্রেণীর ভেতর থেকে 'রিজেন্ট' বা রাজপ্রতিনিধি নামে এক বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের উপর ছেড়ে দিল। এই রিজেন্টদের দিয়েই টাউন কাউন্সিল এবং তার মেয়র ও অল্ডারম্যান, কাউন্সিলার ইত্যাদি গঠিত হল, আর এরাই প্রকৃতপক্ষে শাসক শ্রেণীর ক্ষমতা প্রয়োগ করতে থাকল। সাধারণত এদের ক্ষমতা বাপ থেকে ছেলেতে অর্শাত। তাই গোড়া থেকেই স্বাভাবিক সরকারী কর্মচারীদের থেকে এদের প্রতিপত্তি ছিল বেশি। রিজেন্টদের বেশির ভাগই প্রথমে ছিল ব্যক্তিগত উপায়ে উপার্জনভোগী সাবেক বণিক সম্প্রদায়। অফিসের কাজকর্ম এরা করত খানিকটা সখ হিসাবে, কিন্তু এদের সন্তানরা ইতোমধ্যেই লাইডেন, ইউট্রেক্ট প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিখত এবং বিশেষ করে আইনশাস্ত্র, কারণ বাপদের হাত থেকে সরকারী পদের দায়িত্ব তাদের নিতে হবে।

সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের লোকদেরও প্রভাব প্রতিপত্তি কম ছিল না, বিশেষ করে গেল্ডেরল্যান্ড ও ওভারিজেল-এ; কিন্তু সংখ্যায় তারা ছিল নগণ্য, মাত্র কয়েকটি পরিবারই শহরের নগর পিতাদের সমাজ থেকে নিজেদের আলাদা করে রেখেছিল। এদের বেশির ভাগই মধ্যবিত্ত পরিবারে বিবাহাদি করে বা তাদের ব্যাবসা বাণিজ্যে অংশ নিয়ে ধনী বুর্জোয়াদের সঙ্গে মেলামেশা করত। এইভাবে উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণী নিজেই হয়ে উঠল অভিজাত-বণিক সম্প্রদায়, আর রিজেন্ট পরিবারগুলো এমন এক ধরনের জীবনযাত্রা অনুসরণ করতে থাকল যে ব্যাপকতর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর থেকে আরও বেশি বেশি করে তারা নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে তুলতে থাকল। মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে সম্ভ্রান্ত শ্রেণীতে

ওঠার মাঝামাঝি স্তরটা তারা গড়ে তুলল। সামাজিক ক্রমোচ্চ বিন্যাসে এমন এক ধারাবাহিকতা এরা গড়ে তুলল যা অন্যত্র বিশেষ দেখা যায় না। একদিকে স্টাটহোল্ডারদের (Stadt-holder বা প্রাদেশিক শাসনকর্তা) ঘিরে জড়ো হল ফৌজী মেজাজের রাজতন্ত্রীরা, আর অন্যদিকে জড়ো হল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শান্তিসমর্থক পাটি আব রাজতন্ত্র বিরোধী অভিজাতরা। মধ্যবিত্ত শ্রেণীগুলোর সঙ্গে সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের যে দ্বন্দ্ববিরোধ ছিল এই দুই পক্ষের মধ্যকার টানাটানির চাপ কিন্তু অনেক বেশি। কিন্তু আসল ক্ষমতা রইল বুর্জোয়াদের হাতে, কোনো পক্ষ থেকেই গুরুতর কোনো আশঙ্কাব কারণ তাদের ছিল না।

সম্পত্তির মালিক শ্রেণীগুলো রুচির ব্যাপারে অভিজাত প্রবণতার সঙ্গে যতই মাখামাখি করুক না কেন শিল্পকলার জগতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মনোভাবটাই প্রধান থেকে গেল, এবং সাধারণভাবে ইউরোপের সর্বত্র প্রচলিত দরবারী সংস্কৃতির মাঝখানে একটা মূলত বুর্জোয়া ছাপ চাপিয়ে দিল ডাচ চিত্রকলার উপর। হল্যান্ড যখন তার সংস্কৃতির সর্বোচ্চ স্তরে উঠেছে অন্যত্র তখন কিন্তু মধ্যবিত্ত সংস্কৃতি ইতোমধ্যেই পড়তে শুরু করেছে। আঠার শতকের আগে ইউরোপের বাদবাকি অংশে ডাচদের অনুরূপ কোনো সংস্কৃতি গড়ে তুলতে মধ্যবিত্তদের দেখা যায় নি। ডাচ শিল্পের মধ্যবিত্ত চরিত্রের জন্যে যে ঘটনাটি সব থেকে বেশি দায়ী তা হল চার্চের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাওয়া। চার্চ ছাড়া সর্বত্র ডাচশিল্পীদের কাজ চোখে পড়বে, আর প্রোটেস্ট্যান্ট জনসাধারণের মধ্যে ভক্তিমূলক চিত্র অনুপস্থিত। ধর্মনিরপেক্ষ শিল্পের পাশে বাইবেল কাহিনীভিত্তিক ছবি ডাচ শিল্পে অনুপাতে খুব কম এবং সচরাচর সেগুলোকে জাঁর-চিত্র (genre-picture) বা সামাজিক রীতিনীতির ছবি হিসাবেই দেখা হয়। ক্যাথলিকপন্থী এবং সম্রাটশাসিত দেশগুলোতে বাইবেল কাহিনী ও ধর্মনিরপেক্ষ কাহিনীভিত্তিক ছবির যখন প্রচলন দেখা যাচ্ছে হল্যান্ডে তখন দেখা যাচ্ছে এতাবৎকাল সংসারযাত্রার তুচ্ছ গৌণ সামগ্রী বলে যা পরিচিত ছিল সেগুলো শিল্পকলার পুরোপুরি স্বাধীন বিষয় হয়ে উঠেছে। তারা এখন আর নিছক অনুষঙ্গ মাত্র নয়, নিজস্ব এক স্বশাসিত মূল্য তাদের গড়ে উঠেছে। সেগুলো আঁকার জন্যে শিল্পীকে এখন আর কোনো কৈফিয়ৎ দিতে হয় না ; বরং বলা যায় মোটিফ বা চিত্র উপাদান যত সরাসরি, সুস্পষ্ট ও সাধারণ হয় শিল্প হিসাবে তার মূল্যও তত বেশি হয়ে উঠেছে। এখনকার ডাচ শিল্পে দেখা যাচ্ছে যে, প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ছবি আঁকা হচ্ছে—বাস্তব যেন জয় করে নেওয়া একটা সামগ্রী এবং সেইজন্যে তা সুপরিচিত। এই প্রথম যেন বাস্তবকে আবিষ্কার করা হচ্ছে, তাকে অধিকার করা হচ্ছে, এবং তাকে স্থিতি দেওয়া হচ্ছে। শিল্পকলায় যে জিনিসটার দিকে সব থেকে বেশি আগ্রহ দেখা গেল তা হচ্ছে ব্যক্তি, পরিবার, সম্প্রদায় ও জাতির অধিকারে আসা সামগ্রীগুলো : ঘরদোর, উঠোন, শহর ও তার পারিপার্শ্বিক, স্থানীয় ভূদৃশ্য, খোলা জায়গা, ফিরে পাওয়া গ্রামাঞ্চল। কিন্তু ছবির বিষয়বস্তু নির্বাচনের থেকে আরও বেশি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যেটা এল তা হল এর বিশিষ্ট ন্যাচারালিজম। সাধারণ ইউরোপীয় বারোকের বীরত্বব্যঞ্জক মনোভাব, তার কৃচ্ছ্রসাধন ও প্রায়শ কঠোর গুরুগম্ভীরতা, তার প্রচণ্ড উচ্ছ্বাসপূর্ণ ইন্দ্রিয়পরায়ণতার থেকেই যে এটা শুধু অন্য ধরনের তাই নয় প্রকৃতির প্রতি বিশ্বস্ততার ভিত্তিতে প্রবর্তনকালে যাবতীয় স্টাইল গড়ে উঠেছিল তাদের সব কিছুর থেকে এটা স্বতন্ত্র। শুধুমাত্র চিত্রিত বস্তুর সরল পূত চরিত্র ও সশ্রদ্ধ বস্তুধর্মিতাই নয় পরিচিত রূপের মধ্যে জীবনের যে আশুধর্মিতাকে সকলেই নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে যাচাই করে নিতে পারে শুধু

সেটাকেই আঁকার চেষ্টা মাত্র নয়, এর দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে অন্তর্নিহিত যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এইসব ছবিতে তার সত্যের সবিশেষ গুণটি ফুটিয়ে তুলেছে। নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এই ন্যাচারালিজম এমন এক ধরনের স্টাইল যা আধ্যাত্মিক জিনিসকেই যে কেবল দৃশ্যমান করে তোলে তাই নয়, যাবতীয় দৃশ্যমান জিনিসকেও তা এক আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা করে তোলার চেষ্টা করে। ইজেলে ঘনিষ্ঠ ছবি আঁকার মধ্যে শিল্পের এই প্রত্যয়টি দেহধারণ করল, আর সেটাই হয়ে উঠল গোটা আধুনিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিল্পের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রূপ বা ফর্ম। নিরলস মনস্তত্ত্বমূলক অনুসন্ধিৎসা আর তার সীমাবদ্ধতা সমেত বুর্জোয়া চেতনার পর্যাপ্ত প্রকাশ এর থেকে ভালো অন্য কোনো ফর্মের সাহায্যে হতে পারে না। এক দিকে এটা ছোটো মাপের আকারজনিত বাধা নিষেধগুলোর ফল অন্য দিকে আবার আধ্যাত্মিক বিষয়বস্তুর সর্বোচ্চসম্ভব ঘনীভবনের ফল। বড়ো বড়ো মণ্ডনশিল্প মধ্যবিত্তের কোনো কাজে লাগে না। ব্যক্তিগত প্রয়োজনের ব্যাপারে দরবারী মানের প্রশ্নও ওঠে না, সরকারী ফরমাস ও বড়ো বড়ো দরবারের বিশাল প্রয়োজনের তুলনায় আপেক্ষিকভাবে কদাচিৎ এবং যেটুকু দেখা যায় তাও নগণ্য।

স্টাটহোল্ডারদের বাসস্থান ফরাসী মডেলে তৈরি হত। কোনো দিনই তা প্রকৃত সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হয়ে ওঠে নি, তাছাড়া শিল্পকলা বিকাশের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করার পক্ষে সেগুলো খুবই ছোটো আর দীন ছিল। ক্যাবিনেট সাইজের ছবিই তাই হল্যান্ডের শিল্পকর্মের প্রধান রীতি হয়ে উঠল। সরকারী ও জনপ্রতিনিধিমূলক সংস্থার প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এমন কোনো যুগ শিল্পকলার ক্ষেত্রে এর আগে কখনও দেখা যায় নি। ক্লাসিক্যাল যুগের আথেন্সের কথা দূরে থাক প্রথম যুগের রেনেসাঁসের কালে ফ্লোরেন্সেও এমন যুগ কখনো আসে নি। কেবলমাত্র ব্যক্তিগত ফরমাসে ছবি আঁকার যুগ। তবে হল্যান্ডেও চাহিদাটা পুরোপুরি একরকমের ছিল না। সরকারী এবং আধা সরকারী নিয়োগকর্তারা ছিলেন, কমিউন, পুরসভা ও নাগরিক সঙ্ঘ ইত্যাদি ছিল, ছিল অনাথাশ্রম, হাসপাতাল আর দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলোরও কিছু ভূমিকা, অবশ্য তা গৌণ। সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্যে আঁকা ছবির থেকে অবশ্য এইসব ক্রেতাদের জন্যে আঁকা ছবি কিছুটা ভিন্ন ধরনের হত। ফ্রান্স কি ইতালির মতো হল্যান্ডে যদিও 'গ্র্যান্ড' স্টাইলের শিল্পকলার কোনো প্রয়োজন ছিল না, এমন কি সরকারী উদ্দেশ্যও ছিল না তবু ক্লাসিক্যাল—মানবতাবাদী রুচির ঐতিহ্যধারা ইরাজমাসের দেশের কোনো কোনো মহলে পুরোপুরি লোপ পেয়ে যায় নি। ব্যক্তিগত প্রয়োজনের থেকে সরকারী শিল্পকর্মে, জনসাধারণের জন্য ব্যবহৃত বড়ো বড়ো বাড়ির স্থাপত্য কর্মে মন্ত্রণাসভা ও ভোজকক্ষ সাজানোর জন্যে চিত্রশিল্পে যোগ্য বীরদের স্মৃতিতে যেসব স্মারকস্তম্ভ তৈরি করা হয়েছিল সেসব ক্ষেত্রে তার প্রভাব বেশি পড়েছিল। আবার ব্যক্তিগত দিক থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের শিল্পরুচিও পুরোপুরি এক ধরনের ছিল না; জনসাধারণের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক স্তর; শিল্পের কাছে দাবিও তাদের ভিন্ন ভিন্ন। এই শ্রেণীর সুশিক্ষিত ব্যক্তিরা ক্লাসিক্যাল সাহিত্যপড়া মানুষ, মানবতাবাদের ঐতিহ্যের তারা বাহক, শিল্পে ইতালিয় ভাবধারা আমদানি করার প্রবণতা এবং 'ম্যানারিজমের' সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলার তারা সমর্থক। জনপ্রিয় রুচির বিপরীতে ক্লাসিক্যাল ইতিহাস, পুরাণ, রূপক কাহিনী ও রাখালিয়া চিত্র, বাইবেল কাহিনীর মধুর ছবি এবং সুচারু গৃহাভ্যন্তর মণ্ডনশিল্পের তারা পক্ষপাতী। যেমন পোয়েলেনবুর্গ, বেরখেম, হোগস্ট্রাটেন এবং ভান ডার ভের্ফরা (Cornelis van Poclinburgh, Nicolas Berchem,

Samuel van Hoogstraten and Adrian van der Werff) যেসব ছবি আঁকছিলেন সেই সব বুর্জোয়ার যে অংশ বুদ্ধিজীবী নয় তাদের রুচিও পুরোপুরি এক রকমের ছিল না। টেরবুর্গ, মেটসু ও নেটশের বুর্জোয়াদের সব থেকে কৃতি ও ধনী গোষ্ঠীর জন্যে ছবি আঁকছিলেন, ডে হোথ আর ভেরমের আঁকছিলেন কিছুটা অনাড়ম্বরতাপ্রিয় সম্প্রদায়ের জন্য, আর ইয়ান স্টেন, নিকোলাস বা মায়েসের খরিদ্দার সম্ভবত সমাজের সব শ্রেণীতেই আছে।

রুচির এই দুই ধারার দ্বন্দ্ব ডাচ শিল্পকলার সুবর্ণযুগ জুড়ে বর্তমান। চিত্রকর্মের গুণ ও পরিমাণ দু দিক থেকেই ন্যাচারালিজমের প্রবণতাটি গুরুত্বপূর্ণ, তবে অবস্থাপন্ন ও সুশিক্ষিত মহলে ক্লাসিক্যাল প্রবণতাটি বেশি পছন্দ করত, আর তার ফলেই মর্যাদা ও অর্থ দুই-ই পেয়েছেন এই ধারার চিত্রকররা। বুর্জোয়ার এই দুই মধ্যবর্তী সম্প্রদায়ের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ ইংল্যান্ডে পিউরিটান ও ক্যাভেলিয়ারদের বিরোধের সমান পর্যায়ের। দু দেশেই একদিকে সরল, নিষ্ঠাবান, বাস্তবধর্মী জীবনযাত্রার প্রতিনিধিরা, অন্য দিকে পরিশীলিত ভোগবাদীদের প্রতিনিধিরা, এঁরা আবার প্রায়ই আদর্শবাদের ভেক ধরতেন। একথা অবশ্য ভুললে চলবে না যে সতের শতকের ডাচ সংস্কৃতি ইংল্যান্ডের রেস্টোরেশন যুগের সংস্কৃতির মতো ছিল না, এবং কখনই তারা তাদের বুর্জোয়া চরিত্র পুরোপুরি পরিত্যাগ করে নি। যাই হোক, হল্যান্ডের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রুচি ধীরে ধীরে শিল্প সম্বন্ধে আরও বেশি খুঁতখুঁতে প্রকৃতির অনুরাগী হয়ে ওঠে। শতকের দ্বিতীয় ভাগে গোটা অভিজাত জীবনযাত্রার দিকে প্রবণতা আরও বেশি করে বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রবণতাটি সামঞ্জস্যপূর্ণ। আমস্টার্ডামের টাউন হল মণ্ডনের বরাত দেওয়ার সময় রেমব্রান্টের কথা মনেই পড়ল না কারও। ঘটনাটা খুবই লক্ষণাত্মক। এটা কেবল যে রেমব্রান্টের থেকে সরে যাওয়ার প্রবণতা তাই নয়, ন্যাচারালিজম থেকেও সরে যাওয়ার প্রবণতা। এমন কি হল্যান্ডেও ক্লাসিকধর্মী আকাদেমিপন্থী অধ্যাপক আর সৃজনক্ষমতারহিত অথচ সৃজনশীল শিল্পীদের অনুকরণকারীরা যে এখন প্রাধান্যলাভ করেছে এটা তারই প্রমাণ। আলোয় রিয়েগেল্ (Alois Riegl) এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে লিখেছেন, 'যে পুরো সিভিল গার্ডদের বড়ো বড়ো গ্রুপ ছবির যুগ শেষ, সেই জায়গায় এই সব গ্রুপের কেবলমাত্র অফিসারদের পোর্ট্রেট ছবি আঁকা শুরু হয়েছে ; নতুন অগণতান্ত্রিক মনোভাবেরই এটা পরিচয়।'

মাঝারি ও পেটিবুর্জোয়াদের রুচিই ছিল শিল্পকলার ব্যাপারে জনসাধারণের বড়ো অংশের রুচি। কিন্তু বস্তুর সঙ্গে বাহ্যিক সাদৃশ্যের থেকে বেশি কিছু শিল্পগত গুণের অস্তিত্ব তাদের জানা ছিল না। তাছাড়া, সমাজের উচ্চতর মহলে যা জনপ্রিয় ছিল সেটা দেখেও এরা ছবি কিনত, ঠিক যেমন উচ্চতর মহলের লোকেরা আবার ক্লাসিক্যাল-হিউম্যানিস্ট ধারায় শিক্ষিত পরিশীলিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা প্রভাবিত হত।

চালবাজি না-করা অতি-সরল সাধারণ মানুষের চাহিদা অনুযায়ী ছবি আঁকতে পাওয়ার ফলে প্রথম দিকে শিল্পীদের সুবিধা হলেও পরবর্তীকালে সেটাই একটা বড়ো বিপদ হয়ে উঠল। নিজেদের ধ্যানধারণা মতো স্বাধীনভাবে তাঁরা ছবি এঁকে চললেন, ব্যক্তিগত ক্রেতার ইচ্ছা সম্বন্ধে তাঁদের ভাবনাচিন্তা করার দরকার ছিল না। পরবর্তীকালে এই স্বাধীনতার ফলে ছবির বাজারে নৈরাজ্যজনক পরিস্থিতির ফলে অতি-উৎপাদন দেখা দিল যার ফল হল মারাত্মক।

সতের শতকে হল্যান্ডে অনেক লোকের হাতেই পয়সা এসেছিল। সেটা সুবিধাজনকভাবে

লগ্নী করা সব সময় যেত না মূলধন সুলভ হয়ে যাওয়ার ফলে। আবার, খুব একটা স্থায়ী মূল্যবান কোনো সামগ্রী কেনার পক্ষেও প্রায়ই সেটা পর্যাপ্ত হত না। আসবাবপত্র, ঘরসাজানোর সামগ্রী, ছবি ইত্যাদি কেনাই লগ্নীর জনপ্রিয় উপায় হয়ে উঠতে থাকল। অপেক্ষাকৃত কম সঙ্গতিসম্পন্ন মানুষও এতে অংশ নিতে পারত। বিশেষত অন্য কিছু কেনার মতো সামর্থ্য তাদের ছিল না বলেই তারা কিনত ছবি। তাছাড়া, অবস্থাপন্ন লোকরাও ছবি কিনছে, ছবি টাঙালে ঘরটাও সুন্দর দেখায়, আবার বেশ একটা সম্ভ্রান্ত ভাবও ফুটে ওঠে, আর সব থেকে বড়ো কথা, দরকার হলে সেটা আবার বিক্রিও করে দেওয়া যায়। অতএব সৌন্দর্যপিপাসা তৃপ্ত করার জন্যেই যে তারা ছবি কিনত এই যুক্তি বড়োই দুর্বল। আবার হয়তো লগ্নীর দরকার হচ্ছে না বলেই ছবিগুলো তারা রেখে দিল ঘরে, আর তাদের ছেলেমেয়েরা সেইসব ছবি দেখে যথার্থ আনন্দ পেত। সন্তানের রুচি তৈরির ব্যাপারে সঙ্গতিপন্ন বাপ মায়ের দান হিসাবেও এটা আলোচ্য বিষয় হতে পারে। লোকের হাতে পয়সা ছিল, তাই বলে গরিব চাষীও যে ছবি কিনত একথা বোধ হয় ঠিক নয়। হ্যাঁ, সচ্ছল চাষী ছবি কিনত, কিন্তু তার উদ্দেশ্য ছিল আলাদা। অতিশয় ধনী নগরপিতারা যে চোখে ছবি দেখতেন এঁরা নিশ্চয়ই তাঁদের থেকে ভিন্ন চোখে ছবি দেখতেন।

শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক জন এভলিন (John Evelyn) ডায়েরি রাখতেন। ১৬৪১-এর রটারডাম মেলায় ছবির বাজারে তিনি এমন কি ভালো ভালো ছবিরও যে তেজী বেচাকেনা দেখেছিলেন তা লিখে গেছেন। 'স্মৃতিকথায়' তিনি এক জায়গায় লিখেছেন : বাজারে প্রচুর ছবি, তার বেশির ভাগই বেশ সস্তা। ক্রেতারা বেশির ভাগই পেটিবুর্জোয়া ও চাষী সম্প্রদায়ের মানুষ, চাষীদের মধ্যে কেউ কেউ নাকি দু-তিন হাজার পাউন্ড মূল্যের ছবির মালিক, যদিও ভালো দাম পেলে তারা তাদের ছবিগুলো আবার বিক্রিও করে দেয়। এই প্রসঙ্গে ডব্লু. মার্টিন তাঁর এক নিবন্ধে (The Life of a Dutch Artist) লিখেছেন শিল্পসামগ্রীর বাজারে ফাটকাবাজির সাধারণ ঢেউয়ের ধাক্কায় খুব তেজী ভাব দেখা দিয়েছিল। ১৬২০ সালের পরে হল্যান্ডে এত প্রচুর ছবি এসেছিল যে বিপুল চাহিদা থাকা সত্ত্বেও খুবই বাড়তি উৎপাদন দেখা দিয়েছিল যার ফলে শিল্পীদের খুবই সঙ্গীন অবস্থায় পড়তে হয়। প্রথম দিকে ছবি আঁকলে নিশ্চয়ই ভালো রোজগার করা যেত, না হলে এই জীবিকাতে জোয়ার দেখা দিয়েছিলই বা কেন? সেই ষোল শতকেও আন্তোয়ার্পে ছবির উৎপাদন যে বেশিই হত তা আমরা জেনেছি এবং এখান থেকে রীতিমত তা রপ্তানিও হত। ১৫৬০ নাগাদ শহরে যেকালে মাত্র ১৬৯ জন রুটিওয়ালা আর ৭৮ জন কসাই ছিল ছবি ও গ্রাফিকের কাজে সেখানে তিনশ জন ওস্তাদ শিল্পী কর্মরত ছিলেন। অর্থাৎ সতের শতকেই এবং কেবল উত্তরাঞ্চলেই যে ব্যাপক হারে উৎপাদন এই প্রথম হচ্ছিল তা নয়। নতুন লক্ষণের মধ্যে কেবল এইটুকুই যে উৎপাদন মুখ্যত দেশীবাজারের জন্যে হচ্ছিল, আর বাজারে আসা মাল যদি ক্রেতাসাধারণের আর পছন্দ না হয় তাহলে শিল্পগত জীবনে এক গুরুতর সঙ্কট দেখা দেবে। মোটের উপর, পাশ্চাত্য শিল্পকলার ইতিহাসে এই প্রথম আমরা শিল্পকলার বাজারেও উদ্‌বৃত্ত শিল্পী ও সর্বহারা শিল্পী দেখতে পাই। কথাটা লিখেছেন ফ্লোয়েৰ্কে (Hans Floerke)। তেজীর পরে প্রচণ্ড প্রতিযোগিতা দেখা দিল। অতি বড়ো স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ শিল্পী, মৌলিক ক্ষমতাসম্পন্ন শিল্পীও তার শিকার হলেন। এর আগেও শিল্পীরা অনটনের মধ্যে জীবন কাটিয়েছেন, কিন্তু প্রকৃত অভাবের মধ্যে কাউকে এমন ভাবে পড়তে হয় নি। রেমব্রান্ট ও হাল্‌স্‌দের আর্থিক দুর্বিপাক শিল্পকলার জগতে

এই প্রথম দেখা দেওয়া অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও নৈরাজ্যের সহচারী। শিল্পকলার জগতে আজও সেই নিয়ন্ত্রণেরই প্রচলন। সামাজিক দিক থেকে শিল্পীর উৎখাত হয়ে যাওয়া এবং তার অস্তিত্বের অনিশ্চয়তারও সেই সূত্রপাত। ডাচ চিত্রশিল্পীদের বেশির ভাগই এমন দুর্দশা ক্লিষ্ট পরিস্থিতির মধ্যে বাস করতেন যে বড়ো বড়ো শিল্পীদেরও অনেককে এই বৃত্তির বাইরে অন্য কোনো উপার্জনের পথ খুঁজতে হত। ভান গইয়েন টিউলিপের কারবার করতেন, হব্বেমা খাজনা আদায়কারীর চাকুরি, ভান ডে ভেলডে কাপড়ের ব্যাবসা, ইয়ান স্টেন ও আয়েট ভান ডার ভেলডে সরাইখানা চালাতেন। শিল্পী যত বেশি গুরুত্বপূর্ণ তত বেশি তাঁর দারিদ্র্য। রেমব্রান্ট তবু কিছুদিন সমৃদ্ধির মুখ দেখেছেন, হাল্‌স্‌ কোনোদিনই জনপ্রিয় শিল্পী ছিলেন না। ভান ডার হালস্টকে তাঁর পোর্ট্রেটের জন্যে কত টাকা দেওয়া হত তাও তিনি কোনোদিন উপলব্ধি করতে পাবেন নি। ভেরমেবও তাই। এই সময়ের অন্য দুজন বিখ্যাত চিত্রকর ডে হোখ আর ভান রুইজডায়েল সমকালীনদের কাছ থেকে বিশেষ মর্যাদা পান নি, সুখে স্বচ্ছন্দে জীবনও তাঁরা কাটাতে পারেন নি। ডাচ চিত্রকলার এই মহাকাব্যের যুগের কথা সম্পূর্ণ হবে না যদি না বলে রাখা যায় যে হব্বেমাকে তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ বছরগুলোতে ছবি আঁকা ছেড়ে দিতে হয়েছিল।

হব্বেমা বা ভান ডে ভেলডের মৃত্যুর প্রায় দেড়শ বছর পরে· হল্যান্ডে চিত্রকলার আবার শ্রীবৃদ্ধি ঘটল উনিশ শতকের মাঝামাঝি। নতুন প্রজন্মের জন্যে পথ তৈরি করে দিলেন বসবোম (Johannes Bosboom, ১৮১৭-৯১)। ডাচ গির্জা ক্যাথিড্রালের উল্লেখযোগ্য অভ্যন্তর দৃশ্য তিনি আঁকেন জলরঙ ও তেলরঙে। সতের শতকের ভিট্টের (Emanuel de Witte, ১৬০৭-৯২) প্রভাব তাঁর ওপর ছিল। ভিট্টের ছবিতে রৈখিক পরিপ্রেক্ষিতের নির্ভুল চিত্রণ ছাড়াও ছিল বিস্তৃত আলোছায়ার কাজ। বসবোম তা আঁকলেন আরও বিস্তৃত করে, তার সঙ্গে যোগ করলেন ভারিক্কীচালের জাঁকজমক ও গাম্ভীর্যের এক আবছা পরিবেশ। এই আধুনিক দিক দেখানোর কাজে আর এক পথিকৃৎ হলেন রোয়েলফ্‌স্‌ (Willem Roelofs ১৮২২-৯৭)। আমস্টার্ডামে তাঁর জন্ম হলেও ফ্রান্সের বারবিজঁ গোষ্ঠীর কোরো ও অন্যান্যদের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁদের সঙ্গে থেকে কিছুদিন ফঁতেনব্লো অরণ্যের ছবি আঁকেন। নেদারল্যান্ডসে যখন ফিরলেন সঙ্গে নিয়ে এলেন ভূদৃশ্যের ছবি আঁকার নতুন নতুন আদর্শ। প্রধানত ব্রুসেলসে বসবাস করলেও ডাচ চিত্রকলার ওপর তাঁর রীতিমত প্রভাব। কোরো, দোবিনি, মিইয়ে বা ত্রয়ঁ সকলের কাছ থেকেই কিছু শিখেছেন, কিন্তু অন্ধের মতো কাউকে নকল করেন নি। তাঁর মাধ্যমেই এঁদের ছবি সম্বন্ধে জ্ঞান এবং এঁদের ছবি উপভোগ করতে হল্যান্ড ও বেলজিয়ামের মানুষ শিখলেন। ব্রুসেলসে ১৮৬৮ সালে 'সোসিয়েতে লিব্র্‌ দে বোজার্তস' প্রতিষ্ঠার কাজে ইনি বিশেষ সাহায্য করেন এবং কোরো, দোবিনি ও মিইয়েকে এই সোসাইটির সাম্মানিক সদস্য করা হয় এবং এই বছরের প্রদর্শনীতে ডাচ ও বেলজিয়াম দু দেশের শিল্পীরাই অংশ নেন। কালে এই সোসাইটিকে কেন্দ্র করে নতুন প্রজন্মের এবং বারবিজঁপন্থী চিত্রকররা সংগঠিত হতে থাকেন। চল্লিশ বছর ব্রুসেলসে বাস করার পর রোয়েলফ্‌স্‌ দি হেগে বসবাস করতে থাকেন এবং সেখানেই ১৮৯৭ তে তাঁর মৃত্যু হয়। প্রকৃতির প্রতি মধুর এক বিশ্বস্ততা ও দীপ্তিময় সৌন্দর্য তাঁর 'একটি গ্রীষ্মের দিন' ছবিতে উজ্জ্বল। গ্রোনিঙ্গেনের (Groningen) এক হিব্রু পরিবারে ইজরায়েলসের জন্ম (Joseph Israels, ১৮২৪-১৯১১)। স্বকীয় ব্যক্তিত্বে ভাস্বর এই শিল্পীর ছবির মধ্যে দেখা গেল ফ্রান্সের মিইয়ের সঙ্গে সতের

শতকের মহান ডাচশিল্পী রেমব্রান্টের শিল্পরীতির মিলন ঘটেছে।

১৭৮৯ সালের বিপ্লবের পর উনিশ শতকের ফ্রান্সের চিত্রকলায় দুটি প্রবল ধারা দেখা যায়। একদিকে জেরিকো, দ্যলাক্রোয়া এবং অন্যান্য 'রোমান্টিকরা' ইতিহাস, কাব্য ও বাস্তব জীবনের ছবিকে ক্লাসিকপন্থীদের বাঁধন থেকে মুক্ত করছেন, অন্যদিকে আর এক ফরাসী শিল্পী গোষ্ঠী পুস্যাঁ ও ক্লোদ লরেনের কাল থেকে ভূদৃশ্যের ছবি আঁকা যে প্রাণহীনতা ও কৃত্রিমতার বদ্ধ জলায় আটকা পড়েছিল তা থেকে তাকে উদ্ধার করার চেষ্টা করছেন। কোরো (১৭৯৬-১৮৭৫) ছিলেন এঁদের মধ্যে প্রথম ও অন্যতম প্রধান শিল্পী। ১৮২৭ থেকে নিয়মিত পারি সালোঁতে ছবি পাঠালেও কেউ সেগুলোর দিকে নজরই দিত না। তিরিশ বছর ধরে তাঁর একটি ছবিও বিক্রি হয় নি। ১৮৩৬ এর সালোঁতে তাঁর ছবি দেখে কবি মুসেই (Alfred de Musset) প্রথম তাঁর ছবির দিকে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সংবাদপত্র বা সাধারণ লোক কেউই কিন্তু তাঁর দিকে নজর দিল না। ফঁতেনব্লো অরণ্যের ভেতর ছোট্ট গ্রাম বারবিজঁতে যেসব গরিব কিন্তু প্রকৃতি-প্রেমিক শিল্পীরা আশ্রয় নিয়েছিলেন তাঁরা সকলেই আদর করে এঁকে 'বাবা কোরো' বলে উল্লেখ করতেন। সকাল ও সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার সময়কার কাব্যগুণসমন্বিত প্রাকৃতিক দৃশ্য তাঁকে বিশেষ আনন্দ দিত। সেইসব প্রহরের ছবি তিনি আঁকতেন, তাঁর ভাষায় যখন 'গোটা প্রকৃতি এক সুরে গান করত'। প্রকৃতির বর্ণবিন্যাসের শুদ্ধ স্বরের থেকে কোমল পর্দাগুলোর দিকেই তাঁর পক্ষপাত। প্রকৃতির খেয়ালিপনা, রহস্যময়তা ও স্বপ্নালুতার এত বড়ো ব্যাখ্যাকর্তা সম্ভবত আর কেউ ছিলেন না।

কোরো যাঁকে নিজের ছেলের মতো ভালোবাসতেন তিনি হলেন দোবিনি (Charles Daubigny ১৮১৭-৭৮)। ইনি উদ্ভাবন করেছিলেন আর এক বিশিষ্ট ধরনের ভূদৃশ্যের ছবি আঁকার। শান্ত নদীতীরের দৃশ্যকে কাব্যময় করে তোলায় তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। শিল্পকলায় মুক্তি ও সত্যের জন্যে ফ্রান্সের 'রোমান্টিকরা' যে সংগ্রাম শুরু করেছিলেন তাকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যান মিইয়ে (Jean-Francois Millet, ১৮১৪-৭৫)। ফ্রান্সে তিনিই প্রথম আঁকলেন চাষীর ছবি; ভূদৃশ্যের ছবিতে সাজসজ্জার উপলক্ষ হিসাবে নয়, সত্যিকার চাষী যেভাবে জীবনযাপন করে, চলাফেরা করে ঠিক সেইভাবে তাদের ছবি আঁকলেন তিনি। তাঁর 'বীজবপনকারী' নামের জগদ্বিখ্যাত ছবিটি শুধু শ্রমের মর্যাদারই প্রতীক নয়, ভবিষ্যতের বীজবপনকারী বর্তমানেরও তা বিশ্বজনীন প্রতীক। ডাচ ধীবর পরিবারের অত্যন্ত সাদাসিধা দরিদ্র সংসারের ছবিকে খোলা জানালা দিয়ে অনবদ্য আলো এসে উদ্ভাসিত করে দিয়েছে। মিইয়ে যেমন মাঠে কাজ করতে থাকা চাষীর ছবি এঁকেছেন গণতন্ত্রপ্রিয় ইজরায়েলস সেইরকম ডাচ সংসারযাত্রার ও গার্হস্থ্য জীবনের ছবি এঁকেছেন। হারলেমের কাছে জান্টভোর্টের (Zantvoort) জেলেদের ছোট্ট গ্রামে বসবাস করে ইজরায়েলস তাদের জীবন নাট্য ও করুণ দৈনন্দিন জীবনের সন্ধান পেয়েছিলেন। 'ফ্রুগাল মীল' (Frugal Meal) ছবিতে গরিব মানুষের ঘরোয়া খাওয়াদাওয়ার ঘটনা যেন কোনো পূত পবিত্র ধর্মীয় প্রসাদ ভোজনের গাম্ভীর্য ও তীক্ষ্ণতায় মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। আবার 'পৃথিবীতে একা' ছবিটিকে গরিব মানুষের জীবনের দুঃখও যে গভীরতায় প্রাচীন যুগের বীরদের বিয়োগান্ত ভাগ্যের সমতুল্য তা ফুটে উঠেছে সদ্য স্বামীহারা এক গরিব গৃহস্থ বধূর বিলাপের ছবিতে। দারুণ রোগভোগের পর হার্লেমের কাছে জেলেদের এই গ্রামে থাকার সময় মিইয়ের মতো তিনিও আবিষ্কার করলেন সুদূর কোনো নির্জন গ্রামেও সাধারণ মানুষের জীবনও

যে ইতিহাসের কাহিনীর মতোই কত রোমান্স, উত্তেজনা ও বিপদময় ঘটনায় পূর্ণ হতে পারে তা সহানুভূতি ও বোধসম্পন্ন মানুষের চোখে ঠিক ধরা পড়বে। মিইয়ের সঙ্গে তাঁর তফাত এই যে মিইয়ে আঁকতেন ঘরের বাইরে খোলা আকাশের নীচে চাষীর জীবনযাত্রার ছবি, আর ইজরায়েলস পছন্দ করতেন ঘরের ভেতরের জেলেদের দৈনন্দিন জীবনের ছবি আঁকতে। তবে তাঁর ছবিতে দুঃখদুর্দশার সুর তীব্র নিখাদে বাজে। আলোর রশ্মিরেখা আঁকায় রেমব্রান্টের প্রভাব দেখা যায় তাঁর মধ্যে, কিন্তু জীবনের বিষণ্ণতাকেই তা স্পষ্ট করে তুলত। সাধারণ দর্শক ও পরিশীলিত রসিক সকলের কাছেই তাঁর ছবির আবেদন সমান, সকলের কাছেই তিনি সম্মানের পাত্র ও সুপরিচিত ঘনিষ্ঠের মতো প্রিয়জন।

কর্মসূত্রে ইজরায়েলেসকে মেজডাগ (Mesdag) নামে এক ব্যাঙ্কারের কাছে প্রায়ই যেতে হত। এর ছেলের নামও মেজডাগ (Hendrik Willem Mesdag, ১৮৩১-১৯১৫)। জন্ম গ্রোনিঙ্গেন শহরে। দীর্ঘকাল অ্যামেচার হিসাবে ছবি আঁকলেও ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করার পর পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে পুরোপুরি ছবি আঁকার উদ্দেশ্যে ব্রুসেলসে যান ১৮৬৬ সালে। সেখানে তখন তাঁর বন্ধু ও আত্মীয় আলমা-টাডেমা (Sir Lawrence Alma-Tadema ১৮৩৬-১৯১২) রয়েছেন। রোয়েলফস্-ও সেখানে। তাঁর কাছেই তিন বছর কাজ শিখলেন। ১৮৬৯ সালে দি হেগে ফিরে এলেন পুরোদস্তুর চিত্রশিল্পী হয়ে। বারবিজঁ এবং আধুনিক ডাচ শিল্পীদের ছবির গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রাহক হিসেবেও তাঁর পরিচয়। সমুদ্রের ছবি আঁকায় তিনি সিদ্ধহস্ত এবং বলা যেতে পারে এই ক্ষেত্রেই নিজেকে তিনি সঁপে দিয়েছিলেন। যথার্থতা, ভাস্বরতা ও সতেজতা এই সব ছবির বৈশিষ্ট্য। ঢেউয়ের গতিময়তা আর ভাসমান জাহাজটিকে উপযুক্ত অবস্থানে রাখার ব্যাপারে স্বাভাবিকতা যেমন ফুটে উঠেছে, বিশেষ করে 'এ সীস্কেপ' ছবিতে তেমনি তাতে ডিজাইনের দিক থেকে মণ্ডনধর্মিতা।

সতের শতকের 'ক্ষুদে ওস্তাদদের' মতোই উনিশ শতকের ডাচ শিল্পীদেরও মোটামুটি দুটি ভাগ: ইজরায়েলসের নেতৃত্বে জাঁর (genre) এবং মূর্তি চিত্রশিল্পীরা আর রোয়েলফস্ ও বারবিজঁপন্থীদের নেতৃত্বে ভূদৃশ্য চিত্রশিল্পীরা। প্রথম গোষ্ঠীর বিখ্যাত চিত্রকরদের মধ্যে আছেন ইউট্রেক্টের নিউহুইস ও আর্টজ (Albert Neuhuys ১৮৪৪-? ; D. A. Constant Artz ১৮৩৭-৯০) আর দি হেগের ব্লমার্স (B. Johannes Blommers ১৮৪৫-১৯১৪)। ঘর গৃহস্থালির ছবি ছাড়াও শোভেনিঙ্গেনের জেলেদের জীবনের ছবি শেষোক্ত দুজনেই আঁকতেন। তবে ব্লমার্সের ছবিতে করুণ সুর কখনও বাজে নি, আর জগৎপারাবারের তীরে শিশুদের খেলার আনন্দের স্বাদ যদি পেতে হয় তাহলে ব্লমার্সের ছবি দেখতেই হবে, আকাশ আর সমুদ্রের মিতালি যেমন একদিকে ধরা পড়েছে তেমনি আবার ইজরায়েলসের মতো জীবনের লঘু দিকের ছবি আঁকতেও তিনি সমান দক্ষ। এই শতকের বিখ্যাত নিবন্ধকার রবার্ট লিণ্ডের 'সী-সাইড' নামের রচনাটির চিত্ররূপ যেন পঞ্চাশ বছর আগে ধরে রেখেছেন ব্লমার্স তাঁর 'অন দি বীচ' ছবিতে।

ভূদৃশ্যের ছবি আঁকার ব্যাপারে এই সময়কার হল্যান্ডে যে শিল্পী কোরোর সব থেকে কাছাকাছি পৌঁছেছেন তিনি হলেন মাউভ (Anton Mauve ১৮৩৮-৮৮)। নানদানের এক ব্যাপ্টিস্ট পাদ্রীর ঘরে তাঁর জন্ম। কঠোর প্রোটেস্ট্যান্ট পরিবারে বড়ো হন তিনি যেখানে শিল্পকলার দিকে কোনো উৎসাহ কখনও পাওয়া সম্ভব ছিল না। বাড়ির অমতেই বলতে গেলে তাঁর ছবি আঁকা শেখার

শুরু ভান অস (Van Os) নামে এক নীরস আকাদেমিপন্থী শিক্ষকের কাছে। শিষ্যটি কিন্তু অত্যন্ত সূক্ষ্ম অনুভূতিশীল, প্রায় স্বপ্নালু এক যুবক। পরে আমস্টার্ডামে ইজরায়েলস, মারিস (Maris) ও অন্যান্য শিল্পীদের সংস্পর্শে এসে তাঁর অঙ্কনরীতি পুরোপুরি বদলে গেল—আরও শিথিল ও ব্যাপক হল তুলির ব্যবহার, বর্ণপাত্রে চোখ-জুড়ানো ধূসর, সবুজ, হালকা 'ফন' ও ফিকে নীল রঙের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতেন নিজেকে। ব্রুসেলসের 'ফ্রি সোসাইটি'তে প্রদর্শনী করেন তিরিশ বছর বয়সে। মেজডাগ ও হল্যান্ডের অন্যত্র কোরো আর দোবিনির ছবি দেখে প্রভাবিত হন। বিশেষ ভাবে হল্যান্ডের মাঠে প্রান্তরে এক ধরনের কোমল আবছায়া আলোর রেশ দেখা যায়। অল্পদিনের মধ্যেই মাউভের ছবিতে তা ধরা পড়ল অসীম মমতায় ও কাব্যধর্মী যথার্থতায়। শোভেনিঙ্গেনের বালিয়াড়িতে বসে অনেক বছর তিনি স্কেচ করেছেন, আর এখানে থাকতেই এঁকেছিলেন তার জগদ্‌বিখ্যাত ছবি 'বালির গাড়ি'। কী সরল আর স্নিগ্ধ বিশ্রামের পরিবেশ যদিও দৈনন্দিন কর্মব্যস্ত জীবনের থেকেই তাঁর ছবির বিষয়গুলো সচরাচর নেওয়া। তাঁর ছবিতে প্রায়ই গৃহপালিত প্রাণীদের উপস্থিতি সত্ত্বেও ছবির মধ্যে সেগুলো নিজেরা মুখ্য হয়ে উঠত না; মানুষের কর্মমুখর জীবনের সাহায্যকারী হিসাবেই তাদের ভূমিকাটা ফুটে উঠত। গাড়িটানার কাজে ঘোড়া, সমুদ্রের তীরে গাধা, মাঠে ঘাটে পথের ওপর গোরু, আবার চারণভূমি বা খোঁয়াড়ে ভেড়া—সকলের ওপরেই শিল্পীর স্নেহ। শেষ দিকের ছবিতে অবশ্য ভেড়ারই প্রাধান্য। আমস্টার্ডাম ও দি হেগের পর উত্তরপূর্ব অঞ্চলের মেষপালন ভূমি লারেনে গিয়ে তিনি স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। শান্তি ও সন্তোষের পরিবেশে কৃষিভিত্তিক জীবনের ছবি, নানা রকমের মানুষের মুখের যেসব ছবি তিনি এঁকেছেন তার মধ্যে শিল্পীর গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও রসবোধ প্রকাশ পেয়েছে।

এর পরে আসে একই ডাচ পরিবারের তিন শিল্পীর কথা। এঁরা সকলেই জন্মেছিলেন দি হেগে। প্রাহার মারিস ছিলেন এক অবস্থাপন্ন কিন্তু বাউণ্ডুলে প্রকৃতির ফৌজী মানুষের ছেলে। এক ডাচ মেয়েকে বিয়ে করে হল্যান্ডের এই রাজধানীতে ছাপাখানা খুলে বসবাস করতে শুরু করেন। ১৮৩০ সালে নেদারল্যান্ডসের হয়ে যুদ্ধও করেন। এই যুদ্ধেই বেলজিয়াম স্বাধীনতা অর্জন করে। মুদ্রাকরের তিন ছেলে জ্যাকব বা জেমস (১৮৩৭-৯৯), মাথিস্‌ বা ম্যাথ্যু (১৮৩৯-১৯১৭), আর ভিলেম বা উইলিয়াম (১৮৪৪-?)। ছোটোবেলায় তিন ভাইয়ের মধ্যেই আঁকার হাত লক্ষ করা যায়। জেমস ও ম্যাথ্যুর মধ্যে খুব ভাব। ১৮৫৫তেই হল্যান্ডের রানী সোফিয়ার (Sophie) চোখে পড়ে গেলেন ম্যাথ্যু এবং বৃত্তি পেলেন। মিতব্যয়ী বাবা একই টাকায় দুই ছেলেকেই আন্তোয়ার্প আকাদেমিতে ছবি আঁকা ও লেখাপড়া শিখতে পাঠিয়ে দিলেন। আলমা-টাডেমার বাড়িতে দুজনেই থাকেন এবং সেই সূত্রে তাঁর আত্মীর মেজডাগ, ইজরায়েলস ও অন্যান্য নামকরা ডাচ শিল্পীদের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় হয়ে গেল, তবে সমসাময়িক এই সব বিখ্যাত শিল্পীদের প্রভাব এত অল্পবয়সে তাঁদের ওপর পড়েনি। ভান হোভের (Van Hove) শিক্ষকতায় জেমস ডিটেলসের সূক্ষ্মতার ব্যাপারে পারদর্শিতা লাভ করলেন। মেজডাগ মিউজিয়ামে রক্ষিত মাত্র তেইশ বছর বয়সে তাঁর আঁকা 'একটি ডাচ বাড়ির ভেতরের দৃশ্য' ছবিটি ডে হোখের স্টাইলে আঁকা। ঘরের মাঝখানে বাঁ দিক ঘেঁসে একটা রোদ ঝলমল জায়গা, সামনের জমিতে ঢোকবার হলঘরে একজন পরিচারিকা দাঁড়িয়ে; তার একহাতে বাস্কেট, অন্য হাতে টিনের কেঁড়ে। যথাযথভাবে খুঁটিনাটি জিনিসের ছবি এখন থেকেই তাঁর গৃহাভ্যন্তর দৃশ্যের ছবির বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠল। ১৮৬৫

সালে পারিতে গিয়ে সেখানে বছর ছয়েক থাকলেন। বারবিজঁর ওস্তাদ শিল্পীদের প্রভাবে এসে কালে কালে তাঁর স্টাইলটা হয়ে উঠল ব্যাপকতর, আগেকার ডিটেলসের ঘনিষ্ঠতা ছাড়লেন, জাঁকজমকের একটা সাধারণ ভাব ফুটিয়ে তোলাই এখন হল তাঁর লক্ষ্য। আভিজাত্য ও রাজকীয় দৃষ্টিভঙ্গি আয়ত্ত করার ক্ষেত্রে পরিণত কাজে রুইজডায়েলের তিনি ঘনিষ্ঠ। 'দি স্টোন মিল' বা 'ডরড্রেক্ট' ছবিতে সাধারণভাব সৃষ্টির কাছে বিশেষ বস্তুগুলোর গুরুত্ব কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। চাপ চাপ আলোছায়ার সঙ্গে যাবতীয় ডিটেলসকে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে, অথচ 'উত্তরাঞ্চলের ভেনিস' নামে বিখ্যাত এই শহরের 'গ্রোটে কের্কে' তার জাহাজ চলাচল, তার চওড়া খাল, মাথার উপর আকাশের ঘনঘটা ইত্যাদি মূল বৈশিষ্ট্যগুলো সকলেরই নজর কাড়বে।

অল্পবয়সে তিন ভাইয়ের মধ্যেই স্টাইলের মিল থাকলেও উইলিয়ামের বিস্তারই অপেক্ষাকৃত সীমাবদ্ধ। অন্য ভাইদের তুলনায় ইনি রোয়েলফ্‌সের বেশি কাছাকাছি। খাড়া দিনের আলোয় গোরুবাছুর সমেত ভূদৃশ্যের ছবি আঁকতে তিনি ভালোবাসতেন; ফলে ছবিগুলো অন্য ভাইদের ছবির তুলনায় রঙের দিক থেকে বেশি উজ্জ্বল ও বেশি প্রফুল্ল হত। বালিয়াড়ির সীমানা বরাবর একটা মাঠ, তাতে দুচারটে বেঁটেখাটো গাছ, কয়েকটা গোরু, ঠিক সামনের জমিটাতে হয়তো বা একটা পুকুর, মাথার ওপরে মেঘলা আকাশ—এসব দেখলে প্রথমেই মনে হবে এটা বোধ হয় উইলিয়াম মারিসের আঁকা। মাউভের থেকে কম কাব্যধর্মী, জেমসের থেকে কম ঐশ্বর্যপূর্ণ, ম্যাথ্যুর থেকে কম রোম্যান্টিক এক আনন্দময় বাস্তবপন্থী চিত্রকর ইনি। বর্ণসম্ভারে ভরা তাঁর ছবিতে রোদের ছড়াছড়ি, হল্যান্ডের গোচারণভূমির শ্যামলিমার প্রাচুর্য।

ম্যাথ্যু কিন্তু শুধু ভাইদের থেকেই নয় তাঁর প্রজন্মের সমস্ত ডাচ শিল্পীদের থেকেই আলাদা। প্রফেসর আর. মুথার বলেছেন তাঁর মধ্যে একটা টিউটনিক জাতিসুলভ মধ্যযুগীয় অতীন্দ্রিয়বাদ দেখা দিয়েছিল। দি হেগ ও আন্তোয়ার্পের পর পারিতেও জেমস আর ম্যাথ্যু একই সঙ্গে ছবি আঁকার চর্চা করেছেন। তবে ১৮৫৮ সালে দুই ভাই আন্তোয়ার্পে থেকে দি হেগে ফিরে আসার বছর তিনেক পরে ছবি নকল করে কিছু পয়সা হাতে জমলে ব্ল্যাক ফরেস্টের ভেতর দিয়ে সুইজারল্যান্ডে যান এবং ফেরার পথে দিজঁ (Dijon) থেকে পুই-দ্য-দোম (Puy-de-Dôme) পর্যন্ত ফ্রান্সের ভেতর দিয়ে আসেন। জেমসের উপর এই ভ্রমণের বিশেষ প্রভাব পড়ল না, কিন্তু মধ্য ফ্রান্সে যেসব রোম্যান্টিক দুর্গপ্রাসাদ ও অট্টালিকা তাঁরা দেখেছিলেন ম্যাথ্যুর কবিসুলভ কল্পনার জগতে তার প্রচণ্ড প্রভাব পড়ে। সেগুলোকে তিনি জাদুময় প্রাসাদ বলে মনে করতেন। এমন কি ১৮৭২ সালে আঁকা 'মুরগিদের খাওয়ানো' থেকে তিনি জেমসের সঙ্গে পারিতে থাকেন এবং ১৮৭০ সালে আঁকা তাঁর 'মঁমার্ত্র' (Montmartre) ছবিটি নিখুঁত পরিশীলিত রিয়ালিজমের ছবি, রোম্যান্টিকতার নামগন্ধ সেখানে নেই।

ফ্রাঙ্কো-প্রুশিয়ান যুদ্ধের সময় জেমস দেশে ফিরে এলেন, ম্যাথ্যু কিন্তু পারিতে থেকে গেলেন। পারি অবরোধ স্বচক্ষে দেখলেন, অন্যান্যদের মতো 'মিউনিসিপ্যাল গার্ড' বাহিনীতে নাম লিখিয়ে আজনিয়েরের (Asniéres) উল্টো দিকে মঁ ভালেরিয়েঁর (Mont Valérien) পাহাড়ের ঠিক কোলে ঘাঁটি তৈরির কাজে ডিউটি দিলেন। কিন্তু এইসব খুনখারাবির কাজ তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। পরে অবশ্য স্বীকার করেছেন বন্দুকে তিনি কোনো দিন গুলি ভরেন নি, কেবল তার ভান করেছেন। কিন্তু যুদ্ধের এই অভিজ্ঞতার ফলে নিজের মধ্যে তিনি গুটিয়ে গেলেন, ক্রমেই আরও বেশি বেশি

করে নির্জনে থাকতে শুরু করেন। শেষে ১৮৭২ সালে লন্ডনে গিয়ে বসবাস করতে থাকেন। এখানে ডাকিয়েল কটিয়ের (Dakiel Cottier) নামে এক মণ্ডনশিল্পীর বাড়িতে থাকতে যেসব ছবি এঁকেছিলেন তাতে ইংরেজ চিত্রকর কবি রসেটির (Rossetti) মতো কাল্পনিক জগতের রোম্যান্টিক ভাববিলাস দেখা যায়। ছবিগুলো প্রশংসা পেলেও নিজে কিন্তু তিনি খুশি হলেন না। ১৮৮৭ সালে 'সেন্ট জনস উড'-এ গেলেন দিন পনের কাটাবেন বলে, কার্যত থেকে গেলেন উনিশ বছর। ১৯০৬ সালে প্যাডিংটনে আধখানা ফ্ল্যাট পেলেন, তার মধ্যে ছোট্ট একখানা ছবি আঁকার ঘর। ব্যস্, সেই ১৯১৭ সালের সতেরই অগাস্ট মৃত্যুর দিন পর্যন্ত সেখানেই লোকচক্ষুর অগোচরে দিন কাটিয়ে দিলেন। চাইলে ছবি বিক্রি করে তিনি প্রচুর উপার্জন করতে পারতেন, কিন্তু মুশকিল হল কি নিজের আঁকা একটি ছবিও তিনি প্রাণ ধরে বিক্রি করতে পারতেন না। সংসারত্যাগী সাধুর মতো নিজের স্বপ্ন নিজের মনে রেখে জীবন কাটিয়ে গেলেন।

ইতোমধ্যে ফরাসী বিপ্লব থেকে শুরু করে গোটা ইউরোপে জার্মান রোম্যান্টিসিজম, ন্যাচারালিজম, রিয়্যালিজম, ইম্প্রেশনিজম ইত্যাদি নানাধারার উদ্ভব ও ঘাত প্রতিঘাতে পাশ্চাত্য চিত্রকলার জগতে এক অভূতপূর্ব নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হল এবং আধুনিক চিন্তাধারা ও চিত্রকলার পটভূমি তৈরি হল যেখানে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশের নিজস্ব শিল্পচর্চার ধারা এসে মিলে এক উদ্দাম ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি হল।

ভ্যান গঘের চিত্রকর্ম যুগসন্ধিক্ষণের সেই প্রচণ্ড আবর্তেরই এক উজ্জ্বল অংশ।

রচনা-পরিচিতি

‘মৃত্যুমাঝে ঢাকা আছে যে অন্তহীন প্রাণ’

ভিনসেন্টের মৃত্যুতে শোকাহত হয়ে এবং তেওকে সমবেদনা জানিয়ে চিঠি লিখেছিলেন তাঁর আত্মীয় পরিজন সহ বহু বন্ধু। এইসব শোকলেখন এবং পত্রাবলী প্রকাশিত হয়েছে ‘আ গ্রেট আর্টিস্ট ইজ ডেড/লেটার্স অব কনডোলেনস অন ভিনসেন্ট ভ্যান গঘস ডেথ’ (১৯৯২) নামক গ্রন্থে। সেখান থেকে কয়েকটি সংকলিত হয়েছে।

ইউজিন বক (১৮৫৫-১৯৪১)। বেলজিয়ান শিল্পী। ভিনসেন্টের আর্লের বন্ধু। বককে বিশেষ পছন্দ করতেন ভিনসেন্ট। তাঁকে মডেল করে ‘কবি’ নামে ছবিটি আঁকতে চেয়েছিলেন ভিনসেন্ট।

এইচ টি লত্রেক [আঁরি দ্য তুলুজ-লত্রেক (১৮৬৪-১৯০১)]। পারিতে করমোঁর স্টুডিওয় দু মাস পাঠ নেওয়ার সময় লত্রেকের সঙ্গে আলাপ হয় ভিনসেন্টের। পরে, মঁমার্ত্রে থাকার সময় দুজনের বন্ধুত্ব গাঢ় হয়। বেলজিয়ান শিল্পী চার্লস দ্য গ্রুখ (১৮৬৭-১৯৩০) ভিনসেন্ট সম্পর্কে কটু মন্তব্য করলে লত্রেক তাঁকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেছিলেন। ৬ জুলাই ১৮৯০ তেওর বাসায় ভিনসেন্টের সঙ্গে দেখা করেন লত্রেক। দুপুরে একত্রে আহার এবং ঠাট্টামস্করাও করেন। লত্রেক একটি প্রতিকৃতি এঁকেছিলেন বন্ধু ভিনসেন্টের।

ক্লদ মোনে (১৮৪০-১৯২৬)। মোনের সঙ্গে কোনোদিনই দেখা হয়নি ভিনসেন্টের তবে মোনে তাঁর ছবির অনুরাগী ছিলেন।

গাসে [ডা. পল-ফার্দিনান্দ গাসে (১৮২৮-১৯০৯)]। সমাজতাত্ত্বিক, ডারউইনপন্থী, হোমিওপ্যাথ ও মনস্তাত্ত্বিক গাসে নিজেও ছিলেন একজন সংগ্রাহক ও শখের শিল্পী। পল ভান রিজেল নামে তিনি ছবিতে সই করতেন এবং নিজের ছাপাখানায় ছবি ছাপতেন। সেজান, পিসারো প্রমুখ তাঁর বন্ধুদের এই ছাপাখানা ব্যবহারে উৎসাহ দিতেন গাসে। ভিনসেন্ট গাসের প্রতিকৃতি এঁকেছিলেন। ডা. গাসেও এঁকেছিলেন ভিনসেন্টের—চিরনিদ্রিত ভ্যান গঘের প্রশান্ত মুখখানি।

জন পি রাসেল (১৮৫৮-১৯৩১)। অস্ট্রেলিয়ান শিল্পী। লন্ডন ও পারিতে (করমোঁর স্টুডিওয়) শিখেছিলেন ছবি আঁকা। ভিনসেন্টের প্রতিকৃতি এঁকেছিলেন। ভিনসেন্ট তাঁর ছবি পছন্দ করতেন। রাসেলের সঙ্গে চিঠিপত্রেও তাঁর যোগাযোগ ছিল।

জোয়ান [জোয়ান মারিনাস ভান হুটেন (১৮৫০-১৯৪৫)]। ভিনসেন্টের বোন আন্নাকে বিবাহ করেছিলেন। নিজের ব্যাবসা ছিল। এঁর বিচারবুদ্ধির উপর তেওর আস্থা ছিল। তেও প্রথম তাঁকেই ভিনসেন্টের মৃত্যুসংবাদ জানিয়েছিলেন।

তেও [তেও ভ্যান গঘ (১৮৫৭-৯১)]। ভিনসেন্টের অনুজ। পারিতে আসেন ১৮৭৮এ। বুসো অ্যান্ড ভালাদোঁ নামক ছবি কেনাবেচার ফার্মে কর্মসূত্রে যুক্ত ছিলেন। কর্তাদের সম্মতি ছাড়াই তেও ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পীদের বহু ছবি সংগ্রহ করেছিলেন। ভিনসেন্ট মারা যাবার পর তিনিও বেশিদিন বাঁচেননি। ২৫ জানুয়ারি ১৮৯১ উট্রেক্টে তেওর মৃত্যু হয়।

পল গোগ্যাঁ (১৮৪৮-১৯০৩)। পারিতে জন্ম। বেড়ে উঠেছিলেন পেরুতে। সাত বছরের নাবিক-জীবন এবং পরবর্তীকালের সফল স্টকব্রোকারের ভূমিকা ঝেড়ে ফেলেছিলেন শিল্পের অমোঘ টানে। ইম্প্রেশনিস্টদের প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছিলেন কয়েক বছর।

ভিক্টর ভিন (১৮৪৭-১৯০৯)। ইম্প্রেশনিস্টদের প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছিলেন কয়েকবার। তেও তাঁকে চিনতেন, তাঁর ছবি সংগ্রহ করেছিলেন। দু বছরের পারি-বাসে ভিনের সঙ্গে সম্ভবত ভিনসেন্টের দেখা হয়েছিল। ভিনের সঙ্গে ভাগাভাগি করে একটি স্টুডিও ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন ভিনসেন্ট। তেওকে এ বিষয়ে জানিয়ে কোনো সাড়া পাননি।

ভিল [ভিলেমিনা] ভ্যান গঘ (১৮৬২-১৯৪১)। ভিনসেন্টের কনিষ্ঠতম সহোদরা। প্রভ্যাঁসে থাকার সময় ভিনসেন্ট এঁর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলতেন। নিয়মিত চিঠি লিখতেন। শিল্পে আগ্রহ ছিল ভিলের। স্কেচ করতে পছন্দ করতেন। ডাচ নারীবাদী আন্দোলনের সঙ্গে আদিপর্বে যুক্ত ছিলেন। শেষ জীবনে বহু বছর উন্মাদাশ্রমে কাটিয়েছিলেন।

মা [আন্না কর্নেলিয়া কারবেনতুস (১৮১৯-১৯০৭)]। দ্য হেগে তাঁর জন্ম হয়েছিল। পিতা ভিলেম কারবেনতুস বই-বাঁধাইকর ছিলেন। হল্যান্ডের প্রথম সংবিধান তিনিই বাঁধিয়েছিলেন। আন্নার অনেক গুণের একটি ছিল প্রকৃতি-প্রেম। মনের ভাবনাকে পারতেন কাগজে-কলমে ফুটিয়ে তুলতে। সেলাই-ফোঁড়াই করতেন অবিরাম আবার প্রতিবেশীর সেবায় নিজেকে উজাড় করে দিতে দেরী করতেন না। ঠিক সময় ঠিক কথাটি জানিয়ে দিতে তাঁর এতটুকু ভুল হত না। স্বামীর মৃত্যুর পর কিছুদিন ব্রেডায়, পরে লীডেনে থাকতেন। এই সময় তাঁর কাছে থাকতেন কন্যা ভিল।

সি. [কামিল]। পিসারো (১৮৩০-১৯০৩)। ওয়েস্ট ইন্ডিজে এক স্বচ্ছল পরিবারে জন্ম। শিক্ষা সমাপ্ত করতে তাঁকে পারিতে পাঠানো হয়েছিল। ভিনসেন্টের সঙ্গে প্রথম আলাপ হয় তাঁর পারিতে, ১৮৮৭র শরতে। পিসারোর সঙ্গে ছবির আদান-প্রদান করেছিলেন ভিনসেন্ট।

সি. [চার্লস] ওবাক। লন্ডনে গুপিল গ্যালরির পরিচালক এবং সেই সূত্রে ছিলেন ভিনসেন্টের উপরঅলা। ওবাক তাঁকে কয়েকবার বাড়িতে ডেকেছিলেন। একবার বক্স হিল নামে এক সুন্দর জায়গায় বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিলেন ভিনসেন্টকে। ভিনসেন্ট অবশ্য কস্মিনকালেও তাঁর নামোচ্চারণ করেন নি। পরবর্তীকালে ওবাক নিজেই স্বাধীন ব্যাবসা শুরু করেন। ভেলটেন ছিলেন তাঁর ব্যাবসার অংশীদার।

স্মৃতির ক্যানভাস

প্রথম সাতটি এবং দশম স্মৃতিকথাটি নেওয়া হয়েছে ভিনসেন্ট ভ্যান গঘের তিন-খন্ড পত্রাবলী থেকে। অষ্টম স্মৃতিকথার সূত্র পাস্কাল বোনাফুর গ্রন্থ 'ভ্যান গঘ/দ্য প্যাশনেট আই'। পল গোগ্যাঁর স্মৃতিকথাটি নেওয়া হয়েছে তাঁর 'দ্য রাইটিংস অফ আ স্যাভেজ' গ্রন্থ থেকে। শেষ স্মৃতিকথাটির উৎস অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তর প্রতিবেদন 'একটি প্রদর্শনীর পথে' (দেশ/ ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৯০)।

পল সিন্যাক (১৮৬৩-১৯৩৫)। ফরাসী চিত্রশিল্পী। সিন্যাককে তাঁর তরুণ বয়সে সাহায্য করেছিলেন শিল্পী মোনে। সিন্যাক পরে ইম্প্রেশনিস্ট রীতিতে ছবি আঁকা শুরু করেন। সুরার সঙ্গে আলাপ হবার পর বিন্দুবাদ (Pointillism)-এর দিকে ঝোঁকেন। ইম্প্রেশনিস্ট শেষ প্রদর্শনীতে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। রঙের বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ বিষয়ে তাঁর তত্ত্ব তিনি D'Eugène Delacroix au néo-impressionisme (১৮৯৯) নামক গ্রন্থে প্রকাশ করেন।

[আমার কথা]

উয়েলউইন থেকে তেওকে একটি চিঠি লেখেন ভিনসেন্ট ১৭ জুন ১৮৭৬। তার একস্থানে লিখেছেন, 'লন্ডনে ছিলাম দু দিন। নানাজনের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করার জন্য ছোটাছুটি করেছি নানা জায়গায়। একজন যাজকের সঙ্গে দেখা করেছি। তাঁকেও লিখেছি। তার একটা অনুবাদ এই সঙ্গে রইল। তোকে পাঠাচ্ছি যাতে তুই বুঝতে পারিস "পিতঃ, আমি যোগ্য নই" এবং "পিতঃ, আমাকে করুণা করো" এই অনুভূতি দিয়ে শুরু করেছি।'
অসমাপ্ত এই আবেদনপত্রের শিরোনাম বর্তমান সংকলক প্রদত্ত।

[জীবন তীর্থযাত্রীর পথপরিক্রমা]

রিচমন্ডে থাকার সময় রেভারেন্ড টি. স্লেড জোনস-এর অধীনে একটি মেথডিস্ট চার্চে কিছুকাল কাজ করেন ভিনসেন্ট। সেই সময় তিনি রবিবাসরীয় বাণী ও উপদেশ প্রচার করতেন। এই উপদেশটি ভিনসেন্ট ডাচ ও ইংরেজিতে নিজেই রচনা করেছিলেন। ভাইকে লিখেছেন, 'তেও, গত রবিবার [৪ নভেম্বর ১৮৭৬], ঈশ্বরের আবাসে, যার সম্পর্কে লিখিত আছে, "এই স্থলে তোমাকে শান্তি দিব", তোর ভাই এই প্রথম উপদেশ দিল।...

নির্মল শারদীয় দিন। টেমস বরাবর রিচমন্ড পর্যন্ত সুন্দর হন্টন। হলুদ পাতার ভার নিয়ে চেস্টনাট গাছেরা আর পরিষ্কার সুনীল আকাশের ছায়া পড়েছে টেমসে। গাছের মাথার ভেতর দিয়ে দেখা যায় রিচমন্ডের অংশবিশেষ : সেখানে পাহাড়, লাল-ছাদ বাড়ি, পর্দাবিহীন বাতায়ন আর সবুজ উদ্যান; তাদের মাথার উপর সূচালো কাণ্ড; নীচে দীর্ঘ ধূসর সাঁকো, দু পাড়ে লম্বা পপলারশ্রেণী, তার উপর দিয়ে ছোট্ট কালো মূর্তির মতো পারাপার করছিল মানুষজন।

বেদীর উপর যখন দাঁড়ালাম, মনে হল যেন কেউ একজন নীচের অন্ধকার গুহা থেকে ফিরে এল বন্ধু দিবালোকে।'

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে প্রবল বাইবেল ভক্ত ভিনসেন্ট নিয়মিত চার্চে যেতেন

বাণী ও উপদেশ শুনতে। সেইকালে প্রচারকরূপে সুনাম অর্জন করেছিলেন এলিজা লরিলার্ড (১৮৩০-১৯০৮)। ভিনসেন্ট লরিলার্ডের প্রচারিত উপদেশ শুনেছিলেন। লরিলার্ড সম্পর্কে লিখেছিলেন ভিনসেন্ট, "তিনি যেন আঁকেন আর তাঁর কাজ সেইসঙ্গে উচ্চস্তরের মহান শিল্প। সত্যার্থে তাঁর আছে শিল্পীর অনুভূতি।"

ভ্যান গঘের মতে লরিলার্ড ছিলেন শিল্পী-প্রচারক আর সমালোচকের মতে ভ্যান গঘ ছিলেন প্রচারক-শিল্পী।

ভিনসেন্ট প্রচারিত উপদেশ-বাণীতে লরিলার্ডের প্রভাব সম্ভবত অল্প পরিমাণে ছিল।

[একটি পত্রপ্রতিবেদন]

তেওকে লেখা এই পত্রটির রচনাকাল অক্টোবর-নভেম্বর ১৮৮৩। শিরোনাম বর্তমান সংকলকের।

এই যে আমি]

প্রধানত ভাই তেও এবং বোন ভিলহেলমিনা (সূচক : ডবলু), বন্ধু বার্নার্দ ও রাপার্ডকে (সূচক যথাক্রমে বি এবং আর) লেখা চিঠিপত্র থেকে সূক্তিগুলি চয়িত হয়েছে। সূক্তিশেষে মুদ্রিত সংখ্যাটি পত্রের ক্রমসূচক।

আন্তন জেরার্ড আলেকসান্দার রাইডার ভান রাপার্ড (১৮৫৮-৯২)। ভিনসেন্টের বন্ধু। এঁকে বহু চিঠিপত্র লিখেছিলেন, তার মধ্যে আটান্নটির সন্ধান পাওয়া যায়।

রাপার্ডের জন্ম হয়েছিল জিস্টে। আমস্টার্ডাম গিয়েছিলেন সেখানকার ন্যাশানাল একাডেমিতে পড়বেন বলে। শিক্ষা অসমাপ্ত রেখে কাজ করতে শুরু করেন প্রথমে ব্রাসেলসে, পরে পারিতে। ব্রাসেলসে থাকার সময় একটি শিল্পী সংগঠনের সদস্য হয়েছিলেন। সে সময়ে বহু ডাচ শিল্পীর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। 'দ্য সেলফিশ ক্লাব' নামে তিনি একটি শিল্পীসংঘের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

প্রিয় মি. ওরিয়ের]

ভিনসেন্টের জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয় একটিমাত্র চিত্রসমালোচনা 'মার্কার দ্য ফ্রাঁস' পত্রিকায় (জানুয়ারি ১৮৯০)। সমালোচক : গুস্তাভ-আলবেয়র ওরিয়ের। সমালোচনাটি পাঠ করে ভিনসেন্ট এই পত্রটি লিখেছিলেন ওরিয়েরকে। এটি তিনি প্রথমে পাঠিয়েছিলেন তেওকে। লিখেছিলেন, 'পড়ার পর সঙ্গের চিঠিটা তুই মি. ওরিয়েরকে পাঠিয়ে দিস।' গোগ্যাঁকে পড়াবার জন্য ভিনসেন্ট তাঁর এই পত্রের প্রতিলিপি করে রেখেছিলেন। চিত্রব্যবসায়ী আলেকসান্দার রীদ, এইচ. সি. টেরস্টেগ এবং সি. এম. ভ্যান গঘ-কে ওরিয়েরের সমালোচনার প্রতিলিপি পাঠাবার কথা ভেবেছিলেন ভিনসেন্ট।

বিচ্ছিন্ন মানুষেরা : ভিনসেন্ট। গুস্তাভ-আলবেয়ার ওরিয়ের (১৮৬৫-৯২)

কবি-দার্শনিক। আইনের ছাত্র ওরিয়ের নিজে লিখতেন, আঁকতেন। রেমি দ্য গুরমোঁ তাঁর নাম দিয়েছিলেন 'চিত্রসমালোচনায় আবিষ্কারক'। 'ল্য মদার্নিস্ত' নামে তিনি একটি স্বলায়ু (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর ১৮৮৯) পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন। তেওকে লেখা ভিনসেন্টের চিঠিপত্র অবলম্বনে তাঁর একটি জীবনী লেখার ইচ্ছা পূরণ হয়নি ওরিয়েরের শুধুমাত্র প্রকাশকের অভাবে। সমালোচনার শুরুতে উদ্ধৃত কবিতাটির কবি সম্ভবত ওরিয়ের স্বয়ং।

মহান পবিত্র শিল্পী। ওক্তাভ মির্ব্যু (১৮৫০-১৯১৭)

সাংবাদিক এবং ঔপন্যাসিক। মোনে ও রঁদ্যার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। ভিনসেন্ট, গোগ্যাঁ প্রমুখ নব্যধারার শিল্পীদের পক্ষে ছিলেন মির্ব্যু। ফরাসীদের সঙ্গে মেটারলিঙ্কের প্রথম পরিচয় করিয়ে দেন তিনি। দান্তের 'ইনফার্নো'র ব্যঙ্গ করে মির্ব্যু একটি উপন্যাস লেখেন 'যন্ত্রণার উদ্যান' (১৮৯৯)।

সংকলিত রচনাটির উৎস তাঁর দিনলিপি।

সব-কিছুর উপরে—একজন চিত্রকর। এমিল বার্নার্দ (১৮৬৮-১৯৪১)

চিত্রকর, লেখক এবং কবি বার্নার্দের সঙ্গে ভিনসেন্টের বন্ধুত্ব হয় পারির করমোঁ স্টুডিওর দিনগুলোতে। ভিনসেন্টের মৃত্যুর পর তাঁর একটি জীবনী রচনা করেছিলেন বার্নার্দ। ভিনসেন্টের সঙ্গে তাঁর পত্রালাপ ছিল। বার্নার্দকে লেখা ভিনসেন্টের পত্রাবলী প্রকাশকালে (১৯১১) বার্নার্দ একটি মুখবন্ধ লেখেন।

সংকলিত রচনাটি তার অনুবাদ।

'লাস্ট ফর লাইফ' : পূর্বকথা। আর্ভিং স্টোন (১৯০৩-৮৯)

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রানসিসকোয় স্টোন-এর জন্ম। মৃত্যু লস এঞ্জেলিসে। দক্ষিণ কালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. (১৯২৪) করেন। প্রথম জীবনে নাটক ও গোয়েন্দা কাহিনী লিখতেন।

ভিনসেন্টের জীবন অবলম্বনে লেখা হয়েছে একাধিক উপন্যাস। আর্ভিং স্টোন-এর এই উপন্যাসটি তাদের ভেতর জনপ্রিয়তম। সতেরজন প্রকাশক স্টোনের পাণ্ডুলিপি ফেরত দিয়েছিলেন। প্রকাশের (১৯৩৪) পর উপন্যাসটি সুইডিশ, ড্যানিশ, জার্মান, ডাচ সহ নানা ভাষায় অনুবাদিত হয়। পরবর্তীকালে এটি চলচ্চিত্রায়িতও হয় (১৯৫৬)।

মাইকেল এঞ্জেলো ও কামিল পিসারোর জীবনী অবলম্বনে আর্ভিং স্টোন লিখেছিলেন দুটি উপন্যাস, যথাক্রমে 'দ্য অ্যাগনি অ্যান্ড একসট্যাসি' (১৯৬১) এবং 'ডেপথস অব গ্লোরি' (১৯৮৫)।

ভ্যান গঘ : কবি হিসাবে চিত্রকর। স্টিফেন স্পেন্ডার (১৯০৯-৯৫)

কবি, সমালোচক, প্রাবন্ধিক। ফাশিস্ত ফ্র্যাঙ্কোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে স্পেনে

গিয়েছিলেন। কবি-সমালোচক অডেনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী স্পেন্ডারের মূল রচনাটির উৎস : 'ভ্যান গঘ/অ্যান আর্ট নিউজ পিকচার বুক' (১৯৩৫) নামক গ্রন্থ।

বিয়োগান্ত ঘটনাটির রোগনির্ণয়। ডা. জোয়াকিম বেয়ার

মূল ইংরেজি প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় 'ভ্যান গঘ/অ্যান আর্ট নিউজ পিকচার বুক' (১৯৩৫)-এ।

চূড়ান্ত বিপর্যয়ের মধ্যেও প্রশান্ত। ডবলু. এইচ. অডেন (১৯০৭-৭৩)

ইংরেজ কবি, পরবর্তীকালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন (১৯৪৬)। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'পোয়েমস' (১৯২৮)-এর প্রকাশক ছিলেন বন্ধু স্টিফেন স্পেন্ডার।

'ভ্যান গঘ/আ সেলফ পোর্ট্রেট' (১৯৬১/ভিনসেন্টের চিঠির সংকলন) গ্রন্থ সম্পাদনাকালে লিখিত অডেনের মুখবন্ধের অনুবাদ।

পাখি নদীর পাড়ে যে নক্ষত্রযাত্রার শুরু। এ. এম. হামাচার (জ. ১৮৯৭)

ডাচ সমালোচক, শিল্প-ঐতিহাসিক। ওটারলুর ক্রোলার-ম্যুলার সংগ্রহশালার পরিচালক (১৯৪৮-৬৩)। মিডলবুর্গ থেকে তিনি উট্রেক্ট এসেছিলেন আইনবিদ্যা পড়তে। ১৯১৯-এ গিয়েছিলেন যুদ্ধবিধ্বস্ত বেলজিয়াম ও ফ্রান্স পরিদর্শনে। পারিতে পরিচিত হন আঁরি বারবুসের সঙ্গে।

'ভ্যান গঘ' (১৯৬১) নামক গ্রন্থের জন্য হামাচার একটি ভূমিকা লেখেন। সংকলিত রচনাটি তার ঈষৎ সংক্ষেপিত অনুবাদ।

খ্যাপা শিল্পী ভিনসেন্ট। কনসটানটিন পাউসটোভস্কি (?-১৯৬৮)

-লিখিত শিল্প ও শিল্পী বিষয়ক রচনার একটি সংকলন রাশিয়ান ভাষায় প্রকাশিত হয় (১৯৬৬)। মস্কোর প্রোগ্রেস পাবলিশার্স তার ইংরেজি অনুবাদ 'আ বুক অ্যাবাউট আর্টিস্টস' প্রকাশ করে (১৯৭৮)। শেষোক্ত গ্রন্থাবলম্বনে বর্তমান অনুবাদ।

ভ্যান গঘ প্রসঙ্গে। পল কক্স্ (জ. ১৯৪০)

জন্ম নেদারল্যান্ডসে। বর্তমানে অস্ট্রেলিয়াবাসী। চলচ্চিত্রকার। উল্লেখযোগ্য চিত্রকর্ম : ভিনসেন্ট (১৯৮৮)। দ্য নান অ্যান্ড দ্য ব্যান্ডিট (১৯২২)। তথ্যচিত্র : কলকাতা (১৯৭০)। মূল ইংরেজি প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল অস্ট্রেলিয়ার 'সানডে অবজার্ভার' পত্রিকায়।